বাছাই গল্প

সূচিপত্র

অমলিনাদি

খবরটা দিয়েছিল কুন্তলা। কয়েকদিন আগে নিউ সিনেমার সামনে ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। বয়েমের গায়ে চামচ ঠুকতে ঠুকতে অমলিনা ধীর পায়ে হাঁটছিল। পিছন থেকে কুন্তলাই ডেকেছে, ও অমলিনাদি, অমলিনাদি, ও...।

চেনাশোনা লোকজনের সঙ্গে আজকাল আর দেখা হয় না। পরিচিত মুখগুলো এক এক করে হারিয়ে যাচ্ছে। কুন্তলার ডাকে অমলিনা চমকে গেছিল। খুব চেনা গলার স্বরে শরীরটা এক মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেছে। অমলিনা ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিল—কুন্তলা। সারা মুখে খুশি ছড়িয়ে হাসছে। সিঁথি জুড়ে সিঁদুর, কপালে নিখুঁত গোল টিপ। একই রঙের শাড়ি-ব্লাউজ।

কুন্তলা দ্রুত এগিয়ে এসে গা ছুঁয়ে বলেছিল, আমি ঠিক চিনেছি...। তুমি আমার সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার পরই মনে হল, আরে অমলিনাদি না! তাই তোমাকে ডাকলাম। বলো, কেমন আছ! কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল বলো তো!

অমলিনা হেসেছিল। ম্লান হাসি। লজেন্সের পাত্রটা ঝোলা ব্যাগে ভরে রেখে সতৃপ্ত চোখে কুন্তলাকে দেখেছে অমলিনা। পলক পড়েনি। কুন্তলার উচ্ছ্বসিত মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে।

মুখ নীচু করে কুন্তলা বলেছিল, কী দেখছ হাঁ করে!

—তোর বিয়ে হয়ে গেছে! কবে বিয়ে করেছিস? অমলিনা সহজ স্বরে জানতে চেয়েছে।

বছর দেড়েক আগে। হঠাৎই হয়ে গেল। তোমাদের কাউকে বলার সুযোগ পাইনি।...দূর বাদ দাও তো ওসব। আগে বলো, তুমি কেমন আছ?

—এই তো, দেখতেই পাচ্ছিস—কেমন আছি! অমলিনা দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারেনি।

—কার কাছে যেন শুনেছিলাম, তুমি লজেন্স...। কুন্তলার গলায় করুণা এসে জমা হয়েছিল।

—কী করব বল্। ওখান থেকে কাজ ছাড়ার পর ছেলের টাকাতেই সংসার চলে যাচ্ছিল। আমিও ঘরে বসে টুকটাক হাতের কাজ করে নিজের খরচটা তুলে আনছিলাম। বেশ চলে যাচ্ছিল। মাঝখানে দুম করে ছেলের কারখানায় লক আউট।...আবার রাস্তায় নামতে হল। সাতান্ন বছর বয়সে, বুড়ো হাড়ে ফেরিওয়ালি হয়েছি।

অমলিনাদির চাপা বেদনার শব্দ শুনতে পেয়ে কুন্তলা কথা ঘোরাতে চেষ্টা করেছে।

বলেছে, সে কী! তোমার সাতান্ন বছর বয়েস হয়ে গেল! মাইরি বলছি, তোমাকে দেখে বোঝাই যায় না! তোমার বয়েস যেন থেমে আছে। কেবল একটু রোগা হয়ে গেছ।

সামান্য মাথা নেড়ে অমলিনা সম্মতি জানিয়েছে। একটু চুপ থেকে নিতান্ত কৌতূহলে কুন্তলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আজ কলেজে যাবি না? সিটিং নেই?

—না, না। কলেজ খোলা আছে। সিটিংও ছিল। তবে আমাকে কদিন কামাই করতে হবে গো। বাধ্য হয়ে। তোমার জামাই বাসাবদল করল তো! তাই নতুন ঘরদোর গোছানোর জন্য...

—তোর বিয়ে হয়ে গেছে দেখে খুব খুশি হলাম রে! তা কাকে বিয়ে করলি?

ঠোঁট চেপে হেসে কুন্তলা বলেছিল, বেশ বললে—কাকে বিয়ে করলি!... সত্যিই, আমাদের বিয়ে করতে হয়। কেউ আমাদের বিয়ে দেয় না। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন কেউ না।...তুমি মনে হয় আমার কর্তাকে চিনবে না। ওখানকারই ছাত্র ছিল।

—ছাত্র—সে কি রে! তা হলে, তোর থেকে ছোট নিশ্চয়ই। অমলিনা অবাক হয়ে গেছিল।

—ছোট-বড় জানি না। আমি যে-বছর প্রথম ঢুকলাম, সেই বছরই ও পড়তে এসেছিল। তোমাকেও তো সে-বছরই ওরা ছাড়িয়ে দিল। তাই না!...তা সাত বছর ঘোরাঘুরি করে শেষমেশ বিয়ের পিঁড়িতে বসল। কুন্তলা ঠোঁট উল্টে বলেছে।

—তোর বর এ কাজে আপত্তি করছে না?

—আপত্তি করবে কেন? আমি কি খারাপ কিছু করছি। সেও তো আর্টিস্ট। তাছাড়া আমাকে এই দেখেই তো বিয়ে করেছে।...তবে আমার আর এসব করার ইচ্ছে নেই। এখন মন দিয়ে ঘরকন্না করব। জানো, অমলিনাদি, এ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন।...ওদিকে তিরিশ বছরের ওপরে ওরা এখন রাখে না। বয়স ভাঁড়িয়ে চৌত্রিশ পর্যন্ত টানলাম। আর নয়।...সব ঝুলতে আরম্ভ করেছে। তাড়িয়ে দেওয়ার আগেই ছেড়ে দিতে চাই।

—না ছাড়ালে ছাড়বি কেন?

—নাঃ, অনেক হয়েছে। কুন্তলা দৃঢ়স্বরে বলেছিল।

দিনকাল কত বদলে গেছে।—নিঃশব্দে নিজেকে কথাগুলো শুনিয়েছিল অমলিনা। তারপর একটু ইতস্তত করে কুন্তলাকে বলেছে, তোকে একটা কথা বলব! যদি রাগ না করিস...মানে, তুই তো ছেড়ে দিবি, বলছিস, তা তোর জায়গায় আমার চেনাশোনা একজনকে ঢুকিয়ে দিতে পারবি? ওঁদের তো লোক লাগবেই...

—হ্যাঁ তা তো লাগবেই। আমি ছেড়ে দিলেও লাগবে, না ছাড়লেও লাগবে। কুন্তলা চোখ মটকে বলেছিল।

ধরতে পারেনি অমলিনা—কুন্তলা ঠিক কী বলতে চাইছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিল।

—বুঝতে পারলে না! আরে বাবা, ওরা আর একজন নতুন মেয়ে নেবে। অনেক ছাত্র বেড়ে গেছে। এখনই থার্ড ইয়ারে দুটো সেকশন। আবার একটা হবে শুনছি। মাসে

এখন প্রতি সেকশনের চোদ্দটা নুড স্টাডির ক্লাস। ওরা আর ম্যানেজ করতে পারছে না। তাই নতুন মডেলের খোঁজ করছিল। এই দিনকয়েক আগে বিভাসবাবু আমাকে বলছিলেন।

নিজের অজান্তে অমলিনা কেঁপে উঠেছে। মডেল, নুড স্টাডি—এইসব শব্দগুলো জীবনের সঙ্গে একসময় কীভাবে মিশেছিল! মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, দিন-রাত্রি, সব কিছুর সঙ্গে। সত্তার নিবিড়ে, গভীরে। আর আজ। অমলিনা সর্বশক্তি দিয়ে আবেগ ও অশ্রুর গলা টিপে ধরে বলেছিল, তা হলে হয়ে যাবে বলছিস! এখন তো তোদের রোজ অনেক বেড়ে গেছে। তাই না!

—হ্যাঁ, তা বেড়েছে। তবে কাজের তুলনায় কী আর এমন! সেই তো নো ওয়ার্ক নো পে। তার ওপরে অনেক মেয়েই এখন এ লাইনে আসতে চাইছে।...যাই হোক, আমি প্রিন্সিপাল-স্যারকে তোমার ব্যাপারটা বলব। তুমি ওদের পুরনো লোক। তোমার দেওয়া মেয়েকে ওরা হয়তো নিয়ে নেবে। তবে দেরি করবে না কিন্তু!

—কুন্তলা, আমি নিজেই বরং দেখা করে বলব। তোকে বলতে হবে না। তোর কী মত!

ঘড়ি দেখে একটু আনমনে কুন্তলা বলেছিল, সেটাই ভাল হবে। তুমি বরং নিজেই চলে যাও। প্রিন্সিপাল-স্যার নতুন এসেছেন। খুব ভাল লোক।...তা, এ লাইনে আসতে চাচ্ছে, মেয়েটা কে?

—সে তুই চিনবি না। আমার এক আত্মীয়ের মেয়ে। স্টাডিক্লাসের ছেলেমেয়েরা তো ফিগার ফিগার করে পাগল হয়ে যায়, এই মেয়েটাকে দেখলে চোখ সরাতে পারবে না। অমলিনা দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছিল।

কুন্তলা আর ঔৎসুক্য দেখায়নি। জোর করে জানতে চায়নি—মেয়েটার পরিচয়। চাইলেও অমলিনা বলতে পারত না—মেয়েটা আমার নাতনি, বুলি।

এরপর কয়েকটা মামুলি কথা বলে কুন্তলা চলে গেছে। ওর খুব তাড়া ছিল।

ছবির মতো ডিটেলে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। এই দশ-বারো দিন আগেকার ঘটনা। অমলিনা আড় চোখে বুলির দিকে তাকাল। বাসের জানলা দিয়ে মেয়েটা কলকাতা দেখছে। একেই কি ভবিতব্য বলে! আজ থেকে ষোল বছর আগে বুলি যেদিন জন্মেছিল, সেদিনই কি নিষ্ঠুর ঈশ্বর ঠিক করে রেখেছিলেন, বুলিকেও এই পথে নামতে হবে! এর উত্তর অমলিনার জানা নেই। হয়তো এটা রক্তের দোষ। কিংবা পোড়াকপালের উত্তরাধিকার। তবে অমলিনার নিজের মনের মধ্যে বুলিকে নিয়ে এমন একটা সম্ভাবনা যে উঁকি দিয়ে যায়নি, তা নয়। দিয়েছিল। অমলিনা অস্বীকার করবে না। বিশেষত, চোখের সামনে মেয়েটা যেদিন দুম করে বড় হয়ে গেল। বুলিকে এমন কিছু দেখতে নয়। মুখের আদল বাবার মতো। শুধু একটু আলগা সৌন্দর্য আছে—এই যা। রঙও ময়লা। বুলির একমাত্র সম্পদ—প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা ও সুতীব্র দেহটা। এত কম বয়সে এমন দেহের গড়ন হাজারে একটা মেয়ের হয় কিনা সন্দেহ। যদিও অমলিনা ভেবে পায় না, দৈন্য আর যন্ত্রণায় ভরা এসব সংসারে বুলিরা কেন জন্মায়। এখানে তো দেহের কোনও আলাদা মর্যাদা নেই। সৌন্দর্যের দাম এখানে

কেউ দেয় না। এসব সংসারে দেহের নাম গতর। এখানে গতর খাটাতে হয়। যেভাবেই হোক। শরীরকে বলি দিতে হয় অভাবের ফুঁয়ে জ্বলে-ওঠা আগুনের সামনে। সুন্দরের ব্যবহার এখানে অন্যরকম।

—কি রে ভয় করছে নাকি! মুখ শুকিয়ে বসে আছিস যে বড়! অমলিনা মৃদুস্বরে বলল।

বুলি ঠাকুমার দিকে একঝলক দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। চলন্ত রাস্তায় চোখ সরিয়ে বলল, ধেৎ, ভয় করবে কেন? তুমি তো আছ!

বুলির কথা বলতে ইচ্ছে করছে না—অমলিনার মনে হল। ও হয়তো চুপ করে কাজের পর্বগুলো ভাবছে। লজ্জা বলে যে-শব্দটা মেয়েদের সারা অঙ্গে বৃক্ষলতার মতো পেঁচিয়ে থাকে, সেই শব্দটাকে হয়তো শেকড়-বাকড় সুদ্ধু উপড়ে ফেলে দিতে চাইছে বুলি।

মেয়েটা যে এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাবে অমলিনা ভাবতে পারেনি। তবে মডেলিংয়ের কাজ সম্পর্কে বুলির ছোটবেলা থেকেই ধারণা আছে। অনেক কিছু জেনেছে। জেনেছে ওর বাবা সিদ্ধেশ্বরের কল্যাণে। অমলিনার সেইসব করুণ-কঠোর দিনগুলো সম্পর্কে সিদ্ধেশ্বর কোনও কিছু জানাতে বাকি রাখেনি। মাকে খারাপ প্রমাণ করার জন্য ছেলের গলা যখন-তখন আকাশ ছুঁয়েছে। অমলিনার সঙ্গে ঝগড়া হলেই সেই দিনগুলোর কথা সিদ্ধেশ্বর টেনে এনেছে। শুধু তো বুলি নয়, সিংহী বস্তির আর কেউ জানতে বাকি নেই।

রাজি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওই নগ্নতার প্রশ্নে ওর দ্বিধাগ্রস্ত মন এখনও শূন্যে ঝুলে আছে। বুলি বারবার বলছিল, এমা, ওভাবে আবার দাঁড়িয়ে থাকা যায় নাকি! অমলিনা অস্বীকার করবে না—এ বড় কঠিন কাজ। বুলি যে নারী! নারীত্বের বেদনা পুরোপুরি মুছে ফেলা কি এতই সোজা! অমলিনাই নিজে পারেনি। অন্তত একদিনে। বিসর্জনের বাজনা শোনার আগে পর্যন্ত শেষ বস্ত্রখণ্ডটা আঁকড়ে ধরেছিল। অসম্ভব সংগ্রাম করতে হয়েছিল সেদিন।

—ওইভাবে সারাক্ষণ বসে থাকিস না। ঘাড় ব্যথা হয়ে যাবে। অমলিনা বুলিকে স্নেহের সুরে সতর্ক করে দিল।

বুকের পাশ থেকে বিনুনিটা পিঠে ফেলে সামান্য ঘাড় নাড়ল বুলি।

মেনকার কথায় সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল অমলিনা। বুলিকে এ লাইনে নামানোর প্রস্তাবটা মেনকাই প্রথম দিয়েছে। অমলিনা চমকে যায়নি—স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পেটের মেয়েকে এমন ইনকামের রাস্তায় নামানোর কথা মেনকা শেষ পর্যন্ত ভাবতে পারল! অথচ তাঁর এই ছেলের বউটি একসময় বুলিকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছে। বৌমার স্বপ্নভঙ্গের চেহারাটা এমন বেআব্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে অমলিনা ভাবতে পারেনি। শাশুড়ির পূর্ববৃত্তি নিয়ে একটা চাপা ঘৃণা মেনকার মধ্যে চিরদিনই আছে। যদিও সিদ্ধেশ্বরের মতো প্রকাশ্য দিবালোকে অমলিনাকে খাটো করে দেওয়ার মতো ঘেন্না উগরে দেয়নি মেনকা। তবু ঘৃণা ঘৃণাই। সে যেভাবেই আসুক। আশ্চর্য, মেনকা সেই ঘেন্নার কাছেই আত্মসমর্পণ করল!

সেদিন দুপুরে খেতে বসে মেনকা বলেছিল, কয়েকদিন ধরেই তোমাকে বলব বলব ভাবছি।...বুলি লেখাপড়ায় সুবিধে করতে পারল না। তার ওপর না শিখল হাতের কাজ, না সেলাই-ফোঁড়াই। বাপটার মতো আয়েসি আর কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।...পরশু সন্ধেবেলায় ঝি-গিরি করে ফেরার পথে দেখি, কোয়ার্টারগুলোর সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে চালপট্টির কানাই ছোঁড়াটার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছে। হি হি করে হাসি। মা মাগীকে দেখে যেন চিনতেই পারল না গো!...বিকেল হলেই পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে যাবে। তাই বলছিলাম বুলিকে মডেলিংয়ের কাজে নামিয়ে দাও। কাজটা তো ভালই। অন্তত ঝি-গিরির থেকে ঢের ঢের ভাল। শুধু তো উলঙ্গ হওয়া। কেউ গায়ে-টায়ে হাত দিতে পারে না। অথচ শরীলের সতীত্ব শরীলেই রইল, আবার কাঁচা টাকাও ঘরে এল। তুমি কী বলো!

মেনকার কথায় অমলিনা স্তব্ধ হয়ে গেছিল। মুখে গ্রাস তুলতে ভুলে গেছে। ছেলের বউয়ের কথাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। গলার কাছে আটকে-থাকা ভাতের দলাটা গিলে অমলিনা বলেছে, বউমা, এ তুমি কী বলছো!

অদ্ভুত সহজ সুরে মেনকা উত্তর দিয়েছিল, ঠিকই বলছি। অনেক ভেবেচিন্তেই বলেছি। তোমার ছেলের কারখানা এ-জন্মে খুলবে না।...মেয়েটা নিজের পথ নিজে দেখে নিক। ওই টাকায় ও খেয়েপরে বেশ থাকতে পারবে। তুমি একটা ব্যবস্থা কর।

—ক'টা টাকার জন্যে মেয়েটাকে এই নোংরামিতে নামিয়ে দেবে? অমলিনা লুকনো অভিমানটাকে চেপে রাখতে পারেনি, কাজটা তো নোংরা!

মুখ বেঁকিয়ে মেনকা বলেছে, দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্যে মেয়েরা যেখানে সটান দেহ বিকিয়ে দিচ্ছে নোংরা-ফর্সার বাছবিচার না করে, সেখানে বুলি তো কেবল শরীর সাজিয়ে বসে থাকবে। ওই শিল্পী না আর্টিস কী বলে, ওদের জন্য।

জীবনে অবাক, অবাক, অবাক হওয়ার মুহূর্তগুলো আসতে এখনও বাকি আছে, অমলিনা তা স্বপ্নেও ভাবেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেনকা কী সাংঘাতিক পাল্টে গেছে! অমলিনা এতটা আশা করেনি। মেনকার মুখ দেখে সন্দেহ হচ্ছিল না, তবু সংশয়ের রেশ টেনে অমলিনা বলেছিল, ভালো করে ভেবে দেখ বউমা।...আমি ন্যাংটো হয়েছিলাম বাধ্য হয়ে। প্রয়োজনের তাড়ায়। মরার হাত থেকে বাঁচতে। বুলির এসব দায় নেই। ওর সামনে এখনও দিন পড়ে আছে। তার ওপর সিধুকে ভুলে যেও না। ও জানতে পারলে...

চরম অবজ্ঞায় থুঃ থুঃ শব্দ করে মেনকা বলেছিল, রেখে দাও তোমার ছেলের কথা। জানতে পারলে কী করবে—মারবে! খুন করে ফেলবে! অত সোজা নয়।...এই যে তুমি বছরের পর বছর কাপড় খুলে দাঁড়িয়েছিলে, ও কিছু করতে পেরেছে? ওসব লোকের ক্ষমতা আমার জানা আছে। ঢ্যামনা সাপ। এদের মুখেই তড়পানি। এই লোকগুলো জন্মেছে মা-বউ-মেয়ের গতর খাটানো রোজগারে খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্যে। বুলির সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ও রাজি আছে। তুমি এরই মধ্যে একটা ব্যবস্থা কর দিকি।

যার সঙ্গে ভালবেসে মেনকা ঘর বেঁধেছে, তার সম্পর্কে এই নির্মম উপলব্ধিতে ও একদিনে পৌঁছয়নি। তলে তলে মেনকা এতদূর ভেঙে গেছে! অমলিনা ভীষণ অবাক হয়ে গেছিল। চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মানুষ এইভাবেই হয়তো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়! জীবনের যে জায়গাটায় অমলিনা যৌবনের উত্তরলগ্নেই পৌঁছে গেছিল, সেখানে এসে দাঁড়াতে মেনকার কতদিন সময় লাগল!

কুন্তলার সঙ্গে সেদিন দেখা হওয়ার পর আচমকা সুযোগটা এসে গেল। এবার সব কিছু নির্ভর করছে বুলির ওপর। আজ ওর অভিষেকের দিন। প্রিন্সিপাল-স্যার আর স্টুডেন্টদের পছন্দ হয়ে গেলেই অমলিনার কাজ শেষ।

অমলিনা মুখ বাড়িয়ে দেখল, প্রায় এসে গেছে। আর একটুখানি এগোলেই আর্ট কলেজের দরজা। সাতাশ বছর আগে ওই দরজার সামনে অমলিনা ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল। সঙ্গে মহানন্দ পাল। উপকৃত কিছু মানুষজনের ভাষায় মহান-দা। এই বিশাল, কারুকার্যমণ্ডিত লোহার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মহান-দা বলেছিলেন, এখান দিয়ে মাথা উঁচু করে ঢুকবে। সবসময় মনে রাখবে, তুমি কোনও পাপ করনি, অপরাধ করনি। একটা বই যেমন ছাত্রদের গড়ে তোলে, তেমনি তুমি স্বয়ং ওদের প্রেরণা, জীবন্ত বই। তোমার দেহের প্রতিটি রেখা ওদের শিল্পী করে তুলবে। এ বড় কম কথা নয়। এসো...

মহানন্দ পাল সম্পর্কে কাউকেই কখনও ভাল কথা বলতে শোনেনি অমলিনা। লোকটা অসৎ চরিত্রের—যত দুনম্বরী, তিননম্বরী কারবারের সঙ্গে যুক্ত। দুঃস্থ মেয়েদের খুঁজে বের করে ব্যবসায়ে নামায়। পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম ব্যবসায়। এসব অভিযোগের সত্যাসত্য জানার মতো সময় বা সুযোগ—কোনওটাই অমলিনার ছিল না। মহান-দা নানাভাবে অমলিনাকে সাহায্য করেছেন। বাসন মেজে জীবনযাপন করার গণ্ডি থেকে ওকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এই শিল্পের জগতে। যদিও কয়েকবার মনে হয়েছিল, লোকের কথাই ঠিক—মহানন্দ পাল মেয়েদের এইভাবে বাঁচাতে চায়। দেহটাকে অবলম্বন করে। এর বাইরে কি আর কোনও পথ নেই! তবু অমলিনা মহান-দার নিন্দে করতে পারবে না। অকৃতজ্ঞ হওয়ারও কোনও কারণ ঘটেনি। শুধু সেই মানুষটার গূঢ় অভিপ্রায় অমলিনার সামনে কখনও উদ্‌ঘাটিত হল না। সে সব অতীত হয়ে গেছে। তবু আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একদিন বিকেলে এই দরজাটার সামনে থেকে নিজেকে ছোট করে দিয়ে মহানন্দ পাল বিদায় নিয়েছিলেন। কেন যে তিনি সেদিন অমলিনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন! মহান-দা কি জানতেন না—এটা একেবারেই অসম্ভব। নাকি অমলিনাকে চিনতে পারেননি!

এই সেই দরজা। যেটা পেরিয়ে গেলেই বুলির জীবনযুদ্ধের পথ শুরু হবে। অনাবৃত রেখার কারুকার্য আর ক্ষুধার্ত পেটের ছলচাতুরি যে-পথে হাত ধরাধরি করে চলবে। এই চলাটাকেই মনে হয় লোকে শিল্প বলে ভাবে। সুন্দর বলে ভুল করে।

এত সকাল সকাল আসার কোনও দরকার ছিল না। কলেজের দরজাটাই সবে

খুলেছে। ক্লাসরুমগুলোর ঝাড়পোঁছ এখনও শেষ হয়নি। আসলে একটা টেনশন অমলিনাকে তাড়িয়ে এনেছে। বুলিকে এরা নেবে কি নেবে না, সেটা এখনও অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে অমলিনা একদিন এসে প্রিন্সিপালের কাছে আর্জি জানিয়ে গেছে। সেদিন লুকিয়ে এসেছিল। কত বছর পরে! অধ্যক্ষের খাসবেয়ারা রাধেশ্যাম ছাড়া আর কেউ ওকে নজর করেনি। স্যার ও ছাত্র-ছাত্রীবা কী একটা এগজিবিশন নিয়ে ব্যস্ত ছিল। দোতলায় লোকজন ছিল না। আজও তেমনি নিঝুম। ঝাঁট দেওয়ার শব্দ আর গোলা পায়রার বক্‌বকম্ ছাড়া অন্য কিছু কানে আসছে না।

টানা বারান্দার দু'পাশে ভাস্কর্যের অদ্ভুত সব নমুনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা আছে। নানা রঙের পাথর, কাঠ আর তুঁতে-লাগা কাঁসা-পেতল দিয়ে তৈরি নানান মূর্তি। সবটাকে ভালো করে বোঝাও যাচ্ছে না। দেওয়ালে টাঙানো আরও কিম্ভূত সব ছবি। বুলি ভীরু পায়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখে নিচ্ছে। পুরনো দিনের বিশাল বাড়িটার সারা অঙ্গে যেন পরতের পর পরত বিস্ময়ের রঙ লাগানো। একটা লম্বা-চওড়া ছবির সামনে গিয়ে বুলি থমকে দাঁড়াল। মেয়েলোকের ছবি। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর! মেয়েটার চোখ নেই। মণিকোটরে দুটো অন্ধকার গর্ত। আর ওর বুক দুটো লাউয়ের মতো ঝুলছে। বিশ্রী। এর নাম ছবি! বুলির সারা গা ঘুলিয়ে উঠল। ছবিটার সামনে থেকে কয়েক পা পিছিয়ে এসে বুলি ডাকল, ঠাকুমা, এদিকে দেখবে এসো।

প্রিন্সিপালের ঘরের বাইরে পেতে রাখা বেঞ্চিটায় অমলিনা বসেছিল। উঠে আসতে আসতে বলল, কী দেখে অমন সিঁটিয়ে গেলি?

—ওই দেখো! একেবারে পেত্নীর ছবি। এগুলো কেন টাঙিয়ে রেখেছে! বুলির সারা মুখে অবজ্ঞা।

—এমন কথা আর কখ্‌খনো বলিস না। এই ছবিটা যে এঁকেছে, তাকে আমি চিনি। খুব বড় আর্টিস্ট। আমাকে এখনও মনে রেখেছে। রাস্তায় দেখা হলে কথা বলে। পাঁচ-দশ টাকা দিয়ে সাহায্য করে। এইরকম ছবি এঁকেই তো নাম করেছে। দেখেছিস, এখানের সব ক'টা ছবির থেকে কেমন আলাদা।—কপালে হাত ঠেকিয়ে অমলিনা বলল, যেন সেই অনন্য স্রষ্টার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন।

—চোখ নেই, বুক দুটো ওইভাবে ফেটে বেরিয়ে আছে—এসবের মানে কী ঠাকুমা? বিরক্ত হয়ে বুলি জিজ্ঞেস করল।

—অত মানেটানে কি আমি জানি! তুই এখানে বছরখানেক কাজ কর, সব জানতে পারবি। এটা কি আর অমনি অমনি টাঙিয়েছে! এমন মানে যে শুনলে হয়তো চোখের জল পড়বে।

—তোমার ওই এক কথা। চোখের জল! চোখের জল সস্তা নাকি?

—আহা, রাগ করছিস কেন দিদি! আয়, বসবি আয়। অমলিনা সমস্ত স্নেহ উজাড় করে নাতনিকে ডাকল।

আজ ওকে কিছুতেই কষ্ট দেওয়া চলবে না। যেন কোনওভাবেই বুলির ভেতরের গোপন দুঃখ আর ক্ষোভগুলো দেহের বাইরে বেরিয়ে না-আসে। মেয়েটা খুব সহজে মেনকার কথায় রাজি হয়েছে বলে মনে হয় না। খুব প্রসন্ন চিত্তে ব্যাপারটাকে নিয়েছে কি! সংকল্পের মতো! অমলিনা ঠিক ধরতে পারছে না। মেনকা কি ওকে প্রেসার

দিয়েছে? একটু একটু করে ঘনিয়ে আসা আরও কঠিন, আরও অন্ধকারময় দিনগুলোর ছবি এঁকে ওকে রাজি করিয়েছে? অমলিনা ওদের কাছ থেকে এসব জানতে চায়নি। তবে, যদি নিমরাজি হয়েও বুলি এ-লাইনে টিকে থাকতে পারে, তাহলে ওরই মঙ্গল। কুন্তলার মতো এখান থেকেই ও হয়তো একটা স্বামী জুটিয়ে ফেলবে। বলা যায় না, পয়সার জন্য বুলিকে হয়তো এর চেয়েও খারাপ কাজ করতে হত! ভগবান ঠিক সময়ে মুখ তুলে চেয়েছেন। বুলি সেই অর্থে বেঁচে গেল। অমলিনা জানে, ভদ্রলোকেরা বুলিকে খারাপ মেয়েছেলে বলবে, আঙুল তুলে দেখাবে ওর নিজস্ব জীবিকার দিকে। কিন্তু সেটাই তো সব নয়। এই কলেজবাড়িটা, এখানকার মানুষজনেরা বুলিকে সম্মান জানাবে, একটা নিখুঁত মডেল হিসেবে ওকে চিরদিন মনে রাখবে। আর কী চাই! সবচেয়ে বড় কথা, লেখাপড়া জানে না বলে, সুন্দরী নয় বলে এবার আর বুলিকে বাপের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে না। বুলি স্বাধীন, বুলি রোজগেরে। সিদ্ধেশ্বরই এবার ওর পয়সায় গোঁফে তেল মাখাবে। অমলিনা বেঞ্চিতে বসে বিড়বিড় করে বলল, আমি আর কদিন।...একদিন রাস্তায় মরে পড়ে থাকব। সেদিন একটাই সান্ত্বনা নিয়ে আমি চোখ বুজব—বুলির হিল্লে হয়ে গেছে।

একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে অবিরাম কথা বলতে বলতে বারান্দার মাঝখানের বাঁকে মিলিয়ে গেল। ওদের হাতে, সাইডব্যাগে রোল-পাকানো কাগজের মেলা। সকালের প্রথম ছাত্রছাত্রী এরা। বুলি ওদের দেখে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এসে ঠাকুমার পাশে বসে পড়ল।

—তোকে নিয়ে নেবে, দেখিস। বাদ দিতে পারবে না।...শোন, প্রিন্সিপাল-স্যার যদি বয়েস জিজ্ঞেস করেন, বলবি—আঠারো। অমলিনা চারদিকে দেখে নিয়ে নীচু স্বরে বলল।

—কেন? বুলি সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

—বলা যায় না, ষোলো বছর শুনে হয়তো বাচ্চা বলে বাতিল করে দিতে পারে।

দু'চোখে কৌতুকের ঝিলিক তুলে বুলি জিজ্ঞেস করল, কী গো, আমাকে কি বাচ্চা মনে হয়!

—না, তা নয়। তবে বলা তো যায় না—ওই ষোলো শুনেই হয়তো ফিরিয়ে দিতে পারে।...ওরে, আমিও তো বয়েস লুকিয়েছিলাম। তবে তোর মতো বাড়াইনি, কমিয়েছি।

—তুমি কত হয়েছিলে?

—আস্তে। কে আবার শুনে ফেলবে। একটু মনে করতে দে—বলছি।...তোর ঠাকুরদা যে-বছর মারা গেল, আমি সে বছর উনত্রিশে...না, না পাক্কা ত্রিশে পড়েছি। এখানে চালিয়ে দিলাম পঁচিশ বলে। এরা ধরতে পারেনি। আমি যে বিধবা আর পনেরো বছরের একটা দামড়া ছেলে আছে আমার—তাও গোপন করেছিলাম।...ভগবানের দয়ায় চেহারাটা ছিল। শোকে-তাপে ধসে যায়নি। মহান-দা তো এই চেহারাটাই কাজে লাগানোর পথ দেখালেন।

—তারপর?

—তারপর আর কী। এরা পঁয়ত্রিশে ছাড়িয়ে দিল। কিন্তু আমার বয়স তো তখন চল্লিশ। বয়েস হয়ে গেলেও, এই দেহটা আমার সঙ্গে বেইমানি করেনি। সেই বছরই তোর বাবা বিয়ে করল। সিধুর বিয়ে হল মাঘে আর আমি কাজ ছাড়লাম মার্চ অথবা এপ্রিলে।...সিধু ভেবেছিল, মেনকাকে ঘরে এনে আমাকে টিট করবে। তা আর পারল না। তুই জন্মালি ঠিক পরের বছর। ব্যাস, সিধুর ন্যাজে-গোবরে অবস্থা। ভাগ্যিস রঙের কারখানায় সিধু ঢুকতে পেরেছিল, না-হলে আমাকে আবার অন্য ধান্দায় তখনই নামতে হত।

এত খুঁটিয়ে বুলি কোনওদিন ওর জন্মের কাহিনী শোনেনি। ঠাকুমার দু'চোখে কি জল ভরে এসেছে! দুটি নিটোল মুক্তো এখুনি ঝরে পড়বে! বুলি কথা ঘোরানোর জন্য একটু দুষ্টুমি করল, ও ঠাকুমা, আমাকে ওই ছাত্রমাস্টারদের সামনে জামাকাপড় খুলতে হবে নাকি!

—দূর পাগলী! এরা সব ভদ্রঘরেব ছেলেমেয়ে। এরকম কখনও করাতে পারে! তোর চিন্তা নেই। আলাদা ঘেরাটোপ জায়গা আছে। সেখানে সব ছেড়েছুড়ে ক্লাসে এসে দাঁড়াবি। তারপর স্যার যেমন পোজ দিতে বলবে, তেমন পোজ দিবি। প্রথম প্রথম কাঁকাল ব্যথা করবে। পরে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কোনো ছেলে যদি পায়ে হাত দেয় অসভ্যতা করে, যদি চোখ মারে—তখন কী করব?

—কখ্খনো এসব হবে না। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে! মেয়ে স্টুডেন্ট আছে না! দেখবি, ওরাই তোর ইজ্জত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এটা কলেজ, খারাপ পাড়া নয়। আচ্ছা, প্রথম প্রথম আমি না-হয় স্টাডি ক্লাসে গিয়ে বসব। যতদিন না তোর লজ্জা আর ভয়ের ডিম ভাঙছে।

—আমি তাই বলেছি নাকি! যাও, তোমাকে থাকতে হবে না। বুলি অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ষোড়শী নাতনির পিঠে লজেন্স-বেচা-হাতটা আল্‌তো করে রেখে অমলিনা বলল, শোন্ শোন্, তুই যা ভাবছিস, সেসব কিছুই নয়। একেবারে সহজ ব্যাপার। দেখবি, তোর মতো আরও পাঁচ-ছজন মেয়ে আছে। ওদের সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হয়ে যাবে।...তবে হ্যাঁ, ছেলে-স্টুডেন্টদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তোর সঙ্গে আলাপ করবে। তোর শরীরের প্রশংসা করবে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে।...ওতে গলে যাবি না। মানুষের মোহ কেটে যেতে কদিন! আর কেউ যদি বাড়ি যেতে বলে, যাবি না।

—কেন বাড়ি যেতে বলবে? বুলি বিস্মিত।

—কেন আবার, বাড়িতে একলা নুড-স্টাডি করবে, বলে নিয়ে যেতে চাইবে। তারপরে...। পুরুষ মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই। ওসব বাদ দিলেও, কলেজে যদি ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে। এই বলে রাখলাম।

ফিক করে হেসে বুলি বলল, ঠাকুমা, তোমাকে কেউ বাড়ি নিয়ে যেতে চায়নি?

বুলির প্রশ্নে অমলিনা ক্ষুব্ধ হল না। শুধু উদাস চোখে নীল আকাশের দিকে তাকাল।

একটু নীরব থেকে ম্লান হেসে বলল, সে সব শুনে কী করবি দিদি! কত রকমের, কত রঙের হাতছানি। ইচ্ছে করলেই গা-ভাসিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু করিনি। যতটা সম্ভব পরিষ্কার থাকতে চেষ্টা করেছি। সিধুর কথা ভেবে মহান-দাকেও ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করিনি। অথচ, আমার এই শুচিতার কেউ দাম দিল না! রাস্তার লোকের মতো সিধু, মেনকাও আমাকে সারাজীবন শুধু ঘেন্নার চোখেই দেখে গেল। গোপনে চোখের জলের মুক্তো দিয়ে যে মালা গেঁথেছি—কেউ তার হদিস নিল না। আজ সব ফিকে হয়ে গেছে। আরও বড় হ—তোকে সব বলব। ওরে, তুই আমার মুখ রাখবি তো!

অমলিনার বেদনা বুলিকে স্পর্শ করার আগেই ও সচকিত হয়ে উঠল। ঠাকুমার উরুতে মৃদু খোঁচা দিয়ে বলল, ওই দেখ, কে আসছে!

পাশ ফিরে অমলিনা দেখল—রবিরঞ্জনদা। তেতলার আপিস ঘরের ক্যাশিয়ারবাবু! মানুষটা আরও যেন বুড়ো হয়ে গেছেন। পরনে সংবৎসরের সেই কালো কোটটি। যদিও রঙ জ্বলে গিয়েছে এখানে-ওখানে। রবিরঞ্জন মাথা নীচু করে হেঁটে আসছেন। অমলিনা উঠে দাঁড়াল। আন্তরিক সুরে শুধাল, কেমন আছেন রবিদা?

রবিরঞ্জন থমকে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে মহিলাটিকে চেনার চেষ্টা করলেন। মিনিটখানেক সময় নিয়ে। তারপর চাপা উচ্ছ্বাসে বললেন, মলিনা না!

মডেলিংয়ের কাজে ঢোকার দিনেই রবিরঞ্জন একটু খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন, এই যে বাপু, তোমাকে অত অ-আ লাগিয়ে ডাকতে পারব না। শুধু মলিনা, বুঝেছ! আমি তো মেয়েদের নাম মলিনাই শুনে এসেছি। অমলিনা আবার নাম হয় নাকি!...আর, তুমি যে-প্রফেশনে নেমেছ, যেখানে ওই নাম শুনলে লোকে যে হাসবে! সেই থেকে রবিরঞ্জন মলিনা বলেই ডেকে এসেছেন। হারানো দিনের গন্ধে উদ্বেল হয়ে অমলিনা বলল, হ্যাঁ, রবিদা, আমি মলিনা। কেমন আছেন?

—ভাল। তুমি কেমন? এতদিন পরে আবার কী মনে করে আসা হয়েছে? বুলির দিকে একঝলক দেখে রবিরঞ্জন শেষ প্রশ্নটা করলেন।

এইসব মানুষদের কাছে ভনিতা করে, মিথ্যে কথা বলে কোনও লাভ নেই। একই ছাদের তলায় রবিদার সঙ্গে বুলিকে কাজ করতে হবে। যেমন একসময় অমলিনাকে করতে হয়েছে। রবিরঞ্জন জিজ্ঞেস করছেন নিতান্ত সৌজন্যবশত। উনি কৌতূহলী নন। অমলিনা মুখ নামিয়ে বলল, আপনাদের কাছে আবার ভিক্ষে করতে এসেছি।

—ভিক্ষে! রবিরঞ্জন ঠিক বুঝতে পারলেন না।

—সেদিন কুন্তলার কাছে শুনলাম, কলেজে একজন নতুন মডেল দরকার।...স্টাডি ক্লাসের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। যদি নেন...

—এটি কে?

—বুলবুল। আমার নাতনি।...এই বুলি, রবিদাকে প্রণাম কর্।...জানেন রবিদা, আবার দ-য়ে পড়ে গেছি। ওর বাবা আট-নমাস বাড়িতে বসে আছে। কারখানা বন্ধ। আর সংসার চলছে না। আপনারা না দেখলে অভাবের জ্বালায় মারা পড়ব।

বিষাদের নীলরঙে রবিরঞ্জনের সারাটা মুখ ভরে গেল। বুলিকে করুণ চোখে দেখে

উনি বললেন, তুমি কি আগে একদিন এসেছিলে? রাধেশ্যাম না কে যেন বলছিল!
—হ্যাঁ এসেছিলাম। প্রিন্সিপাল-স্যারকে নিজের পরিচয় দিয়ে সব বলেছি। উনি আজ দেখা করতে বলেছিলেন। স্টুডেন্টদের আপত্তি না-থাকলে বুলিকে নিয়ে নেবেন হয়তো।
—নাতনিকে তাই আজ দেখাতে এনেছ?
অমলিনা উত্তর দিতে পারল না। রবিদার প্রশ্নের মধ্যে কোথায় যেন একটু ব্যঙ্গের ছোঁয়া আছে। আবার একই সঙ্গে বেদনার স্পর্শ।
বুলির মাথায় হাত রেখে রবিরঞ্জন বললেন, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। ফিরিয়ে দেবেন না।...মলিনা, তুমি চলে যাওয়ার আগে একবার আপিসে দেখা করে যেয়ো।
রবিরঞ্জন কী একটা গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে চলে গেলেন।
—লোকটা বেশ ভাল, তাই না! বুলি বলল।
—হ্যাঁ। খুব ভাল। ওঁর হাত থেকেই তোকে টাকা নিতে হবে। উদাস স্বরে উত্তর দিয়ে অমলিনা ডুবে গেল নিজের মধ্যে।

প্রিন্সিপাল দশ মিনিটও সময় নিলেন না। বিভাসবাবু নামের একজন কমবয়েসী শিক্ষককে ডেকে বললেন, এই ভদ্রমহিলা আগে এখানকার মডেল ছিলেন। অ্যান্ড দিজ গার্ল ইজ হার রিলেটিভ। ওকে মডেল হিসেবে রাখা যেতে পারে। আপনি আজই ওর ফিগার স্টুডেন্টদের সামনে শো করিয়ে দিন।
বিভাসবাবু ওদের নিয়ে এলেন অদ্ভুত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে। নুড-স্টাডি রুমের বাইরে দাঁড় করিয়ে বুলিকে বললেন, এখন যার সেটিং দেওয়ার কথা, সে যদি তৈরি হয়ে না থাকে, তাহলে আপনাকে ডাকব। একটু দাঁড়ান।
বুলির হয়ে অমলিনা মাথা নাড়ল। ঘর বদল হয়েছে। অমলিনার মনে পড়ল, ওর সময়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই ডান দিকের ঘরে স্টাডি ক্লাস বসত। ওই ঘরটায় একটা ঠাণ্ডাঠাণ্ডা ভাব লেগে থাকত সারা বছর। কষ্ট হত শীতকালে। হাই পাওয়ারের সার্চলাইটের নিচে দাঁড়িয়েও কাঁপুনি লেগে যেত। বুলি ঠাকুমার হাত খামচে ধরে কিছু বলতে চাইল। পারল না। অমলিনা কাঁপা গলায় বলল, আমি তো আছি! ভয় কী!
মিনিট পনেরো পরেই বিভাসবাবু বেরিয়ে এলেন। এই সময়টুকু মনে হচ্ছিল, আদি অন্তহীন অন্তকালের যাত্রার মতো। এর যেন শেষ নেই। বিভাসবাবু বুলিকে বললেন, চলুন।
—স্যার, আমি ওর সঙ্গে যাব!...প্রথম দিন তো! কাল থেকে ঠিক হয়ে যাবে। অমলিনা সঙ্গে সঙ্গে কাতর কণ্ঠে বলল।
ভুরু কুঁচকে বিভাসবাবু বুলিকে আপাদমস্তক দেখলেন। একটু রুক্ষ স্বরে বললেন, মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসেননি। এইভাবে বাইরের লোককে ক্লাসে অ্যালাউ করার নিয়ম নেই।...ঠিক আছে, আজকের মতো যেতে দিচ্ছি।...হ্যাঁ আপনার নামটা যেন কী?

—বুলবুল দাস। অসম্ভব সরু গলায় বুলি উত্তর দিল।
—এই প্যাসেজটা দিয়ে চলে যান। দরজা ফাঁক করে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে বিভাসবাবু ভেতরে চলে গেলেন।
এক মুহূর্তে বুলির জীবনে অমলিনা বাইরের লোক হয়ে গেল।

লজ্জায় চোখ বন্ধ করে বুলি দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলা মুখে লজ্জার রক্তিম আভা। অমলিনা একটু একটু করে ওকে নিরাবরণ করে দিচ্ছে। পরম মমতায়। পরিপূর্ণ দেহটা কীভাবে কুঁড়ির মতো ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে, বুলি তা কল্পনাই করতে পারবে না। অমলিনা বুলির নগ্নসৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে বিহ্বল হয়ে গেল। এত নিখুঁত। এত সুন্দর! মৃদু স্বরে অমলিনা নাতনিকে বলল, তোকে স্বর্গের দেবতারা সৃষ্টি করেছেন। সিধু তোর বাপ নয়...নে দিদি, চল, ওরা অপেক্ষা করে আছে।
বন্ধ চোখের পাতার তলায় এত জল জমেছিল, অমলিনা ভাবতে পারেনি। বুলি চোখ মেলতেই টপটপ করে ঝরে পড়ল। এক অব্যক্ত ব্যথায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল অমলিনার বুকের ভেতরটা। প্রবল ধিক্কারের মতো কিছু একটা সশব্দে বাইরে বেরিয়ে আসছে। কাঠের ঘেরাটোপের এককোণে রাখা লম্বা আয়নাটার দিকে চোখ সরে গেল। দর্পণে দুই নারীর প্রতিচ্ছায়া। আবৃত আর নগ্ন। একজন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যজন জীবনের দিকে। দু'জনের কারুরই চোখের মণি নেই। শূন্য গহ্বর। সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার আগুন। অমলিনা ভয়ে কেঁপে উঠল। ছোট জায়গাটায় দমবন্ধ হয়ে আসছে।
আয়নায় নিজেকে দেখতে গিয়েও বুলি পারল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে অমলিনাকে বলল, 'চলো।'
অমলিনাকে আড়াল করে বুলি প্লাটফর্মের উপর এসে দাঁড়াতেই সারা ক্লাস জুড়ে একটা চাপা গুঞ্জন। বিভাসবাবু অতি সংক্ষেপে বুলির পরিচয় দিলেন। অমলিনা নীচে নেমে দেখল—লজ্জায়, সঙ্কোচে বুলি নুয়ে পড়েছে। যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে ওর সত্তা, অস্তিত্ব।
পাশ ফিরিয়ে শিল্পিত ভঙ্গিমায় বিভাসবাবু বুলিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ছাত্রছাত্রীদের মুখ-চোখে অমলিনা তৃপ্তির আভা দেখতে পেল। তার মানে—বুলিকে এরা পছন্দ করেছে। ঠিক বুলিকে নয়, ওর দুর্লভ দেহটাকে। পরম নিশ্চিন্তে অমলিনার চোখ বুজে এল। নিবিড় সুখের সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত। চোখ খুলতেই চমকে গেল অমলিনা। প্লাটফর্মের ওপর কে দাঁড়িয়ে আছে? বুলির জায়গায়!
শব্দহীন তীব্র হাহাকারে অমলিনার ভেতর থেকে কে যেন বলল, ওকে চিনতে পারছ না!...খুব ঝাপ্সা লাগছে! ভাল করে দেখো। আরে, ওর নাম অমলিনা!

মেনকা সব জানে, ইচ্ছে করে চেপে যাচ্ছে। বলবে না। যতবার ঘটনাটা ভাবছে, সিদ্ধেশ্বরের মাথায় রক্ত চলকে উঠছে। মায়ের সঙ্গে মেয়েটার এই সাতসকালে বেরিয়ে যাওয়ার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য। সেটা কী—সিদ্ধেশ্বর ধারণা করতে পারছে

ভাল মতোই। কেবল মেনকার কাছ থেকে জেনে মিলিয়ে নিত। কয়েকদিন আগে সিদ্ধেশ্বরের নাকে একটা শলা-পরামর্শের গন্ধ এসে লেগেছিল। মা, মেনকা এবং বুলি—ওর সংসারের এই তিনটে মেয়েছেলেকে ও কোনওভাবেই চিনতে পারল না। এরা প্রত্যেকে রহস্যময়ী। বুলিকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের ওই বেরিয়ে যাওয়াটাও একটা রহস্য। যে-মেয়ে নটা-সাড়ে নটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না, সেই মেয়ে জরুরি কাজে সকালে বেরিয়ে গেছে শুনেই সিদ্ধেশ্বর চমকে উঠেছিল। তার ওপর, বুলির সঙ্গে মা গেছে। মেনকা এই সংযোজনটা করতেই সিদ্ধেশ্বর প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে।
এখানে আসার পর থেকেই গণেশ, লালু, কিষেণ, হীরালাল—প্রত্যেকের কাছে সিদ্ধেশ্বর ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছে না। অথচ এখানে অফিসযাত্রী ধরার সাংঘাতিক কমপিটিশন। একটু ঢিলে দিলেই অন্য দলের ড্রাইভারদের মওকা। সব প্যাসেঞ্জার ওরাই তুলে নেবে।
কিষেণ তো বলেই ফেলল, কী সিধুদা, আজ এমন ল্যাললেলে হয়ে গেলে কেন মাইরি। আমাদের ছটা সওয়ারি জোগাড় করার আগেই তো ওরা দুটো মেরে দিচ্ছে। যা মাইরি, এমন করলে শালা অটো বসিয়ে দিতে হবে।
সিদ্ধেশ্বর অস্বীকার করবে না, আজ সকাল থেকেই মনটা খিঁচড়ে আছে। শরীরের সব রক্ত উঠে এসেছে মাথায়। সিদ্ধেশ্বর কি আর ইচ্ছে করে কাজে ঢিলে দিচ্ছে! কিষেণরা অটো বসিয়ে দিলে একই সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরকে যে বসে যেতে হবে চিরদিনের মতো। কারখানাটা বন্ধ হওয়ার পর থেকে ওর সংসার কীভাবে, কোন্ ম্যাজিকে চলছে তা মনে হয় ঈশ্বরও জানেন না। গণেশ আর হীরালালকে ধরে-করে ও এই কাজটা জুটিয়েছে। জোড়ামন্দিরের কাছ থেকে শিয়ালদা-বেলেঘাটা সাটল অটো সার্ভিসের দালালি। খুব বেশি হলে দিনে দশ থেকে পনেরো টাকা ইনকাম। কারখানা কবে খুলবে কেউ বলতে পারছে না। আদৌ খুললে কজন আবার চাকরি পাবে কে জানে। সিদ্ধেশ্বর নিশ্চিত, ছাঁটাই-এর লিস্টে ওর নাম থাকবে সবার প্রথমে। কেননা, যারা জীবনে কখনও গোঁয়ার হতে পারেনি, তাদের শেষ দুর্দশা এইভাবেই নেমে আসে। কারখানাটায় লকআউট হওয়ার পর থেকে বাড়ির চেহারাই বদলে গেছে। বদলে গেছে মা, বুলি ও মেনকা। আজকাল বুলি তো বাপকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। এমনভাবে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা বলে যেন রঙের কৌটোয় লেবেল মারছে। মেনকা গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে ঠিকে ঝিয়ের কম্ম নিয়েছে। বেলা তিনটে নাগাদ বেরিয়ে যায়। কটা ফ্ল্যাটে বাসন মাজে সিদ্ধেশ্বর জানে না। মেনকা ঝি-গিরির টাকা হাতে পাওয়ার পর থেকে স্বামীকে একদমই কেয়ার করেনি। বাকি রইল মা। সিংহী বস্তির সকলের অমলিনাদি। মা চিরকালই স্বাধীন। সেই কবে থেকে টাকা ইনকাম করছে। সিদ্ধেশ্বরের কামাই-এর পয়সাকে মা সম্মান দিয়েছে। তবে তার ধার ধারেনি। ইদানিং দুপুরবেলা ঝোলা ব্যাগে লজেন্সের বয়েমটা ভরে নিয়ে মা ধর্মতলায় চলে যায়। রাত সাতটা সাড়ে সাতটায় বাড়ি ফেরে। সব মিলিয়ে একটা অসহ্য পরিবেশ। তার ওপর বুলিকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাজে বেরুনোর ঘটনাটা সিদ্ধেশ্বরকে পাগল-পাগল করে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে, রাস্তার ধারে পড়ে থাকা এই কংক্রিটের চাঙড়টার ওপর বসতে

গিয়ে, পুরনো প্যান্টটা থাইয়ের কাছে ফেঁসে গেছে। স্ট্যান্ডে অটো বিশেষ নেই। যেগুলো শিয়ালদায় রওনা দিয়েছিল, তারা এখনও ফেরেনি। হয়তো জ্যাম কিংবা অ্যাকসিডেন্টে আটকে পড়েছে।

মেনকা জেনেশুনে ন্যাকা সাজল। আসার আগে সিদ্ধেশ্বর আর একবার জানতে চেয়েছিল। মেনকা কিছুতেই বলল না। ভাসাভাসা উত্তর—'জরুরি কাজে গেছে', 'এক্ষুনি এসে পড়বে', 'তোমার অত জেনে কী হবে'। মাগী চালাকি করতে চাইছে। অথচ জানে না, সিদ্ধেশ্বরকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

এই যে অমলিনাদি, রক্তের সম্পর্কে সে সিদ্ধেশ্বরের মা, সে কি শেষ পর্যন্ত লুকোতে পেরেছিল। পারেনি! ধরা পড়ে গেছে। সিদ্ধেশ্বরের স্পষ্ট মনে পড়ছে, মায়ের কল্পনাতেও আসেনি। ভেবেছিল, এমনিভাবে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবে। মা ভালোমানুষ সেজে বেশ ছিল। মাকে সন্দেহ করার বয়স বা বুদ্ধি কোনওটাই তখন হয়নি। গান্ধী বস্তির সরকারদা প্রথম চোখ খুলে দিল। সে সময় সিদ্ধেশ্বরের বয়স কত!—বড় জোর আঠারো কি উনিশ! এক সন্ধেবেলায় বেলেঘাটার খালপুলের ওপর সরকারদা আর সিদ্ধেশ্বর দাঁড়িয়েছিল। চুপচাপ হাওয়া খেতে খেতে সরকারদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছে, সিধু, তোর মা কি চাকরি করে?

প্রশ্নটা যে নিষ্পাপ. নির্বিরোধী নয়, এইটুকু ধরতে পারার মতো বুদ্ধিও তখন হয়নি। সিদ্ধেশ্বর সহজ সুরে বলেছিল, হ্যাঁ, চাকরি করে।

—কোথায়? আপিসে, নাকি কারখানা-টারখানায়! সরকারদা প্রশ্নের জাল ছুঁড়ে দিয়েছিল সিদ্ধেশ্বরের ব্যক্তিগত জীবনের অতলে।

—তা তো জানি না। মা বলেনি, আমিও জানতে চাইনি।

—সে কি রে! যুবতী মা প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে, কী উপায়ে টাকা কামাচ্ছে—ছেলে হিসেবে তুই সেটা জানবি না! এতে তো দোষের কিছু নেই। খচ্ করে কানে এসে লেগেছিল 'যুবতী মা' কথাগুলো। সিদ্ধেশ্বর মুখ নীচু করে মিঁউ মিঁউ করে বলেছে, এমনি জানতে চাইনি। মা কত কষ্ট করছে...

—এই দ্যাখো, তুই দুঃখ পাচ্ছিস কেন? আমি কি বলেছি কষ্ট করছে না! কষ্ট সবাই করছে। তোর বাবা যদি বেঁচে থাকত সে কি কষ্ট করত না, নাকি করেনি! কাজ করে প্রত্যেককে খেতে হয়। তবে কিনা দেখতে হবে ইনকামের ধরনটা কেমন। কীভাবে টাকা কামাচ্ছিস।

সিদ্ধেশ্বর বোকার মতো হাঁ করে সরকারদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। খালের পচা জলের গন্ধে হালকা বাতাস মাঝে মাঝে ভারী হয়ে উঠেছে। ব্রিজের রেলিঙে হেলান দিয়ে সরকারদা আবার বলেছে, যেমন তুই লেদ মেসিনের কাজ শিখছিস। এসব শিখেটিকে পয়সা ইনকাম করবি। আমি ডাইসের কাজ জানি। তেমনি...। আসলে তোর মাকে...। কে যেন বলছিল, অমলিনাদি খারাপ...। আচ্ছা তোর মা কবে থেকে কাজে বেরুচ্ছে?

—প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। সামান্য চিন্তা করে সিদ্ধেশ্বর বলেছিল।

—তিন বছর, আশ্চর্য! আমার কাছে অন্য খবর ছিল...। যাই হোক, আসলে একটা

খারাপ লোকের সঙ্গে তোর মাকে অনেকেই যাতায়াত করতে দেখেছে।
—খারাপ লোক! সিদ্ধেশ্বরের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল সেদিন প্রবলভাবে নড়ে উঠেছিল।
—তাহলে আর বলছি কী। তুই হয়তো চিনিস না—রাসমণি বাজারের মহানন্দ পাল—ওকে আমরা একডাকে চিনি।
—আমিও চিনি। অযথা খুশিতে সেদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সিদ্ধেশ্বরের মুখ।
—তুই চিনলি কী করে?
—আমাদের বাসায় কয়েকবার এসেছে। মাকে বোন বলে ডাকে। আমাকে গত পুজোয় জামা-প্যান্ট কিনে দিয়েছিল।
—বোন! হাঃ হাঃ বোন! মহানন্দ বোর্ন-জঙ্গল পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। বেশ, বেশ। ওই রাঁঢ়ের দালালটা তোদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে! তাহলে তো খবরটা ঠিকই আছে। তোর মাকে একবার জিজ্ঞেস করিস, মহানন্দ পাল ওকে কোথায় নিয়ে যায়, কোন্ আপিসে!
যন্ত্রণার সেই শুরু। সেদিন রাত থেকেই মায়ের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরের সম্পর্কে প্রথম চিড় ধরে গেছিল। মা কিছুতেই বলেনি—কোন্ অফিস, কী রকম কাজ, কত মাইনে। মা হেসে এড়িয়ে গেছে। ফলে সিদ্ধেশ্বরের মনের মধ্যে সন্দেহের গাছটা আরও একটু বেড়ে ওঠার জায়গা পেয়েছিল। একদিন খুব বেশি রকম পীড়াপীড়ি করাতে মা অসম্ভব কঠিন গলায় বলেছে, জানি না, কেন তুই হঠাৎ পাগলামো করতে শুরু করেছিস। এসব জেনে তোর কী লাভ! এখানকার ঘরভাড়া, লাইটভাড়া মেটানো আর আমাদের দু'জনেব পেট চালানোর মতো একটা কাজ নিশ্চয়ই করি। সেটা তো বুঝতে পারিস। এখন তোকে এসব জানতে হবে না। নিজের কাজ কর। যেদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি সেদিন সব তোকে বলব। কিছুই গোপন রাখব না।
এর পরের ইতিহাস মা ও ছেলের ভাঙনের ইতিহাস। নিরন্তর শত্রুতা আর সংগ্রামের এক একটি অধ্যায়। একদিকে মায়ের অবিচল প্রত্যয়—দিনযাপনের দৈন্য ও গ্লানির ওপরে ওঠার জন্য। সেই সঙ্গে সব কিছুকে উপেক্ষা করার শক্তি। অন্যদিকে নিন্দে, অপবাদ আর ব্যর্থতার আগুনে জ্বলতে-থাকা সিদ্ধেশ্বরের বিদ্রোহ।
সরকারদাই একসময় মায়ের সম্পর্কে সব খবর জুটিয়ে এনেছিল। কুৎসিত দৃশ্য দেখে মানুষ যেভাবে ঘৃণা প্রকাশ করে তেমনভাবে সরকারদা বলেছিল, তোর মা তো মডেলের কাজ করে। মডেল কাকে বলে জানিস? মডেল হল ন্যাংটো মেয়েছেলে। তোর মা আর্ট কলেজের ছেলেমেয়েদের সামনে কাপড় খুলে দাঁড়ায় আর তারা ওই দেখে ছবি আঁকে। চোখ বুজে একবার চিন্তা কর—দেখবি গা-হাত-পা শিরশির করবে। শেষকালে অমলিনাদি শরীর দেখানোর বিজনেসে নামল! কবে শুনব বেবুশ্যে হয়ে খদ্দের...।
গোপন দলিলের মতো মায়ের সামনে এই সত্যগুলো সিদ্ধেশ্বর মেলে ধরেছিল। মা সেদিন আর কোনও কিছু ঢাকতে চেষ্টা করেনি। নীরবে সব স্বীকার করেছে। সিদ্ধেশ্বরের মনে আছে, স্বীকারোক্তির মুহূর্তে মায়ের গোলগাল ফর্সা মুখটা অসম্ভব

যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছিল।
শত চিৎকার-চেঁচামেচি, মহানন্দ পালকে জড়িয়ে খারাপ ভাষায় কথা বলা, বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার ভয় দেখানো—এগুলোর কোনওটাই মাকে টলাতে পারেনি। প্রথম প্রথম মা নীরবে সব সহ্য করেছে। ছেলেকে ক্ষমা করে দিয়েছে নিঃশব্দে। পরে অবশ্য মা-ও গলা চড়িয়েছে বাস্তব ভাষায়, ক্লেদক্লিন্ন জীবনের অসহনীয় আর্তনাদে। তীব্র ঝগড়ার শেষে মা প্রতিবারই বলেছে, তোর বাবার মতো আমি আত্মহত্যা করতে পারব না। আমার পেটে খিদে আছে। আমি বাঁচতে চাই। তাই লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়েছি। তুই আমার গায়ে থুথু দিলেও কিছু করার নেই। দরকার মনে করলে, বাড়ি থেকে সোজা বেরিয়ে যেতে পারিস।
সিদ্ধেশ্বর হেরে গেছে। দারুণভাবে। পেটের ছেলের শত্রুতায় মা ভয় পায়নি। লাভের মধ্যে হয়েছে, সিংহী বস্তি আর গান্ধী বস্তির সকলে জেনে গেছিল, অমলিনা দাস শরীর দেখিয়ে টাকা ইনকাম করে। কেউ কেউ বিষয়টাকে আরও নোংরা জায়গায় টেনে নামিয়েছে। সিধুর মা লাইনের মেয়ে—এমন একটা ধারণাই শেষ পর্যন্ত চালু হয়ে গেছিল সারা এরিয়ায়। নোংরা খবরের সত্যাসত্য কেউ যাচাই করে না। মায়ের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। সিদ্ধেশ্বর আরও কিছুদিন হয়তো লড়াইটা চালিয়ে যেতে পারত। সম্ভব হল না, মেনকার বাবার জন্য। ওই আর একটা হারামজাদা। লোকটা তড়িঘড়ি মেনকাকে গলায় ঝুলিয়ে দিল। আসলে সেই সময় মায়ের সঙ্গে দূরত্ব যত বেড়ে গেছে, মেনকাকে তত কাছে পেতে চেয়েছে সিদ্ধেশ্বর। ওর বাবা সেই সুযোগটা নিতে ছাড়েনি। অবশ্য শ্বশুরই সিদ্ধেশ্বরকে রঙের কারখানায় কাজটা পাইয়ে দিয়েছিল।
বহুদিন আগে সেই নগ্নতার জগৎ থেকে মা বিদায় নিয়েছে। মায়ের 'অমলিনা' নামটা নিয়ে যারা প্রকাশ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত, হাসত, খারাপ কথা বলত—তারা এখন ছায়ার মতো হারিয়ে গেছে। এমন কী সেই উত্তাল অপবাদের ওপর সময়ের ধুলোর পুরু আস্তরণ। তবু মায়ের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরের অদৃশ্য যুদ্ধ এখনও চলছে। বাবার ফেলে যাওয়া নিম্নমধ্যবিত্তের উত্তরাধিকারকে উপেক্ষা করে, তাকে পিছনে ফেলে রেখে সিদ্ধেশ্বর কিছুই করতে পারল না। না অর্থ, না দিনযাপনের সৌষ্ঠব। বরং অবনতির কাঁটাটা অতিদ্রুত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। মা এই সুবর্ণ সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে। সিদ্ধেশ্বরের অসহায়তাকে তুরুপের তাসের মতো এই রহস্যময়ী হাতে তুলে নিল। মা চাকাটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে! মাকে একসময় চরম শত্রু বলে মনে হত। মা আজও তাই। বুলিকে নিয়ে মা যা করতে চাইছে তা সেই পুরনো শত্রুতার দিকবদল।
—কী গুরু, সেই থেকে চোখের পাতা পড়ছে না যে! জেগে জেগে ধ্যান করছ নাকি! খেতে যাবে না? অটোটাকে রাস্তার ধার ঘেঁষে রেখে দিয়ে গণেশ বলল।
সিদ্ধেশ্বর সামান্য চমকে গিয়ে উঠে পড়ল। কখন থেকে এইভাবে বসে আছে কে জানে।
গাড়ি পরিষ্কার করার তেলচিটে কাপড়টায় হাত মুছতে মুছতে গণেশ বলল, সিধুদা,

তুমি কিষেণকে একটু বলে দিও, আমার ফিরতে দেরি হবে। বউ-মেয়ে বাড়ি নেই। নিজেকেই ভাত-টাত বেড়ে খেতে হবে।...তুমি বলে দিও কিন্তু। চলি।...

—বাড়ি নেই! সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, কেন বাড়ি নেই? কোথায় গেছে! বউ-মেয়েকে কেন বাড়ির বাইরে বেরোতে দিয়েছিস।

গণেশ অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। সিধুদা নেশা-টেসা করেছে নাকি! আজ সকাল থেকেই লোকটা কেমন যেন হয়ে আছে। এলেবেলে। ছিটগ্রস্তের মতো। এতক্ষণে পাঁচটা টাকাও কামিয়েছে কিনা সন্দেহ। সিধুদাকে দেখলে মায়া হয়। মানুষটা একেবারে মেরুদণ্ডহীন। শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলেছে। গণেশ রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল। বলল, তোমার মাথায় বায়ু চড়ে গেছে। চান-টান করে খেয়ে ঘুমোও গে।

সিদ্ধেশ্বর উঠোনে পা দিয়েই দেখতে পেল, দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো মা আর বুলির জুতো। তার মানে ওরা ফিরে এসেছে! দু'মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সিদ্ধেশ্বর। এপাশটা বস্তির পশ্চিম দিক। সিদ্ধেশ্বরকে বাদ দিয়ে যারা এদিকে থাকে, তারা সবাই নানান উপায়ে পয়সা করে নিয়েছে। গুরুদাস সাহা তো ছোট একটা কালার টিভি কিনেছে মাস পাঁচ-ছয় আগে। গুরুদাসের দখলে দুটো ঘর। একটা ঘরের চাল ফুঁড়ে উদ্ধত অ্যান্টেনা আকাশের দিকে তাক করে আছে। পয়সা আর ধান্দাবাজি—দুটোই সিংহীর পশ্চিমের বৈশিষ্ট্য। এদিককার পুরুষরা এখন রাস্তায়। মেয়েরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ঘরের খিল তুলে দিয়ে। সিদ্ধেশ্বরকে কেউ লক্ষ করল না।

মা আর বুলিকে ঠিক তিনবার জিজ্ঞেস করবে সিদ্ধেশ্বর—কোথায় যাওয়া হয়েছিল, কোথায় গেছিলে, কোথায় গেছিলি। উত্তর দিতেই হবে। দরকার মনে করলে আরও তিনবার চান্স দেবে সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু বলতেই হবে। অমলিনা দাস ভেবেছেটা কী? যা খুশি তাই করবে! নিজে খারাপ, তাই বলে বুলিটাকেও খারাপ করে দেবে! সিদ্ধেশ্বর যতদিন বেঁচে আছে ততদিন বুলির ভাগ্য ওর বাপের হাতে। অনাহারে মরে গেলেও বুলির নিস্তার নেই। আজ মায়ের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া। বহুদিন আগেকার একটা হিসেব এবার ও বুঝে নেবে।

হতশ্রী ঘরটায় পা দিয়েই সিদ্ধেশ্বর দেখল, মেনকা মেঝেতে বসে আছে। ওর সারা মুখে অজানা তৃপ্তির চিহ্ন। মা আর বুলি ক্লান্ত হয়ে তক্তপোষের ওপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়েছে। পরনের কাপড় এলোমেলো। মনে হচ্ছে, আসন্ন ঝড়ের জন্য ওরা যেন প্রস্তুত হয়েই আছে। কোনও উত্তেজনা নেই। আর পাঁচটা দিনের মতোই স্বাভাবিক। সিদ্ধেশ্বর আরও ক্ষেপে গেল। ওর অস্তিত্ব ওদের কাছে আজ যেন আরও মূল্যহীন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সিদ্ধেশ্বর জানতে চাইল, অ্যাই বুলি, সকালে কোথায় বেরিয়েছিলি?...কোন্ বাবার কাছে গেছিলি! চুপ করে থাকিস না, উত্তর দে।

বুলি চোখ সরু করে বাবাকে দেখল। কোনও জবাব দিল না।

—কী হল, শুনতে পাচ্ছিস না। কোথায় গেছিলি। সিদ্ধেশ্বর তক্তপোশের দিকে আরও এক পা এগিয়ে এসেছে।

—সেই সকাল থেকে ওই একটা বিষয়কে মাথার মণি করে রেখেছ! তুমি আচ্ছা লোক তো! মেনকা হালকা স্বরে বলল।
—চুপ কর্, লাথি মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব। আমি ওদের কাছে জানতে চাইছি। ওরা বলবে।
সিদ্ধেশ্বরের উন্মত্ত চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসে বুলি বলল, কী ছোটোলোকমি হচ্ছে বাবা!
—ছোটোলোকমি! আমি ছোটোলোক! আর তোরা খুব ভদ্দরলোক তাই না! তোরা ছোটলোক, তোরা বেশ্যা, ডাইনি, হারামজাদি কোথাকার।...তুই ভেবেছিস আমি কিছু জানি না! সব জানি। ওই অমলিনা তোকে আর্ট কলেজে নিয়ে গেছিল। তুই মডেল হয়েছিস—ঘরভর্তি লোকের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিলি।...ওই মাগী অস্বীকার করতে পারবে! ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, তুই নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে এলি!...আমি...
সিদ্ধেশ্বর কথা শেষ করতে পারেনি, বুলি হঠাৎ দু হাঁটুর মাঝখানে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।
—এখন কাঁদছিস কেন? জানি, তোর কোনও দোষ নেই। ওই শালী তোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেছে।...আজ ওটাকে শেষ করে দেব।
চকিতে ঘুরে এসে সিদ্ধেশ্বর ঘরের কোণ থেকে দরজার আলগা খিলটা তুলে নিল। অমলিনা এখনও শুয়ে আছে। ওর দু'ঠোঁটের ফাঁকে লগ্ন হয়ে আছে সরু চাঁদের মতো একটুকরো হাসি।
—খবরদার, মায়ের গায়ে হাত তুললে তোমাকে জ্যান্ত রাখব না। রুখে ওঠার আগেই মেনকা খাটের তলা থেকে কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা টেনে বের করে এনেছে।
—মার্, মার্, দেখি কত বড় সাহস...। সিদ্ধেশ্বর মেনকার দিকে ধেয়ে এল।
অমলিনা কল্পনাও করতে পারেনি, মেনকা সত্যিই সর্বশক্তি দিয়ে সিদ্ধেশ্বরের কপালের ওপরে হাতুড়িটা বসিয়ে দিল। সে বাধা দেওয়ার সময়টুকু পেল না।
মুখ থুবড়ে রক্তের ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর পড়ে আছে। বুলি স্তব্ধ পাথর। দরজায় মাথা ঠুকে কাঁদছে মেনকা। ঘরের বাইরে কিছু উৎসুক ও ভয়ার্ত মহিলার মুখ। মৃত্যুর আর্তনাদে এদের ঘুম ছুটে গেছে। হাহাকার আর বিহ্বলতা কাটিয়ে অমলিনা মৃত্তিকালগ্ন সিদ্ধেশ্বরের পাশে এসে বসেছে। ছেলেব রক্তাক্ত মাথাটা কোলে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করল অমলিনা।
আস্তে আস্তে চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে। তবু প্রাণপণে বাধা দিয়ে সিদ্ধেশ্বর কঁকিয়ে উঠল, কে, কে তুই! ছেড়ে দে...
দরজার বাইরে থেকে কেউ বলল, অমলিনাদি!
যেন সিদ্ধেশ্বরের প্রতিবাদের জবাব।
রক্তের একেবারে কাছে মুখ নামিয়ে এনে অমলিনা বলল, আমি মা।...

আঁটপুর-যাত্রা

অবিনাশ সাড়ে-নটা নাগাদ একবার এসেছিল। ঠিক তার দশ মিনিট আগে আমি অফিসে বেরিয়ে গেছি। সন্ধের একটু পরে ও আর একবার এসেছে। তখন আমি আবার অফিস থেকে ফিরিনি। আজকাল বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে যায়। ভীষণ কাজের চাপ। বছরের শেষে অন্যান্য সহকর্মীরা পাওনা ছুটিগুলো এই সময়ে নেয়। দূরে কোথাও বেড়াতে যায়। পাহাড়ে, সমুদ্রে কিংবা জঙ্গলে।

দপ্তর বেশ ফাঁকা। এর-তার কাজ আমাকে দেখতে হচ্ছে। ফলে সময়ের ঠিক থাকে না।

দু-দুবার এসেও অবিনাশ আমার দেখা পেল না। অপর্ণার কাছ থেকে ওর আসার খবরটা শুনে একটু থমকে গেছিলাম। অবিনাশ আসা মানেই কোনও একটা গণ্ডগোলের ব্যাপার। ছেলেটা কালেভদ্রে যখনই আসে, তখনই ভগ্নদূতের মতো দুঃসংবাদ বয়ে আনে। আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে অপর্ণাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন এসেছিল কিছু বলেছে?

আমাদের দু'বছরের মেয়ে হৈমী তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অপর্ণা প্রথমে বলেছে, মেয়েটা এতক্ষণ তোমার জন্যে জেগে ছিল। তোমার তো কোনও আক্কেল নেই। অফিসটাকেই জীবনের সব করে নিয়েছ!

এরপর ঘুমন্ত মেয়েকে আলতো আদর করে খুব দায়সারাভাবে বলেছিল, কী আর বলবে? তোমার সমাজসেবা-সংক্রান্ত কথা। তুমি ছাড়া তো এদের আর অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই! সেই যে মানিক বলে একটা ছেলেকে পালেদের রঙের দোকানে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে, তাকে নাকি ওঁরা তাড়িয়ে দিয়েছেন। তা মানিকবাবু লজ্জায় তোমাকে বলতে আসতে পারেনি। অবিনাশকে পাঠিয়েছে।

আমি মানিকের নামটা শুনেই চমকে উঠেছিলাম। অপর্ণা স্পষ্টতই রেগে গেছিল। সারা মুখে বিরক্তি ছড়িয়ে বলেছিল, এদের নিয়েই থাকো—যত সব মণি-মানিক, হীরে-জহরত। আমি কোনও উত্তর দিইনি। মানিক আমার কেউ না, মানিকের সঙ্গে আমার কোনও আত্মীয়তা নেই। ওর সম্পর্কে কিছু ভাবা কিংবা ওর জীবনের সঙ্গে আমার অকারণ জড়িয়ে যাওয়া অপর্ণা বরদাস্ত করতে পারে না। শুধু ও কেন, কেউই হয়তো পারবে না। মানিকরা সবসময়েই ইউসলেস, অপাঙ্‌ক্তেয়, একটা বোঝা।

সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেছিল, মানিকের মায়ের মৃত্যুর খবরটা। অবিনাশই আমাকে দিয়ে যায়। পালেদের বিরাট দোকানের সাতজন সেলসম্যানের মধ্যে অবিনাশ একজন। মানিক আর একজন। হয়তো সমবয়সী কিংবা একই রকম দুশ্চর

জীবনপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে দুজনে ভেসে চলেছে বলে অবিনাশকে আমার কাছে মানিক পাঠিয়েছে। এসব অবশ্য আমার অনুমান। তবে অবিনাশের রোগা, গালভাঙা, বুড়োটে চেহারাই বলে দেয়, ছেলেটা মানিকের মতনই অভাবী, দুঃস্থ, আলো-অন্ধকারের তফাত বোঝার ক্ষমতা একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছে।

অপর্ণা বেশ কঠিন মুখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। বুঝতে চেষ্টা করছিল, মানিককে নিয়ে আমার ভাবান্তরের রহস্যটা। আমি কি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। মনে নেই। হালকা পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিয়ে তখন কীসব ভেবেছিলাম তাও আর মনে নেই। অপর্ণা চলে যাচ্ছিল। আমি অনেকটা নাটকের বিষণ্ণ নায়কের মতো বাঁ-হাতটা তুলে আনমনে জিজ্ঞেস করেছি, আর কিছু বলেছে!

অপর্ণা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। তবু ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ রুক্ষস্বরে বলেছিল, মানিক নাকি কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় চলে গেছে। ওর পাত্তা নেই। একেবারে উধাও।

—বেপাত্তা হবার ঘটনা কবে ঘটেছে। ওর চাকরি যাওয়ার আগে না পরে! আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা ধোঁয়াটে মনে হচ্ছিল।

এইভাবে আমি ওকে প্রশ্নের জালে জড়িয়ে ফেলব অপর্ণা ভাবতে পারেনি। তাই দপ করে রেগে গিয়ে উত্তর দিয়েছিল, অত খুঁটিয়ে আমি জানি না। শুনিওনি। এইসব ছেলেগুলো ভারি অসভ্য। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মিনমিন করে কথা বলেই চলে যায়। শত বললেও একবারটি ভিতরে এসে বসে না। চা-টা খাওয়া তো দূরের কথা। এদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ যে কেন ছাই কিছুই বুঝি না। যত্তসব উটকো ঝামেলা।...হ্যাঁ বলো, কী খাবে—চা না কফি!

সব কিছু ভুলে গেছি—চা খেয়েছিলাম, না কফি, অপর্ণা গজগজ করছিল, না চুপ করে আমাকে দেখছিল, হৈমীকে আমি অভ্যাসবশত ছুঁয়েছিলাম, না ছুঁইনি—সব কিছু। শুধু এইটুকু মনে আছে, এর কিছুক্ষণ পরে আমি সোজা হাঁটতে হাঁটতে পালেদের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। একদম খেয়াল ছিল না যে, ওদের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে অন্তত ঘণ্টা আড়াই আগে। রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেছিল। সবুজ নাইটল্যাম্পের শ্যাওলা-শ্যাওলা আলোয় নিদ্রাতুর ঘরটাকে অদ্ভুত লাগছিল। আলোটা চোখে সয়ে যেতেই মানিকের মুখটা বুকের ভেতরে ভেসে উঠেছিল। আমার খুব খারাপ লাগছিল। অজানা ভয়ে ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। আমি হঠাৎ ভেবেছিলাম, মানিক আত্মহত্যা করেছে। এসব ক্ষেত্রে ওর বয়সী ছেলেরা তাই করে। বেঁচে থাকার বিড়ম্বনায় লাথি খেতে খেতে কেউ কেউ ঘুরে দাঁড়ায়; কেউ কেউ একেবারে হেরে যায়। মানিক এই হেরোদের দলে।

আশ্চর্য, মানিকের সম্বন্ধে এইসব সাত-পাঁচ খারাপ কথা ভাবতে ভাবতে আমি আবার ঘুমিয়েও পড়েছি। শ্যাওলা-রঙের আলোর সমুদ্রে ডুবে গেছি কিছুক্ষণ পরেই। মানিক সেই রাতটার মতো সুপ্তির বিস্মরণে হারিয়ে গেছিল। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। কেননা, মানিকের সঙ্গে আমার কোনও নাড়ির যোগ নেই। ওর কাছে এমন কোনও সম্পদ নেই, যা দিয়ে ও আমাকে জাগিয়ে রাখতে পারে। আমার সোস্যাল-ওয়ার্কের

একটা আইটেম ছাড়া মানিক আর কিছুই নয়। তবু মানিক আমায় সেই রাত্রে কেন নাড়িয়ে দিয়েছিল, পথে নামিয়েছিল, ঘুম ভাঙিয়েছিল—জানি না।

এমন কী, কেন আমি এই যে সকালের বাসে, মানিকের খোঁজ করতে ওর গ্রাম আঁটপুরের দিকে চলেছি, তাও বলতে পারব না। মানিকই একদিন আমাকে বলেছিল, দত্তদা, আমাদের সব কাজ যদি একের পিঠে এক দুই, দুয়ের পিঠে দুই চার—এই নিয়মে চলত তা হলে হয়তো এত দুঃখ থাকত না। গরিবের পাশে এসে মানুষ দাঁড়াবে, তাকে দাঁড়াবার জায়গা করে দেবে, এ যদি হত, তা হলে পুরো পৃথিবীটাই বদলে যেত। কিন্তু দেখবেন ঠিক তার উল্টোটা হয়। গরিবকে, দুঃস্থকে লাথি মেরে আরও নীচে ফেলে দাও। শালার বেটা যাতে উঠতে না পারে।

এসব ভাববাদী কথাবার্তা মানিককে কেউ হয়তো শিখিয়েছিল। অথবা ওর অভাবী, শূন্য সত্তায় এসব বায়বীয় ভাবনা জন্ম নিয়েছে। যাই হোক না কেন, মানিক এমন সব ডায়ালগ দিত মাঝে-মাঝেই। আমি ওর এই জাতীয় কথা শুনে অবাক হয়ে যেতাম। কিন্তু কখনও তা প্রকাশ করিনি। পালেদের দোকানে ওকে ছ'শো টাকার নো ওয়ার্ক নো পে কড়ারে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর থেকে সব সময়েই এমন একটা ভান করেছি যেন আমি ওর একমাত্র পরিত্রাতা। মানিক যদিও এই সামান্য উপকারে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে থাকত। আমি অস্বীকার করব না, ওর এই নত-বিনত স্বভাবটা আমার ভাল লেগেছিল।

এমন মাথা-নীচু-করা একটা ছেলেকে পালেরা কেন যে দ্বিতীয়বার তাড়িয়ে দিল কে জানে। অবিনাশ আমাকে পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। পরদিন রাত্তিরে দোকান বন্ধ হওয়ার মুখে অবিনাশকে আমি ধরেছিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে ওকে বাইরে ডেকে এনেছি। কাউন্টারে তখন সেজো পালবাবু বসেছিলেন। ক্যাশবাক্সে আগুন দেখাবার উদ্‌যোগ করছিলেন বোধহয়। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। তবু হাসেননি। একটু বিরক্ত হয়ে অবিনাশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী ব্যাপার বলো তো। মানিকের দোষটা কী?

রাস্তা থেকে মুখ না তুলে অবিনাশ বলেছে, আমিও জানি না দাদা। এসব পাঁচদিন আগের ঘটনা। কয়েকদিন জ্বর হয়েছিল বলে আসতে পারিনি। ওইদিন জয়েন করেই শুনলাম, মানিককে মালিকরা তাড়িয়ে দিয়েছে। আর রাখবে না।

—এবারও কি ও সেই বাড়িতে বসেছিল! দু'দিনের ছুটি নিয়ে গিয়ে এক মাস...।

—কই না তো! অবিনাশ আমার অনুমান উড়িয়ে দিয়েছে।

—তা হলে? আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলাম।

বড় অদ্ভুত চোখে অবিনাশ আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল। সম্ভবত ও অবাক হয়ে গেছে আমার আচরণে। মানিক আমার কে?—এমনও হয়তো ভেবেছে। ভীষণ নিস্পৃহ গলায় অবিনাশ বলেছিল, তাড়িয়ে দেওয়ার অজুহাতের অভাব আছে নাকি। মালিকদের জিজ্ঞেস করুন, ওঁরাই বলবেন...।

অবিনাশ কথা শেষ করেনি। আমি সেজোবাবুর দিকে আবার তাকিয়েছি। ভদ্রলোক আমাকে ডাকা কিংবা মানিকের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করা—এর দুটোর কোনওটাই

করেননি। আমি একবার ভেবেছিলাম, ওঁকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। মনে হয়েছিল, আমার কথায় যাঁরা মানিককে দয়া করে সামান্য কাজটা দিয়েছিলেন, তাঁরা বাধ্য নন, কেন মানিক বিতাড়িত হল—এটা জানাতে। এখন চাকরি-বাকরির বাজার খুব খারাপ। যেন সবসময় সরু সুতোয় ঝুলছে। যে কোনও সময় ছিঁড়ে পড়তে পাবে।

—মানিকটা তো ভীষণ আহাম্মক। এ সময় কেউ চাকরি খোয়ায়! আমি বলেছিলাম।

সম্ভবত 'চাকরি' শব্দটা অবিনাশের বুকে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। ছেলেটা ম্লান হেসে শুধু বলেছে, ভাল বলেছেন—চাকরি! মানিক নাকি রঙ চুরি করেছে। যত সব মিথ্যে কথা! ও রুখে দাঁড়ালে পারত।

বাস থামল। সরকারি বাস। যাত্রী-রাস্তা-স্টপ কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে এতক্ষণ দৌড়াচ্ছিল। জায়গাটার নাম জাঙ্গিপাড়া। আজ হয়তো এখানকার হাটবার। রাস্তার দু'পাশে মানুষ আর পসরার ভিড় দেখে তাই মনে হচ্ছে। পাশের ভদ্রলোক, ইনিও আমার মতো কলকাতা থেকে আসছেন, এবার অযাচিতভাবে বললেন, এখান থেকে আর আধ ঘণ্টা। তারপরেই আঁটপুর। আমি অবশ্য তড়ার মোড়ে নেমে যাব। আঁটপুরে কি এই প্রথম যাওয়া হচ্ছে? বেড়াতে নাকি?

একটু অবাক হয়ে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। আঁটপুর কি বেড়াবার জায়গা! টুরিস্ট স্পট! নাকি, ইনি বেড়ানো মানে বলতে চাইছেন কোনও কুটুম-বাড়ি যাওয়া। কিছুই ধরতে না পেরে বললাম, না, মানে, ওখানে আমার চেনাশোনা একজন থাকে। তার সঙ্গে দেখা করতে...।

—অ। তার মানে কাজে-কম্মে আসা হচ্ছে। তা বেশ। তবে গ্রামটা ঘুরে দেখবেন। ভাল লাগবে। সব গ্রামেই তো আজকাল আগুন জ্বলছে। পলিটিকসের আগুন, জোতদার-বর্গাদারের আগুন, দারিদ্র্যের আগুন—আরও কত কী! আঁটপুর মশাই এসবের থেকে মুক্ত। একেবারে ছবির মতো পরিবেশ। বইয়ের পাতা থেকে যেন গ্রামটা উঠে এসেছে।

—আপনিও কি ওখানেই থাকেন? আমি সামান্য ঔৎসুক্য দেখালাম।

—তা বলতে পারেন। ঠিক আঁটপুরে নয়, ওর মুখোমুখি একেবারে গা ঘেঁষে আঙরবাটি বলে যে-গ্রামটা আছে সেখানে আমাদের তিনপুরুষের বাস। গিয়ে নামুন না। সব দেখতে পাবেন। সময় থাকলে আপনাকে আমাদের বাড়িতেও নিয়ে যেতাম। আসলে মুশকিল হয়েছে কি, আমাকে বিশেষ কাজে ওই তড়ার মোড়ে নামতে হবে।

ভদ্রলোক এমনভাবে তড়ার মোড় শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন, যেন আমি জানি জায়গাটা কোথায়।

আমি হেসে আবার বাসের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। দু'পাশে আদিগন্ত ধানখেত। এখন অঘ্রান। মাঠের পর মাঠ জুড়ে হেমন্তের সোনালি ফসল। ধানের গুছিগুলো মা লক্ষ্মীর পদভারে নুয়ে পড়েছে। হিম-হিম হাওয়ার স্পর্শে আর দুলতে

পারছে না, ঢেউ খেলিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে না কোথাও। কোনও কোনও খেতের ফসল এরই মধ্যে চাষিরা ঘরে তুলে নিয়ে গেছে। নবান্নের আর বেশি দেরি নেই। শস্যশূন্য মাঠগুলো চরাচরের মাঝখানে যেন দ্বীপের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। রাস্তার দু'পাশে বাবলাগাছের সারি। কিশোর বয়সী গাছগুলো নিশ্চিত বনসৃজন প্রকল্পের সাক্ষী। দু-একটা গরুর গাড়ি চোখে পড়ছে। সবজি অথবা খড়বোঝাই মন্থর গাড়িগুলো অনন্তকাল ধরে যেন গন্তব্যের দিকে চলেছে। রাস্তার ধারে ধারে ধান শুকোতে দিয়েছে গ্রামের মানুষ। আচ্ছা, বাসের চাকার তলায় ধানগুলো পিষে যাচ্ছে না তো! অন্য যাত্রীদের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। বাসের যাত্রীদের চেহারায়-পোশাকে আধাগ্রাম-আধাশহরের ছোঁয়া। এঁরা সবাই কি আঁটপুরে যাচ্ছেন? আমার মতো! দেখে বোঝার উপায় নেই।
বাসের গতি আর বাইরের দৃশ্য আমাকে মাঝে মাঝে মানিকের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছে। আজ শনিবার। আমার অফিস ছুটি। প্রথমে ভেবেছিলাম অপর্ণাকে বলে আসব। শোনো, আঁটপুরে যাচ্ছি, মানিকের খোঁজ করতে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত আর বলিনি। ও হয়তো আসতে দিত না, অযথা ব্যঙ্গ করত, বাড়াবাড়ি ভাবত। আমিও অবশ্য ওকে বোঝাতে পারতাম না, কেন এইভাবে আঁটপুরের দিকে ছুটে আসছি মানিকের জন্যে। মানিক তো আমার কেউ নয়, ওর সঙ্গে দূরসম্পর্কের আত্মীয়তাও নেই। তা হলে! অপর্ণাকে মিথ্যে কথা বলে কাকভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। ও জানে, আমি যাচ্ছি কৃষ্ণনগরে আমার স্নেহশীলা, অতিবৃদ্ধা জ্যাঠাইমাকে দেখতে। অপর্ণা একটু বাধা দিয়েছিল। তবে জ্যাঠাইমার বয়সের কথা ভেবে আর জোর করেনি। হয়তো এই শীতের পর সেই স্নেহময়ী মহিলা আর বাঁচবেন না। ওঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। মিথ্যে হলেও আমার কৃষ্ণনগরেই যাওয়া উচিত ছিল। তার জায়গায় আমি আঁটপুরে চলেছি। শুধুমাত্র একটি পরিচিত ছেলে আমাকে ওর গ্রামে টেনে নিয়ে আসছে। যদিও আমি নিশ্চিত নই, মানিক গ্রামে ফিরে এসেছে কি না। অবশ্য ওর আর যাওয়ার জায়গাই বা কোথায়।
পাশের ভদ্রলোক উসখুশ করছেন। আবার কিছু বলতে চাইছেন হয়তো। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে না। বাইরের দৃশ্য আমাকে টানছে। ছোট ছোট গ্রামের বুক চিরে বাসটা হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেলুলয়েডে ধরা ছোট ছোট মুহূর্তগুলোর মতো এক-একটা গ্রাম চকিতে মুছে যাচ্ছে চলমান দিগন্তের প্রান্ত থেকে। ভদ্রলোক অকারণে হাসিমুখ করে বললেন, আগে আগে মশাই গরমেন্টের বাস জাঙ্গিপাড়ায় মিনিট পনেরো দাঁড়াত। এই চা-টা খাওয়ার জন্যে। আজকাল কী যে হয়েছে। দাঁড়াবার প্রয়োজন মনে করে না। অথচ এতটা পথ। একটানা ঠায় তিন ঘণ্টা বসে থাকা কি চাট্টিখানি কথা! বাসে তো আবার বিড়ি-সিগ্রেটও খেতে দেবে না। যেদিকে তাকাও সর্বত্র নো স্মোকিং। এভাবে ভাল লাগে। দুর, দুর। আমি তো মশাই ওই জন্যে বাড়িতে আসা একেবারে কমিয়ে ফেলেছি।
—আপনি ওখানে থাকেন না। আমি একটু বিস্মিত হলাম।
—আরে না মশাই। গ্রামে বসে থাকলে ভাত জুটাবে ভেবেছেন। আমি হাওড়ার দাসনগরের কাছে একটা প্রাইমারি স্কুলের টিচার। পরিবার নিয়ে বেলগাছিয়ায় থাকি।

যা হয়, গ্রামের পৈতৃক সম্পত্তি বেচতেও পারি না, দেখভালও করতে পারি না। অসুবিধে হলেও ন'মাসে ছ'মাসে তিন-চারবার আসতে হয়। কী করব বলুন!
খুব শিশুকে কিংবা কথা বলতে ভালবাসেন—ভদ্রলোক এই দুটোর মধ্যে একটা। ওঁর ব্যক্তিগত কথায় আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে কিনা সে সম্পর্কে উনি মোটেই চিন্তিত নন। আমি হঠাৎ ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আঁটপুর তো নয় ছবির মতো, কিন্তু আপনাদের গ্রাম—সেটার অবস্থা কেমন?
প্রথমে বেশ উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, ভাল, ভাল, কোনও গোলমাল নেই। বামফ্রন্টের এম. এল. এ. এবং এম. পি.। অশান্তি হবার জো নেই মশাই। তবে কী জানেন...
একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, আসলে ছবি-টবি হল বাইরের রূপ। বাংলাদেশের কোন গ্রামটাকে আপনি স্বর্গ বলবেন মশাই? ওসব কথার কথা। বাইরে থেকে যেমন দেখায় আর কি! আঁটপুরই বলুন কিংবা আঙরবাটি—সব এক। আরে, গ্রাম তো আর শুধু গাছপালা, পুকুর-টুকুর দিয়ে গড়া কোনও বৈকুণ্ঠ নয়। গ্রামের প্রধান জিনিস হচ্ছে মানুষ। আর মানুষ যেখানে আছে সেখানেই সমস্যা আছে, লোভ আছে, লালসা আছে। আছে মামলা-মোকদ্দমা, লাঠালাঠি, ফাটাফাটি—আরও কত কী!
একটানা কথা বলে ভদ্রলোক থামলেন। স্কুল-মাস্টারদের স্বভাবই এরকম। একবার শুরু করলে আর থামতে পারেন না। আমি আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। ভদ্রলোক আধ ঘণ্টার মধ্যে নিজের কথাকে নিজেই সংশয়াচ্ছন্ন করে দিলেন। বুঝতে পারছি না, কোনটা ঠিক। কিছুক্ষণ আগেও আমি একটু চাপা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। যেন একটা সুস্থিত গ্রাম আবিষ্কার করতে চলেছি। নানা আগুনের হল্‌কা থেকে দূরে অবস্থিত এমন একটা জায়গা যেখানে মানিকের বাড়ি। যেখানে গেলে মানিককে অন্যরকমভাবে পাব। আর এক মানিক। হতাশাগ্রস্ত, অভাবী এবং আলোকশূন্য মানিক নয়, নিজের জন্মস্থানের চৌহদ্দিতে আপন অহংকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য এক মানিক।
পাশের ভদ্রলোক কি মানিককে চেনেন? একবার ভেবেছিলাম জানতে চাইব। কিন্তু এখন আর সে রকম কিছু ভাবছি না। আঁটপুর পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে—কেবলমাত্র এই প্রশ্নটা করার পর থেকে স্কুল-শিক্ষকটি যে রকম গায়ে পড়ে নিজের জীবনচরিত বলছেন, তাতেই বিরক্তি ধরে যাচ্ছে। কিন্তু মানিককে আমিই বা কতটুকু চিনি। পাঁচ-ছ'বছর আগে, আক্ষরিক অর্থে একটা আঁস্তাকুড়ের পাশে মানিক দে নামের ওই ছেলেটাকে প্রথম দেখি। আমার বন্ধু অসিতের মায়ের শ্রাদ্ধে মানিক লেবার দিচ্ছিল। কাজ বলতে এঁটোকাঁটা, পাতা-ভাঁড় পরিষ্কার করা। শোকস্তব্ধ অথচ ভূরিভোজনে ব্যস্ত নিমন্ত্রণ বাড়ির ডামাডোলের মধ্যে অসিতের ছোট বোনের গলা থেকে একটা সোনার চেন কোথায় যেন অজান্তে খুলে পড়ে যায়। টের পাওয়ার পর সবাই খুঁজতে শুরু করেছিল। আত্মীয়-স্বজন, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা। খুঁজে পাওয়ার আশা সবাই যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, সেই সময় হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে মানিক খুব ভিতু গলায় বলেছিল, স্যার, ওই ওখানে পাতা তুলতে গিয়ে হারটা কুড়িয়ে পেলাম। এই

নিন। কাউকে আমার কথা বলবেন না স্যার। তা হলে সবাই আমাকে চোর বলে সন্দেহ করবে। মারবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এইমাত্র আমি ওটা কুড়িয়ে...।

এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়, কেন সেদিন মুণ্ডিতমস্তক গৃহকর্তা অসিতকে বাদ দিয়ে, কিংবা ওর অনুসন্ধানী বোনেদের চোখ এড়িয়ে মানিক আমার কাছে হারটা নিয়ে এসেছিল, তুলে দিয়েছিল আমার হাতে। আমার মধ্যে মানিক কী দেখেছিল। কোনও আশ্রয়, কোনও অবলম্বন। সেই দিন থেকে ছেলেটা আমার মনের এক কোণায় জায়গা করে নিয়েছে। ওর সেই আচমকা এবং ভীরু সততা আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। মুহূর্তে মনে হয়েছিল, ছেলেটাকে এই আঁস্তাকুড়ের পাশে কিছুতেই মানাচ্ছে না। ওর আসন একটু ওপরে। নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে মানিক কোনও রকমে দিনযাপন করছে। অথচ এমনটা হওয়া উচিত নয়।

আমি সেই দিনই ওকে অবসরমতো ডেকে নিয়ে এসে ওর জীবনপঞ্জি জেনে নিয়েছিলাম। নাম—মানিককুমার দে। পিতা—ব্রজমাধব দে। ঠিকানা—গ্রাম : আঁটপুর, জেলা : হুগলি। শিক্ষা—মাধ্যমিক ফেল। বসতবাটি ছাড়া জমিজায়গা বলতে কিছুই নেই। বাবা হাওড়া কোর্টের সামান্য স্ট্যাম্প ভেন্ডার ছিলেন। তিন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছেন। বউ ও ছেলের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি। মানিকদের গ্রামের এক তন্তুবায়ের হাতিবাগানে গামছা-লুঙ্গি-ঝাড়নের দোকান আছে। তিনিই মানিককে কলকাতার রুজি-রোজগারের ধান্দায় আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। উনিশ বছর বয়সে ও কলকাতায় এসেছিল। আমার সঙ্গে ওর যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তখন মানিকের বয়স তেইশ। চার বছর এ ঘাট-সে ঘাট ঘুরেও কিছু করতে পারেনি। সেই সময় ও একটা ক্যাটারার সংস্থার সাফাইকর্মী। লম্বা খাওয়ার টেবিল থেকে এঁটো-কাঁটা, পাতা-ভাঁড় কুড়িয়ে জঞ্জালে ফেলা, জায়গা পরিষ্কার করা, প্লেট ইত্যাদি ধোয়া—এই সব কাজ।

এমন একটা আশাহীন, আলোহীন বিধ্বংসী অবস্থা সত্ত্বেও মানিক সেদিন হারটা পেয়েও গাব করে দেয়নি। ও কি সেদিন ভয় পেয়ে গেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর আমি এখনও পাইনি। তবে ওর হাত থেকে হারটা নিয়ে মনে হয়েছিল, মানুষের ভেতরে এখনও কিছু সৎ প্রবৃত্তি ঘাসের মতো বেঁচে আছে। পদদলিত হতে হতেও সেগুলো দূর্বা হয়ে ওঠে। মানিককে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেছিলাম। ও রেখেছিল, এরপর একটা সুযোগ এসে যাওয়াতে, ওকে পালেদের রঙের দোকানে ঢুকিয়ে দিই। গত বছরের গোড়ার দিকে। এরই মধ্যে ওকে পালেরা একবার ছাঁটাই করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ মা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে মানিক সেই যে বাড়িতে এসেছিল, তারপর প্রায় একমাস কোনও খবর দেয়নি। মালিকরা ওর এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বরদাস্ত করতে পারেননি। মানিকের সততার দোহাই দিয়ে সেবার ওকে পুনরায় ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার অবলম্বনটা পাইয়ে দিয়েছিলাম। এবারে ও সেই সুযোগটা দিলও না, নিলও না। আমি নিশ্চিত নই, তবু আমার মন বলছে, মানিক আঁটপুরেই ফিরে এসেছে। যদিও সেই অর্থে এই পৃথিবীতে ওর কোনও বন্ধন নেই, তবু ওর আবাল্য স্মৃতিবিজড়িত মাটির জগতের দিকে মানিক উল্টোযাত্রা করেছে।

আঁটপুরের বাড়িটাও এই মুহূর্তে ওর কাছে এক স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু ও এসেছে। শুনেছিলাম ওর এক বিধবা পিসি ওদের বাড়িতে অনেকদিন থেকে আছেন। সেই নিঃসঙ্গ মহিলাই হয়তো এখন মানিকের একমাত্র সান্ত্বনা, দৈনন্দিন জীবনের অভিপ্রেত আশ্রয়।

মানিক আমাকে বেশ কয়েকবার বলেছিল, দত্তদা, একবারটি যাবেন আমাদের আঁটপুরের বাড়িতে? আপনাকে একদমই আদর-যত্ন করতে পারব না। কীই বা আছে আমাদের! তবু আপনার ভাল লাগবে। দেখবেন! চলুন না, বউদি আর হৈমীকে নিয়ে। হাওড়া ডিপো থেকে স্টেটবাস ছাড়ে। একদম সোজা আঁটপুর। প্রাইভেট বাসও আছে। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, আমাদের গ্রামে গিয়ে দেখবেন—কত দেখার জিনিস এধারে-ওধারে ছড়ানো-ছেটানো। আমরা তো প্রতিদিন দেখি, তাই ওসবের মর্ম বুঝতে পারি না। যাবেন! তখন মানিকের মা বেঁচেছিল। আমি সেই সময়ে সামান্য উৎসাহ দেখিয়েছি। হরিৎবর্ণের নিটোল পল্লীগ্রামে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা আমার আছে। অপর্ণা অবশ্য কলকাতার বাইরে তেমন পা দেয়নি। ওকে তখন বলেছিলাম, ঠিক আছে, যাওয়া যাবেখন। তুমি একটু কাজে-কর্মে দাঁড়িয়ে যাও। তারপর দেখা যাবে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে মানিক এক বাক্স মিষ্টি কিনে এনেছিল। আমি ও অপর্ণা—দু'জনেই রাগ করেছিলাম। অপর্ণা কড়া গলায় বলেছিল, এসব লৌকিকতা আর খবরদার করবে না বলে দিচ্ছি। অভাবী মানুষ অভাবী মানুষের মতো থাকবে।

অপর্ণার শেষ বাক্যটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। ছেলেটাকে এতটা নির্মমভাবে ও না-বললেই পারত। মানিক অবশ্য কথাগুলোকে গায়েই মাখেনি। কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে হেসে বলেছিল, কী যে বলেন বউদি। দাদা আমার জন্যে যা করেছেন, তার তুলনায় এ তো সামান্য তুচ্ছ। যেদিন আপনাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভাল-মন্দ খাওয়াতে পারব, সেদিন আমার আশ মিটবে।

আমি সে-ই আঁটপুরে আসছি। এখন মনে হচ্ছে, আগে এলেই ভাল হত। মানিকের সেই আপাতসুখের দিনগুলোতে। আমার এই আসাটা ওকে হয়তো আরও বিড়ম্বনায় ফেলে দেবে। মানিক আমার সঙ্গে একবার যদি দেখা করে আসত, তা হলে এখানে দৌড়ে আসার কোনও দরকার পড়ত না; মানিকের এই নীরবে চলে আসার মানে কি কোনও প্রতিবাদ? আমি সব মিলিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় উৎসাহে ভেসে যাচ্ছি না তো! মানিকের বয়সী বহু ছেলে এখন গভীর দুঃসময় আর সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে মানিকের চেয়ে শিক্ষিত। কর্মহীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তারা হন্যে হয়ে ঘুরছে। তাদের জন্যে আমি কী করতে পারছি? সত্যিই হয়তো বাড়াবাড়ি করছি। মানিকের জন্যে এতটা না করলেও চলত। ওর এই মুখ থুবড়ে পড়া বা হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই।

—তড়ার মোড় এসে গেছে। আমি নামলাম মশাই। আর পাঁচ মিনিট গেলেই বাসের যাত্রা শেষ। বাস থেকে যেখানটিতে নামবেন সেখানটাই আঁটপুরের কেন্দ্রস্থল। সেন্টার

প্রেস। চলি, আবার দেখা হবে। যদি আঙরবাটি যান, তবে ওখানে গিয়ে আমার নাম বললেই হবে। আমাদের বনেদি ফ্যামিলি—সবাই একডাকে চেনে।

বাস থামল। ভদ্রলোক বস্তার মতো একটা চটের থলে আর সুটকেশ নিয়ে নেমে গেলেন। আমি একটু ধাতস্থ হয়ে কিছু বলার আগেই বাস ছেড়ে দিল। ভদ্রলোক নিজের নাম জানাতে ভুলে গেলেন। আমিও জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম না। খানিকটা বাঁক ঘুরে, একটা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরাট কোঠাবাড়ি ছাড়িয়ে, রাস্তার দু'পাশে আরও কিছু পাকাবাড়িকে ফেলে রেখে বাসটা যেখানে এসে থামল, সেটা কিছুতেই বাসস্টপ নয়। মাঝারি মাপের একটা লম্বাটে মাঠ। সামনেই দুটো প্রাচীন শিবমন্দির। কোনও উপলক্ষে সদ্য রঙ ফেরানো হয়েছে। মন্দিরের গায়ে গাঢ় পাটকেল রঙের টেরাকোটার ভাস্কর্য। মাঠটার একটা দিক পাঁচিল আর প্রবেশ-তোরণ দিয়ে ঘেরা। একটু দূরে দূরে পাঁচিলের লাগোয়া একটা দোলমঞ্চ, অন্যটা রাসমঞ্চ। বনস্পতির মতো বিশাল একটা বকুলগাছ মাঠের অর্ধেকটা ছায়া দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। মন্দির, মাঠ, তোরণ, স্থাপত্য, মহীরুহ—সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা রাজকীয় সমারোহ। অথচ কী শান্ত, নির্জন, কোলাহলহীন পরিবেশ! চারপাশটা চোখ বুলিয়ে দেখতে যতটা সময় লেগেছে, তারই মধ্যে বাসের যাত্রীরা যে যার পথে চলে গেল। অবশ্য ক'জনই বা ছিল এই শেষ বিন্দু পর্যন্ত। কাউকে মানিকের কথা জিজ্ঞেস করা হল না। সরকারি বাসের ড্রাইভার আর কনডাকটব হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিচ রাস্তার ওপারে একটা মিষ্টির দোকানের দিকে চলে গেলেন। মাঠের মাঝখানে কয়েকটা ছাগল চরছে। বকুলগাছটার গোড়া ঘিরে যে গোল, লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো চত্বর, সেখানে একজন শুয়ে আছে। গামছা মুড়ি দিয়ে। মানিকের খবর জানার জন্যে কোনও লোককে ধারে-কাছে দেখতে পাচ্ছি না।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে আমি মিষ্টির দোকানের সামনে চলে এলাম। বাস-কর্মচারীরা এতক্ষণে চায়ের অর্ডার দিয়ে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। পাঁচ-ছ' রকম মিষ্টির পাশে দুটি গামলার মতো পাত্রে গুড়ের মুড়কি আর চিনির বাতাসা সাজানো আছে। একজন প্রৌঢ় লোক ও একটি সদ্যকিশোর দোকান সামলাচ্ছে। ধোঁয়াময় কাঠের উনুনে বসানো আছে চায়ের কেটলি। ভুসোকালিতে ঢাকা পড়ে গেছে কেটলির আসল রঙ।

আমাকে দেখেই প্রৌঢ় লোকটি বুঝতে পারলেন, আমি নবাগত। এই প্রথম পা রেখেছি আঁটপুরের মাটিতে। নিজের থেকে উনি জানতে চাইলেন, কাদের বাড়ি যাবেন? নাকি ঘুরেঘারে সব দেখতে এয়েছেন।

—আজ্ঞে না। আসলে আমি একটি ছেলের খোঁজ করছি। সে এই গ্রামেই থাকে।

—কী নাম বলুন তো। একটা নোংরা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করলেন। শো-কেসের ওপরে একটা বারকোশে কিছুটা শুকনো বোঁদে রাখা আছে। ওখানেই মাছির আমদানি।

—মানিক। মানিক দে। আমি ইতস্তত করে বললাম। কেননা মানিককে ইনি নাও চিনতে পারেন।

—মানিক! ময়রা লোকটি ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে হেসে বললেন, তার মানে প্যাঙা মানিক। আমাদের এখেনে তিনজন মানিক আছে—মোটা, ধলা আর প্যাঙা। তিনটেই কায়স্থ। ওদের পদবি-ফদবি মনে থাকে না বাবু। তা, প্যাঙা তো কিছুক্ষণ আগেও আমার দোকানে বসেছিল। বাকিতে এক ভাঁড় চা মেরে গেল। ব্যাটা তেএঁটে বজ্জাত। ভীষণ বুক্‌নিবাজ। তবে দেখলে মায়া হয়। রোগা, খেঁকুরে। তায় আবার বাপ-মা মরা। তা, আপনি প্যাঙাকেই খুঁজছেন তো!

অনেকক্ষণ আগে আমার হ্যাঁ বলা উচিত ছিল। দোকানি নিজের থেকেই মানিক সম্পর্কে অনেক কথা জানিয়ে দিলেন। মানিকের বজ্জাতি বা বুক্‌নি সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই। কলকাতায় ওকে অন্যরকম দেখেছি। তবে মানিক বড় বড় কথা বলতে ভালবাসে। সেটাকেই কি ইনি বুক্‌নি বলছেন? আর বজ্জাতি! আমি আনমনে মাথা নাড়তেই প্রৌঢ় বললেন, আপনি একটা কাজ করুন। এই রাস্তাটা ধরে একটু এগিয়ে গেলেই বাজার। বাজারের যে-আটচালাটা আছে, দেখবেন তার উল্টো দিকেই সুধাকৃষ্ণ গণৎকারের জ্যোতিষ কার্যালয়। প্যাঙাকে ওখেনে পেয়ে যাবেন। নিশ্চিত আড্ডা দিচ্ছে। কলকেতায় তো বেশ কাজকম্ম করছিল, আবার গাঁয়ে ফিরে এলো কেন কে জানে! এখানকার ছেলে-পুলেদের ধরনধারণই আলাদা।

ম্লান হেসে আমি বললাম, তা যা বলেছেন।

তারপর চারদিকে তাকিয়ে আর একবার দেখলাম। নির্মল বাতাস, উজ্জ্বল রোদ ও নীরব পরিপার্শ্বের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি। দোকানটার পিছনেই একটা বড়সড় পুকুর। দশ-বারোটা পাতিহাঁস চরে বেড়াচ্ছে। অল্প শব্দ করছে। পুকুরের বাঁ-দিকে জেগে আছে ভাঙা ঘাটের একটুখানি অংশ। পার্স থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বললাম, সবচেয়ে ভাল মিষ্টিটা দিন।

—ক' টাকার দেব! প্রৌঢ় শো-কেসের কাচে তাল ঠুকে বললেন।

—পুরো টাকাটা ধরেই দিন।

দোকানি একটু অবাক হয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, একটা কাজ করুন, আধ কিলো কাঁচাগোল্লা নিয়ে যান। তিরিশ টাকা পড়বে। মালটাও সরেস। কাল বিকেলে উঠেছে। এর চেয়ে ভাল কিছু আর আমার দোকানে নেই।

—ঠিক আছে, তাই দিন। ঘড়ি দেখলাম। বেশ বেলা হয়ে গেছে।

একটু পরে শালপাতা দিয়ে মোড়ানো মিষ্টির প্যাকেটটা ঝোলা ব্যাগে ফেলে পা বাড়াতেই প্রৌঢ় বললেন, মানিককে ওখানে দেখতে না-পেলে সিধে এখেনে চলে আসবেন। আমার কাজের ছেলেটা আপনাকে ওর বাড়ি দেখিয়ে দেবেখ'ন।

একটা টুলে বসে আছে মানিক। কটকটে লাল রঙের ধুতি-চাদর জড়ানো একজনের সঙ্গে গল্প করছে। উনিই হয়তো গণৎকার। মানিক এখনও আমাকে দেখতে পায়নি। ওকে ভীষণ রোগা লাগছে। গণৎকার ভদ্রলোক হয়তো চোখের ইঙ্গিত করে থাকবেন, হঠাৎ ঘুরে তাকিয়ে আমাকে দেখেই মানিক লাফিয়ে রোয়াক থেকে নেমে এল। প্রবল বিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলল, দত্তদা, আপনি!

আমার এই অভাবিত আগমনে মানিক স্পষ্টতই চমকে গেছে। ওর পরনে অপর্ণার দেওয়া আমার পুরনো কাটের সেই ফুলপ্যান্ট। জামাটা দেখা যাচ্ছে না। রঙচটা সস্তা চাদরটার তলায় ঢাকা পড়ে গেছে। এখানে কোথাও শীতের 'শ'-ও নেই। তবু মানিক গায়ে চাদর জড়িয়েছে। ওর শরীরটা কি খারাপ করেছে?

আমাকে প্রণাম করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতেই মানিক শরীর বাঁকিয়ে পায়ে হাত ছোঁয়াল। জিজ্ঞেস করল, বউদি কেমন আছে? আর হৈমী-সোনা!

—তোমার কী ব্যাপার বলো তো। রাগ-রাগ গলায় ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

মানিক কোনও উত্তর দিল না। অপরাধীর মতো মুখ করে মাথা নামিয়ে ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—হুট করে চলে এলে। কোনও খবর দিলে না। কাজটাই বা ছেড়ে চলে এলে কেন? আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম।

—আমি তো ছাড়িনি দত্তদা। ওঁরা আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন। মানিকের গলার স্বরে কোনও জোর নেই। মনে হল, ও যেন কাঁপছে।

—কিন্তু কেন? এই কথাটা জানতেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে!

মানিক এবার ফিক করে হেসে ফেলল। করুণ মুখে বলল, আপনি আমার জন্যে খুব ভাবেন, তাই না দত্তদা! আপনাকে সবই বলতাম। আসলে এমন আঘাত পেয়েছি। যাক্‌গে, ওসব পরে বলব। আপনাকে দেখে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! চলুন, আগে গোবিন্দদার দোকানে দু'জনে মিলে চা-টা খাই। তারপর আপনাকে আমাদের গ্রাম দেখাব।

—না, চা খাব না। তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলেই চলে যাব। আমি হঠাৎ রেগে উঠলাম। মানিকের আচরণ অদ্ভুত লাগছে। ওকে দেখে কে বলবে, আগামীকাল কী খাবে তার সংস্থান পর্যন্ত নেই।

—যাব বললেই যেতে পারবেন না। কলকাতার বাস আবার সেই দুপুর আড়াইটে নাগাদ। তারপর চারটেয়। মানিক মাথা ঝাঁকিয়ে অসম্ভব খুশিতে বলল, একবার এসে যখন পড়েছেন, তখন আমাদের গ্রামে না-ঘুরিয়ে ছাড়ছি না।

গোবিন্দদা মানে সেই প্রৌঢ় মিষ্টিওয়ালা। মানিক ওঁরই দোকানে চা খাওয়াতে নিয়ে এল। আমাকে দেখেই লোকটি চেঁচিয়ে বলল, এই তো প্যাঙার সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁরে মানিক, কলকেতার বাবুদের সঙ্গে তোর এমন ওঠা-বসা, তা বাপ্‌, আমাদের দিকে একটু দেখিস। গরিব মানুষ, যেন লাটে তুলে দিসনি।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ব্যবসায়ী মানুষটি ঠেস দিয়ে, ঘুরিয়ে মানিকের ধার-বাকিতে খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলছেন। আমার খুব খারাপ লাগছে। কোনও রকমে বিস্বাদ চা-টুকু, সস্তা বিস্কুট আর দুটো দানাদার খেয়ে আমিই দাম মিটিয়ে দিলাম। মানিক আপত্তি করছিল। কিন্তু আমার জোর আর রাগের কাছে হার মানল। দোকান থেকে রাস্তায় পা রাখতেই মানিক বলল, ওই যে বকুল গাছটা দেখছেন, ওটার বয়স কত বলুন তো!

—কত? আমি মানিকের কথায় কোনও গুরুত্ব না-দিয়ে বললাম।

—কল্পনাও করতে পারবেন না। একেবারে গুনে গুনে পাঁচশো বছর। কাছে গিয়ে দেখবেন আসুন।

একটি গ্রামের আবহমান সুখ-দুঃখের সাক্ষী হয়ে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। গুঁড়ির বেড় দেখে মনে হচ্ছে, গাছটা পাঁচশো বছরের পুরনো হলেও হতে পারে। এক নীরব আভিজাত্য বকুলের সারা গা থেকে ঝরে পড়ছে। হঠাৎ কী মনে পড়তেই মানিক বলল, দত্তদা, আপনি এখানে একটু দাঁড়ান। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা কাজ সেরে আসছি।

রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, প্রবেশ-তোরণ—সব কিছু পেরিয়ে পাঁচিলের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল মানিক। বকুল গাছটার পেছনের দিকে একটা সুউচ্চ মন্দির চূড়া আকাশের দিকে সোজা উঠে গেছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ডান দিকে একটা শ্বেতপাথরের স্ল্যাব ইঁটের দেওয়ালে লাগানো। অনেকটা কলকাতার শহিদ বেদিগুলোর মতো। কালো অক্ষরে পাথরের গায়ে যা খোদাই করা আছে, তার সংক্ষিপ্তসার এই : এই গ্রামে নিতান্ত কিশোর বয়সে মিত্রবাটির দুটি ছেলের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংস এসেছিলেন। এই পাথর সেই শুভ পদার্পণের স্মারক।

মানিক সত্যিই মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এল। কোথায় গেছিল জানি না। তবে ওর চোখে-মুখে কোনও কিছু প্রাপ্তির আনন্দ ফুটে বেরোচ্ছে। ও কাছে আসতেই চোখের ইঙ্গিতে পাথরটা দেখালাম। মানিক কৃতজ্ঞতা আর আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, আপনার চোখে পড়েছে। শুধু কি রামকৃষ্ণ ঠাকুর, জানেন মা সারদা দেবী, বিবেকানন্দ—আরও কত মহাপুরুষ আমাদের গ্রামে এসেছেন। রামকৃষ্ণের এক শিষ্য প্রেমানন্দ স্বামীর বসতবাড়ি এখানে। আপনাকে একে একে সব দেখাব। তার আগে চলুন, ওই রাধাগোবিন্দের মন্দিরটা দেখিয়ে আনি।

আমার আবার রাগ হয়ে গেল। আমি গ্রাম দেখতে আসিনি। বাংলার বহু গ্রামেই এমন একটা মন্দির, কোনও মনীষীর জন্মস্থান কিংবা কোনও স্মৃতিচিহ্ন থাকে। এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। মানিক কি আমার এই অযাচিত সমবেদনাকে জ্ঞানত উপেক্ষা করতে চাইছে। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, মানিক তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। এখানে ঘুরে বেড়াতে নয়।

—সে তো জানি! আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। মানিক দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, দেখবেন, আপনার মন ভাল হয়ে যাবে। আমার ওপর এই যে রাগ করছেন, তা আর থাকবে না।

টেরাকোটার নানান শিল্পমাধুর্য দিয়ে সাজানো এমন একটি মন্দির যে এখানে থাকতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বিষ্ণুপুরের এক কুষ্ঠাশ্রমে এক সময় কিছু সার্ভিস দিতে গেছিলাম। ফেরার পথে ওখানকার বিশ্বখ্যাত মন্দিরগুলো ঘুরে দেখেছি। সেই শিল্পিত স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে অম্লান। বাংলার ঐশ্বর্যের জন্যে গর্ববোধ করেছিলাম। এই মুহূর্তে আঁটপুরের মন্দিরটা দেখে আমি স্তম্ভিত, অভিভূত। এ যেন একাই সমগ্র বিষ্ণুপুরকে ছাপিয়ে গেছে।

—এটার তিন-চারশো বছর বয়স হবে। মানিক মাথা উঁচু করে মন্দিরের চূড়ার দিকে আঙুল তুলে বলল।

ইস, ক্যামেরা থাকলে দুর্লভ সব টেরাকোটার কাজ ধরে রাখা যেত। আমি মনে মনে আপসোস করলাম। মানিক হয়তো আমার আবেগ-আপ্লুত অবস্থাটা টের পেয়ে থাকবে, তাই বলল, চলুন, আর একটা দুর্দান্ত জিনিস দেখাব।

বকুলগাছটাকে এবারে বাঁ-দিকে রেখে, একটা পোড়োবাড়ির পাশ দিয়ে মানিক আমাকে একটা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে নিয়ে এল। খড়ের দোচালা। চালের সৌকর্য অদ্ভুত। দেখে মনে হচ্ছে, একটা বিরাট ওলটানো নৌকা। অপূর্ব কারুকার্য করা কাঠের থাম আর কড়িবরগার উপরে দাঁড়িয়ে আছে মণ্ডপটা। কাঠের গায়ে খোদাইয়ের কাজ দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়।

বলেছিলাম না, আপনার ভাল লাগবে—এমন একটা ভঙ্গিমা করে মানিক আমাকে আবার বাস রাস্তার কাছে নিয়ে এল। ভাবছিলাম ওর কাছ থেকে আরও কিছু খুঁটিনাটি জেনে নেব, কিন্তু নিজেকে দমন করছি যাতে মানিক আরও বেশি উৎসাহিত না-হয়ে পড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে মানিক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, দত্তদা, আপনি চাঁপাডাঙার নাম শুনেছেন?

এমন একটা বেয়াড়া প্রশ্নে অবাক হয়ে আমি বললাম, কেন বলো তো।

—আঁটপুর ছাড়িয়ে উত্তর দিকে আরও খানিকটা গেলে সেই চাঁপাডাঙা। লাইট রেলওয়ের শেষ স্টেশন। আর এই যে দেখছেন—মানিক রাস্তার ওপরে পাতা এক টুকরো ন্যারোগেজ রেললাইনের অতীত-চিহ্ন দেখিয়ে বলল—এইটা হল হাওড়া-চাঁপাডাঙা লাইট রেলের লাইন। পুরনো লোকেদের কাছে শুনেছি, হাওড়ার শিবপুর থেকে নাকি সেই খেলনা রেলগাড়িগুলো ছাড়ত। সকালে ছেড়ে কু-ঝিক্-ঝিক্ করতে করতে বিকেলে এসে আঁটপুর থামত। ওই যে ওপারে বাদাড়ে জমিটা দেখছেন, ওখানেই নাকি ছোট গাড়িগুলোর স্টেশন ছিল। ইঞ্জিনে জল ভরত, কয়লা নিত। প্ল্যাটফর্ম, স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টার, গেটম্যানের কুঠুরি—আরও কত কি! এখনও চোখ বুজে ভাবলে রোমাঞ্চ লাগে। সে-সব দিন আর ফিরে আসবে না দত্তদা।

কালো রাস্তার বুকে গেঁথে-থাকা লোহার দুটো টুকরো আমাকেও টেনে নিয়ে গেল অদূর অতীতে। আমারও বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। বাসের ভদ্রলোক এই জন্যেই কি জানতে চেয়েছিলেন, আমি আঁটপুরে বেড়াতে যাচ্ছি কি না। অথচ আমি তো এখানে কোনও মতেই বেড়াতে আসিনি। মানিক আমাকে একটু একটু করে যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। সুন্দরকে দেখার নেশা, করুণ-রঙিন অতীতকে জানার নেশা। মানিক এক অর্থে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে, কিছুতেই ওর ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ বলতে চাইছে না। আবার আর এক অর্থে এই মুহূর্তে আঁটপুরের ভুবনে নিজেকে আলোর মতো, সুরের মতো, উদ্দাম বালকের মতো ছড়িয়ে দিয়েছে। ওর পেছন পেছন সরু মাটির রাস্তা ধরে আনমনে হাঁটছি। কতক্ষণ জানি না, হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে মানিক নিচু স্বরে বলল, এই ঝোপঝাড়গুলো দেখছেন, তার পেছনে একটা বিরাট কোঠা বাড়ি আছে। এদিকে সরে আসুন। হ্যাঁ হ্যাঁ—এবার এই ফাঁকটা দিয়ে দেখুন...। দেখতে পেয়েছেন।

আমি মাথা নাড়লাম। পলেস্তারা খসা, ইট বার করা, অনেকটা ভগ্নস্তূপের মতো

একটা বাড়ি সত্যিই দেখা যাচ্ছে। বাড়িটার বয়স কত?
—আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন? মানিক একটু বিজ্ঞের মতো জানতে চাইল।
একটু আমতা-আমতা করে আমি বললাম, হ্যাঁ কালো পাড়ের সাদা শাড়ি পরা এক ভদ্রমহিলা রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছেন।
—ঠিক দেখেছেন। ওই ভদ্রমহিলার নাম সুকুমারীদি। আমারই মতো একা। এত বড় একটা বাড়িতে কত বছর ধরে একলা পড়ে আছেন। ওঁর নিকট-আত্মীয়রা সবাই কলকাতায় থাকে। তবে সাহায্য পাঠায়।
—উনি কে? প্রশ্নটা করেই ভীষণ লজ্জা পেলাম। এক নিঃসঙ্গ মহিলার সম্বন্ধে এভাবে আগ্রহ দেখানো ঠিক নয়।
—কে আবার! আমাদের গ্রামের সকলের দিদি, সুকুমারীদি। জানেন, ওঁর জীবনটা বড় দুঃখের। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে হাওড়ার এক ডাক্তার এখানে বেড়াতে এসে ওঁদের বাড়িতে উঠেছিলেন। তখনই এ বাড়ির রমরমার দিন শেষ। এখানে সেই ডাক্তারের খুব অসুখ করে। সুকুমারীদি ওর সেবা করেছিলেন। তারপর সেই ছোকরা ডাক্তার নাকি সুকুমারীদিকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। একটু প্রেম-ট্রেমও হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ডাক্তার ওঁকে বিয়ে করেনি। সুকুমারীদিকে ঝুলিয়ে রেখে রেখে শেষকালে অন্য মেয়েলোককে বিয়ে করে। সেই শোকে আমাদের দিদি কেমন যেন হয়ে গেছেন। তবে এখনও দেখলে মনে হয় না ওঁর বয়স প্রায় ষাট।
কী ভেবে আমি আচমকা বলে ফেললাম, এ তো দেখছি অনেকটা সেই 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের মতো!
মানিক বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকাল।
—মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর' ছবিটা দেখেছ? আমি বললাম।
—হ্যাঁ, হ্যাঁ। শাবানা আজমি...। আরে ঠিক বলেছেন তো, অনেকটা সেই রকম! সত্যিই তো, কখনও ভেবে দেখিনি। মানিক খুক্ খুক্ করে চাপা স্বরে হাসল। তারপর হঠাৎ আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, আরে বারোটা বেজে গেছে! চলুন, চলুন, দেরি হয়ে গেলে সর্বনাশ। আসল ব্যাপারটাই বাকি থেকে যাবে।
আমি হতভম্ব। নাটকের দৃশ্যান্তরের মতো মানিক প্রতিটা মুহূর্ত চমকে ভরিয়ে দিচ্ছে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই, একটা বড় পুকুরের পাড় ঘেঁষে দুটো বাঁশঝাড় আর একখণ্ড এবড়ো-খেবড়ো পতিত জমি পেরিয়ে মানিক দ্রুত পায়ে যেখানে এসে থামল, সেই জায়গাটা একটু বেশি গাছগাছালিতে ভরা স্নিগ্ধ তপোবনের মতো। সামনেই ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি। চারপাশে কোমর-উঁচু পাঁচিল। কাঠের গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে টিনের ফলকটা নজরে এল : প্রেমানন্দ মঠ, আঁটপুর।
হাস্যময় মধ্যবয়সী এক সন্ন্যাসী আমার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। সামনের দালান থেকে বাগানে নেমে এসে আমাকে বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনি এখানে এসেছেন। আপনাদের মতো বড় মাপের মানুষ এই অজ পাড়াগাঁয় যত আসবেন ততই আমাদের মঙ্গল।

লজ্জিত হয়ে প্রতিনমস্কার জানালাম। মানিক এখানে কেন নিয়ে এল এখনও বুঝতে পারছি না। আমি কিছু বলার আগেই স্বামীজি বললেন, চলুন, খাওয়ার ঘন্টা পড়ে গেছে। পরে আপনার সঙ্গে গল্প করা যাবে। মানিক, তুমি ওঁকে কলঘরটা দেখিয়ে দাও। সাবান দেওয়া হয়েছে কিনা দেখে নিও।

অসম্ভব খাতির করে আমাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে। স্বামীজি আমার পাশে বসে তদারকি করছেন। সামনের পঙ্ক্তির একেবারে কোণায় মানিক বসেছে। 'এটা নিন', 'ওটা আর একটু দিক', 'ভেজিটেবল স্টু কেমন হয়েছে' ইত্যাদি অতিথি সৎকার করতে করতে স্বামীজি একসময় বললেন, আপনার অনেক লেখা কাগজে পড়েছি। পার্থবাবু, আপনার কাছে একটা অনুরোধ, এবার আঁটপুর সম্পর্কে কিছু লিখুন। আপনাদের কাগজের হাইয়েস্ট সার্কুলেশন। বহুলোক জানতে পারবে।

মুহূর্তে গলার মাঝখানে ভাতের দলাটা আটকে গেল। এক লহমায় পরিষ্কার হয়ে গেল, এই রকম উষ্ণ অভ্যর্থনা কেন! আমি তো পার্থবাবু এবং সাংবাদিক—এর কোনওটাই নই, আধা সরকারি অফিসের আপার গ্রেড কেরানির সম্বন্ধে এই মিথ্যে পরিচয় কে দিল! দু'চোখে আগুন ছুটিয়ে আমি মানিকের দিকে তাকালাম। এমনটা যে হতে পারে ও যেন জানত। সঙ্গে সঙ্গে মানিক চেঁচিয়ে বলল, মহারাজ, পার্থবাবুকে বলতে হবে না। আমার অনুরোধে উনি আঁটপুর দেখতে এসেছেন। দয়া করে নিশ্চয়ই লিখবেন।

চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে, ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানিককে ঠাসঠাস করে চড় মারি। জেনেশুনে ছেলেটা প্রতারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর চেয়ে অন্যায় আর কী হতে পারে! আমি সহ্য করতে পারছি না, তবু পারিপার্শ্বিকের কথা ভেবে চুপ করে গেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ত্যাগী মানুষটির সঙ্গে কিছু মামুলি কথাবার্তা বলতে হল। আমি অনেক চেষ্টা করেও আমার মিথ্যে পরিচয়টাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। সেই কাঠের দরজাটা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে স্বামীজি আবার বললেন, পার্থবাবু, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল। জানেন, প্রতিদিন সকালে কলকাতার বাসটা যখন এসে গ্রামে দাঁড়ায়. তখন ভাবি, আজ যদি গণ্যমান্য, বিখ্যাত কেউ আসেন, তা হলে বেশ হয়। এত সুন্দর অথচ অখ্যাত একটা জায়গার কথা সকলে জানতে পারবে। সেই মান্য মানুষটি আর পাঁচজনকে বললেন—এই আর কী! আবার আসবেন কিন্তু! মানিক, ওকে প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থান—ঘোষেদের ভিটেটা দেখিয়েছ?

—না মহারাজ, এবার দেখাব। মানিক তাড়াতাড়ি বলল।

আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। মঠের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে খানিকটা দূর এসে চাপা গর্জনে মানিককে বললাম, তুমি আমাকে এক্ষুনি বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে চলো। এবার বুঝতে পারছি পালবাবুরা কেন তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন! কেন তুমি তখন পাঁচ মিনিটের জন্যে কোথায় চলে গেছিলে! তুমি একটা আস্ত চিট। তোমার এই চিটিংবাজি করার গুণটা তো জানা ছিল না!

—আপনি রাগ করছেন! মানিক করুণ স্বরে বলল।

—রেগে যাব না! এ কত বড় অন্যায় তুমি জানো? আমার নাম পার্থবাবু? বলো, বলো...। ছিঃ ছিঃ।

—বিশ্বাস করুন, আমি হর্ষবাবু বলেছিলাম। মহারাজ পার্থবাবু শুনেছেন। মানিক ভয়ে ভয়ে বলল।

—আর আমি সাংবাদিক, বিখ্যাত লোক—এগুলোও কি উনি ভুল করে শুনেছেন! আমার গলা অসম্ভব চড়ে গেল।

—এ সব না বললে দুপুরে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম না। মানিকের কণ্ঠস্বর কান্নার মতো শোনাল।

—সে কী! তোমার নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতে।

—আমার বাড়িতে কিছু নেই দত্তদা। কেবল খুদ-কুঁড়ো। আপনাকে দুটো ভাল জিনিস খাওয়াতে পারতাম না। তা ছাড়া আমাদের ওই ভাঙাচোরা বাড়িটা দেখলে আমাদের এই সুন্দর, ছবির মতো গ্রাম সম্পর্কে আপনার বাজে ধারণা হয়ে যেত। আমি মরে গেলেও তা হতে দিতে পারি না।

মানিকের কথা শুনে আমি হাঁ হয়ে গেলাম। একটা গ্রামের শ্রী ও সৌন্দর্যের প্রশ্নে মানিক নিজের অভাবী, হতকুৎসিত সংসারের স্থিরচিত্রটাকে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলতে চাইল! ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, এটা তুমি খুব ভুল করলে।

—না দত্তদা, ভুল করিনি। মানিক গলার স্বরে দৃঢ়তা এনে বলল।

বাসস্ট্যান্ডে এসে মানিককে আবার জিগ্যেস করলাম, কিন্তু ওঁরা তোমাকে ছাড়িয়ে দিলেন কেন?

অদ্ভুত হেসে মানিক বলল, আমি নাকি চোর। ওদের চার কৌটো রঙের হিসেব মিলছিল না। কাউন্টারের যেখানটায় আমি দাঁড়াই সেখান থেকেই মালগুলো খোয়া যায়। ওঁরা আমাকেই সন্দেহ করলেন। দত্তদা, আপনাকে ছুঁয়ে বলছি, আমি চুরি করিনি। আমি গরিব, তেমন লেখাপড়া শিখিনি, গেঁয়ো কিন্তু চোর নই। আপনি তো জানেন.. ।

মানিক শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল। গোবিন্দ ময়রার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সেই মিষ্টির প্যাকেটটা এখনও আমার ব্যাগে পড়ে আছে। মানিকদের বাড়িতে গিয়ে ওর পিসির হাতে যেটা তুলে দেব ভেবেছিলাম। কলকাতায় ফেরার বাস ঠায় দাঁড়িয়ে মাঠের কোল ঘেঁষে। মন্দির, বনস্পতি আর শিল্পসুষমা দিয়ে ঘেরা এই ভূমিখণ্ডটুকু দুপুরের নির্জনতায় ভরে আছে। কেমন যেন পবিত্র-পবিত্র ভাব চতুর্দিকে। পৃথিবীর একপ্রান্তে ছোট্ট কৌটোর মতো এই সবুজ শান্ত গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল রোগা, দরিদ্র, হাড়-হাভাতে মানিকরা আছে বলেই, সুন্দর শব্দটা এখনও পৃথিবী থেকে মুছে যায়নি। শুকিয়ে যায়নি মানুষের ভেতরের আবেগ। যে-আবেগ আমাকে এতদূরে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে, যে-আবেগ আমাকে আবার মানিকের জন্যে কিছু করার প্রেরণা জোগাবে।

ওর শীর্ণ, শিরা-ওঠা হাত দুটো ধরে মনে মনে বললাম, মানিক, আমি জানি, আঁটপুর কখনও শয়তানের জন্ম দেয়নি।

আঁধার করে আসে

একটু আগে প্রিয়া বাড়ি ফিরেছে। সেই পুরনো বাড়ি, সেই বিষাক্ত পাড়া। শ্বশুর, দেবতোষ, পুপুনকে নিয়ে সংসারের যে-ছবি, যে-ক্যানভাস, তারই গায়ে আবার লগ্ন হয়ে গেছে প্রিয়া। একটু অমল বাতাস, একটু উদার আকাশ সে চেয়েছিল। প্রতিনিয়ত এই পরিবেশে যে-জীবনটা ম্লান হয়ে আসছে, তাকে অন্যভাবে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আকাঙ্ক্ষিত জীবনের মৃতদেহটা নিয়ে ফিরে এসেছে প্রিয়া। 'আমি পারিনি'—একথা কী করে দেবতোষের সামনে উচ্চারণ করবে ও! একটু পরেই দেবতোষ অফিস থেকে ফিরবে।

বিয়ের পরে প্রথম যেদিন পড়ন্ত বিকেলে দেবতোষের সঙ্গে ট্যাক্সিতে চেপে প্রিয়া এ পাড়ায় ঢুকেছিল, সেদিনই ওর হৃৎপিণ্ডের বাইরে চল্‌কে উঠেছিল অনেকটা রক্ত। খসে-পড়া ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চারপাশে তাকিয়ে প্রিয়া হতবাক। গলির দু'পাশে নানাবয়সী মেয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। উৎকট সাজে, রুচিহীন পোশাকে আর অসভ্য ভঙ্গিমায় সমাগত সন্ধ্যার বুক চিরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন চেহারার লোক গিজগিজ করছে চারদিকে। এই মেয়েগুলো কারা, কেন, কী জন্যে—মুহূর্তে প্রিয়ার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।
এমন পাড়ায় প্রিয়ার শ্বশুরবাড়ি। নববধূটি হয়ে সে স্বামীর ঘর করতে আসছে এখানে। প্রিয়া স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। পসারিণীদের সহস্র চাহনি, শরীর দোলানো হাসি আর কোলাহলের মাঝখান দিয়ে পথ কেটে ট্যাক্সিটা এই গলির প্রায় শেষপ্রান্তে এসে থেমেছিল। দেবতোষ অনেকটা চোরের মতো মুখ নীচু করে হাত বাড়িয়ে প্রিয়াকে নামিয়ে এনেছিল গাড়ি থেকে। প্রিয়ার মুখের দিকে চকিতে তাকিয়ে দেবতোষ বুঝতে পেরেছিল—প্রিয়া লজ্জায়, ঘৃণায় আর অপার বিস্ময়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। 'এই বাড়িতে সেদিন বধূবরণের জন্যে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না। শাঁখ বাজেনি। প্রদীপ জ্বলেনি। সে সব পর্ব দেবতোষ চুকিয়ে এসেছিল দমদমে কাকার বাড়িতে। দমদমের বাড়িতেই বৌভাত, ফুলশয্যা। দেবতোষের এক দূরসম্পর্কের বিধবা পিসি ট্যাক্সি থামার আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন। 'এসো বউমা' বলে প্রিয়াকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওপরে। পরদিন সকালেই চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। গত পাঁচ বছরে ভদ্রমহিলাকে আর দ্বিতীয়বার দেখেনি। মহিলা দেবতোষের ঠিক কী রকম পিসি—কোনওদিন জানতে চায়নি প্রিয়া। আশ্চর্য, দেবতোষও এই ক-বছরে

একবারও সেই পিসির কথা বিস্মৃতির অতলান্ত থেকে তুলে আনেনি। এখনও ভদ্রমহিলার শ্বেতপাথরের মতো সাদা, রক্তশূন্য দুঃখী মুখটা মনে পড়ে প্রিয়ার।

দোতলায় উঠে ওদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটায় ঢুকে প্রিয়া কেঁদে ফেলেছিল। তার বিয়ের যৌতুক দিয়ে ঘরটা ইতিমধ্যেই কারা যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করে রেখেছে। খাট, ড্রেসিং টেবিল, স্টিলের আলমারি, আলনা। বাবা-মা-দাদা, বহরমপুরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডের ছোট্ট একতলা বাড়ির স্মৃতি সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে। প্রিয়ার বিয়ের কথা পাকা করতে অন্তত দুবার বাবা এই পাড়ায় এসেছিলেন। বাবার চোখে কি কিছুই পড়েনি! প্রিয়া বহুবার অবাক হয়ে গেছে ভেবে। নিরীহ স্কুলমাস্টার বাবা কি এসব উপেক্ষা করাটাই শ্রেয় মনে করেছিলেন! নাকি বাবা ভেঙে পড়েছিলেন। একদিকে মুর্শিদাবাদ অন্যদিকে নদীয়ার বিভিন্ন স্টেশনে বাবাকে বহুবার নামতে হয়েছে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে। প্রায় তিন বছর ধরে অবিরাম চেষ্টা চালিয়েও বাবা কিছুই করতে পারছিলেন না। পছন্দ-অপছন্দ, দেনা-পাওনার ভো-কাট্টা খেলায় বাবার স্বপ্নের ঘুড়িগুলো একের পর এক কেটে নীল-নিঃসীম শূন্যে হারিয়ে যাচ্ছিল। দেখতে সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট, বয়স ছাব্বিশ, একটু-আধটু গান জানে, মধ্যবিত্ত সংসারের সমস্ত সমস্যাকে হাসিমুখে মেনে নেওয়ার জন্মগত ঐশ্বর্য সবই ছিল প্রিয়ার। তবু কোথায় যেন আটকে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেবতোষের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেল প্রিয়ার। কোথায় বহরমপুর আর কোথায় কলকাতা! দাদার এক বন্ধুই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। দেবতোষ কলকাতায় স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অ্যাকাউন্টস্ ক্লার্ক। প্রিয়ার দাদাও একই সংস্থায় কাজ করে। বহরমপুরের অফিসে। অন্য পোস্টে। দাদার পক্ষে হয়তো সুবিধেই হয়েছিল দেবতোষের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার ব্যাপারে। দাদা কী জানত না দেবতোষেরা এই রকম একটা নরকে থাকে! নিশ্চয়ই জানত। দাদা চুপ করেছিল! নিজস্ব বাড়ি, পাকা চাকরি, ভাল ছেলে—সব মিলিয়ে দাদা হয়তো চুপ করে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নরকের যন্ত্রণা দিয়ে ঘেরা এই পরিবেশেও তার প্রিয় বোনটি ঠিক স্বর্গরচনা করে নিতে পারবে—দাদা হয়তো এমন স্বপ্ন দেখেছিল। প্রিয়া পারেনি। দুঃসহ পারিপার্শ্ব প্রবল প্রতিপক্ষের মতো অবিজিত থেকে গেছে।

দেবতোষের জন্ম এখানে। পড়াশোনা, মানুষ হওয়া, ওর এই সংসার—সবই এই বাড়িতে। এই পাড়ায়। বিয়ের পর থেকে দেবতোষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে যেতে যেতে প্রিয়া অনুভব করেছে, দেবতোষও এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চায়। খুব সঙ্গোপনে মুক্তির স্বপ্নজালটা বুনে যাচ্ছে দেবতোষ। প্রিয়া বুঝতে পারে—উপায় থাকলে দেবতোষ হয়তো এই বাড়ি বেচে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেত। কিন্তু উপায় নেই। যতদিন শ্বশুরমশাই বেঁচে আছেন, ততদিন দেবতোষ এ বাড়ির একটা ইঁটও বিক্রি করতে পারবে না। তার চেয়ে বড় সমস্যা দেবতোষের কাকা এখনও বাড়ির অংশ ছেড়ে দেননি। একতলাটা নিজের দখলে রেখেছেন। যদিও কাকা বাড়ি করে দমদমে চলে গেছেন। একতলার সবকটা ঘরে তালা লাগানো। একটাই বাঁচোয়া কাকা নিজের অংশে কোনও ভাড়াটে বসাননি। ইচ্ছে করলেই, অবলীলায় নীচের চারটে ঘরে অন্তত দুটো ভাড়াটে বসাতে পারতেন। ভাড়াটের

অভাব হবে না। এই পাড়ায় এই পরিবেশেও বহুলোক অফার দিলেই আসবে—প্রিয়া জানে। মাথা গোঁজাটাই যেখানে মূল সমস্যা সেখানে ভাল পাড়া, খারাপ পাড়ার বাছবিচার আজকাল আর তেমন কেউ করে না। পাচ্ছ যখন আপাতত নিয়ে নাও, পরে দেখা যাবে। অনেকেই আজ এই জাতীয় দর্শনে বিশ্বাসী। অথচ পরে আর দেখা হয় না। মাটির ভিতরে শিকড় ঢুকে যায়। বহুদূরে ছড়িয়ে যায় শিকড়। যেমন দেবতোষের ক্ষেত্রে হয়েছে। প্রিয়া শ্বশুরের কাছ থেকে একবার শুনেছিল যে ওঁর বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে জলের দরে এই বাড়িটা কিনে নিয়েছিলেন। দেবতোষের ঠাকুরদারও নাকি ইচ্ছে ছিল আরও উত্তরে একটা বাগান-ঘেরা বাড়ি কিনবেন। বাড়ি নাকি তিনি পছন্দও করে রেখেছিলেন। সে আর হয়ে ওঠেনি।

ক্ষতবিক্ষত হতে হতেও সময় কেটে যাচ্ছিল। দেড় বছরের মাথায় পুপুন জন্মালো। পুপুনের জন্মের পর থেকেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল দেবতোষ। দুশ্চিন্তার একটা অস্পষ্ট ছাপ দেবতোষের মুখে প্রায়ই দেখতে পেত প্রিয়া। আসলে দেবতোষেরও এতদিনের অভ্যাসে চিড় ধরতে শুরু করেছিল। নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে দেবতোষ ভাবতে পারত না, তার মতো পুপুনকেও এখানে বড় হতে হবে। নম্র সন্ধ্যায় একদিকে দেবালয়ে মন্দিরে পুজোর ঘণ্টা বাজবে, আরতির আলোয় পবিত্র হয়ে যাবে কলকাতার অন্যান্য রাস্তা, আর অন্যদিকে তার ছেলে খেলাধুলো সেরে দেহপণ্যবীথির মাঝখান দিয়ে বাড়ি ফিরবে, দূষিত ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে কৈশোর-যৌবনের পরমলগ্ন স্পর্শ করবে। দেবতোষের এই যন্ত্রণা প্রিয়ার অনুভবে গোপন থাকেনি। দেবতোষের এই জীবন-যন্ত্রণার সুযোগ নিয়ে প্রিয়া উল্টো পথেও হাঁটেনি। অথচ খুব সহজেই বিদ্রোহ করতে পারত প্রিয়া। তার জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে দেবতোষ—এই অভিযোগ এনে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারত সংসারে। বিয়ের আগে দেবতোষ কেন তাকে জানায়নি তার এই অবাসযোগ্য পারিপার্শ্বিকের কথা। যখন বিয়ের কথাবার্তা ক্রমশ ফলবতী হচ্ছিল, সেই সময় একটা চিঠি দিয়েও তো জানাতে পারত প্রিয়াকে! আমাকে তুমি ঠকিয়েছ—একথাও প্রিয়ার পক্ষে বলা অসম্ভব ছিল না। কেননা সুদূর বহরমপুরে বসে দেবতোষদের এই গলিটার জীবনপঞ্জি, দিনলিপি তার জানার কথা নয়। বাবা-দাদাকেও অপরাধী করতে পারত প্রিয়া। ওঁরা তো জেনেশুনে এখানে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে!

এর কোনওটাই করেনি প্রিয়া। বরং এই গলিটার কামজর্জর সন্ধ্যা, রক্তাক্ত রাত্রি আর অর্ধনগ্ন পূতিগন্ধময় দিনগুলোকে উপেক্ষা করে দশ হাতে আঁকড়ে ধরেছিল পুপুনকে। ছোট্ট সোনামণিকে। স্বভাবজ বুদ্ধিতে প্রিয়া এটুকু বুঝেছিল, বিদ্রোহ করা যতটা সহজ, সারাটা জীবন ধরে তার আগুন অনির্বাণ রাখা মোটেই সহজ নয়। কী করতে পারে সে! দেবতোষের সংসার থেকে বেরিয়ে গেলে কে তাকে আশ্রয় দেবে! কে বলতে পারে—প্রিয়াকে হয়তো এ পাড়াতেই ফিরে আসতে হতে পারে, অন্য পরিচয়ে! এমন ভয়ংকর চিত্ররচনার কথা ভাবতে পারেনি প্রিয়া। তবু এক ছুটির দিনে দুপুরবেলায় নিদ্রাতুর দেবতোষকে প্রিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, 'পুপুনের সম্বন্ধে কিছু ভাবলে?'

প্রিয়ার প্রশ্ন কী উত্তর চাইছে দেবতোষের বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি। তবু নিজেকে আড়াল করে দেবতোষ অবাক হওয়ার ভান করেছিল, 'পুপুনের সম্বন্ধে ভাবব মানে?'
প্রিয়া সহসা রেগে গিয়েছিল। প্রবল আক্রোশে দেবতোষকে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিল, 'পুপুন কী এই পাড়ায় মানুষ হবে? এই নোংরা পরিবেশে?'
দেবতোষ উত্তর দেয়নি। দেবতোষ চুপ করে আছে দেখে প্রিয়া কঠোর গলায় বলেছিল, 'পুপুন এখানে মানুষ হবে না। হতে পারে না। অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। আমার ছেলেটাকে তুমি এভাবে শেষ করে দিও না!'
দেবতোষ প্রিয়ার কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। পুপুন অন্য কোথাও অন্য কোনও সুন্দরের আঙিনায় বেড়ে উঠুক—দেবতোষও মনেপ্রাণে তাই চায়। কিন্তু এক্ষুনি কী করে সম্ভব! অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া নিয়ে চলে যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না। দেবতোষের মতো মধ্যবিত্ত মানুষদের প্রতিটি পদক্ষেপ অনেক ভেবেচিন্তে মেপে মেপে ফেলতে হয়। প্রিয়া কী সেটা বোঝে না? একটা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে হাজারটা সমস্যার কথা ভাবতে হয়। প্রিয়ার ব্যবহারে দেবতোষ ভীষণ অবাক হয়ে গেল।
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার এই হিমযুদ্ধের সময়টাতে পুপুনের বয়স ছিল এক বছর। তারপর পুপুন একটু একটু করে বড় হয়েছে, কথা বলতে শিখেছে, রাস্তায় বেরোতে চেয়েছে। বিকেলবেলা পুপুনকে কাছের পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেছে প্রিয়া। সন্ধে ঘনিয়ে আসার আগেই অজানা আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে। গলির যে মুখটায় মেয়েগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে দিকটা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে প্রিয়া। এই গলির একটা মুখই প্রিয়ার কাছে খোলা আছে। পার্ক থেকে ফেরার পথে পুপুনের 'মা এটা কী! ওটা কী মা' ইত্যাদি অদম্য কৌতূহলে ঘেরা প্রশ্নগুলোর একটারও উত্তর দেয়নি প্রিয়া।
দেবতোষ নটায় বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাতটা সাড়ে সাতটা। সারাটা দিন আর সন্ধেটুকু কীভাবে কাটে—একমাত্র প্রিয়াই জানে। রাধার সঙ্গে গল্প করতে আর ভাল লাগে না। শ্বশুরমশাই দিনরাত্রি নিজের ঘরে বসে যত রাজ্যের ঘড়ি সারাচ্ছেন। পুরনো সব ঘড়ি। বহুদিন থেকে সংগ্রহ করেছেন। এক একটা দিন, এক একটা বিভীষিকা। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে একটু শুয়েছে প্রিয়া। পুপুন পাশে ঘুমোচ্ছে। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ অকথ্য গালাগালি, চিৎকার, বাসন পড়ার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। জানলার খড়খড়ি তুলে প্রিয়া দেখেছে, সেই মেয়েগুলো গঙ্গাস্নান করে দল বেঁধে ফিরছে। কপালে রসকলি, সিঁদুরচন্দনের ফোঁটা। দেবতার পায়ের ছাপ দু'গালে। ওদেরই মধ্যে একটা মোটাসোটা কালো মেয়ে অসম্ভব মুখ খারাপ করছে। একটা পিতলের কলসি কাত হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। গঙ্গাজল গড়িয়ে গেছে ড্রেনের দিকে। ওপাশের পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বেঁটে মতো লোকের দিকে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে মেয়েটা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিও করছে—দু'হাতে পরনের কাপড় প্রায় হাঁটুর কাছে তুলে এনে। প্রিয়া খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে দ্রুত ফিরে এসেছে

পুপুনের কাছে। ছেলেটা জেগে যায়নি তো! পুপুনের নরম তুলতুলে গালে হাত রেখেছে প্রিয়া। পুপুন একটু নড়েচড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রথম প্রথম গভীর রাত্রে প্রিয়ারও ঘুম ভেঙে যেত পুপুনের মতো। মাতালের বেসুরো প্রলাপসঙ্গীতে, নারীমাংসভোজীদের আদিম উল্লাসে অথবা পসারিণীদের বীভৎস বিলাপে জেগে উঠত প্রিয়া। ভয়ে জড়িয়ে ধরত দেবতোষকে। অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি তারপর। এখনও সেই একই রাতজাগা মহোৎসবের নিনাদে ঘুম ভেঙে যায় প্রিয়ার। ভয় করে। তবে ভয়টা এখন আর নিজের জন্য নয়। পুপুনকে ঘিরে ভয়।
প্রিয়া জানত এইভাবে ক্রমাগত আড়াল করে রাখতে পারবে না ছেলেকে। প্রিয়ার শঙ্কা ও উদ্বেগ গত মাসে সত্যি হয়ে গেছে। সেদিন সাতটা নাগাদ রাধাকে সঙ্গে নিয়ে বড় রাস্তার ওপরে ডাক্তার বসাকের চেম্বারে গিয়েছিল প্রিয়া। দুপুরের দিকে তেড়ে জ্বর এসেছিল পুপুনের। পুপুনকে দেখিয়ে রোগীভর্তি চেম্বার থেকে প্রিয়া যখন বেরোল, তখন রাত প্রায় নটা। ডাক্তারখানার সামনে একটা রিকশা দেখতে পেয়ে পুপুন বায়না ধরল রিকশায় চড়বে। রিকশাওয়ালা প্রিয়ার কোনও কথা না শুনে গলির নিষিদ্ধ মুখটা দিয়ে ঢুকে পড়ল। প্রিয়া যা চাইছিল না। রাতের আসর জমজমাট। আরও অনেক মেয়ে, অনেক লোক। চাপা উত্তেজনার একটা আবরণ। ভিড় কাটিয়ে রিকশাটা এগোতেই পারছিল না। দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েগুলো প্রিয়া আর রাধার দিকে কেমনভাবে তাকাচ্ছে! মুচকি হাসছে কেউ কেউ। পুপুন মায়ের কোলে ছোট্ট শরীরটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। চোখদুটো অসম্ভব বড় করে দুদিকে দেখছে। শক্ত হয়ে বসে আছে প্রিয়া। হঠাৎ পুপুন সোজা হয়ে উঠে বসে দুর্বল হাতদুটো মায়ের দু'গালে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'মামণি, মাসিরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কেন?'
প্রিয়া চমকে গেছিল। পুপুন ওর সাড়ে তিন বছরের জীবনে আত্মীয়তার দ্যোতক যে সামান্য কয়েকটা শব্দ শিখেছে—মাসি তার মধ্যে একটি। 'মাসি' শব্দটা এই পরিবেশে, এই মেয়েগুলোর উদ্দেশে এমনভাবে বেজে উঠল—প্রিয়া নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। পুপুনের কচি হাতদুটো জোরে কোলের উপর নামিয়ে দিয়ে প্রিয়া বলেছিল, 'দুষ্টুমি কোরো না পুপুন, চুপ্ করে বসো।'
বাড়ি ফিরেই দেবতোষকে ঘটনাটা বলেছিল প্রিয়া। জলখাবার খেতে খেতে ম্লান হেসে দেবতোষ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল, 'তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ, না! পুপুন তো জানতে চাইবেই। আজ হোক, কাল হোক, কিংবা পাঁচ বছর পরে! ওকে একদিন না একদিন জানাতেই হবে। সামনের জানুয়ারিতে পুপুনকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। তখন তো বাইরের জগৎটাকে আরও নিবিড় করে পাবে পুপুন।' দেবতোষের কথায় আরও মুষড়ে পড়েছিল প্রিয়া। এভাবে ছেলেটাকে নিয়ে বেঁচে থাকা যাবে না। পাগল হয়ে যাবে ওরা।
গত শনিবার সকালে আচমকা ঘটে যাওয়া আর একটা ঘটনা, প্রিয়া দেবতোষ দুজনকেই শেষ করে দিল। যুদ্ধ করার যেটুকু সঞ্চয় এখনও অবশিষ্ট ছিল, তাও নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। পুপুন বড় হয়ে উঠছে—এই বিপদটাকেও যেন ছাপিয়ে গেল ঘটনাটা। মাসের তৃতীয় শনিবার। দেবতোষকে অফিসে বেরোতে হবে। বাজার

করে এসে একটু খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছিল দেবতোষ। প্রিয়া রান্নাঘর থেকে শুনতে পেল কে যেন নিচে কড়া নাড়ছে। প্রিয়া জোরে বলল, 'শুনছ, কেউ মনে হয় ডাকছে। একবার দেখ না!' জামাটা গায়ে গলিয়ে দেবতোষ বিরক্ত হয়ে নীচে নেমে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরেও দেবতোষ বা অন্য কেউ ওপরে উঠে এল না দেখে প্রিয়া রাস্তার দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্রিয়া দেখল, রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনজন লোক আর একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেবতোষ কথা বলছে। বারান্দা থেকে কথা শোনা যাচ্ছে না। খুব হাত-পা নাড়িয়ে কথা বলছে যে লম্বা লোকটা, তাকে চেনা মনে হল প্রিয়ার। এই গলিতেই কয়েকবার দেখেছে। ভদ্রমহিলা মনে হয় মাঝবয়সী। টপ নট খোঁপায়, দামি শাড়িতে আর সাজে বয়স কমিয়ে ফেলেছেন। শাড়ির আঁচলটা বারবার খসে পড়ছে ভদ্রমহিলার বুকের ওপর থেকে। দেবতোষ সবাইকে কিছু বলার চেষ্টা করছে। প্রিয়া একটু দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে দেবতোষ ফিরে এসেছিল। ভয়ার্ত দৃষ্টি, রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল দেবতোষ। প্রিয়া দারুণ উদ্বেগে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমাকে এরকম লাগছে কেন? শরীর খারাপ লাগছে?'

দেবতোষ খাটের ওপর সটান শুয়ে পড়ে বলেছিল, 'তুমি চেনো ওই লম্বা মতন লোকটাকে?'

'এই পাড়াতেই দেখেছি হয়তো। কে?'

'রতন। রতন দাস। দালাল। মাস্তানি করে খায়।'

'কী বলছিল তোমাকে ওরা?'

'নীচের তলার দুটো ঘর ভাড়া চাইছে।'

'তুমি কী বললে?'

'বললাম—ঘর তো আমাদের নয়—কাকার। সব শুনেটুনে কাকার ঠিকানা চাইছিল।'

'ঠিকানা দিয়েছ!'

'না দিইনি। তবে আবার আসবে বলেছে। রতন কেমন যেন চাপ দিচ্ছিল। যেন ঘর ভাড়া না নিয়ে ছাড়বে না।'

'ওই ভদ্রমহিলা আর লোকগুলো কে?'

'মহিলাই তো ভাড়া নিতে চায়।' লোকদুটোকে চিনি না। হয়তো ভদ্রমহিলারই আত্মীয়স্বজন। ঠিক বলতে পারব না।'

'এখন কী করবে?'

প্রিয়ার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না দেবতোষ। কঠিন প্রশ্ন—কী করবে এখন দেবতোষ।

দুর্ভাবনায় মুখ কালো করে দেবতোষ অফিসে বেরিয়ে গেল। প্রিয়া সারাটা দুপুর ভেবেছে—কী করবে এখন ওরা। কাকা-শ্বশুর যদি সত্যিই ভাড়া দিয়ে দেন দুটো ঘর! রতন দাসের উন্মোচিত ছুরির ভয়ে! ভদ্রমহিলাকে দেখে সুবিধের মনে হয়নি প্রিয়ার।

এ পাড়ায় দালালির সংজ্ঞা অন্যরকম। প্রিয়া এতদিনে সেটা ভাল রকম জেনে গেছে। রতন দাস দালাল—দেবতোষের এই কথার একটাই মানে হতে পারে। তবে কি মহিলা ঘর ভাড়া নিয়ে...! প্রিয়া ভাবতে পারেনি এরপর কী ঘটবে, ঘটতে চলেছে!

রবিবার সকালেই দেবতোষ কাকার সঙ্গে পরামর্শ করতে দমদমে চলে গিয়েছিল। অনেক বেলায় ফিরে এল দেবতোষ। কাকার সঙ্গে কথাবার্তায় কোনও ফল হয়নি। বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাবে তেমন আমলই দেননি। বরং সব শুনে দেবতোষকে উল্টে বলেছেন, 'বুঝেছিস দেবু, দিনকাল যা পড়েছে, ঘর আর তালা বন্ধ করে ফেলে রাখা যাবে না। এতদিন তো রেখেছিলাম। রাখিনি বল!' দেবতোষ এসব খেজুরে কথার জবাব না দিয়ে এক গাদা রাগ আর অভিমান নিয়ে ফিরে এসেছে। সারাটা দুপুর দেবতোষ বিশ্রাম নেয়নি। দুশ্চিন্তায় এঘর-ওঘর করেছে।

পুপুনকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে প্রিয়া নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রিয়া উঠে পড়ল। মেঘলা বিকেল। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। ড্রেসিং টেবিলের ছোট্ট টুলটার ওপর বসে আছে দেবতোষ। চোখ বুজে। মুখে-চোখে জল দিয়ে এসে দেবতোষের কাছ ঘেঁষে মেঝেতে বসল প্রিয়া। পিরিচ-পেয়ালার টুংটাং আওয়াজ আসছে রান্নাঘর থেকে। রাধা চা করছে। পুপুন বারান্দায় বসে আপন মনে খেলছে। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙেছিল দেবতোষ, 'এখান থেকে চলে যাব ঠিক করেছি।'

'সত্যি!' প্রিয়া যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, 'সত্যি চলে যাব আমরা!'

'হ্যাঁ। এভাবে দম বন্ধ করে দিন কাটানো যায় না। আমি একা থাকলে হয়তো পারতাম। কিন্তু তুমি, পুপুন কিংবা নতুন অতিথি যদি কেউ আবার আসে আমাদের সংসারে—তোমরা কেউ পারবে না। মরে যাবে।'

'কোথায় যাবে ঠিক করেছ?'

'অন্য পাড়ায় ঘর ভাড়া নেব। যা লাগে। অন্তত একখানা ঘর ভাড়া নিয়েও উঠে যাব। এক মাস দু-মাস পরে হলেও...। কাল অফিসে গিয়েই রমেনকে বলতে হবে। ওর কাছে ঘর ভাড়ার খোঁজখবর থাকে।'

খুশিতে ডগমগ হয়ে প্রিয়া বলল, 'তুমি যদি বল আমিও দেখতে পারি। সারাটা দিন তো বাড়িতেই বসে থাকি।'

দেবতোষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি! তুমি কোথায় দেখবে?'

'কেন! দেখনি, কাগজে বাড়ি ভাড়ার কত বিজ্ঞাপন দেয়। ঠিকানা খুঁজে চলে যাব। দেখে আসব। খোঁজখবর নেব।'

দেবতোষ এদিকটা ভেবে দেখেনি। ওর মাথাতেই আসেনি। প্রিয়ার পক্ষে খুব একটা দুরূহ হবে না কাজটা। দুপুরের দিকে প্রিয়া সহজেই বেরিয়ে পড়তে পারে। ভয়ের কিছু নেই। প্রিয়া ছোট খুকিটিও নয় যে রাস্তায় হারিয়ে যাবে। ঘর খোঁজার ব্যাপারে প্রিয়া হয়তো দেবতোষকে পিছনে ফেলে দেবে। দেবতোষ তবু একটু দ্বিধায় বলল, 'পারবে তো?'

রাধা চা দিয়ে গেল। গরম চায়ে দীর্ঘ তৃপ্তির চুমুক দিয়ে প্রিয়া উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই পারব।'

দেবতোষের মনে হল, আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর প্রিয়া যেন স্বপনপুরীর কোন্ বিজন অন্তরীক্ষ থেকে কথা বলছে!

রাত্রে শোওয়ার আগে বিজ্ঞাপনটায় দাগ দিয়ে রেখেছিল প্রিয়া। একটু অন্যরকম বিজ্ঞাপন। জনৈকা মিসেস পি. মুখার্জির নামে। 'মধ্যবিত্তদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ। কলকাতার উপকণ্ঠে স্বর্গদ্বার হাউসিং কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ কর্তৃক নির্মীয়মাণ ৬৪০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ফ্ল্যাট। বর্গফুট প্রতি এক টাকা হিসেবে মাসিক মাত্র ৬৪০ টাকা ভাড়া। বুকিং চার্জ ১৬ হাজার টাকা। ৭৫ টাকা দিয়ে নিয়মাবলী পুস্তিকা কিনুন। নিম্নের ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুন।'

'লী রোডটা কোথায়?' দেবতোষের টিফিন বাক্সটা নিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল প্রিয়া।

'আজ থেকেই শুরু করে দিচ্ছ বুঝি।'—দেবতোষের স্বর একটু গম্ভীর, 'কই, দেখি বিজ্ঞাপনটা!'

প্রিয়া কাগজটা এগিয়ে দিল! দু-মিনিটও লাগল না বিজ্ঞাপনটা পড়তে। দেবতোষ আঁতকে উঠল, 'ছশো' চল্লিশ টাকা ভাড়া দেব কী করে? তার ওপর ষোলো হাজার টাকা অ্যাডভান্স!'

'তুমি এমন করছ যেন ভাড়া নেওয়া হয়ে গেছে। আগে দেখে আসি না। তারপর ওসব ভাবা যাবে। বল না, লী রোডটা কোথায়?'—প্রিয়ার কণ্ঠে অধৈর্যের প্রলেপ। দেবতোষ যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দিল কলকাতার ঠিক কোথায় লী রোডের অস্তিত্ব। তারপর একটু সংশয়ের সুরে বলল—'যেতে পারবে কি!' গভীর আত্মবিশ্বাসে মাথা নাড়ল প্রিয়া। খুব মন দিয়ে শুনে নিয়েছে।

দেবতোষ চলে যাওয়ার পর থেকে ঝড়ের বেগে সংসারের কাজ সারছে প্রিয়া। মাঝখানে একটু সময় করে শ্বশুরকে ওদের সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিল প্রিয়া। বৃদ্ধ মানুষটি প্রিয়ার মুখ থেকে সব শুনে বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'তোমরা যা ভাল বুঝবে করবে। তবে জান বউমা এ আমাদের আপন আশ্রয়। আমি জানি জায়গাটা খারাপ। লোকের কাছে গলিটার নাম বলতে গেলে জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসে। অনেকে ছড়া কাটে—রাঁঢ়পাড়ায় ভদ্রলোকের বাড়ি আর নারায়ণের সঙ্গে বৈকুণ্ঠের আড়ি—একই কথা। তবু কি এখানে ভদ্রগৃহস্থ কম আছে! তাদের ছেলেরা মানুষ হচ্ছে না! দেবুকে কি আমি মানুষ করে তুলতে পারিনি। দেবুর মা অকালে মারা গেল। একমাত্র ভাই ব্যবসা করে টাকা করল, বাড়ি করল—তারপর একদিন এ বাড়ির মায়া ত্যাগ করে সরে পড়ল। কত দুঃখ! কত কষ্ট! তবু কেউ আমাকে এখান থেকে নড়াতে পারেনি। অথচ ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারতাম। আমি যাইনি। এখন দিনকাল বদলে গেছে। দেখ, কী করবে!'

শ্বশুরমশাইয়ের কথাগুলো যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনল প্রিয়া। কিন্তু কথাগুলো নিয়ে একটু যে ভাববে সে সময়টুকু পর্যন্ত হাতে নেই। স্নান, খাওয়াদাওয়া, পুপুনকে ঘুম পাড়ানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ শেষ করে প্রিয়া বাড়ি থেকে যখন বেরোল, ঘড়িতে তখন প্রায় একটা। রাস্তায় বেরিয়েই প্রিয়ার মনে হল সবাই যেন হাঁ করে ওকে দেখছে। একটু বেশি রকম সাজগোজ করে ফেলেছে প্রিয়া। খুব লজ্জা করছে।

এতটা না করলেই হত। কী দরকার ছিল শাড়ি-ব্লাউজ ম্যাচ করে পরার, চুলে শ্যাম্পু করাটাও বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কোনও নিমন্ত্রণে তো আর যাচ্ছে না—প্রিয়ার অস্বস্তি তীব্র হয়ে উঠছে। বাস স্টপে দাঁড়ানো মানুষজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে।

লী রোডে পৌঁছতে অসুবিধা হল না প্রিয়ার। দেবতোষ চমৎকার ডিরেকশন দিয়েছিল। শুনশান চওড়া রাস্তা। লোকজন প্রায় নেই। দামি দামি প্রাইভেট গাড়ি হর্ন বাজিয়ে স্তব্ধমগ্ন নির্জনতা গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বিজ্ঞাপনের কাটিংটা বের করে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়া খুঁটিয়ে লক্ষ করছে প্রত্যেকটা বাড়ির দরজা, পাঁচিল, মেন গেট। খানিকটা গিয়েই ও পেয়ে গেল বাড়িটা। পুরনো মডেলের বাড়ি। তিনতলা। আদ্দেক খোলা কোলাপসিবল গেট দিয়ে ঢুকেই সিঁড়ি। সিঁড়ির বাঁপাশে অনেকগুলো লেটার বক্স। প্রিয়া লেটার বক্সের গায়ে লেখা নাম দেখে বের করল। মিসেস মুখার্জি দোতলার চারনম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন। মিসেস মুখার্জি নামের ওপরে স্বর্গদ্বার হাউসিং কমপ্লেক্স-এর লেটার প্যাড কেটে কে যেন সদ্য সাঁটিয়ে দিয়েছে।

কলিং বেল টিপে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল প্রিয়া। প্রায় মিনিট তিনেক পরে দরজা খুললেন এক ভদ্রমহিলা। একঝলক তীব্র সেন্টের গন্ধ প্রিয়ার পাশ দিয়ে উধাও হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা প্রিয়ার চেয়ে মাথায় লম্বা, ঢলঢলে একটা সুতীর ম্যাক্সি পরনে, চুল অবিন্যস্ত, ফর্সা গায়ের রঙ, সমস্ত শরীরে গভীর আলস্যের আমেজ। অদ্ভুত সুরেলা গলায় ভদ্রমহিলা প্রিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চাই?'

প্রিয়ার মনে হল ভুল ঠিকানায় এসে বেল বাজিয়েছে। ইনি হয়তো মিসেস মুখার্জি নন। একটু থমমত খেয়ে প্রিয়া বলল, 'না মানে, আমি মিসেস মুখার্জির সঙ্গে...।'

'মিসেস মুখার্জি আমি। আপনি কি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে এসেছেন?'

প্রিয়া মাথা নাড়ল।

'ওঃ, ডিসগাসটিং, আমি বারবার প্রবীরকে বলেছিলাম, আমার নামে অ্যাড-ফ্যাড দিও না। কিছুতেই শুনল না। অবশ্য শীঘ্রি অন্য কোথায় ও নাকি অফিস করবে। বিজ্ঞাপনটা তখন আবার রিভাইস করারও প্ল্যান আছে ওর। আরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আসুন, ভিতরে আসুন, কী জানতে চান বলুন?'

প্রিয়া ভীষণ দমে গেল। ভদ্রমহিলা এমনভাবে 'ডিসগাসটিং' শব্দটা উচ্চারণ করলেন! নিজেকে খুব ছোট মনে হল প্রিয়ার। ফিরে যাবে কি না ভাবার সময় পেল না প্রিয়া। মিসেস মুখার্জি ড্রইংরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রিয়াকে ডাকলেন, 'কই, আসুন!'

বসার ঘরের চেহারা যে এত সুন্দর হতে পারে প্রিয়ার ধারণা ছিল না। একেবারে স্বপ্নের মতো। সিনেমার পর্দায় যেমন দেখেছে। সমস্ত ঘরটা ধূসর কার্পেট মোড়া। দেওয়ালগুলোতে মাউন্ট করা আধুনিক ছবি, বিদেশি ক্যালেন্ডার। দামি সেন্টার

টেবিল। ঘরের চারকোণায় ঢাউস পিতলের ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ডানপাশের গাঢ় খয়েরি রঙের ডাবল সোফা সেটটার একধারে জড়সড় হয়ে বসে প্রিয়া বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

মিসেস মুখার্জি সামনের সিঙ্গল সোফাটার ওপর ধপাস করে নিজেকে ফেলে দিয়ে বললেন, 'নো, নো, ডোন্ট মাইন্ড। আসলে প্রবীর এত তাড়াহুড়ো করছে! সব গুছিয়ে নিয়ে অন্য ঠিকানায় বিজ্ঞাপনটা দিলে পারত। এই দেখুন না, আজই জাস্ট অ্যাট্ টেন, এক ভদ্রলোক এসে হাজির। আমার তো তখন ভাল করে ঘুমই ভাঙেনি। আর কিছু না, এতে বাড়ির প্রাইভেসিটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

প্রবীর কে—এটা বুঝতে কষ্ট হল না প্রিয়াব। কিন্তু মিসেস মুখার্জি কি প্রবীরবাবুর স্ত্রী? প্রিয়ার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। কেননা মিসেস মুখার্জির অবয়বে বিবাহিত বাঙালির রমণীর কোনও চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না প্রিয়া। একমাত্র মহিলাটির মুখ আর সমস্ত শরীরে অপরিমেয় ভোগের ক্লান্তিটুকু ছাড়া। প্রিয়া খেয়াল করল, মিসেস মুখার্জির পরনে ম্যাক্সি বাদ দিয়ে আর কোনও বস্ত্রখণ্ড নেই। এমন বিশ্রীভাবে উনি বসে আছেন যে প্রিয়ার নিজেরই লজ্জা করছে। প্রিয়া চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হাউসিং কমপ্লেক্সটা কোথায় হচ্ছে?'

'ডোন্ট ইউ নো? ওই যে সোনারপুর না কালিকাপুর কোথায় যেন! দাঁড়ান আমি আপনাকে প্রসপেকটাসটা এনে দিচ্ছি।' শ্লথ ভঙ্গিমায়, অনেক জড়তা নিয়ে উঠে গেলেন মিসেস মুখার্জি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন প্রসপেকটাস নিয়ে। প্রিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে সোফার পিছনের দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখছিল। মিসেস মুখার্জির গলার আওয়াজে চমকে গেল।

'এই নিন। এটাতে সব লেখা আছে।' মিসেস মুখার্জি ওর সামনে এগিয়ে এলেন প্রসপেকটাসটা নিয়ে। প্রিয়া প্রথমে বাঁ-হাত, তারপর ডান হাত বাড়িয়ে সুদৃশ্য বুকলেটটা নিল।

'বাই দ্য বাই, মে আই নো, আপনি কোত্থেকে আসছেন? অ্যান্ড ইওর নেম!' প্রশ্ন করতে করতে একই ভঙ্গিমায় বসে পড়লেন মিসেস মুখার্জি।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় প্রিয়া ঠিক করেছিল মিসেস মুখার্জিকে বলবে না ও কোথায় থাকে। উত্তর কলকাতা, মধ্য কলকাতা, পূর্ব কলকাতা যা হোক কিছু ভাসা ভাসা বলবে। মিসেস মুখার্জির আচমকা প্রশ্নে সব গুলিয়ে গেল। প্রিয়া ওদের পাড়ার নামটা বলে দিল।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। মিসেস মুখার্জি দুচোখ কপালে তুলে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'হোয়াট! ডু ইউ লিভ ইন দ্যাট লেন, ইজ ইট্!'

প্রিয়ার মনে হল, ও যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মিসেস মুখার্জি উত্তেজনায় কোমরে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আভাস। প্রিয়া কী করবে এখন। মিসেস মুখার্জির চোখ দুটো কী যেন খুঁজছে প্রিয়ার মধ্যে। প্রিয়া, প্রায় মরিয়া হয়ে, জোর করে উঠে দাঁড়াল। দ্রুত ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা একশো টাকার নোট বের করে মিসেস মুখার্জিব দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বইয়ের

দামটা নিয়ে নিন। আমি এবার যাব। আপনার এখনও স্নান, খাওয়াদাওয়া হয়নি...।

প্রিয়ার কথা শেষ হল না। মিসেস মুখার্জি গলার স্বরে কপট অন্তরঙ্গতা মিশিয়ে বলে উঠলেন, 'ওঃ মাই ডিয়ার। ডোন্ট থিংক ওভার ইট। প্লিজ চলে যেও না। একটু বস। প্রবীর অনেকক্ষণ হল বেরিয়েছে। ওর চলে আসার সময় হয়ে গেছে। প্রবীরের সঙ্গে তুমি বাড়ির ব্যাপারে কথা বলে নাও। তুমি চলে গেলে প্রবীর তোমায় মিস্ করবে।'

এক মুহূর্তও আর এখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না প্রিয়ার। মিসেস মুখার্জির চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাষা অসহ্য লাগছে। ভদ্রমহিলা হঠাৎ আপনি থেকে তুমিতে নেমে গেলেন। আশ্চর্য! সুন্দর ড্রইংরুমটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে প্রিয়াকে যেন চেপে ধরছে। প্রিয়া অনুভব করল, একটা অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য জালে যেন আটকে গেছে ওর সমস্ত সত্তা, ওর অস্তিত্ব।

পাশের ঘরে তীব্র শব্দে ফোন বেজে উঠল। মিসেস মুখার্জি তড়াক করে উঠে বেরিয়ে গেলেন। রিসিভারটা কাঁধের ওপর চেপে ধরে পুরো ফোনটা নিয়ে ফিরে এলেন এঘরে। এক মিনিটও সময় লাগল না। লাল টুকটুকে ফোনটা মিসেস মুখার্জির থাবার মধ্যে ধরা! প্রিয়া দেখল, যেন ওর হৃৎপিণ্ডটা ভদ্রমহিলার মুঠোয় ঝুলছে। যে কোনও মুহূর্তে খসে পড়ে যাবে।

'হ্যালো, হ্যালো! কে প্রবীর! আঃ গুডলাক। কখন ফিরছ? এক্ষুণি!...ফাইন।...চিলি চিকেন! নো ডিয়ার...হোয়াই নট কিচেন সুইট অ্যান্ড সাওয়ার টু ডে? উইথ মিকস্‌ড চাউমিন!...লাঞ্চ খুব জমবে। এই শোন—হিয়ার এ ক্লায়েন্ট ইউ এক্সপেকটিং ইউ...না, না। এ সুইট লেডি...। ওঃ সিওর।...আই কিস ইউ।' হালকা ঠোঁট ছুঁইয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন মিসেস মুখার্জি। চূড়ান্ত ন্যাকামি। প্রিয়ার সমস্ত শরীর রাগে জ্বলছে। কোনও কথা নয়—এবার ঠিক উঠে পড়বে? ভাবল প্রিয়া।

ঠিক তখুনি কিশোর বয়সী একটি নেপালি ছেলে সুদৃশ্য ট্রেতে দু কাপ কফি আর এক প্লেট স্নাকস্ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ট্রের ওপর থেকে এক কাপ কফি তুলে প্রিয়াকে এগিয়ে দিলেন মিসেস মুখার্জি। নিজের কাপটা হাতে নিয়ে বললেন, 'একটু রিলাক্স করুন। প্রবীর দশ মিনিটের মধ্যেই এসে যাবে। ওর স্কুটার আছে।'

প্রিয়া কফি হাতে নিয়ে বিমূঢ় বসে রইল। হু হু করে সময় চলে যাচ্ছে। মিসেস মুখার্জি প্রিয়ার সামনে বসে আছেন শিকারী বেড়ালের মতো। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে চতুর দৃষ্টিতে প্রিয়ার দিকে তাকাচ্ছেন। অজানা শঙ্কায় প্রিয়ার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে প্রিয়া। কী দরকার ছিল এই ভরদুপুরে একা এখানে আসার! এতক্ষণে পুপুন হয়তো ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। মাকে দেখতে না পেয়ে কান্নাকাটি করছে। রাধা সামলাতে পারছে না ছেলেটাকে। কেন যে এইভাবে ওকে আটকে রাখার চেষ্টা করছেন মিসেস মুখার্জি। প্রিয়া ভেবে পাচ্ছে না।

কলিং বেলের আওয়াজে সম্বিৎ ফিরল। নিশ্চয়ই প্রবীর মুখার্জি ফিরলেন। 'জাস্ট আ মিনিট।'—মিসেস মুখার্জি প্রায় দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেলেন। দরজা খুলেই

'ওঃ, ডিয়ার' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কারুর উপরে। ঘরের ভিতর থেকে বুঝতে পারছে না প্রিয়া। ফ্ল্যাটের মধ্যে কেউ ঢুকল না। মিসেস মুখার্জি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে কিছু বলছেন। ক্ষীণ ফিসফিস শব্দ খালি ভেসে আসছে প্রিয়ার চারপাশে।

মাত্র দু-তিন মিনিটের এই রুদ্ধশ্বাস নাটক শেষ করে মিসেস মুখার্জি প্রবল উচ্ছ্বাসে, কৃত্রিম আহ্লাদে গলে পড়তে পড়তে এক ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই যে আমার প্রবীর। আর শোন, ইনি এসেছেন তোমার সঙ্গে ডিসকাস করতে। বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে।'

প্রবীরের ডান হাতটা ভদ্রমহিলার কোমরে জড়ানো। প্রিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। রোদেপোড়া তামাটে মুখ, দুচোখের তলায় কালি পড়া, মাঝারি গড়নের প্রবীর মুখার্জিকে দেখে প্রিয়া ভয় পেয়ে গেল। প্রিয়াদের গলিতে এইরকম চেহারার কিছু লোক প্রায়ই যাতায়াত করে—ঠোঁটের উপর সরু গোঁফ, কাঁচাপাকা জুলফি, মুখে লাম্পট্যের ছোবল। প্রিয়ার দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছে লোকটা। চোখের দৃষ্টি নোংরা, ক্ষুধার্ত। ভদ্রলোকের নিচের ঠোঁটটা সামান্য ঝুলে পড়েছে।

'তোমরা কথা বল। আমি বাথরুমে যাচ্ছি। আরে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? প্লিজ, বি সিটেড।—মিসেস মুখার্জি প্রিয়ার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রমহিলা হাসছেন। অন্যরকম ইঙ্গিত হাসিতে। প্রিয়াকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'বসুন, আমি যাচ্ছি।'

প্রবীর মুখার্জি একটুও ইতস্তত না করে প্রিয়ার পাশে এসে বসল। মাঝখানে সামান্য দূরত্ব। দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবুও প্রিয়া সহজ হওয়ার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। কেমন যেন জড়িয়ে ভাঙাচোরা শব্দগুচ্ছ বেরিয়ে এল প্রবীর মুখার্জির গলা দিয়ে, 'আপনি বাড়ি ভাড়া নেবেন?'

কথার কোনও ভূমিকা, আলাপের সামান্যতম প্রস্তুতি ছাড়াই প্রবীরের এই প্রশ্নে প্রিয়া আবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। 'না, মানে, আমার স্বামী ভাড়া নেবেন। আমি খোঁজ নিতে এসেছি।'

'আপনার স্বামী মানে?'

প্রবীরের এই পাল্টা প্রশ্নটি প্রথমে বুঝতে পারল না প্রিয়া। কয়েক মুহূর্ত পরে প্রিয়ার মনে হল, মিস্টার মুখার্জির প্রশ্নে একটা জঘন্য ইঙ্গিত ফুটে উঠছে। কী বলতে চাইছে লোকটা! ইয়ার্কি করছেন কী? প্রিয়ার মাথায় রক্ত উঠে গেল। শরীরে আগুন জ্বলছে। তবু অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে প্রিয়া বলল, 'মানে, আমার স্বামী...।'

প্রিয়ার কথা শেষ হল না। প্রবীর মুখার্জি হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'আপনি যে-পাড়ায় থাকেন, সেখানে আবার স্বামী! হাঃ হাঃ!'

সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে সঞ্চিত শেষ বোধটুকু হারিয়ে ফেলল প্রিয়া। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রিয়া বলল, 'কী বলছেন আপনি!'

প্রবীরের কোনও বিকার নেই। প্রিয়ার ক্রুদ্ধ কম্পিত দেহ প্রতিমা দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না মিস্টার মুখার্জি। হাসির দমকটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

'রাগ করো না মাইরি। তোমাদের আবার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক! এই যে নূপুর, যাকে তুমি মিসেস মুখার্জি বলে ভাবছ, ও কী তাই! আরে না, না। নূপুরকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট থেকে তুলে এনেছি। কয়েক মাস আগে। যে কোনও দিন চলে যেতে বলব! তারপর আবার তোমার মতো আর একটা বউ নিয়ে আসব।'

এই লম্পটটার সামনে আর এক মুহূর্ত থাকলে প্রিয়া পাগল হয়ে যাবে। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে প্রিয়া চিৎকার করে উঠল, 'আপনি ছোটলোক, ইতর, অভদ্র, অসভ্য কোথাকার! একজন ভদ্রমহিলাকে এভাবে আপনি অপমান করতে পারেন না। জুতো মেরে আপনার মুখ ভেঙে দেব।'

প্রিয়ার আর্তনাদ বাথরুমের দরজা ভেদ করে মিসেস মুখার্জি বা নূপুরের কানে গিয়ে পৌঁচেছে। নিশ্চয়ই গণ্ডগোল বাধিয়েছে প্রবীর। দুশ্চরিত্র লোকটা কোনও সীমা-পরিসীমা, সময়-অসময় মানে না। একটা বড় তোয়ালে কোনওরকমে জড়িয়ে অর্ধনগ্ন নূপুর দৌড়ে এল ড্রয়িংরুমে।

'হোয়াট হ্যাপেন্ড? হোয়াট হ্যাপেন্ড? ও হোঃ, প্রবীর তুমি কি জেলে যেতে চাও। ওঃ ইউ হ্যাভ নো সেন্স, নো কন্ট্রোল। তোমাকে ফোনে জানানোটাই ভুল হয়েছে। মেয়েছেলেটা এখন যদি তোমায় ফাঁসিয়ে দেয়! তুমি এত দূর স্টুপিড যে বলার নয়!'

ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে প্রিয়া ইতিমধ্যে ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজাটা খুলে ফেলেছে। নিদারুণ ঘৃণায় একবার নূপুরের দিকে তাকিয়ে 'ছিঃ ছিঃ' করে উঠল প্রিয়া। তারপর দড়াম করে দরজাটা টেনে দিয়ে প্রবল ঘোরের মধ্যে নেমে এল নীচে। প্রায় নির্জন অভিজাত লী রোডের কালো কঠিন বুকের ওপর।

দেবতোষ অফিসে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। আসলে ঘর ভাড়ার ব্যাপারে দু-একজন তেমন আমলই দিল না। রমেনও আজ আসেনি। নিজে কিছু করতে না পারলেও প্রিয়ার কাছ থেকে যেমনই হোক একটা খবর নিশ্চয়ই পাবে—এমন আশা নিয়ে দেবতোষ বাড়ি ফিরল। সদর দরজায় কড়া নাড়তে হল না। দরজা ভেজানো ছিল। একটু অবাক হল দেবতোষ। সারা বাড়িটা নিশ্চুপ। নিচের সব লাইট নেভানো। সিঁড়ির ওপরের বাল্‌বটা শুধু জ্বলছে। পুপুনের সাড়াশব্দ নেই। দোতলায় উঠে এসে দেবতোষ দেখল, বাবার ঘর ছাড়া কোনও ঘরে আলো জ্বলছে না। সব ঘরের দরজা বন্ধ। দেবতোষ ওদের শোবার ঘরের বন্ধ কপাট আলতো করে ঠেলে ঘরে ঢুকল। নীল নাইট ল্যাম্পটা জ্বলছে। বিছানার ওপর এলোচুলে হালকা রঙের শাড়ি পরে বসে আছে প্রিয়া।

'আলো জ্বালিও না।' অনেক কান্নায় মেয়েদের গলার স্বর কেমন যেন ভিজে যায়, প্রিয়ার কণ্ঠ তেমনই ভেজা ভেজা লাগল দেবতোষের।

'কেন? কী ব্যাপার! কী হল তোমার! পুপুন কোথায়?'—দেবতোষ এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

'পুপুনকে নিয়ে রাধা ছাদে বসে আছে।' প্রিয়ার ভগ্নকণ্ঠ নাড়িয়ে দিল দেবতোষকে।
'তুমি এভাবে বসে আছ কেন? কী হয়েছে? দাঁড়াও লাইটটা জ্বালি।'
'কিছু হয়নি। প্লিজ, লাইট জ্বালিও না। শোনো, একটা কাজ কর তো। গলির ও-মাথায় যে-মেয়েগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের একবার দেখে এসো। যাও।'
'কী বলছ এসব, ওদের কেন দেখতে যাব?'
'যাও না, লক্ষ্মীটি, মাত্র একবার দেখে এসো, প্লিজ...। আমি তোমার পায়ে পড়ছি।'
দেবতোষ বিপন্ন বোধ করল। প্রিয়া এ কী পাগলামি শুরু করেছে। বিস্মিত দেবতোষ কী ভেবে দ্রুত নীচে নেমে গেল। অতি দ্রুত গলির করুণ—রঙিন এলাকাটা থেকে ঘুরে এল। মেয়েগুলোর মুখের দিকে যেটুকু পেরেছে চোখ বুলিয়ে এসেছে দেবতোষ। অন্তত এই মানসিকতায় যতটা সম্ভব। গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘরে ঢুকল দেবতোষ। প্রিয়া তেমনভাবেই বসে আছে। মায়াবী নীল আলোয়। পুঞ্জীভূত রহস্যের ঘেরাটোপে। দেবতোষ বিহ্বল। কথা আটকে আসছে। দেবতোষ কোনওরকমে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখতে পাঠালে আমায় প্রিয়া? বল, বল!'
অনবরুদ্ধ কান্নার স্রোতে অতলান্তের দিকে ভেসে যেতে যেতে প্রিয়া বলল, 'ওগো, মেয়েগুলোর লাইনে কি তুমি আমায় দেখতে পেলে? বল না, আমি কি দাঁড়িয়েছিলাম।'

আগামীকাল পূর্ণিমা

এবার কোথায় যাবেন? জিজ্ঞেস করেছিলেন 'সময়গ্রন্থি' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক কুমারবাবু, সমুদ্র, পাহাড় নাকি মরুভূমি! যদি মনে করেন গ্রামবাংলা, তাহলে সে-ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

কুরুবিন্দ ভাবতে সময় নিয়েছিলেন। প্রতিবছর পুজোর দু'মাস আগে, জুলাইয়ের শেষ কিংবা আগস্টের প্রথমে, সম্পাদক ওঁকে এই সঙ্কুচিত-হয়ে-আসা শহরটা থেকে দূরে কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দেন। একটানা কুড়ি-পঁচিশ দিন। কোনও হোটেল কিংবা অতিথিনিবাসে। সব খরচা 'সময়গ্রন্থি'র। এই সময়ের মধ্যে কুরুবিন্দ ওঁর পুজোর উপন্যাসটা লিখে শেষ করে ফেলেন। সম্পাদক সুকুমারবাবু নিজের স্বার্থেই কুরবিন্দের পেছনে এই খরচাটুকু করেন নির্দ্বিধায়। কেননা, প্রথমত ঠিক সময়ে লেখাটা ওঁর হাতে চলে আসে। দ্বিতীয়ত, সমস্ত রকম ঝামেলার বাইরে বসে কুরুবিন্দ যে-ফসল ওঁর হাতে তুলে দেন তা পুজোর বাজারে সর্বোত্তম। অন্তত গত আট বছর ধরে সময়গ্রন্থি ওঁর পেছনে যা খরচ করে তার চারগুণ লাভ বাজার থেকে তুলে নেয়।

অবশ্য খরচা বলতে যাতায়াত আর থাকা-খাওয়ার ব্যয়। কুরুবিন্দ মদ্যপান করেন না। নারী-শরীরের প্রতিও ওঁর তেমন কোনও আসক্তি নেই। ফলে এই দু'ধরনের খরচার হাত থেকে সময়গ্রন্থি বেঁচে যায়। একটা বড় লেখার জন্য, ধরা যাক ওঁর হাতের লেখায় দু'শো পাতার পাণ্ডুলিপি, কুরুবিন্দ কিছুটা নির্ঝঞ্ঝাট সময় এবং নির্জন একাকিত্ব ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন না।

তার মানে এই নয়, কলকাতায় বসে কুরুবিন্দ কিছুই লিখতে পারেন না কিংবা সেই অভ্যেসটা হারিয়ে ফেলেছেন। সারা বছর ধরেই ওকে সময়গ্রন্থির জন্যে ফিচার, ছোটগল্প, লঘু প্রবন্ধ, গ্রন্থ সমালোচনা—কিছু না কিছু করতেই হয়। বিডন স্ট্রিটে ওঁর পৈতৃক পুরনো বাড়ির দোতলার একটি ঘরে বসে কুরুবিন্দ দিব্যি এইসব নানা মাপের স্বাদের-আঙ্গিকের রচনা প্রসব করেন। কোনও কোনও সময় খুব বিরক্তিকর মনে হয়, কিংবা ক্লান্তি এসে ওঁকে চেপে ধরে ঠিকই, কিন্তু কলম একেবারে থেমে যায় না। কিংবা বলা ভাল, কুরুবিন্দ থামতে দেন না। লিখতে লিখতেই ওঁকে বেঁচে থাকতে হয় শারীরিক ও মানসিক দু'দিক থেকেই। লেখা ছাড়া কুরুবিন্দের অস্তিত্ব তো নেই আর কোথাও নেই! এমন কী, ছোটখাটো প্রকাশকদের জন্যে উনি দু'তিনটে উপন্যাসও লিখেছেন এই শহরের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে শুনতে।

তা সত্ত্বেও, একটি বড় ও ভাল লেখার জন্যে কুরুবিন্দ দূরে কোথাও চলে যাওয়ার

কামনাটুকু কিছুতেই দমন করতে পারেন না। কুমারবাবু দ্বিতীয় বছরেই এই আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরে ওঁকে পুরীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে বছর ওঁর 'জেগে আছ, সমুদ্র?' উপন্যাসটি পাঠকদের পাগল করে দিয়েছিল। এমন কী একজন কড়া সমালোচক বইটার রিভিউ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, এ দশকের সেরা পাঁচটি প্রেমের উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম এই কথাকাহিনী।

কুরুবিন্দকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সময়গ্রন্থিও সেই থেকে ওঁকে জাপটে ধরে আছে। অবশ্য ওঁর ব্যাঙ্ক-চাকুরে বন্ধু প্রীতম হাসতে হাসতে বলে, সময়গ্রন্থি তোকে কিনে নিয়েছে।

হয়তো তাই। এই জাতীয় যে কোনও পত্রিকারই শেষ লক্ষ্য বাণিজ্য। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি-অবনতি নিয়ে এরা মাথা ঘামায় ঠিকই, এমন কী সৃজনশীলতার প্রতি এরা এক ধরনের দায়বদ্ধতাও অনুভব করে, তা সত্ত্বেও লাভ-লোকসানের অঙ্কটাই চূড়ান্ত বিন্দু। বলা যেতে পারে, ক্রমশ-উঠতে-থাকা সোপানশ্রেণীর অন্তিম ধাপ। ওখানেই সময়গ্রন্থিরা পৌঁছতে চায়। এতে দোষের কিছু নেই। কুরুবিন্দ যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখেছে, এইসব কাগজ তো আর সাহিত্যের ধর্মশালা নয় যে, নানা ধরনের সাহিত্যস্রষ্টার অকুণ্ঠ সেবা করবে! বরং এই বাণিজ্যমনস্কতাই এদের বাঁচিয়ে রেখেছে এবং এরাও বাঁচিয়ে রাখছে কিছু মানুষকে।

প্রীতমের কথার কোনও প্রতিবাদ করেননি কুরুবিন্দ। ফিকে হেসেছিলেন। এও ঠিক প্রীতম যা বলেছে তা আসলে পাঠকসমাজের একাংশের চিন্তার প্রতিফলন। কেউ কেউ ওঁর সম্বন্ধে হয়তো এমনই ভাবে। তবু কুরুবিন্দ পুজোর ফসল ফলানোর জন্যে সময়গ্রন্থির অকাতর অ্যারেঞ্জমেন্ট উপেক্ষা করতে পারেন না। একবার ভেবেছিলেন, নিজের পয়সায় যাবেন, কিন্তু সম্পাদকমশাই মৃদু ধমক দিয়ে বলেছিলেন, এসব বিলাসিতা করতে যাবেন না কুরুবিন্দবাবু! নিজের পয়সা মানেই নিজের মনের সঙ্গে টাই-আপ। ওটা কিছুতেই খুলতে পারবেন না। বড় শক্ত বাঁধন। ফলে টাকার চিন্তায় লেখাও ভাল হবে না, টাকাও খরচ হবে। এসব কেন করবেন বলুন তো! আপনি তো আর শখের লেখক নন!

সুকুমারবাবু সময়গ্রন্থির মালিক নন, মাইনে-করা সম্পাদক। ফলে ওর দৃষ্টিভঙ্গিতে আবেগের চেয়ে যুক্তিই বেশি। ইঙ্গিতে ভদ্রলোক বোঝাতে চেয়েছেন, পত্রিকার মালিক যখন আপনার পেছনে টাকা ঢালাতে উৎসাহী তখন এই সেন্টিমেন্টাল চিন্তা-ভাবনার কোনও মানে হয় না।

কুরুবিন্দ নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। প্রফেশনাল রাইটারদের যেভাবে নিজেকে সামলানো উচিত। দ্বিতীয় বছর পুরী, তারপরের বছরও পুরী। তার মানে দু'বার সমুদ্রের কাছে। চতুর্থ বছরে কুরুবিন্দ গেলেন দেরাদুন। পাহাড়। পঞ্চম বছরে হরিদ্বার। নদী। ষষ্ঠ বছরে আবার পাহাড়—এবার কালিম্পং। সপ্তমে দূরে নয়, বারাসতের কাছে একটা রিসর্টে প্রায় একমাস। গত বছর সুন্দরবনের কাছাকাছি একটা জায়গায়। সেখানে সম্পাদকের এক মৎস্য ব্যবসায়ী বন্ধুর একটা বাগানবাড়ি আছে। ভারি চমৎকার! ওই সব অঞ্চলে ইলেকট্রিসিটি নামক প্রহেলিকার নিষ্ঠুর খেলা

কুরুবিন্দকে ছুঁতেই পারেনি। বাড়িটায় দুটো জেনারেটরের ব্যবস্থা। জায়গাটা বেশ স্বপ্নের মতো। ওঁর কোনও একটা উপন্যাসে জায়গাটার কথা কুরুবিন্দ লিখবেন।
অফার দেওয়ার তিনদিন পরেই সম্পাদক ফোন করেছিলেন, কী হল আপনি বললেন না, কোথায় যাবেন?
ওঁর কণ্ঠস্বর একটু রুক্ষ, অযথা উদ্বিগ্ন এবং তাপদগ্ধ দিনের মতো শুনিয়েছিল। কুরুবিন্দ সামান্য বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, যেতেই হবে!
টেলিফোনের ওপারে সুকুমারবাবু অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন, এ কী বলছেন মশাই! নেশাটেশা করেছেন নাকি! যেতে হবে মানে, আলবৎ যাবেন, যেতেই হবে। আমি কিন্তু আগামী সোমবার আবার ফোন করব। এর মধ্যে ভেবে রাখবেন প্লিস। টিকিট কাটতে হবে, হোটেলের ব্যবস্থা করতে হবে। মালিক অবশ্য আপনার ব্যাপারে আমাকে ফ্রিহ্যান্ড দিয়ে রেখেছেন। তবু সময় তো কিছু লাগবেই। সব তো আর ম্যাজিকের মতো চোখের পলকে হবে না। আজকাল যা দিন পড়েছে, টাকা ছড়ালেও মশাই সব কিছু সময়মতো পাওয়া যায় না।
কুরুবিন্দ মনে মনে বলেছিলেন, একমাত্র আমাকে ছাড়া।
—হ্যালো, হ্যালো...। শুনতে পাচ্ছেন? আরে আপনি চুপ করে আছেন কেন? আমি কি কিছু ভুল বলেছি।...তাহলে ওই কথাই রইল, সোমবার ফোন করব।
সঙ্গে সঙ্গে কুরুবিন্দ বলেছেন, শুনুন, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি। আপনি গোপালপুরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।
—গোপালপুর-অন-সি। প্রবীণ সম্পাদক সামান্য বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
—হ্যাঁ। আলতো স্বরে বলেছিলেন কুরুবিন্দ।
—ঠিক আছে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।...গোপালপুর, তার মানে আপনাকে বেরহামপুরে নেমে গাড়িতে করে...। আচ্ছা, আমি আমাদের ট্রাভেল এজেন্টকে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি। তবে মশাই আমি ভেবেছিলাম এবার আপনি রাজস্থানের দিকে যাবেন। মরুভূমিতে। তা নয়, আবার সেই সমুদ্র! সাগরের প্রেমে পড়ে গেছেন দেখছি!
সময়গ্রন্থির এই সম্পাদক যত না সাহিত্যমনস্ক, তার চেয়েও বেশি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। কোয়ালিটি কন্ট্রোলার নন, বরং কোয়ালিটি রেইজার। নিজেও সে-কথা অকপটে স্বীকার করেন। ভদ্রলোকের ওই সব ছেঁদো কথার কোনও জবাব না-দিয়ে কুরুবিন্দ বলেছিলেন ঠিক আছে, রাখছি। রিসিভারটা নামিয়ে রেখেই ওঁর মনে হয়েছিল, হঠাৎ গোপালপুর জায়গাটার নাম ওঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল কেন? কোন্ অনুষঙ্গে? সেই মুহূর্তের ঠিক আগে কিংবা এই ক'দিনও একেবারের জন্যেও গোপালপুর শব্দটা ভাবেননি। ভারি আশ্চর্য লাগছিল নিজের এই অদ্ভুত অনিকেত আচরণে।
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো হঠাৎ এসে কেন যে ওঁর বুকের মধ্যে আছড়ে পড়েছিল গোপালপুরের নামটা। অদৃশ্য পারম্পর্য হয়তো কিছু আছে। কুরুবিন্দ তা জানেন না। এমন কী গোপালপুর সম্বন্ধে ওঁর কোনও ধারণাও নেই। অবশ্যই পুরনো টুরিস্ট

স্পট, পুরীরই মতন সমুদ্রের ধারে, কিন্তু এই কমন পরিচয়ের বাইরে গোপালপুরের আর কোন্ নিজস্বতা আছে, বলতে পারবেন না। বেশ অবাক হয়ে গেছিলেন কুরুবিন্দ!

অবশেষে সত্যি সত্যি গোপালপুর। পরশুদিন সকালবেলা মাদ্রাজ মেলে ব্রহ্মপুর স্টেশনে নেমেছেন কুরুবিন্দ। সেখান থেকে একটা অটোতে জলকল্লোলের একেবারে কাছাকাছি। এখন অফ সিজন। ফলে সমুদ্রসৈকত প্রায় জনহীন। অনেক হোটেল, কিন্তু নিষ্প্রাণ, তালাবন্ধ। সিজনেও নাকি পুরীর মতো ভিড় হয় না। ওঁর হোটেলটা সমুদ্রের খুব কাছে। বলতে গেলে হোটেলের ঝুল বারান্দার নীচ থেকে বেলাভূমি শুরু হয়েছে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে কয়েক পা হাঁটলেই গোপালপুরের লাইটহাউস। ইট রঙের সুউচ্চ নির্মাণ। কাল অনেক রাত পর্যন্ত লাইট হাউসের ঘুরন্ত আলোর মায়াবি খেলা দেখেছেন কুরুবিন্দ।

ওঁর ঘরের সব ক'টা জানলা দিয়ে সমুদ্রে উঁকি দেয়। ভেসে আসে দুরন্ত বাতাসের চাপা গর্জন আর ঢেউয়ের উন্মাদধ্বনি। বিরামহীন। পুরীর সঙ্গে গোপালপুরের ভৌগোলিক শরীরে হয়তো কিছু পার্থক্য আছে, কুরুবিন্দর চোখে সেটা খুব খুঁটিয়ে ধরা পড়ছে না। কিন্তু এই জায়গাটার সত্তা ও চরিত্র পুরীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কংক্রিটের স্তূপগুলো না-থাকলে গোপালপুরের এই স্তব্ধ সৌন্দর্য কেমন হত, কুরুবিন্দ ভাবতেই পারছেন না।

পরশুদিন বিকেলে তিনি উত্তর দিকে অনেকটা হেঁটেছেন সমুদ্রের পাড় ধরে। সাহেব ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কিছু বাড়ি এখনও আছে। থাকেনও কেউ কেউ। তবে অধিকাংশ বাড়িই হাত-বদল হয়ে গিয়ে হোটেল, নয় হলিডে হোম। সমুদ্রতট জুড়ে পড়ে আছে মৎস্যজীবীদের কালো কালো সরু ও লম্বা নৌকা এবং নাইলনের জাল।

আজ সকালে কুরুবিন্দর ঘুম ভেঙেছে এই মৎস্যজীবীদের চিৎকার চেঁচামেচিতে। ওঁর রুমবয় বলেছিল, গভীর সমুদ্র থেকে জীবনপণ করে যে মাছ ওরা ধরে আনে তার ভাগ-বাঁটোয়াবা আর বিক্রি নিয়ে এমন হই-হট্টগোল লেগেই থাকে। এক কাপ চা খেয়ে কুরুবিন্দ আজ তটরেখা ধরে দক্ষিণ দিকে হেঁটে গেছিলেন। সমুদ্র দক্ষিণে অর্ধেক চাঁদের মতো বেঁকে গেছে। বালির ওপর জাল বিছিয়ে মেরামতির কাজ করছিল যে দু'জন নিকষ কালো অর্ধনগ্ন, অপুষ্টিতে ভরা মানুষ, তাদেরকে কুরুবিন্দ হিন্দিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সমুদ্র ওদিকে কোথায় গেছে?

প্রশ্নটার মধ্যে অদ্ভুত ছেলেমানুষি ছিল। সমুদ্র তো আর নদী নয় যে তার আঁকাবাঁকা শরীর নিয়ে কোথাও বয়ে যাচ্ছে! সমুদ্র অনন্ত, আদিগন্ত। আবার অতলান্ত। তার অবয়ব ধারণার বাইরে।

লোক দুটি পরস্পরের মুখ চেয়ে একটু থমকে গেছিল। তারপর একজন কী মনে করে হাত তুলে বলেছিল, বন্দর।

শব্দটা শুনিয়েছিল—বান্দর। কুরুবিন্দ কিছুই বোঝেননি। তবে লোকটা যে বাঁদর বা ওই জাতীয় কিছু বলতে চাইছে না সে সম্পর্কে ওঁর কোনও সংশয় ছিল না।

সমুদ্রের লবণাক্ত হাওয়া আর চড়চড়ে রোদ গায়ে মেখে কুরুবিন্দ দশটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এসেছেন। রিসেপশন কাউন্টারে বসে থাকা হোটেল-ম্যানেজারকে সমুদ্রের বক্রতটভূমির কথা বলতেই ভদ্রলোক বলেছেন, ওদিকেই তো ভাইজাখ—বিশাখাপত্তনম্। রাত্রে দেখবেন বড় বড় জাহাজ গোপালপুর পেরিয়ে ভাইজাখের দিকে যাচ্ছে। বহু বছর আগে এখানে একটা বন্দর ছিল। কিন্তু সেটা মরে গেছে। আবার শুনছি নতুন করে পোর্ট তৈরি হবে। ম্যানেজার বাঙালি মুসলমান। ভাগ্যান্বেষণে মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে এসেছিলেন কিশোর বয়সে। আর দেশে ফিরতে পারেননি। বিয়ে-থা করে এখন এখানেই থাকেন। শুনেই কুরুবিন্দের মন খারাপ হয়ে গেছে। বন্দর মানেই গোপালপুরের নিজস্ব প্রাণের উল্লাস স্তব্ধ হয়ে যাবে। অবধারিত। পোর্ট মানেই বহু নাবিক-লোক-দেহকল্পলতা রমণী-সস্তা হোটেল-অস্ত্র-রক্ত-হত্যা—দিনযাপনের গ্লানি আর পাপ। পণ্যের সঙ্গে তুল্যমূল্য হয়ে যাবে এখানকার জীবন। এইসব ছিমছাম হোটেলগুলো পরিণত হয়ে যাবে মদের আখড়া আর বেশ্যাখানায়।

দুপুরবেলায় কুরুবিন্দ লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু সাদা পাতা তেমনই সাদা থেকে গেছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেবলই মনে হয়েছে, গোপালপুর পুরীর মতো ঐশ্বর্যময়ী নয়, টুরিস্টদের আকর্ষণ করার মতো আয়োজন এখানে সামান্য; সমুদ্র, লাইটহাউস এবং একটি অর্ধভগ্ন মন্দির ছাড়া আর কিছুই নেই; তবু এই সমুদ্রসৈকতে, নিঃশব্দে পড়ে থাকা জায়গাটার পরতে পরতে হাতছানি। অজানা-লোকের ইঙ্গিত। কোথাও বা একটু-আধটু রহস্যের আবরণ। গোপালপুরকে সম্পূর্ণ না-জানা পর্যন্ত কিছুই তিনি লিখতে পারবেন না।

সকালেই কুরুবিন্দ ঠিক করে রেখেছেন, বিকেলের দিকে রোদ পড়ে এলে লাইটহাউসের চুড়োয় উঠবেন। ওই উত্তুঙ্গ নির্মাণটাও একটা নীরব হাতছানি। হয়তো আলোকস্তম্ভটির গায়ে কোথাও রহস্য লেগে নেই, ওর মাথায় উঠলে গোপালপুর জনপদটাকে অনেক দূর পর্যন্ত একটিমাত্র ফ্রেমে দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন ঘুরন্ত আলোর কারিগরি—এ ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে! তবু বাতিঘরটা ওকে শিশুর মতো উতলা করে দিচ্ছে।

বিকেলের আলো একটু মরে আসতেই কুরুবিন্দ পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নীচে নেমে এলেন। ম্যানেজার হোটেলের সুদৃশ্য বাগানের মালিদের কাজ তদারকি করছেন। ওঁকে দেখেই ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমাদের এই ছোট টাউনটা ঘুরে দেখে নিন। খারাপ লাগবে না।

কুরুবিন্দ একটু থমকে গেলেন। ভদ্রলোক কী আন্তরিকতার সঙ্গে 'আমাদের' শব্দটি উচ্চারণ করলেন! অথচ গোপালপুর ওঁর জন্মস্থান নয়, ভাগ্য ও জীবিকার লীলাভূমি। মৃদু হেসে কুরুবিন্দ বললেন, নিশ্চয়ই দেখব। এখন একটু লাইটহাউসে যাচ্ছি। ওটা দেখা যাবে তো! মানে উপরে উঠে...

—নিশ্চয়ই। তবে আপনার হার্টের কোনও গণ্ডগোল নেই তো! একেবারে সোজা উঠতে হবে। অনেকগুলো সিঁড়ি...দমের ব্যাপার আছে।

বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন কুরুবিন্দ। কার্ডিয়াক অ্যাজমায় মাঝে মাঝেই তাঁকে ভুগতে হয়। শেষ ইসিজি রিপোর্ট বলেছে, কুরুবিন্দর হার্টের জোর কমে এসেছে। যে কোনও সময়ে খুব বড় না হোক ছোটখাটো বিদ্রোহ করতে পারে। অতএব একটু সতর্কতা সবসময়ে দরকার। বড় ছেলে অমৃতাভ ট্রেনে তুলে দিতে এসে বলেছিল, বাবা, কোনও অসুবিধে হলেই বাড়িতে ফোন করবে। তোমার শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে মায়ের উদ্বেগের শেষ থাকে না। এবারও তুমি মাকে সঙ্গে নিলে না, অথচ তোমার বয়স বাড়ছে। স্ট্রেইঞ্জ!

গত কয়েক বছর ধরে দুই ছেলে ও তাদের মা সুরঙ্গমা এই সংলাপ বলে যাচ্ছে। কুরুবিন্দ অবশ্য এ সব কর্ণপাত করেন না। পুজো সংখ্যার উপন্যাস লেখাটা ওঁর কাছে প্রতিমা নির্মাণের মতো। এই কাজে কুরুবিন্দকে আপসহীন হতেই হয়। নিজের সংযত ও পরিমিত জীবনের প্রতি ওঁর যথেষ্ট আস্থা আছে। অতএব সুরঙ্গমাকে সঙ্গে আনার কোনও প্রশ্নই নেই।

—না, হার্ট ঠিক আছে। কুরুবিন্দ যেন একটু বেশি জোর দিয়ে বললেন, এখানে এসে লাইটহাউসে না-উঠলে কি চলে!

—দ্যাটস্ রাইট। ম্যানেজার আবার হাসলেন।

মাত্র একটাকা মূল্যের টিকিট কেটে, সরু টানেলের মতো আকাশচুম্বী এই আশ্চর্য সৃষ্টির ভেতর দিয়ে খুব ধীরে-সুস্থে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে একেবারে শীর্ষবিন্দুতে উঠে এসে কুরুবিন্দ অবাক। জীবনে এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। কত নীচে সমুদ্র আর গোপালপুর। ঝুলনযাত্রার উৎসবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেভাবে রঙিন কাঠের গুঁড়োর ওপরে পুতুল আর ঘরবাড়ি সাজিয়ে রাখে, তেমনভাবে সাজানো আছে পোগালপুর অন-সি। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন কুরুবিন্দ। দমকা হাওয়া ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে লাইটহাউসের গায়ে। ওঁর মাথার পেছনে হাই পাওয়ারের আলো আর মিরর রিফ্লেক্টর। আলোগুলো দিনের আলো নিভে গেলেই জ্বলে উঠবে। আয়নাগুলো ঘুরতে ঘুরতে সেই আলো প্রতিফলিত করবে সুদূর সমুদ্রে। চলন্ত জাহাজ আর নাবিকদের সঙ্গে গড়ে তুলবে এক নিবিড় সখ্য। প্রতিটি জলযানের কাছে এই আলোর ভূমিকা অনিবার্য।

একটু একটু করে উপভোগ করছেন কুরুবিন্দ। জীবনে হয়তো দ্বিতীয়বার আর কোনও লাইটহাউসে ওঠা হবে না। অমৃতাভর কথাগুলো ক্রমশ সত্যি হয়ে আসবে, বাবা, তোমার বয়স বাড়ছে।

সবাইকে ছাড়িয়ে বাতিঘরটা এই যে প্রায় আকাশের কাছাকাছি উঠে এসেছে, এও এক ধরনের শূন্যতা। আশপাশে কেউ কোথাও নেই। আমি একা। এই নিরালম্ব শূন্যতার মাথায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর অনুষঙ্গ হঠাৎ কুরুবিন্দর মাথার ভেতরে বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলে গেল। এই উচ্চতা থেকে তিনি যদি নীচে লাফিয়ে পড়েন, কিংবা অনবধানবশত পড়ে যান, তাহলে জীবনের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকবে না। ওঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। এমন কী প্রত্যঙ্গগুলো হারিয়েও যেতে পারে। সেই বীভৎস মৃত্যুর ব্যাখ্যা হবে একটাই—আত্মহত্যা। কুরুবিন্দ মুখোপাধ্যায়

একাকিত্ব আর হতাশায় ভুগছিলেন। তাই শহরের জীবন থেকে পালিয়ে এসে এই বাতিঘরের নির্জন চূড়াটিকে বেছে নিয়েছিলেন নিজেকে নিঃসংশয়ে ধ্বংস করার জন্যে।

ভাবতে ভাবতে কুরুবিন্দ কেঁপে উঠলেন। মৃত্যু নিয়ে বিলাস করার জায়গা এটা নয়। সত্যি সত্যি মৃত্যু এখানে যে কোনও সময়ে যে কোনও মানুষকে প্রলুব্ধ করতে পারে। নিজেকে খুব কষে ধমক লাগালেন কুরুবিন্দ, কী হচ্ছে কি এ সব।

আর ঠিক তখনই লাইটহাউসের বৃত্তাকার অলিন্দের ওপাশ থেকে কে যেন ডুকরে উঠল, আমাকে তুমি একটু একা থাকতে দাও।

এখানে উঠেই গোল বারান্দাটা একবার ঘুরে নেওয়া উচিত ছিল। বাতিঘরের এই মাথার ওপরে সর্বত্রই মুগ্ধতার আবহ। প্রথমে ইটের সিঁড়ি, তারপর মইয়ের মতো লোহার সিঁড়ি দিয়ে নীচু দরজায় মাথা গলিয়ে কুরুবিন্দ অলিন্দে পা রেখেছিলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর চোখ আটকে গেছে এই আকাশ থেকে মৃত্তিকার বহুব্যাপ্ত সৌন্দর্যে। সামনে আর দু'পাশে যা আছে দেখেছেন, পিছনে তাকাননি।

কোনও মহিলার কণ্ঠস্বর এবং তিনি বাঙালি—কুরুবিন্দ চকিতে ভেবে নিলেন। ওঁর কান এই মুহূর্তে উৎকর্ণ। দুটো চোখ যেন পাখির মতো চঞ্চল হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে। দূরত্ব খুব সামান্য, একটা মাত্র বাঁক। তবু সৌজন্য ও ভদ্রতার খাতিরে কুরুবিন্দ যেতে পারছেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেও প্রবল অস্বস্তি হচ্ছে।

মুচড়ে-ওঠা কান্নাব শব্দ ওই একবারই মাত্র ভেসে এল। আবার সব চুপচাপ। আর থাকতে না পেরে কুরুবিন্দ ধীর পায়ে রেলিং ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে এলেন। ট্রাউজার্স ও বুশশার্ট পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বারান্দার মেঝেতে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে বসে আছেন এক মহিলা। সম্ভবত ওর উপস্থিতি টের পেয়ে লোকটি চকিতে ঘুরে তাকাল। ভয়ার্ত আবার একই সঙ্গে কেমন যেন নিষ্ঠুর মানুষটির মুখ। মাঝবয়সী। কয়েক সেকেন্ড পরে মহিলাও মুখ তুললেন।

কুরুবিন্দ যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। এই মহিলাকে কাল বিকেলে আর আজ সকালে বালুবেলায় একা একা হাঁটতে দেখেছেন। মাথা নীচু করে। মহিলা একবারও সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছিল না। দেখছিল না কোনও দৃশ্য। যে-দৃশ্য নিয়ত সৃষ্টি করছিল সমুদ্র, বাতাস, জেলেদের নৌকা, অগণিত ঢেউ আর সমুদ্রচর পাখি। চঞ্চল শাড়ির আঁচল শক্ত হাতে ধরে এই নারী বিষাদপ্রতিমার মতো হেঁটে যাচ্ছিল। প্রথমদিন দেখে কুরুবিন্দ অতটা আশ্চর্য হননি। বরং একটু উপেক্ষাই করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়দিন ঘাড় ঘুরিয়ে কুরুবিন্দ দেখেছেন রমণীটিকে। খুব আশ্চর্য মনে হয়েছিল। এমনও ভেবেছেন, এ কি পাগল!

সেই নারী। কুরুবিন্দ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছেন না। মহিলার চোখে জল। লাবণ্যহীন শুকনো গাল দিয়ে গড়িয়ে এসেছে। গভীর বিষণ্ণ মুখ, তবু কোথায় যেন এক ঝলক ভাল-লাগা সৌন্দর্য লগ্ন হয়ে আছে।

ভদ্রলোক একটু থমমত খেয়ে গেছেন কুরুবিন্দকে দেখে। ওঁদের দুজনের এই করুণ নিভৃত মুহূর্তে তৃতীয় কোনও মানুষ উপস্থিত হতে পারে, হয়তো উনি ভাবেননি।

কিন্তু কুরুবিন্দ কিছুতেই ভেবে পেলেন না, এই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী উচ্চতায় উঠে এসে কেন এই নারী কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় করছেন—আমাকে একা থাকতে দাও!

ভূমির স্পর্শ বহুদূরে ফেলে এসে জীবন এখানে, এই বাতিঘরের শীর্ষদেশে কী অবলীলায় খেলাঘর বাঁধছে, এবং সেই খেলাঘরে আলোর মূর্ছনা, আনন্দের রশ্মিছটা নেই। অথচ দিক্‌ভ্রষ্ট নাবিককে আলোকসম্পাতে ঋদ্ধ করার জন্যেই এই বাতিঘরের সৃষ্টি। একটু পরেই সেই আলো জ্বলে উঠবে। বিস্মিত এবং কিছুটা বা অভিভূত কুরুবিন্দ মাথা নীচু করে ঘুরে দাঁড়ালেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, এই যে দাদা, দেখুন এ কিছুতেই নীচে নামতে চাইছে না। এত উঁচুতে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছে, ভয় লাগছে। ওকে এত করে বলছি!

কুরুবিন্দকে থমকে দাঁড়াতেই হল। পুনর্বার ঘুরতে হল ওঁদের দিকে। ভদ্রলোকের দু'চোখে আর্তি। যেন কুরুবিন্দ মহিলাটিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নীচে নামাতে পারবেন।

দু'তিনবার ঢোঁক গিলে কুরুবিন্দ বললেন, উনি...

—আমার স্ত্রী। ওকে ওপরে ওঠানোই ভুল হয়েছে। যদি জানতাম...। বলতে বলতে লোকটি মহিলার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল।

এই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত কুরুবিন্দ বুঝতে পারলেন না। মহিলাটি কিন্তু তেমনই স্তূপের মতো শক্ত হয়ে বসে আছে। কোনও শারীরিক শক্তিই ওকে এতটুকু নড়াতে পারছে না। আবার এমন একটা জীবন-মৃত্যুর কিনারে ঘটনাটা ঘটছে, যেখানে ভয়ঙ্কর কোনও কাণ্ড যে কোনও মুহূর্তে...। কুরুবিন্দ আর ভাবতে পারছেন না।

মহিলা এবার সমস্ত শক্তি দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সংবিৎ ফিরে পাওয়া মানুষের মতো কুরুবিন্দ তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোকের গায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে রূঢ় গলায় বললেন, বাচ্চাদের মতো কী করছেন আপনি? ছেড়ে দিন ওঁকে।

লোকটি ফুঁসে উঠল বিকৃত গলায়, ওকে নামতেই হবে। দরকার হলে আমি ওর গায়ে হাত তুলব।

—উনি হঠাৎ যদি এখান থেকে লাফ দেন! পারবেন আপনি ঠেকাতে? কুরুবিন্দ চোয়াল শক্ত করে জিজ্ঞেস করলেন।

—সে জন্যেই তো রুমা এখানে উঠে এসেছে। আমি কি জানি না। আমাকে ও জেলে পাঠাবে। লোকটি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল।

—কিন্তু এভাবে গায়ের জোরে আপনি পারবেন না। ওঁকে ভালভাবে বোঝাতে হবে। কড়া গলায় বললেন কুরুবিন্দ।

—আর কীভাবে বোঝাব। ভদ্রলোকের স্বরে যেন নিদারুণ ধিক্কার আর হিংস্রতা, ছি ছি, আপনি ওকে সাপোর্ট করছেন! ঠিক আছে, আমি নেমে যাচ্ছি। দেখি, আপনি ওকে কী করে নামান!

কুরুবিন্দকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ক্রুদ্ধ লোকটি নীচু দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে আলোকস্তম্ভের গহ্বরে সেঁধিয়ে গেল। এতটাই দ্রুত ও চকিত পলকে যে কুরুবিন্দ কিছু বলতেই পারলেন না। অসভ্যের মতো হয়তো চেঁচানো যেত—এই যে শুনছেন,

এই যে শুনছেন! কুরুবিন্দর সেই প্রবৃত্তি হল না। বরং একটা চাপা স্বস্তি ওকে ছুঁয়ে গেল। ভদ্রলোকের দুর্দান্ত এবং অসহ্য জেদ এই মুহূর্তে একটি রক্তাক্ত মুহূর্তের জন্ম দিতে পারত। লোকটি চলে গিয়ে হয়তো ভালই হয়েছে।

রুমা নাম্নী এই রমণী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। নিজেকে খুব অসহায় লাগছে কুরুবিন্দর। সেই সঙ্গে একটা অদৃশ্য দায়বদ্ধতা ওকে যেন ক্রমশ ঘিরে ধরছে। রুমাকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া ওর জীবনের সবচেয়ে বড় এবং কঠিন ডিউটি। সময় হয়ে গেলেই এখান থেকে নেমে যেতে হবে। নীচ থেকে লাইটহাউসের কর্মীরা ঘণ্টা বাজাবেন। তাতেও কাজ না হলে ওঁরা ওপরে উঠে আসবেন। জোর করে নামিয়ে দেবেন কঠোর অনুশাসন প্রয়োগ করে। এর কোনও ব্যত্যয় হবে না। কিন্তু ওই সময়টুকুর মধ্যে কত কী ঘটে যেতে পারে। কুরুবিন্দ কেঁপে উঠলেন। তাঁর মতো প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় সাহিত্যিকের জীবনে এ এক চরম পরীক্ষা। এই পরীক্ষার কঠিন প্রশ্ন তিনি নিজেই তৈরি করেছেন। এঁদের এই অসুখী দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার কী দরকার ছিল!

অসহায় কুরুবিন্দ অনেক সঙ্কোচ আর দ্বিধা নিয়ে রুমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, শুনছেন, আমার কথা শুনুন, আপনি নীচে নেমে যান। আপনার স্বামী প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন, উনি ভয় পাচ্ছেন।

রুমা কোনও কথা বলছে না। তেমনই নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে।

—এখানে বসে থাকাটা আইনবিরুদ্ধ।এটা ঠিক নয়। আসুন, আমি আপনাকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দেব। আমার হাত ধরুন। কুরুবিন্দ বুকের মাঝখানে আন্তরিকতার উৎসমুখ খুলে যেন বললেন।

রুমা ধীরে ধীরে ফিরে তাকাল। কুরুবিন্দ হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু রুমা একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারছে না। দৃষ্টি অপলক। দুটো চোখ আবার জলে ভরে আসছে।

করতলে দ্রুত অশ্রুধারা মুছে নিয়ে রুমা ভগ্নস্বরে বলল, বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু করব না। শুধু একটু একা থাকতে চাইছি।

—কিন্তু পাঁচটার পরে তো আর এখানে কারও থাকা চলবে না। নেমে যেতেই হবে। পাঁচটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। এই দেখুন...আর মিনিট দশেক।

কুরুবিন্দ বাঁ-হাতটা এগিয়ে দিলেন। ঘড়ি দেখাব মতো মনের অবস্থা রুমার নেই। সে শরীর মুচড়ে বলল, দশ মিনিট অনেক সময়। প্লিজ, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।

স্মিত হেসে কুরুবিন্দ বললেন, আমি তো আপনাকে ধরে-বেঁধে রাখিনি। দেখুন, কতটা দূরে দাঁড়িয়ে আছি। বলতে বলতে কুরুবিন্দ ইচ্ছে করেই আরও দু'পা পিছিয়ে গেলেন।

হয়তো ওঁর এই আচরণে কোথায় কৌতুকের আভাস ছিল। তাই রুমা হাসল। তবে আলোহীন ম্লান হাসি। কিন্তু কুরুবিন্দ যেন এই রোদসী নারীর ওই হাসিটুকুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুরুবিন্দ বললেন, চলুন, সমুদ্রের ধারে বসে আমি, আপনি আর আপনার স্বামী—তিনজনে একসঙ্গে চা খাব। গল্পও করব। আপনারা

বুঝি এখানে ঘুরতে এসেছেন?

শেষ প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে রুমা হিসহিস স্বরে বলল, না, ওই লোকটাকে আমাদের সঙ্গে নেব না! ও আমাকে খুন করবে বলে এখানে নিয়ে এসেছে। অবশ্য তার আগেই আমি সুইসাইড করব।

আবার কেঁপে উঠলেন কুরুবিন্দ। তবে ওঁর মনের অবস্থাটা রুমাকে বুঝতে না দিয়ে পরম স্নেহে বললেন, বেশ তো, তাই হবে। তাহলে নীচে চলুন এবার।

অগ্নিশিখা যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে, রুমা তেমনভাবে এক ঝটকায় নিজেকে বাতিঘরের অলিন্দ থেকে তুলে নিল। কিন্তু নামার কোনও ইঙ্গিতই দিল না। রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অনড় ভঙ্গিতে।

গভীর প্রত্যাশায় কুরুবিন্দ হাসি-হাসি মুখ করে রেখেছেন। রুমার দৃষ্টি কিছুটা অস্বাভাবিক ঠিকই কিন্তু ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাবে বলে মনে হচ্ছে না। হঠাৎ রুমা বলল, জানেন, আমাকে কেউ ভালবাসে না! কেউ না, কেউ না।

মুখ দিয়ে ব্যথার ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে কুরুবিন্দ বললেন, তা কি কখনও হয়! ভালবাসা ছাড়া কেউ কি বাঁচতে পারে!

----এই তো আমি বেঁচে আছি। কিন্তু আর নয়। আর আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। সমস্ত বিতৃষ্ণা মুখের চারপাশে জড়ো করে রুমা বলল।

নিজেরই কথার জালে জড়িয়ে গেলেন কুরুবিন্দ। ভালবাসা তো জীবন নামে এক আলোকশিখার উজ্জ্বল উত্তাপ। সেই আলো যেখানে জ্বলছে না, সেখানে মরণের নিষ্করুণ অন্ধকার অনিবার্য। কুরুবিন্দ কী বলবেন ঠিক করতে পারলেন না। এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি রুমাকে মৃত্যুর কিনার থেকে ফিরিয়ে আনা। যেভাবেই হোক। আমতা আমতা করে কুরুবিন্দ বললেন, আপনার আর কী এমন বয়েস?

চোখ বড় বড় করে রুমা সকৌতুকে বলল, না না অনেক বয়েস হয়ে গেছে। সাঁইত্রিশ। থার্টি সেভেন। পরক্ষণেই রুমা অদ্ভুত স্বরে বলল, জানেন, আমি এখনও মা হতে পারিনি।

কিছু একটা আঁকড়ে ধরার মতো পেয়েছেন, এমনভাবে সাগ্রহে কুরুবিন্দ বললেন, এটাও কোনও সমস্যা নয়। এখনও আপনার মা হওয়ার বয়েস শেষ হয়ে যায়নি।

ওঁর কথা শুনে রুমা শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠল। ঠিক অট্টহাস্য নয়। কিন্তু এই হাসিতে ঝরে পড়ল তীব্র ব্যঙ্গ আর নিদারুণ বিদ্রূপ।

কুরুবিন্দ আবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। রুমা নিশ্চিত মানসিক রোগী। ওর ইনসেনিটি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখান থেকে রুমা আর ফিরে আসতে পারছে না। কোনও করুণ বিপর্যয় অথবা আঘাত এই নারীর স্বপ্নময়, আকাঙক্ষাময় জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। রুমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কষ্টে ভরে যাচ্ছে ওঁর বুকের ভেতরটা। কুরুবিন্দের কোনও গল্প বা উপন্যাসে রুমার মতো কোনও চরিত্র নেই। এঁদের এই যন্ত্রণার কথা, বুভুক্ষার কথা তিনি কোথাও বলেননি। এবারের উপন্যাস তিনি রুমাকে নিয়েই লিখবেন।

দমকে দমকে খানিকক্ষণ হেসে রুমা থেমে গেল। উদাস চোখে তাকাল সমুদ্রের দিকে, আকাশের দিকে এবং মাটির দিকে। তারপর কুরুবিন্দকে অবাক করে দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের নীচু দরজাটার সামনে এসে রুমা ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ওর বন্ধু! চেনা পরিচিত?

'ওর' মানে স্বামী ধরে নিয়ে কুরুবিন্দ জোর দিয়ে বললেন, নাঃ, না। আমি ওঁকে আজই প্রথম দেখলাম।

—আপনি কে? রুমা স্থির চোখে কুরুবিন্দের দিকে তাকাল।

নিজের পরিচয় কী দেবেন? আমি একজন লেখক—এই জাতীয় স্টেটমেন্ট এখানে সবচেয়ে হাস্যকর। ওঁর ভূমিকা এখন সেই ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষদের মতো। উদ্ধারকর্তা—সেভিয়র। সামান্য হেসে কুরুবিন্দ বললেন, আপনাদের মতোই এখানে ঘুরতে এসেছি। সকলের আমি শুভার্থী।

দু'চোখে খুশির ঝিলিক তুলে রুমা বলল, বাঃ বেশ নাম তো আপনার—শুভার্থী। জানেন, আমার ভায়ের নাম শুভায়ু। নৈহাটি নিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর।

—বাঃ, তাই নাকি! কুরুবিন্দ কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করলেন। রুমা ওঁর সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। মৃত্যুর চেতনা ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আর সেই জীবনও। না হলে ওর ভাইয়ের কথা মনে পড়বে কেন? তবে এখন রুমার ভাই কী আর কী নয় জানার চেয়েও জরুরি রুমাকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া।

দরজার উচ্চতায় মাথা নীচু করে রুমা কড়া গলায় বলল, নীচে যদি ওই লোকটা দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আমি আবার ওপরে উঠে আসব।

দুরুদুরু বুকে কুরুবিন্দ বললেন, বেশ তো, তাই হবে। এই মুহূর্তে রুমার সমস্ত পাগলামিকে বরদাস্ত করে নেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

খুব সন্তর্পণে রুমা নামছে। ঝরোখা দিয়ে ঢুকে আসা বিকেলের আলোয় লাইটহাউসের বুকের ভেতরটা রুপোলি উজ্জ্বলতায় ভারি কমনীয় হয়ে উঠেছে। সোপানশ্রেণী এতটাই সরু যে দু'জন পাশাপাশি যাওয়া অসম্ভব এবং বাতুলতা। তা সত্ত্বেও কুরুবিন্দর ইচ্ছে করছে রুমার হাত ছুঁতে। ওর দুঃখী করকমলের অন্তত একটি পাপড়ি নিজের হাতের মুঠোয় নিতে। এমন তাপদগ্ধ না-হলে রুমার দেহপ্রতিমা আর মুখশ্রী কুরুবিন্দকে নিশ্চিত অবশ করে দিত। যদি সত্যি সত্যি ওর বয়স সাঁইত্রিশ হয়, তাহলে বলতেই হবে বয়সের তুলনায় রুমা অনেক বেশি যুবতী। মানসিক দিক থেকে সুস্থ থাকলে রুমা মাকড়সার মতো রূপের জাল ছড়িয়ে দিতে পারত। নামতে নামতে কুরুবিন্দ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

লাইটহাউসের পাঁচিল-ঘেরা চত্বরে পা দিয়েই কুরুবিন্দের মনে হল, পৃথিবীর সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস নাটকের যবনিকা পড়ল এক মধুময় পরিসমাপ্তিতে। তিনি রুমাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। একটু আগে জীবনের শেকড় উপড়ে ফেলে যে মরতে চেয়েছিল, তাকে আবার মাটির বুকে ফিরিয়ে এনেছেন। চারদিকে এক ঝলক তাকিয়ে কুরুবিন্দ দেখলেন রুমার হাজব্যান্ড কোথাও দাঁড়িয়ে আছে কিনা। কুরুবিন্দ চারপাশটা ভাল করে দেখলেন। বাঁ-হাতি সার সার স্টাফ কোয়ার্টার। লোকটি ওইসব আবাসের

পেছনে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই তো! কুরুবিন্দ ঠিক স্বস্তি পাচ্ছেন না। রুমার অবশ্য কোনও বিকার নেই। অচঞ্চল ধীর পায়ে ও লোহার গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কী ভেবে কুরুবিন্দ ডাকলেন, আপনি কি হোটেলে ফিরে যাচ্ছেন?

রুমা থমকে দাঁড়াল। তারপর সামান্য ঘুরে মরা চোখে বলল, আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

—তাহলে চলুন না, সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে একটু বসি। দেখবেন, মন ভাল হয়ে যাবে। মৃদু ভয় আর দ্বিধায় বললেন কুরুবিন্দ। রুমাকে চলে যেতে দিলেই হয়তো ভাল হত। কী হবে এই অর্ধোন্মাদিনীর শুশ্রূষার ভার নিজের কাঁধে নিয়ে! ওকে এই বিপজ্জনক উচ্চতা থেকে নামিয়ে আনতে পেরেছেন কুরুবিন্দ। এটাই তো যথেষ্ট! জীবন-মৃত্যুর সরু দড়ির উপর ঝুলছিল এই নারী। এই একটু আগে।

—ঠিক আছে চলুন। ফিকে হাসল রুমা।

সমুদ্রতটের দক্ষিণ দিকটা উত্তরের চেয়ে বেশি নির্জন। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। দিনের আলো দ্রুত ম্লান হয়ে আসছে। উত্তরতটে ফেরিওয়ালা, ট্যুরিস্ট এবং স্থানীয় মানুষদের ছোটখাটো মেলা। কিছুক্ষণ এই ভিড়টা থাকবে। হয়তো ঘণ্টা তিনেক। তারপর গোপালপুর শুনশান।

গ্র্যান্ড হোটেলের সী-সাইড গেটটা পেরিয়ে আর একটু হেঁটে এসে কুরুবিন্দ রুমাকে বললেন, এখানে বসবেন?

রুমা কেবল মাথা নাড়ল। তারপর বসে পড়ল ধপ করে। প্রায় হাত তিনেক দূরত্ব রেখে একটু কোনাকুনি বসলেন কুরুবিন্দ। বালি খুঁড়ে ক্রমাগত বেরোতে থাকা ছোট ছোট সামুদ্রিক কাঁকড়া ছাড়া এখানে আর কেউ বিরক্ত করবে না। রুমা স্থির, ধ্যাননিমগ্না পার্বতীর মতো। দৃষ্টি নির্নিমেষ। শরীরটা ঈষৎ বেঁকে আছে।

লেখক কুরুবিন্দের খুব ইচ্ছে করছে রুমার জীবনপঞ্জি জানতে। ওর নামটুকু ছাড়া আর সবটাই যেন রহস্যে মোড়া। এই মুহূর্তে ওঁর কল্পনা, একজন স্রষ্টার বিনির্মাণ প্রক্রিয়া—কিছুই যেন কাজ করছে না। কুরুবিন্দের কেবলই মনে হচ্ছে, রুমার জীবনকাহিনী জানতে না-পারলে কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাবে। অথচ এই স্তব্ধতা ভেঙে ফেলা নিষ্ঠুরতা। দুরন্ত চঞ্চল সমুদ্রহিল্লোলের পাশে রুমার এই নিস্পন্দ, অকম্পিত মূর্তি এক অপূর্ব কনট্রাস্ট।

যেন ঝুপ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। সন্ধ্যালগ্ন অতিক্রম করে আজকের এই আশ্চর্য দিনটা রাত্রির সিংহদ্বারের দিকে চলে যাচ্ছে। বারিধি-দিগন্ত থেকে উঠে আসছে চাঁদ। এখন কি শুক্লপক্ষ? কুরুবিন্দ অবাক হয়ে দেখছেন, কি পূর্ণ চন্দ্রমা! ঢেউয়ের বুকে খেলা শুরু করে দিয়েছে জ্যোৎস্না-বালিকারা! কুরুবিন্দ চোখ ফেরাতে পারছেন না।

প্রকৃতির এই রূপবিভঙ্গ কি রুমার ভেতরে কোনও আসক্তির জন্ম দিচ্ছে না? বেঁচে থাকার আসক্তি, আগামীকাল প্রত্যুষে নতুন সূর্যোদয় দেখার আসক্তি! ভালবাসার জন্যে, মাতৃত্বের জন্যে ওর অন্তরে যে-শূন্যতা জন্ম নিয়েছে, তা কি আরও বেড়ে যাবে? কুরুবিন্দ বুঝতে পারছেন না। ওকে কোনও সান্ত্বনা দেওয়াও বাতুলতা। খুব

বেশি হলে কুরুবিন্দ ভালবাসার অভিনয় করতে পারেন। ওর কাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব সম্পর্কে শোনাতে পারেন কিছু আশার বাণী। তার মানে, কাগজে-কলমে তিনি যেসব প্রেমের গল্প, ভালবাসার গল্প লেখেন, তার থেকে জীবন কি এতটাই দূরে অবস্থিত! রুমা হয়তো পাগল নয়, বহু নিষ্ঠুর প্রহার ওকে এমন অস্বাভাবিক করে দিয়েছে। রুমার জীবনটাকে এইভাবে নষ্ট করে দেওয়ার দায় পরিপার্শ্বের।

কুরুবিন্দের বুক ভারী হয়ে আসছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে, আত্মহত্যার তীব্র প্রবণতা থেকে রুমাকে ফিরিয়ে এনে তিনি আত্মতৃপ্তির যে-উত্তাপ অনুভব করছিলেন, তা অতিদ্রুত হিম হয়ে যাচ্ছে। কুরুবিন্দের মনে হল, রুমার এই যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের জন্যে তিনিও দায়ী।

বেশ খানিকক্ষণ পরে রুমা করুণস্বরে, যেন স্বগতোক্তির মতো বলল, আগামীকাল পূর্ণিমা, তাই না!

—হ্যাঁ, মনে তো হচ্ছে! নিজের ভেতরে রুমা নিজে জেগে উঠছে দেখে কুরুবিন্দ ভারি আগ্রহে বললেন, এমন নিটোল চাঁদ বহুদিন দেখিনি।

—কাল আমার জন্মদিন। রুমা তেমনই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে কুরুবিন্দ ওঁর বুকের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা সাদা পাতায় লিখে নিলেন চারটি শব্দ : আগামীকাল পূর্ণিমা। রুমার জন্মদিন।

এই প্রথম, কুরুবিন্দর পুজোর উপন্যাসের প্রথম পঙ্‌ক্তি জন্ম নিল কল্পনার মায়াবী বিভ্রমে নয়, এক নারীর জীবনস্পন্দনে।

আগ্নেয়গিরি

অনেকক্ষণ আগে চলে গেছেন ভদ্রমহিলা। অদ্ভুত শান্ত ধীর। খয়েরি রঙের সরু মেটাল ফ্রেমের চশমার ওপারে দুটো চোখ যেন হিমায়িত। মাখনরঙের আটপৌরে শাড়ি। দেহের কোথাও কোনও সোনা নেই - না হাতে, না কানে, না গলায়। কেবল বাঁ-হাতে একটা লোহার রুলি। ডান হাতে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া রিস্টওয়াচ। সিঁথিতে সিঁদুরের আভাসও যেন ছিল। রৌদ্রদগ্ধ ফরসা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাইরে থেকে দেখে সঙ্কর্ষণ বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেনি বুকের মধ্যে কোন অগ্নিশিখা বয়ে বেড়াচ্ছেন ভদ্রমহিলা।

ফোনের রিসিভারটা অকারণে তুলে ক্রাডলে নামিয়ে রেখে সঙ্কর্ষণ নিজেকেই প্রশ্ন করল, এ কোন আগুন? মাটির প্রদীপের নিষ্কম্প শিখা। হতেই পারে। অথচ তার দাহিকা শক্তি ফার্নেসের আগুনের মতোই বিধ্বংসী।

ওর টেবিলের ওপর সেই কাগজটা পড়ে আছে। হ্যান্ডবিলের মতন একটুকরো। কাগজের মাঝখানে, একটু ওপরের দিকে ছোট্ট ছেলেটির একটা ছবি। পাশপোর্ট সাইজের চেয়ে একটু বড়। সস্তা মুদ্রণের ফলে ছবিটার মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেছে। বাচ্চাটির মুখের আদল কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এই নষ্ট ছবিটির চেয়েও এলোমেলো, কাগজে মুদ্রিত এই বক্তব্যটি। সঙ্কর্ষণ আবার পড়ল :

> ওপরের ছবিটি আমার একমাত্র ছেলে শ্রীমান দেবব্রতর। ডাকনাম রিম্পু। ন বছর আগে শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের সামনে থেকে দেবব্রত নিখোঁজ হয়ে যায়। তখন ওর বয়স ছিল দশ বছর দু মাস। ক্লাস ফাইভের ছাত্র। স্কুল ছুটির পরে বাড়ি ফিরছিল। আমরা তখন শ্যামপুকুর স্ট্রিটে থাকতাম।
>
> দেবব্রত হারিয়ে যাওয়ার পর আমি অনেক খুঁজেছি। ওকে কোথাও পাইনি। পুলিশ জানে ও কোথায় আছে। কিন্তু আমাকে বলবে না। এর পেছনে পুলিশের কী স্বার্থ আছে তা আমি জানি। পুলিশ নিজেকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বহু মায়ের বুকের ভেতরে এইভাবে গর্ত তৈরি করেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলছে, চলবে।
>
> দেবব্রতর সঙ্গে আপনাদের কোথাও-না-কোথাও দেখা হয়ে যেতে পারে। ওর বয়স এখন উনিশ বছর। কাঁচা যুবক। ওই ছবি দেখেই ওকে চিনতে পারবেন। তখন ওকে বলবেন, রিম্পু, তোর দুখিনী মা তোর জন্য পায়েস রান্না করে অপেক্ষা করে আছে। তুই পায়েস খেতে ভালবাসতিস। মাকে আর কেন চোখের জল ফেলাচ্ছিস। রিম্পু, বাড়ি ফিরে যা। তোর মা এখন

নীচের ঠিকানায় থাকে।

মাননীয় জনগণ, পুলিশকে আপনারা ছাড়বেন না। তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। দেবব্রতকে যারা সরিয়ে দিয়েছে, তাদের বুকের রক্ত দিয়ে মা কালীর পুজো দিন। একজন অসাহায়া মায়ের এই প্রার্থনা।

শ্রীমতী চিত্রা হালদার

৫৫/২/এ, তারাতলা...ইত্যাদি।

মৃদু হেসে সঙ্কর্ষণ লিফলেটটা পেপারওয়েটের তলায় রেখে দিল। যে-কেউ এটা পড়ে বলবে, ভদ্রমহিলার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনও মানুষ হারিয়ে যাওয়ার পর, পুলিশের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই সেই ব্যাপারে একটা সংযোগ গড়ে ওঠে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পুলিশই ঘটনাটা ঘটিয়েছে কিংবা নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির হদিস জানা সত্ত্বেও পুলিশ বলবে না। ইলোপ করে দেওয়া ঘটনার সঙ্গে পুলিশ মাঝেমধ্যে জড়িয়ে পড়ে ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা অভাবনীয়। দশ বছরের একটি নিরপরাধ স্কুলপড়ুয়া ছেলের সঙ্গে পুলিশের কী সম্পর্ক! তবু ভদ্রমহিলা এইসব লিখে কেন ছাপিয়েছেন, সঙ্কর্ষণের কাছে পরিষ্কার নয়। ও একটু আগে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এটা কি আপনার লেখা? আই মিন, আপনি লিখেছেন...

ভদ্রমহিলা প্রথমে স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিলেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলেছেন, এটা আমার বক্তব্য, ইনজাস্টিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

সঙ্কর্ষণ ওর প্রশ্নের উত্তর পায়নি। হয়তো কেউ ওকে এসব লিখে দিয়েছে। পাড়ার কোনও ছেলে অথবা রাজনৈতিক দলের কর্মী। তারপর সস্তা কাগজে কোনও আধমরা প্রেস থেকে ছাপিয়ে দিয়েছে। সঙ্কর্ষণ কাগজটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিল। হয়তো কুঁচকে গেছিল ওর মুখের চামড়া, ভুরু। ভদ্রমহিলা হঠাৎ লিফলেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওখানে কি কোনও বাজে কথা লেখা আছে?

চোখ তুলে সঙ্কর্ষণ মহিলাকে দেখেছিল, ঠোঁট চেপে, চোয়াল শক্ত করে। চিত্রা হালদার ব্যগ্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। সঙ্কর্ষণ অবশ্য কোনও জবাব দেয়নি।

—আমি কিন্তু আপনার কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছি। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন। স্মিত হেসে সঙ্কর্ষণ আলতো স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার কাছে আপনাকে কে আসতে বললেন।

—কেউ বলেনি। কাগজে আপনার সংস্থার বিজ্ঞাপন দেখলাম। খুঁজে খুঁজে চলে এলাম। এর মাঝখানে আর কেউ নেই। রিম্পুর ব্যাপারে আমি যা করি সব একা। কারও সাহায্য নিই না। সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন ভদ্রমহিলা।

—এই তো আমার সাহায্য নিতে এসেছেন। শব্দ করে হেসে সঙ্কর্ষণ বলেছে, সব কাজ কি আর একা করা যায়।

চিত্রা হালদার সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে লজ্জা প্রকাশ করেছেন। সঙ্কর্ষণ কপালে ভাঁজ ফেলে মনে মনে বলেছিল, কেসটা খুব জটিল। আমার সংস্থা এ বিষয়ে কতটা এগোতে পারবে কে জানে। সঙ্কর্ষণের সংস্থার নাম লিগাল এইড কনসার্ন ফর হিউম্যান রাইটস রিকভারি। কয়েকজন উকিল বন্ধুর সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই ছোট্ট ফিলানথ্রফিক

সংস্থাটি দু'বছর আগে সঙ্কর্ষণ চালু করেছে। ও নিজেও একজন ব্যস্ত ল-ইয়ার। তবু সপ্তাহের অন্তত দুটো দিন—শনি এবং রবিবার নিজের বাড়ির চেম্বারে সংস্থার অফিস বসায়। ওর দু'-তিনজন বন্ধুবান্ধব আসে ওকে কাজে সহায়তা করার জন্য। আসে সাহায্যপ্রার্থী, পীড়িত যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষজন। এখনও এই সংস্থার প্রচার তেমনভাবে হয়নি। তাই অর্থী মানুষের সংখ্যা কম। তবে ওর বন্ধুদের ধারণা আর বছরখানেকের মধ্যেই সঙ্কর্ষণের চেম্বার ছেড়ে নতুন অফিস তৈরি করতে হবে, পুরো সময়ের জন্য রাখতে হবে অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, টাইপিস্ট, ক্লার্ক, বেয়ারা। দিন দিন মানুষের দিশেহারা অবস্থা বাড়ছে বই কমছে না। এইসব সংস্থা এখন ভুক্তভোগী মানুষজনের কাছে লাইফবোটের মতো। একটুখানি আশার আলো, একটুখানি আশ্রয়ের জন্যে অত্যাচারিত মানুষেরা চতুর্দিকে ছুটে মরছে। এদিক থেকে এই সংস্থার কাজের পরিধি হয়তো আরও বিস্তৃত হবে। সঙ্কর্ষণ নিজে অবশ্য এতদূর ভাবে না। আজ সকালে চেম্বার খুলে ও আধঘণ্টা একা বসেছিল। কোনও সাহায্যপ্রার্থীই আসেননি। ওর বন্ধুরা অবশ্য একটু বেলার দিকে আসে। চিত্রা হালদার আসার পর আর এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তবে তিনি এই সংস্থা সম্পর্কে কিছু কোয়্যারি করেই চলে গেছেন। এখন অনেকেই আসে ঔৎসুক্যবশত।

স্বল্প লজ্জাতেও ভদ্রমহিলার ফরসা মুখ একটু লাল হয়ে গেছিল। ওঁর লজ্জারুণা মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে সঙ্কর্ষণ বলেছিল, আমাকে একটা ব্যাপার জানতে হবে, জিজ্ঞেস করতে পারি!

—কী বলুন? চিত্রা হালদার সোজা হয়ে বসেছিলেন।

—আপনার হাজব্যান্ড কি তাঁর ছেলের ব্যাপারে...মানে আমি বলতে চাইছি, তাঁর এফোর্ট...

—স্বামীর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

—সম্পর্ক নেই! সঙ্কর্ষণ বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়েও সংযত গলায় বলেছে, ডিভোর্স হয়ে গেছে কি?

—না। ভদ্রমহিলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলেছিলেন। ওঁর গলায় কোনও কাঁপন ছিল না। মুখ তেমনই শান্ত। দৃষ্টি স্থির।

সেই মুহূর্তে সঙ্কর্ষণ আর সংযম রক্ষা করতে পারেনি। ভুরু তুলে বলেছিল, তার মানে? ঠিক বুঝতে পারলাম না তো!

চিত্রা হালদার যেন ঝড়ের বেগে মুখ ঘুরিয়েছিলেন। একুট রুক্ষস্বরে বলেছিলেন, আপনাকে বোঝাতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। সেসব শোনার মতো সময় ও ধৈর্য কারও নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, রিম্পু হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে ওর আর আমার মাঝখানে দূরত্ব বাড়তেই থাকে। আর আমরা কাছাকাছি আসতে পারিনি।

টেবিলের ওপর ডটপেনটাকে আস্তে আস্তে ঠুকে সঙ্কর্ষণ দু'মিনিট চুপচাপ ভেবেছে। একটা স্তব্ধতার প্রবাহ সারা ঘর জুড়ে খেলা করছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করার মতো সঙ্কর্ষণ জিজ্ঞেস করেছিল, আপনারা স্বেচ্ছায় এই সেপারেশন মেনে নিয়েছেন। ছেলের

ব্যাপারটা নিয়ে...
যে-উদ্দেশ্য নিয়ে চিত্রা হালদার ওর সংস্থায় এসেছিলেন, সেটা একটু একটু করে অন্য দিকে সরে যাচ্ছিল। এ বিষয়ে ভদ্রমহিলা হয়তো খুব সচেতন ছিলেন। তাই ওঁর ব্যক্তিগত জীবনের আর কোনও পৃষ্ঠাই সঙ্কর্ষণকে দেখার সুযোগ করে দেননি। সঙ্কর্ষণের মুখের কথাকে কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, ব্যাপারটা আমি একাই দেখব। আপনি মা হলে বুঝতেন যন্ত্রণাটা কোথায়! যাই হোক, রিম্পুকে কি আবার ফিরে পাব? সন্তানের প্রতি আমার যে অধিকার, মায়ের অধিকার, তা কি আপনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন! আবারও বলছি, আমি অনেক আশা করে এসেছিলাম।
কথা বলতে বলতে মহিলা উঠে পড়েছিলেন। সঙ্কর্ষণ আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলেছিল, আমরা চেষ্টা করব। কিন্তু ঘটনাটা এত পুরনো! সূত্রটুত্রগুলো এতদিনে নড়বড়ে হয়ে গেছে।
—জানি। করুণ হেসে চিত্রা বলেছিলেন, আমার কাছে কিন্তু কিচ্ছু পুরনো হয়নি। দিনের আলোর মতো জ্বলজ্বল করছে সব কিছু।
—অস্বীকার করছি না। কিন্তু আইনের পথ ধরে আমরা কতটা এগোতে পারব সেটা আমার কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয়।
—তবু দেখবেন। চিত্রা হতাশা লুকিয়ে বলেছিলেন।
—পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এতদিনে যা পারেনি, আমাদের পক্ষে সেটা আদৌ সম্ভব হবে কি! সঙ্কর্ষণ ঠোঁট উল্টে সন্দিগ্ধচিত্ত মানুষের মতো মাথা নেড়েছিল!
—পুলিশ কোনও চেষ্টাই করেনি। কেন করেনি জানেন? চিত্রা বিস্ফারিত চোখে ওর টেবিলের ওপরে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল।
—কেন? সঙ্কর্ষণ আগ্রহ দেখিয়েছিল।
যেন কোনও পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে গেছে এমনভাবে কেঁপে উঠে নিজেকে সোজা করে চিত্রা বলেছিলেন, রিম্পুকে ওরা মেরে ফেলতে পারেনি। আমি নিশ্চিত ও বেঁচে আছে। আমি বুকের মধ্যে সবসময় ওর ডাক শুনতে পাই। বিশ্বাস করুন।
কিছু অবাস্তব প্রসঙ্গ টেনে এনে চিত্রা হালদার পুলিশের ওপর ওঁর ঘৃণা-ক্রোধ-অবিশ্বাসের কারণগুলো বলতে গিয়েও সরে গেছিলেন।
সঙ্কর্ষণ আর থাকতে না-পেরে জিজ্ঞেস করল, একটা কথা বলব মিসেস হালদার! পুলিশের ওপর আপনার এত রাগ কেন?
—রাগ নয়, বলুন ঘেন্না, ঘেন্না! চিত্রা শরীর মুচড়ে একদলা থুথু ফেলার মতো বলেছিলেন।
—ঠিক আছে, ঘেন্না। কিন্তু কেন?
—সেটা ওই কাগজেই বলেছি। নতুন কিছু বলার নেই।
—কিন্তু কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে আপনার ছেলের ব্যাপারে পুলিশ সব জানে? দেবব্রতকে লুকিয়ে রেখে পুলিশের কী লাভ?
—সেটা ওরাই বলতে পারবে। কাজটায় হাত দিলে আপনিও অবশ্য বুঝতে পারবেন।

চিত্রা হালদার দরজার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, আজ আসছি। আপনাকে অনেকক্ষণ ডিস্টার্ব করলাম। কিছু মনে করবেন না।

নমস্কার করার মতো ভঙ্গিতে অর্ধেক হাত তুলে চিত্রা আবার বলেছিলেন, আসলে আমি এর একটা শেষ দেখতে চাই। সব কিছুরই তো একটা এন্ড আছে, তাই না! রিম্পুর সঙ্গে আমার দেখা হবেই। আমি এক মুহূর্তের জন্যও চেষ্টা ছাড়িনি। আমি লড়াই চালিয়ে যাব। হয়তো আমাকে পাগল ভাবছেন। হ্যাঁ, ছেলের জন্য তো আমি পাগল হয়ে গেছিই। এ কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু আমার বুকের ভেতরটা যদি একবার আপনাকে দেখাতে পারতাম! আচ্ছা, আসি।

বিষণ্ণ হাসিতে এ ঘরের আবহকে আরও ভারী করে দিয়ে ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ আগে চলে গেছেন। অথচ একটা অদৃশ্য উত্তাপ অনুভব করছে সঙ্কর্ষণ।

পরিতোষ লিফলেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখে বলল, দু'বছর পরে মহিলা আরও ইনসেনট্রিক হয়ে যাবেন। সিওর। একটা বেসলেস বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে উনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এতগুলো বছর! ভাবা যায়!

একমনে নীলাদ্রি সিগারেট তৈরি করছিল। চোখ না-তুলে চাপা শব্দ করল, উঁহু উঁহু। তারপর সিগারেটের পাতলা ফিনফিনে কাগজ ঠোঁটের জলে ভিজিয়ে পরিতোষকে বলল, কিস্‌সু হবে না। মহিলা যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। কিছু হওয়ার হলে এতদিনেই হয়ে যেত। ম্যাডনেস তো আর সময়ের হিসেব-নিকেশ করে আসে না।

—আসলে ভদ্রমহিলা টেরিবলি শকড। সঙ্কর্ষণ বলল।

—কারেক্ট! নীলাদ্রি খুশি হয়ে দ্রুত হাতে সিগারেট ধরিয়ে বলল, মোদ্দা কথা হল, হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে এখনও পর্যন্ত খুঁজে না পাওয়ার যন্ত্রণা। ভদ্রমহিলা সেই পেইন এখানে ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই পারে না। বাট হার ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইনকোহেরেন্ট অ্যান্ড ইনএলিগ্যান্ট। এটা অস্বীকার করছি না।

নীলাদ্রি ও পরিতোষ—দু'জনেই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী এবং সঙ্কর্ষণের এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। বন্ধুর স্বপ্ন, আদর্শ আর প্রয়াসের অংশীদার। চিত্রা হালদার যে-রবিবার এসেছিলেন, ঠিক তার পরের শনিবার ওরা বিষয়টাকে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। কোথাও কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না, তবু নিবিড় অন্ধকারে হেঁটে চলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো রিম্পুর নিরুদ্দেশ যাত্রার কেসটা ওরা বিবেচনা করতে বসেছে। একটু আগে পরিতোষ বলছিল, জানিস সঙ্কর্ষণ, আরও অনেক তথ্য জানতে হবে; তুই জিজ্ঞেস করে নিলে পারতিস।

—আরে, ভদ্রমহিলা আসল কথার কোনও উত্তরই দিচ্ছিলেন না। বারংবার এড়িয়ে গেছেন। সঙ্কর্ষণ মৃদু বিরক্তি ঝরিয়ে বলেছে।

—তবু, এইগুলো জানতেই হবে। যেমন এই ভদ্রমহিলা কবে এবং কেন ডিপ সাউথ এরিয়ায় চলে গেলেন শ্যামপুকুর ছেড়ে? দুই, উনি বর্তমানে কী করেন? আই মিন, অকুপেশন। তিন, খুঁজতে খুঁজতে রিম্পুর মতো দেখতে কাউকে ওঁর রিম্পু বলে সন্দেহ

হয়েছে কি না। চার, পুলিশের প্রতি ওঁর এই রাগ, অবিশ্বাস কেন? পাঁচ, এই এতগুলো বছরে কেউ কি রিম্পুর খবর নিয়ে ওঁর কাছে এসেছিল? সে কী বলেছিল? আরও অনেক জিজ্ঞাস্য আছে। তবে একেবারে প্রথমে এইগুলো জানা জরুরি।
জানতে না-পারার ব্যর্থতা সঙ্কর্ষণ নীরবে স্বীকার করে নিয়েছে। ও নিজে অবশ্য স্তূপাকৃতি তথ্যের চেয়ে সরাসরি কাজ শুরু করে দিতে বেশি আগ্রহী। সঙ্কর্ষণ হেসে বলল, ভদ্রমহিলাকে সামনাসামনি দেখলে পরিতোষের অবশ্য অন্যরকম ধারণা হত।
—দারুণ দেখতে। নীলাদ্রি চোখ টিপে রহস্য করল।
—না, তা ঠিক নয়। শোকে-তাপে দেহের লাবণ্য সব নষ্ট হয়ে গেছে। তবু কী অসম্ভব ধীর-স্থির। চোখদুটো বরফের মতো। ওঁর চোখে কোনও আবেদন বা মেয়েলি ঝিলিক নেই। অদ্ভুত! ভদ্রমহিলা বুকের মধ্যে অদৃশ্য আগুন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। সঙ্কর্ষণ একটু হাসল।
—চিত্রা হালদারের বয়স কত? লিফলেটটা আবার মুখের সামনে তুলে পরিতোষ হাই তুলে জিজ্ঞেস করল।
—চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। অন্য কোনও চিন্তায় মগ্ন হতে সঙ্কর্ষণ বলল।
নীলাদ্রি একটু খোঁচা দিয়ে পরিতোষকে বলল, তুই কি ক্লান্ত হয়ে পড়লি নাকি?
—কই, না তো! পরিতোষও কিছু একটা ভাবছিল। নীলাদ্রির ইয়ার্কিতে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না।
সংক্রামকের মতো চিন্তামগ্নতা অবশ করে দিল ওদের তিনজনকেই। হঠাৎই। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। পরিতোষ সিগারেট ধরালো। লাইটারটা টেবিলের ওপর শব্দ করে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এই কেসটা এনটারটেইড করা হয়তো ঠিক হবে না। ভদ্রমহিলাকে আইনি সাহায্য আমরা কীসের ভিত্তিতে দেব! প্রতিদিন কেউ-না-কেউ হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের অনেককেই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এটা তো কোনও...
পরিতোষের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল সঙ্কর্ষণ।
—ইস্যু হতে পারে না। ঢোক গিলে পরিতোষ বলল, বাকি থাকল পুলিশ। ভদ্রমহিলার কথার ওপর, স্রেফ কথার ওপর ভিত্তি করে পুলিশের বিরুদ্ধে কোর্টে যাওয়া যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এভিডেন্স, পাথুরে প্রমাণের অভাব। এই ব্যাপারে পুলিশ কোনও পার্টি নয়। আমি ডেফিনিট, এটা ভদ্রমহিলার বিকার। পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়।
রহস্যের জট ছাড়ানোর দায়িত্ব কি আমরা নিতে পারি না—এ কথা বলতে গিয়েও সঙ্কর্ষণ থেমে গেল। এটা ঠিক, ওদের সংস্থার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য তা নয়। অবশ্যই নয়। কোনও অনুসন্ধানী সংস্থা কাজটা স্বচ্ছন্দে করতে পারবে। কিন্তু যিনি দীর্ঘদিন লড়াই করছেন, অতলান্ত আশা করে আছেন তাঁর ছেলে একদিন ফিরে আসবে, তাঁকে ও এককথায় কীভাবে ফিরিয়ে দেবে! সেটা কখনও সম্ভব! হয়তো এক পা-ও এগনো যাবে না। ন'বছর আগের বিন্দুতে স্থির থাকতে হবে। তবু...। সঙ্কর্ষণ ধীর

গলায় বলল, তা হলে কি মিসেস হালদারের মুখের ওপর আমরা দরজা বন্ধ করে দেব?
চশমাটাকে নাকের ওপর ঠিক করে বসিয়ে পরিতোষ বলল, না, আমি কিন্তু তা বলতে চাইছি না। আসলে, আমরা কোনখান থেকে শুরু করব?
—রাইট। নীলাদ্রি নড়েচড়ে বসে বলল, এই কেসটার ক্ষেত্রে এটাও একটা প্রবলেম। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আবার কথা বলা দরকার। সঙ্কর্ষণ, তুই ওঁকে একটা চিঠি দিয়ে আবার ডেকে আন। আমরাও পুরো ঘটনাটা শুনি। যদি মনে হয়, পুলিশের গাফিলতিতে মহিলা ওঁর হারানো ছেলেকে খুঁজে পাননি, তা হলে অন্তত একটা পা রাখার জায়গা পাওয়া যাবে।
সঙ্কর্ষণ যেন এই কথাটাই বলতে চাইছিল। কুসুম-কুসুম রঙের ভোরের সূর্য দেখতে পাওয়ার আনন্দে মানুষ যেমন অভিভূত হয়ে যায়, তেমনভাবে সঙ্কর্ষণ বলল, নীলাদ্রি, তুই ঠিক বলেছিস। চিত্রা হালদার আর একবার আসুন। আমরা সবাই মিলে ওঁর কথা শুনব। আমি আজই ওঁকে চিঠি দেব। দেখাই যাক না। একটু অড-চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ক্ষতি কী? এই লিফলেটটা তো আর পাগলের প্রলাপ নয়। কিছু সত্য তো আছেই। ভদ্রমহিলাকে দেখলেই বোঝা যায়।
পরিতোষের মুখে কোনও ভাবান্তর হল না। অযথা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী রে সঙ্কর্ষণ, এখনও চা দিতে বললি না। সেই কখন এসেছি।
লজ্জা পেয়ে সঙ্কর্ষণ বেল বাজিয়ে বলল, দেখেছিস, একদম ভুলে গেছি। আসলে এই কেসটা এমন অদ্ভুত। ভদ্রমহিলা কেমন যেন ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। কথা বলতে বলতে সঙ্কর্ষণ উঠে পড়ল। কিছু একটা মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বলল, আমি একটু ভেতর থেকে আসছি। দু'মিনিট। একটু বোস!
বাড়ির ভেতরে যাওয়ার দরজা দিয়ে সঙ্কর্ষণ অদৃশ্য হয়ে যেতেই পরিতোষ বলল, এসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে ও ব্যাটা এমন সিরিয়াসলি মাথা ঘামায় কেন, কে জানে! নীলাদ্রি, তোর কি মনে হয় আদৌ ব্যাপারটা অ্যাকসেপটেবল! মহিলা যে মাথার ব্যারামে ভুগছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে!
নীলাদ্রি হেসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল এই মুহূর্তে। এক বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। পেছনে একজন বিবাহিতা যুবতী। ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি একটু আগে মুছে যাওয়া হাসিটা ফিরিয়ে এনে বলল, আসুন বসুন। এটাই লিগাল এইড কনসার্নের অফিস। বলুন, কী সাহায্য করতে পারি!

শ্যামপুকুর থানার ওসি মনোযোগ দিয়ে সব শুনে মৃদু হেসে সঙ্কর্ষণকে বললেন, কই দেখি, লিফলেটটা!
সঙ্কর্ষণ ওর ব্যাগ থেকে কাগজটা সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিল না। বরং চাপা অস্বস্তিতে বলল, আপনি এ বিষয়ে কিছুই কখনও শোনেননি!
—আমি এক বছর হল এখানে এসেছি। অথচ ব্যাপারটা তো ন'বছর আগে ঘটেছে

বলছেন। ওসি গলার স্বর গম্ভীর করে বললেন।

—না, মানে, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ভদ্রমহিলার জেহাদ পুলিশের বিরুদ্ধে, অথচ পুলিশই কিছু জানে না। আপনার থানার এস আই মিঃ বর্মনও বলছিলেন, আগে শোনেননি।

—হতেই পারে। দেখি কাগজটা। ওসি হাত বাড়ালেন।

এবার সঙ্কর্ষণকে দিতেই হল। তবে এটা লিফলেটটার জেরক্স। পুনরায় জেরক্সের ফলে রিম্পুর ছবিটা কালো রঙের চৌখুপি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। তবে জেরক্সের ভাল কাগজে লেখাগুলো আরও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

খুব দ্রুত চোখ বুলিয়েই ওসি হো হো করে হেসে উঠলেন। যেন পৃথিবীর সবচেয়ে হাস্যকর কোনও বস্তু ওঁর হাতে ধরা আছে। ভদ্রলোকের অট্টহাস্যের ব্যাপ্তি সঙ্কর্ষণকে যেন জোরে ধাক্কা মেরে গেল। অপ্রস্তুত ভাবটা যথাসম্ভব গোপন করে ও বলল, ভদ্রমহিলার বক্তব্য কিছুটা ইরেলিভেন্ট। সেটা ঠিক। হাসি পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তবে ওঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, উনি ইনসেন নন।

ওসি ভদ্রলোক সঙ্কর্ষণের কথাগুলো শুনেও শুনলেন না। কাগজটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চোখ সরু করে বললেন, পুলিশের বিরুদ্ধে কত লোকের কত রকমের নালিশ দেখেছেন। অথচ পুলিশকে না হলে এক পা-ও চলে না। মিস্টার চৌধুরী, আমাদের রক্তে মা কালীর পুজো ঠিক ঠিক হবে তো! হাঃ হাঃ! যত্তসব এঁদো গল্প। ছেঁদো কারবার!

ভদ্রলোক ঠাট্টা করছেন. সেইসঙ্গে একটা চাপা রাগ প্রকাশ করতেও ছাড়ছেন না। মুহূর্তে সঙ্কর্ষণ বুঝে গেল, ওসি ব্যাপারটাকে একদমই গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তবুও অনুনয়ের সুরে একটু ঘুরিয়ে বলল, ভদ্রমহিলাকে যদি কোনও হেল্প করা যায়!

—কী বিষয়ে! ওসি ভদ্রলোক নাকের পাটা ফুলিয়ে রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্কর্ষণ আরও সতর্ক হয়ে বলল, আপনার থানায় ওঁর ছেলের ব্যাপারে যদি কোনও রেকর্ড থাকে, কোনও ডায়েরি—তা হলে কিছু একটা ক্লু পাওয়া যেতেও পারে।

—এত পুরনো রেকর্ড তো পুলিশ স্টেশনে থাকে না। থাকলেও চট করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া পুরনো রেকর্ড দেখার জন্যে লালবাজার থেকে আপনাকে পারমিশন করিয়ে আনতে হবে। টেবিলের ওপর তবলা বাজানোর মতো আওয়াজ করে ওসি বললেন। ভাবটা এমন—হুঁহুঁ বাবা, কাজটা অত সোজা নয়।

ওসি-র সঙ্গে আলাপ করেই সঙ্কর্ষণ ওর পরিচয়, ওর সংস্থার পরিচয়, ওর আসার উদ্দেশ্য সবই জানিয়েছে। তবু ভদ্রলোক নিজের পুলিশি বৃত্ত ছেড়ে এতটুকু বেরিয়ে এলেন না। চিত্রা হালদারের জীবন থেকে দুর্ভাগ্য কখনও মুছে যাওয়ার নয়। সঙ্কর্ষণ চেষ্টা করেও পারবে না কোনও আশার আলো দেখাতে। হয়তো এই লিফলেটটাই এমন একটা ব্যথাতুর গম্ভীর বিষয়ের মর্যাদাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। চিত্রার লিখিত নিবেদন পড়ে সঙ্কর্ষণ নিজেও তো হেসে ফেলেছিল। এটা ওসি ভদ্রলোককে না-দেখালেই হত। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে ও বলল, আচ্ছা, সেই সময়ে, আই মিন

মহিলার ছেলে হারানোর সময়ে এখানকার অফিসার-ইন-চার্জ কে ছিলেন?
—আপনার কি মনে হয় তিনি ঘটনাটা মনে করে বসে আছেন। ওসি ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, ডু ইউ থিংক ইট?
—নো। ব্যবহারজীবী সঙ্কর্ষণ এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। ভদ্রতার মুখোশ সরিয়ে কড়া গলায় বলল, আই ওয়ান্ট টু নো হিজ নেম। দিস ম্যাচ।
—অ। ওসি সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজিয়ে অ্যাটেন্ডন্টকে ডেকে বললেন, দাস সাহাব কো বোলাও।
অল্প বয়সী এক অফিসার ঘরে ঢুকে ওসি-কে স্যালুট করে বলল, আমাকে ডেকেছেন স্যার?
—দাস, তুমি কি বলতে পারবে এখন থেকে ঠিক ন'বছর আগে এই থানার কে কর্তা ছিলেন? ওসি মুখ ঝুলিয়ে বললেন।
—সার্ভিস লিস্ট দেখে বলতে হবে স্যার। দাস থমমত খেয়ে বলল।
—আমার ঘরের দেওয়ালে এ যাবৎ অফিসার-ইন-চার্জদের নামের লিস্টের একটা বোর্ড টাঙানো ছিল না!
—না, স্যার।
—তা হলে অন্য কোনও থানায় দেখেছি। ঠিক আছে, তুমি এই ভদ্রলোককে একটু সাহায্য করো। যান, আপনি ওর সঙ্গে যান। হি ক্যান গিভ ইউ দ্যাট নেম।
ওসিকে শুকনো নমস্কার জানিয়ে সঙ্কর্ষণ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল।

তিলতলা এই বাড়িটার পুরোটাই চাকরিজীবী মহিলাদের মেস। একতলায় তিন-চারটে দোকান আছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়ানো দু'জন গল্পরত যুবককে ঠিকানাটা বলতেই তারা হাত তুলে দেখিয়ে দিয়েছিল। ছেলে দুটো ওকে আপাদমস্তক দেখছিল স্তিমিত কৌতুকে। তখনও সঙ্কর্ষণ বুঝতে পারেনি। নীচের মিষ্টির দোকানে আর একবার জিজ্ঞেস করতেই দোকানের ক্যাশ কাউন্টারে বসে থাকা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভাঙা গলায় বলেছিলেন, বাঁ-পাশেই কোলাপসিবল গেট আছে। একজন দারোয়ান পাবেন। ওকে গিয়ে বলুন। জানেন তো এটা চাকুরে মেয়েদের মেসবাড়ি! ঠিকানা ভুল হচ্ছে না তো!
সঙ্কর্ষণ স্পষ্টতই হাঁ হয়ে গেছিল। চিত্রা হালদারকে খুঁজতে এসে এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় উপস্থিত হতে হবে, ও কল্পনাও করেনি। এটা যে নিজস্ব আবাস নয়, একটা যৌথ বাসস্থান তা একবারও বলেননি ভদ্রমহিলা। মেসবাড়িতে কারও ব্যক্তিগত জীবনের চালচিত্র দেখতে পাওয়া যায় না। এখানকার বাসিন্দারা কর্মের নির্মম প্রহারে ক্লান্ত, প্রহরে বন্দিনী। এঁদের নিরুচ্চারিত অন্তর্লোক অন্য কোথাও রাখা আছে। কোনও দূর দেশে অথবা অদৃশ্য সেতুর ওপারে। কাউন্টারের ভদ্রলোক কিছু একটা আঁচ করে বলেছিলেন, যাঁকে খুঁজছেন, তিনি হয়তো স্পষ্ট করে বলেননি যে, মেসে থাকেন! তা, একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। ঠিকানাটা কারেক্ট...

সংবিৎ ফিরে পেয়ে সঙ্কর্ষণ হেসে বলেছিল, না ঠিকই আছে। থ্যাঙ্ক ইউ। গেটটা কি বাঁ-দিকে?

ভদ্রলোক নীরবে মাথা নেড়েছিলেন। চোখ তুলে ওকে দেখেওছিলেন সেই যুবক দুটির মতো। সবাই যে কেন এইভাবে তাকাচ্ছে। অস্বস্তিটা সেই থেকে এখনও ঝেড়ে ফেলতে পারেনি সঙ্কর্ষণ। ওপরে ওঠার সিঁড়ির পাশে এই যে ভিজিটরস্ রুমে ও একা বসে আছে, তা যেন অস্বস্তিটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

গেটকিপার ওকে এই ঘরে বসিয়ে রেখে প্রায় দশ মিনিট আগে উধাও হয়ে গেছে। চিত্রা হালদারকে কি এখনও ওর আসার খবরটা দেয়নি! না কি ভদ্রমহিলা এখনও কর্মস্থল থেকে ফেরেননি। সঙ্কর্ষণ ঘড়ি দেখল। সাতটা কুড়ি। হঠাৎ এইভাবে আসার কোনও দরকার ছিল না। চিত্রাকে পরপর দুটো চিঠি দিয়ে কোনও উত্তর পায়নি সঙ্কর্ষণ। থার্ড টাইমে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি দেবে ভেবেছিল। কিন্তু কী মনে করে আজ কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার পথে চেতলায় কিছু কাজ সেরে এখানে চলে এসেছে। যদিও এভাবে আসা উচিত হয়নি। সন্তান-হারা একজন মায়ের প্রতি ওর এই আবেগতাড়িত আচরণ একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এ নিয়ে পরিতোষ বা নীলাদ্রি কটাক্ষ করলে কিছু বলার নেই। ভদ্রমহিলা কি দুটো চিঠির একটাও পাননি! সেটা অসম্ভব নয়। তবে সঙ্কর্ষণের স্বতই মনে হয়েছে চিত্রা হালদার কোনও কারণে ওদের সংস্থা সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। অথবা ওঁর আর নতুন করে কিছু বলার নেই। পুরনো ঘটনার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মহিলা ক্লান্ত। তাই ওর চিঠির জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

এই ঘরের চার দেওয়ালে চারটে ছবি টাঙানো—স্বামীজি, নেতাজি, গান্ধীজি আর ইন্দিরা গান্ধী। বাহাই সম্প্রদায়ের লোটাস টেম্পলের ছবিওয়ালা একটা ক্যালেন্ডারও ডান দিকের দেওয়ালে ঝুলছে। একটু নীচুতে। ফ্যানের হাওয়ায় ক্রমাগত দুলতে দুলতে ক্যালেন্ডারের কিছুটা ছিঁড়ে গেছে। বাড়িটা একটু পুরনো ধাঁচের। ঘরের ফ্লোর ধরে রেখেছে লোহার বিম। সোফাগুলো বহু ব্যবহারে জীর্ণ। কভারে তেলচিটে পড়ে গেছে। সঙ্কর্ষণ ঘাড় তুলে ঝুলও আবিষ্কার করল। লেডিস মেস হলেও লক্ষ্মীশ্রীর অভাব এখানে-ওখানে। একটা সিগারেট ধরাবে কিনা সঙ্কর্ষণ ভাবল। একান্তভাবে মহিলাদের এই বাসস্থানে সিগারেট খাওয়া আপত্তিকর হতে পারে। হতেই পারে। সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার পুনরায় বুক-পকেটে রেখে দিল সঙ্কর্ষণ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মোটাসোটা, ছোটখাটো এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। পরিপাটি করে সবুজ পাড়-সাদা খোলের শাড়ি পরা। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। মুখের শেপ পানপাতার মতো, ঢলঢলে। ব্যক্তিত্বময়ী। হালকা পাউডারের গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল। ওকে নমস্কার জানিয়ে মহিলা ধীরস্বরে বললেন, বাথরুম সেরে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না।

সঙ্কর্ষণ সটান উঠে পড়েছে। ওর দু'চোখের ভাষায় বিস্ময় ও নীরব জিজ্ঞাসা, আপনি!

ভদ্রমহিলা ওর মুখোমুখি সোফাটায় বসে তেমনই নরম স্বরে বললেন, বসুন। আমি

এই মেসবাড়ির সুপার। তবে অনারারি। মেয়েরাই আমাকে সুপার বানিয়েছে। এটা তো বলতে গেলে হট্টমন্দির। তাই একজন গার্জেন থাকা খুব দরকার। আমি সেই গার্জেন। ভদ্রমহিলা স্মিত হাসলেন।

বিহ্বল মানুষের মতো বসতে বসতে সঙ্কর্ষণ প্রতিনমস্কার জানাল। ভদ্রমহিলা যেভাবে নিজের পরিচয় জানালেন, তা যথেষ্ট। কিন্তু ওঁর কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠিক কী বলা উচিত সঙ্কর্ষণ ভেবে পেল না। কেবল মৃদু হেসে ও সৌজন্য বিনিময় করল।

—আপনি চিত্রার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। দারোয়ান বলল। ভদ্রমহিলা এবারও হাসলেন।

সঙ্কর্ষণের মনে হল, ওঁর হাসির মধ্যে কোথায় যেন কৌতুকের স্পর্শ আছে। ও ঢোক গিলে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। মিসেস হালদার কি নেই?

—এখনও ফেরেনি। ওর ফিরতে ফিরতে নটা-সাড়ে নটা হয়ে যায়। কাজের জায়গা থেকে বেরিয়ে কোথায় কোথায় যে ঘোরে!

—ওঁর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল। সঙ্কর্ষণ অতিসৌজন্যে বলল।

—হয়তো জানি কী দরকার। ভদ্রমহিলা চোখ নামিয়ে হাসলেন।

চমকে উঠল সঙ্কর্ষণ। চিত্রা হালদার কি মেসের সমস্ত বোর্ডারকে ওর সম্বন্ধে, ওর ছোট সংস্থা সম্পর্কে সব বলেছেন। এমন কী, যে কোনওদিন ও এসে পড়তে পারে, তাও কি এঁদের জানা ছিল!

ওর হতবাক মুখের দিকে একঝলক দেখে সুপার বললেন, আপনি কে আমি জানি না। মানে আপনার পরিচয়। তবে এটুকু বলতে পারি, চিত্রার দেওয়া একটা হ্যান্ডবিল আপনার হাতে পড়েছে কোনওভাবে। কিংবা ও নিজে আপনাকে দিয়েছে। তাই আপনি বিষয়টা খতিয়ে দেখতে এসেছেন। ঠিক তো!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সবিস্ময়ে সঙ্কর্ষণ কোনওরকমে বলল। নিজের সামান্য পরিচয়ও দিল।

—প্রায়ই আপনার মতো কেউ না-কেউ আসেন। আমি বুঝতে পারি আপনারা কেন এসেছেন। চিত্রা মেসে থাকলেও আমিই কথা বলতে আসি। কয়েক বছর ধরে এই কাজ করে চলেছি। সুপারের মুখ সহসা বিষণ্ণ হয়ে গেল। অথচ এতক্ষণ উনি মৃদু কৌতুকে হাসছিলেন।

ভদ্রমহিলা চুপ করে আছেন। এই মুহূর্তে কী বলবে সঙ্কর্ষণ ভেবে পেল না। চিত্রা হালদারের জীবনকাহিনীর কিছুটা ও জানে। অনেকটাই অজানা। আবার সুপার ভদ্রমহিলা যেখান থেকে কথা শুরু করলেন তা আরও রহস্যময়। হয়তো গল্পের শুরু থেকে। কিংবা মধ্যিখান। কপালের চারপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। এইভাবে চুপচাপ আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে দমবন্ধ হয়ে যাবে। সঙ্কর্ষণ বিহ্বল মানুষের মতো বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুপার একবার কাশলেন। কাপড়ের আঁচলে মুখ মুছে ধীর স্বরে বললেন, সবাইকে একই কথা বলতে আমার খুব খারাপ লাগে। কিন্তু বলতেই হয়। আসলে চিত্রার

ছেলে রিম্পু মারা গেছে।
—তার মানে? সঙ্কর্ষণের মাথার ভেতরে যেন গরম রক্তের স্রোত ছুটে এল। অবাক হওয়ার শেষ স্তর স্পর্শ করার বদলে ওর সমস্ত অন্তরাত্মা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল রহস্যের তীব্রতায়। ও আবার বলল, মারা গেছে? কী বলছেন আপনি!
ওর গলার স্বরের কর্কশতায় সুপার সামান্য চমকে উঠলেন। তবে ভয় পেলেন না। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ডান হাতটা তুলে বললেন, আপনি হয়তো বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু আসল ঘটনা এটাই। এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়...
—আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস বড় কথা নয়। নিজের ছেলে মারা গেল, অথচ মা জানল না। এ কখনও হতে পারে!
—জানি, এটা দারুণ অস্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে ভাই। চিত্রাকে সেই মর্মান্তিক ঘটনাটা জানানো হয়নি। ও যাতে কিছুতেই না-জানতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
—বিশ্বাস হচ্ছে না। বাতাসে ভর করে এইসব দুঃসংবাদ ঘুরে বেড়ায়—এ কথা আপনি মানেন! তা হলে! মিসেস হালদার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি তা কখনও হয়! প্রকাশ্য দিবালোকে স্কুলফেরত একটি ছেলে...
সঙ্কর্ষণ হয়তো বাচ্চা ছেলের মতো তর্ক করছিল, তাই ভদ্রমহিলা আবার স্মিত হাসলেন। সঙ্কর্ষণ রেগে গিয়ে বলল, রাস্তাঘাটে অ্যাক্সিডেন্টে কেউ মারা গেলে আগুনের মতো খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকাল থানা-হাসপাতাল-জনগণ-খবরের কাগজ—কেউ জানতে বাকি থাকে না।
—সবই ঠিক। কিন্তু চিত্রার অভাগা ছেলেটা উত্তর কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে...।
—অবিশ্বাস্য! একটা দশ বছরের ছেলে হঠাৎ কীভাবে পার্ক সার্কাসে চলে এল! আপনি এসব কীভাবে জানলেন!
চোখ নামিয়ে ভদ্রমহিলা মৃদুস্বরে বললেন, ভাই, আমি চিত্রার আত্মীয়া। ঘটনাটা গোড়া থেকেই জানি। রিম্পু কীভাবে অতদূর চলে গেল সেটাই এখনও রহস্য থেকে গেছে। বাদবাকি সবই সত্যি। ছেলেটা খুব দুরন্ত ছিল। বয়সের তুলনায় বেশ অ্যাডভান্স। আমার তাই মনে হত। কী ভীষণ প্রাণবন্ত!
—আচ্ছা, রিম্পুর স্কুলব্যাগে ওর নাম, স্কুলের নাম তো ছিল! সেই সূত্র ধরে কেউ খোঁজ দেয়নি!
—না। আমরাও প্রথমে ভেবেছিলাম রিম্পু হারিয়ে গেছে। ওর স্কুলব্যাগটা পাওয়া যায়নি, ভাই! সাত দিন, না না, দশ দিন পরে সুজিতকে ওর এক বন্ধু খবরটা জানায়। তাও ভাসা ভাসা। পরে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের সূত্র থেকে জানা যায় রিম্পু কয়েকদিন আগেই বেওয়ারিশ লাশ হয়ে গেছে।
—সুজিত কে? সঙ্কর্ষণ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।
—চিত্রার স্বামী। আমাদের সঙ্গে মানে রিলেটিভদের সঙ্গে আলোচনা করে সুজিত ডিসিশন নেয়, খবরটা চিত্রাকে জানাবে না।

—কিন্তু কেন? সত্যকে এইভাবে চেপে রেখে লাভটা কী হল।

সুপার কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর দুই ভুরুর মাঝখানে আঙুল দিয়ে টিপে ধরে বললেন, চিত্রা তখনই কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে গেছিল। সুজিত ভেবেছিল, ছেলের মৃত্যুর খবর জানালে চিত্রা পাগল হয়ে যাবে। তাই ওকে...

—ওঁর পাগল হয়ে যাওয়া কি ঠেকাতে পেরেছেন আপনারা? তার চেয়েও বড় কথা মিসেস হালদারের কনজুগাল লাইফও তো শেষ হয়ে গেছে এমন একটা যুক্তিহীন সিদ্ধান্তে।

নীরবে মাথা নেড়ে সঙ্কর্ষণের কথায় সম্মতি জানালেন সুপার। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, শেষপর্যন্ত কিছুই বন্ধ করা যায়নি। সেই সময় চিত্রাকে আমরা সবাই আশ্বাস দিয়েছিলাম রিম্পু ফিরে আসবে। পুলিশ ওকে খুঁজছে। এইসব সান্ত্বনায় প্রথম প্রথম ও বিশ্বাস করত। তারপর সেই বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে চিত্রা সন্দেহবাতিক হয়ে উঠল।

—খুবই স্বাভাবিক। একজন মা কতদিন মানসিক চাপ সহ্য করতে পারে? আপনারা মারাত্মক ভুল করেছেন। সঙ্কর্ষণের গলার স্বর চড়ে গেল। বোর্ডারদের কেউ কেউ কাজকর্ম সেরে মেসে ফিরছেন। দোতলায় ওঠার আগে ভিজিটরস্ রুমে উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন স্বভাববশত। কিংবা সঙ্কর্ষণের গলার শব্দ পেয়ে ঔৎসুক্য দমন করতে পারছেন না।

সুপার ভদ্রমহিলা দরজার বাইরে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, এমনটা হবে আমরা কেউ ভাবতে পারিনি।

—সুজিতবাবুর সঙ্গে ওঁর কবে থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল?

—বছর পাঁচেক হবে। তারপর থেকে ওকে আমি এখানে এনেই রেখেছি। একসময় চিত্রা মনে করতে শুরু করল, সুজিতই রিম্পুকে কোথাও সরিয়ে রেখেছে। এবং সুজিত জানে কোথায় আছে রিম্পু।

—কিন্তু চিত্রা দেবী তো ওঁর লিফলেটে পুলিশের ওপরে এই দায়গুলো চাপিয়েছেন। পুলিশ সম্পর্কে ওঁর রাগ, ঘৃণা সবচেয়ে বেশি।

মুখে হাসির আভাস এনে ভদ্রমহিলা বললেন, সুজিতের কয়েকজন পুলিশ-বন্ধু আছে। তাঁদের কাছে চিত্রা বারবার ছেলের কথা বলত। হয়তো ঘ্যানঘ্যানও করত। ওঁদের মধ্যে কেউ হয়তো এমন কিছু বলেছিল যাতে ওর ধারণা হয়ে যায়, পুলিশ সব জানে। পুলিশ ইচ্ছে করলেই রিম্পুকে ওর বুকে ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সুজিতের বন্ধুরা কোনও সাহায্যই করছে না।

ব্যঙ্গ ঝরিয়ে হেসে সঙ্কর্ষণ বলল, ভাল বলেছেন, মায়ের বুকে পুলিশ ছেলেকে ফিরিয়ে দেবে!...আচ্ছা সুজিতবাবু কোথায় চাকরি করেন?

—হোম ডিপার্টমেন্টে। খুব ভাল ছেলে ছিল। কিন্তু রিম্পুর ঘটনাটার পর ওর জীবনটাও তছনছ হয়ে গেল। আগে আগে এখানে আসত, দূর থেকে হলেও চিত্রাকে দেখে যেত। এখন আর আসে না। কে যেন বলছিল, আজকাল প্রতিদিন সার্জেন্ট ক্লাবে গিয়ে পুলিশ-বন্ধুদের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করে।

—বাঃ, তা মিসেস হালদার কোথায় কাজ করেন?

—প্রিন্সেপ স্ট্রিটের একটা মোটর অ্যাকসেসরিজের দোকানে। ওর চাকরি করার দরকার ছিল না। সুজিত ওর খরচখরচা দেবে বলেছিল। কিন্তু চিত্রা কিছুতেই নেবে না। তবে এই মেসে থাকার জন্য ওই চাকরিটা কাজে লেগেছে। সুপারের গলার স্বর ধীরে ধীরে বিষাদমগ্ন হয়ে এল।

এই কাহিনীর এক-একটা পৃষ্ঠা এখনও সঙ্কর্ষণের কাছে অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড রাগে সৌজন্য ও ভদ্রতার নান্দীপাঠ ভুলে গিয়ে সঙ্কর্ষণ সিগারেট ধরালো। মাতৃসমা ভদ্রমহিলা কোনও আপত্তি করলেন না। কেবল অপরাধিনীর মতো মাথা নীচু করে বসে রইলেন। অথচ সঙ্কর্ষণকে এতটা সমীহ করার কোনও কারণ নেই। উত্তেজনায় ঘন ঘন সিগারেট টানল সঙ্কর্ষণ। তারপর হঠাৎ বলল, যাঁরা মিসেস হালদারকে সিমপ্যাথি জানাতে এখন আসেন, তাঁদের মধ্যে কেউ ওঁকে আসল ঘটনাটা বলে দেননি!

—আমি সকলকেই অনুরোধ করি না-বলার জন্য। এখনও পর্যন্ত তো সকলেই শুনেছেন। চিত্রা এমনিতেই নিদারুণ যন্ত্রণা বহন করছে। আর ওকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?

—যদি আমি বলে দিই! ভুরু নাচিয়ে সঙ্কর্ষণ বলল।

ভদ্রমহিলা মলিন হেসে বললেন, সে আপনার ইচ্ছে। তবে কি জানেন, যে-আশাটুকু নিয়ে চিত্রা বেঁচে আছে সেটা নষ্ট করে দিলে ওর আর কিছুই থাকবে না। সন্তান ও স্বামী—দুটোই ওর জীবন থেকে চলে গেছে। রিম্পুর মৃত্যুসংবাদ শুনলে চিত্রা মরে যাবে। আর বাঁচবে না।

—এর নাম বেঁচে থাকা! একটা হোপলেস হোপ নিয়ে... সঙ্কর্ষণ আর কিছু বলতে পারল না। আসলে ক্ষোভ ও তর্ক ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ভদ্রমহিলা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। হয়তো একই কাহিনী বলতে বলতে ক্লান্ত। সঙ্কর্ষণ ঘড়ি দেখল। আটটা পঁয়ত্রিশ। চিত্রা হালদারের এখনও আসার সময় হয়নি। সঙ্কর্ষণ উঠে পড়ল। এবার যেতে হবে। এই হাহাকারের মধ্যে ওর আর এক মুহূর্ত ভাল লাগছে না। বাড়িতে গিয়েই ও পরিতোষ আর নীলাদ্রিকে ফোন করবে : হ্যালো হ্যালো, আমি সঙ্কর্ষণ, জানিস, এইমাত্র আমি একটা আগ্নেয়গিরির ওপর থেকে ঘুরে এলাম। না না, ভয়ের কিছু নেই। মৃত, একেবারে মৃত আগ্নেয়গিরি। আমি সাহস করে একটু উঁকি দিয়ে দেখছি, আগ্নেয়গিরির ভেতরে কোনও গলন্ত লাভা নেই। তবে জল আছে। উষ্ণ জল। ঠিক চোখের জলের মতো। আচ্ছা, পৃথিবীর কান্না কি ওই অগ্নিপর্বতের ভেতরে জমা হয়ে আছে? তোরা বলতে পারবি। হ্যালো নীলাদ্রি, হ্যালো পরিতোষ...।

অ্যালসেশিয়নের বাচ্চা

বাড়িটা খুঁজে পেতে একদমই অসুবিধা হল না।

ইন্দ্রনাথ খুব ভাল করে ডিরেকশান এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলতে গেলে একেবারে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে। ললিত মিত্র লেন। ইন্দ্রনাথ ওখানেই পাশের মোহনলাল মিত্র স্ট্রিটে থাকে। গলিটা সারথি আগে বহুবার দেখেছে। কিন্তু ওটাই যে ললিত মিত্র লেন, তা জানত না। একটা কাগজে এঁকে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, গলিতে ঢুকে প্রথমে অভিনেতা প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িটা কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখে নিবি।...এই, এই জায়গাটায় হবে।...প্রমোদবাবুর বাড়ির কয়েকটা বাড়ি পরেই এই ঠিকানাটা। আমি ডেফিনিট।...আর বাড়ির বাইরের দরজায় নিশ্চয়ই লেখা থাকবে দেখবি : বিওয়্যার অফ ডগ—কুকুর সম্পর্কে সাবধান।

সারথি হেসে বলেছিল, বাংলায় তো লেখা থাকে কুকুর হইতে...

—ওটা গ্রামাটিক্যাল ভুল। যদি সত্যিই তাই ঝোলানো থাকে তা হলে কুকুরের মালিককে বাংলাটা সংশোধন করে দিবি। এবং একই সঙ্গে অ্যালসেশিয়নের জেনুইনিটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবি।

বিজ্ঞাপনটা গত রবিবার বেরিয়েছিল। দুপুরের ভাত-ঘুমের আগে চন্দ্রিমা সময় কাটানোর জন্য একটু খুঁটিয়ে কাগজ দেখে। বিজ্ঞাপনের পাতাগুলোও পড়ে। সারথির তন্দ্রা ভাঙিয়ে চন্দ্রিমা একটু চেঁচিয়ে বলেছিল, এই দ্যাখো, তুমি যা খুঁজছিলে।

একটু বিরক্ত হয়ে সারথি কাগজটা হাতে তুলে নিয়েছে। 'জীবজন্তু' কলামে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন। 'উচ্চ পেডিগ্রিসম্পন্ন অ্যালসেশিয়নের বাচ্চা বিক্রয়। ইমপোর্টেড ব্লাড লাইন। সত্বর যোগাযোগ করুন। অনিলেন্দু চৌধুরী।...' তারপর ঠিকানা। স্ত্রীর দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে সারথি বলেছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসে কুকুরের বাচ্চা! আশ্চর্য! প্রাকৃতিক নিয়মে কুকুরদের তো বাচ্চা হয় অঘ্রান-পৌষ মাসে। ভাদ্র মাসের কাজকারবারের পর।

—যাঃ! তুমি ভারি অসভ্য। এ কি রাস্তার নেড়ি কুকুর পেয়েছো? বিলিতি কুকুরের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। চন্দ্রিমা ওর কাঁধের কাছটায় মৃদু চাপড় মেরে বলেছিল।

—তা কি করতে বলছো? সারথি জিজ্ঞেস করেছে।

—এ তো দেখছি কলকাতার ঠিকানা। একবার গিয়ে দেখে এসো না। একটা ভাল জাতের ষণ্ডাগুণ্ডা কুকুর তো আমাদের খুবই দরকার।

সারথি হুঁ-হাঁ করে আবার তন্দ্রায় ফিরে গেছিল। বাগুইহাটির এই জায়গাটায় বাড়ি

করার পর থেকে সারথি, চন্দ্রিমা আর ওদের বাইশ বছরের একমাত্র ছেলে টম একটা সূক্ষ্ম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এখানে গত চার মাস ধরে চুরি-চামারিটা বড্ড বেড়েছে। এমন কী দুপুরবেলায় দরজা-জানলা ভেঙে দু'-তিনটে বাড়িতে রাহাজানি হয়ে গেছে। কেউ টের পায়নি। এটা মূলত এল আই সি আব ব্যাঙ্ক অফিসারদের কলোনি। ফলে দুপুরে বাড়ির কর্তারা কেউই বাড়ি থাকেন না। বাচ্চা এবং মহিলারা আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। একটা শঙ্কার হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে সারা কলোনিতে। রাতের দিকে ভয়টা আরও বেড়ে ওঠে। মুখে কেউ কিছু বলেন না, কিন্তু খুব শান্তিতে ঘুমোতে পারেন না প্রত্যেকটি বাড়ির মালিক। ইতিমধ্যে নাইট গার্ড দেওয়ার ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে। তাও শেষ পর্যন্ত কতদূর কার্যকর হবে বলা মুশকিল। কেননা সাত জনের চোদ্দরকম মত। তবে এরই মধ্যে যাঁরা বাড়িতে অ্যালসেশিয়ন বা ওই জাতের দামি পাহারাদার কুকুর পুষেছেন, তাঁরা একটু স্বস্তিতে আছেন। বাড়ির আশপাশে কাউকে আসতে দেখলে কুকুরদের ভয়ংকর গর্জন এক একসময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অনেকেই এখন নাকি কুকুর পোষার কথা ভাবছে। এ-বাড়ি সে-বাড়ির মালকিনদের সঙ্গে কথা বলে এটা বুঝতে পেরেছে চন্দ্রিমা। সারথিকে তাই কুকুরের বাচ্চার খোঁজ পেলেই জানাতে ভুলছে না।

পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর কোনও বাঙালি পুরুষ আর নতুন কিছু পেতে চায় না। বিশেষত চাকুরিজীবীরা, যারা এই সময়টায় সমস্ত পুঁজি ভেঙে একটা একতলা বাড়ি করে ফেলে। তখন শুধু বাকি দিনগুলোর হিসেব-নিকেশ। যেটুকু সঞ্চয় আছে, তা দিয়ে নিজের চেনা বৃত্তটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। এই অবস্থায় একটা কুকুর পোষা মানে একটা নতুন সংযোজন। তার নিত্যদিনের আমিষ আহারের খরচ, তার রোগ-ভোগ, তার মেজাজ, তার স্পেশাল ডাক্তার—সব মিলিয়ে সাত-সতেরো খরচের বোঝা। সারথি প্রথমে চন্দ্রিমার প্রস্তাবে রাজি হয়নি। ও বলেছিল, কুকুর পোষা মানে বড়লোকি চাল দেখানো। আমাদের ওসব মানায় না। আর দরকারই বা কি!

—তোমাকে এত করে বললাম, তুমি নিজেও বুঝতে পারছো, তবু বলছো দরকারই বা কি! বাঃ! চন্দ্রিমা ব্যঙ্গ ঝরিয়ে বলেছিল, ন্যাকামো করছো কেন? একটা কুকুর থাকলে কতটা নিশ্চিন্ত, তা তুমি কী করে বুঝবে?

ঠোঁট উল্টে সারথি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রিমা ছাড়েনি। সেন্টিমেন্টের ঘরে একটা মোক্ষম চাল দিয়ে বলেছিল, তুমি, টম—দু'জনেই সকালবেলায় বেরিয়ে যাও। ঠিকে-ঝি চলে যাওয়ার পর বাড়িতে একটা জীবন্ত প্রাণী বলতে কেউ থাকে না। যখন পাইকপাড়ার ভাড়া বাড়িতে ছিলাম তখন অন্য ঘরের মেয়ে-বউদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পেরেছি। আর এখানে! সারাটা দুপুর মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকা। দিনের পর দিন এভাবে ভাল লাগে! একটা কুকুর থাকলে তাকে নিয়ে সময়ও কাটবে আবার কাজের কাজও হবে।

ঠিক নিখাদ সেন্টিমেন্ট নয়, চন্দ্রিমার বক্তব্যের মধ্যে খানিকটা যুক্তিও প্রচ্ছন্ন ছিল। সারথি তাই আর তর্ক করেনি। ইচ্ছে না থাকলেও চন্দ্রিমার কথাগুলো মেনে

নিয়েছিল। সারথি বহুবার ভেবে দেখেছে, একটি মানুষের সমগ্র জীবন এই মেনে নেওয়ার সার্কাস। একটা নির্দিষ্ট এরিনার এপাশ থেকে ওপাশে কেবলই ঘুরে-ফিরে চলা। এই চন্দ্রিমার কাছে ভাড়াটে বাড়ির জীবন একদিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অনেকটা জোর করেই বাগুইহাটিতে সারথিকে দিয়ে বাড়িটা করাল। সারথি এখনই বাড়ির পেছনে জমানো টাকাটা ঢালতে চায়নি। ওর খুব ইচ্ছে ছিল টমের পড়াশোনায় এটা কাজে লাগাবে। ছেলেটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে। খুব মেধাবী। এম-টেক-এ ভাল রেজাল্ট করবে। সারথি নিশ্চিত। এবং তাই যদি হয়, তখন টমকে বিদেশে পড়তে পাঠানোর কথা চিন্তা করতে হবে। সারথি ভেবে রেখেছিল, ওই টাকাটা টমের বিদেশযাত্রায় ব্যয় করবে। কিন্তু চন্দ্রিমা শুনল না। বাড়ি করতেই হল। অথচ ভাড়াটে বাড়ির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েও চন্দ্রিমা শান্তিতে নেই। এখন ওকে নিঃসঙ্গতার ভূত তাড়া করে ফিরছে। ফলে এই দুদিক থেকে দরকারি জিনিসের মধ্যে পড়ে গেছে কুকুর পোষার ব্যাপারটা। একটা ভাল জাতের কুকুরের সন্ধানে সারথিকে বাধ্য হযে পথে নামতে হয়েছে। ইন্দ্রনাথ একবার কথায় কথায় বলেছিল, গেরস্থ বাড়ির পক্ষে অ্যালসেশিয়নই ভাল। গার্ডও দেবে, আবার বাড়িটাকেও জমিয়ে রাখবে। ওই জাতের কুকুরগুলো ভীষণ প্রভুভক্ত আর ফ্যামিলিয়র। এক পিস বাড়িতে তোল, দেখবি কী মায়া পড়ে যাবে। এক মিনিটও ছেড়ে থাকতে পারবি না।

এ সব তো অনেক পরের কথা। আগে একটা বাচ্চা দেখেশুনে কেনা হোক, তারপর মায়া-মমতার গল্প। প্রভুভক্তির কাহিনী। আজকাল আর শ্যামবাজারের দিকে সারথি আসতে পারে না। ওর রুটের মিনিবাসগুলো মানিকতলা-কাঁকুড়গাছি-উল্টোডাঙা-ভি আই পি ধরে বেরিয়ে যায়। কলকাতার বিভিন্ন পয়েন্টের খোল-নলচে পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় তেমনই আছে। কেবল দিন দিন পাঁচ পাশের বহুমূল্য জায়গাটাকে সংকুচিত করে দিচ্ছে ক্রমবর্ধমান গাড়ি, বাজার আর ফুটপাতের হকার। অফিস থেকে সারথি আজ একটু আগেই বেরিয়েছে। দিনের আলো থাকতে থাকতে যে কোনও কাজ করে ফেলতে পারলে অনেক সুবিধে।

ললিত মিত্র লেনে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে আসতেই একটা পানের দোকানের সামনে তিনজন যুবককে দেখতে পেয়েছিল সারথি। ওরা সিগারেট ধরিয়ে গল্প করছিল। জিজ্ঞেস করতেই প্রবীণ অভিনেতার বাড়িটা একজন দেখিযে দিয়েছে। তার পাশের ছেলেটি একটু হালকা সুরে হেসে জানতে চেয়েছিল, দাদা, আপনি কি স্টুডিও পাড়ার লোক?

—না তো! সারথি সামান্য অবাক হয়ে নিজেও হেসে ফেলে বলেছে, আমি প্রমোদবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি।...ওঁর বাড়ির কাছাকাছি অনিলেন্দু চৌধুরী থাকেন, তাঁর কাছে যাবো।

—কিছু মনে করবেন না দাদা। আমরা সব বেকার তো, তাই নতুন কেউ এলে এসব জিজ্ঞেস করি। যদি টালিগঞ্জে কোনও কাজটাজ জুটে যায়। স্টুডিওতে এক্সট্রা-ফেক্সট্রা

তো লাগে। সেই ছেলেটি বলেছে।

একটু রোগা লম্বা, তৃতীয় ছেলেটি হঠাৎ বলেছিল, কি বললেন, অনিলেন্দু চৌধুরী! নিশ্চয়ই কুকুরের বাচ্চা কিনবেন!

—হ্যাঁ, মানে...। আপনারা জানেন দেখছি। সারথি আমতা আমতা করেছে।

—আপনার আগে কদিন ধরে আরও কয়েকজন এসেছেন। তবে কাউকেই কুকুরের বাচ্চা হাতে ফিরতে দেখিনি। হয়তো দরদামে পোষাচ্ছে না।...যান, গিয়ে দেখুন। ওই অনিলবুড়ো কিন্তু মহা খেঁচো। কিপ্‌টে। চাঁদা দেওয়ার ভয়ে ইয়াব্বড়-বড় দুটো টেরিফিক কুকুর পুষেছে। একেবারে জ্যান্ত নেকড়ে। সকালের দিকে রাস্তায় একবার পায়খানা করানোর জন্য বের করে। কী দেখতে মাইরি! কুকুর দুটোকে দেখে রাস্তা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়...যান গিয়ে দেখুন।

সারথি ইন্দ্রনাথকে যা বলেছিল, তাই। অনিলেন্দু চৌধুরীর পুরনো ধাঁচের দোতলা বাড়ি। বাড়ির সদরের গায়ে এক টুকরো কাঠের প্লেট ঝুলছে। তাতে পরিষ্কার বাংলায় লেখা : কুকুর হইতে সাবধান। সারথি মনে মনে হেসে কলিংবেল টিপল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে এল দুটো কুকুরের বীভৎস চিৎকারের যুগলবন্দি। কয়েক মুহূর্ত পরে সদর দরজার ওপাশে নখ দিয়ে আঁচড়ানোর শব্দ। ভয় পেয়ে সারথি খানিকটা পিছিয়ে দাঁড়াল।

—কাকে চাই। সারথি চমকে উঠে ওপরে তাকিয়ে দেখল রাস্তার দিকে গোল বারান্দায় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন।

—আজ্ঞে আমি অনিলেন্দু চৌধুরীর সঙ্গে দেখা...। অ্যালসেশিয়ন বাচ্চা বিক্রির ব্যাপারে...। সারথি অপ্রস্তুত হয়ে বলল।

—অ। আপনি একটু দাঁড়ান। আমি আসছি। ভদ্রলোক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সারথির মনে হল, চেঁচিয়ে কারোর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভদ্রলোক নিচে নেমে আসছেন। সম্ভবত উনি ওঁর দুই অবাধ্য কুকুর দুটোকে চেষ্টা করছেন বাগে আনতে।

বসার ঘরে একা বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে কুকুর দুটো ছুটে এসে সারথির ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ওপাশের খোলা দরজায় চোখ রেখে সারথি দম বন্ধ করে বসে রইল। কুকুরের বাচ্চা কিনতে এসে তাদের বাবা-মায়ের শিকার হয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আর কিছু না হোক, শুধু দাঁত বসিয়ে দিলেই পেটে চোদ্দটা ইনজেকশানের অমানুষিক শাস্তি। সারথি একবার ভাবল চলে যাই। অ্যালসেশিয়ন মাথায় থাক। আগামী রোববার হাতিবাগান বাজার থেকে স্পিৎস, পিকিনিজ, ড্যাসহাউন্ড বা অন্য কোনও ল্যাপডগ কিনে নিয়ে যাবে। সকালে বেরোনোর সময় চন্দ্রিমাকে বুক বাজিয়ে 'কুকুরের বাচ্চা নিয়ে ফিরব'—একথা বলে না এলেই হত। এই সব ফালতু প্রতিজ্ঞা অকারণে অশান্তি ডেকে আনে। এখন রীতিমতো ভয় করছে।

—সরি, আপনাকে খানিকক্ষণ বসিয়ে রাখতে হল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বললেন।

আবার সারথি চমকে গেল। ওর মনে হল, এই ঘরের পুরনো বইয়ের আলমারিটার পেছন থেকে অনিলেন্দু চৌধুরী বেরিয়ে এলেন। সোফা থেকে সামান্য উঠে সারথি হাসার চেষ্টা করে বলল, না, না, ঠিক আছে। আপনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন...।

—কাজ নয়, কাজ নয়। কেটে মটকার শৌখিন পাঞ্জাবির বোতাম আটকে এক ইঞ্চি পাড়ের শান্তিপুরী ধুতির কোঁচা সামলে অনিলেন্দুবাবু বললেন, ডিউক আর কুইনিকে বিকেলবেলায় বেড়াতে নিয়ে যেতে পারি না। তাই ওরা বাড়ির ভেতরে আমার সঙ্গে খেলাধুলা করে।...এমনিতে ওরা আমার একেবারে বাধ্য ছেলেমেয়ে। তবে আননোন পার্সনকে দেখলে ডিউক আর কুইনি ওদের ইন্সটিংক্ট দমিয়ে রাখতে পারে না।

—তাই! কোনও রকমে ঢোঁক গিলে সারথি বলল।

—আপনি কি আনইজি ফিল করছেন? আরে না, না। কোনও ভয় নেই। ওদের আমি ছাদে তুলে দিয়ে এসেছি। ছাদের দরজা বন্ধ আছে। যদি এখানে এসেও পড়ে, নো প্রবলেম। একটু শুঁকেটুঁকে চলে যাবে। আপনি তো এসব জানেন। অনিলেন্দু চৌধুরী সামান্য হাসলেন।

—যেগুলো বিক্রি করবেন, নিশ্চয়ই এদেরই বাচ্চা?

—ইয়েস। কুইনি এবার চারটে বাচ্চা দিয়েছে। ফুটফুটে তুলতুলে। তিনটে মেল, একটা ফিমেল। আবার এর মধ্যে একটা টোট্যালি ব্ল্যাক। এ বেয়ার স্পেসিস। কুইনির গ্র্যান্ড মাদার ওরিজিনালি জার্মান শেফার্ড। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়রের সময়েও বেঁচেছিল। আর ডিউকের ফোরফাদাররা সব ইংলন্ডের উইন্ডসর ক্যাসেলে মানুষ হয়েছে। আমি আপনাকে ওদের পেডিগ্রি ফাইল দেখাব।...তা, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—বাগুইহাটিতে আমার বাড়ি। আগে এই কাছেই পাইকপাড়ায় ভাড়া থাকতাম। সারথি স্বচ্ছন্দ হওয়ার চেষ্টা করল।

—আপনার নাম?

—আজ্ঞে, সারথি মজুমদার।

—শুধু সারথি! তার আগে পার্থ, কৃষ্ণ, সূর্য—এসব নেই? অনিলেন্দুবাবু চাপা ঠোঁটে হেসে ভুরু নাচালেন।

সারথি একটু অবাক হয়ে গেল। কুকুরের বাচ্চা কিনতে আসার সঙ্গে ওর নামের কী সম্পর্ক। ভদ্রলোক তো অদ্ভুত! এ যেন পুলিশি জেরা আরম্ভ হয়েছে। সারথি একটু শক্ত গলায় শুধু বলল, না।

—আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

আবার অনাবশ্যক প্রশ্ন। সারথি ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। তবু ও উত্তর দিল, আমি আমার স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে।

—বাচ্চাটার দেখাশোনা করবে কে? আপনার স্ত্রী?

অনিলেন্দু চৌধুরী শুধু 'বাচ্চাটা' বলাতে সারথি প্রথমে বুঝতে পারেনি। হাঁ করে কয়েক সেকেন্ড ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে সারথি বলল, বাচ্চাটা!...ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার স্ত্রী ওকে দেখাশোনা করবে।

—আগে কখনও কুকুর পুষেছেন? কোনও অভিজ্ঞতা আছে?

—না, মানে, এই প্রথম। সারথি একটু ইতস্তত করল।

—তাহলে! ছেলে বুঝি আবদার ধরেছে—কুকুর চাই, বাবা কুকুর কিনে দাও। অমনি আপনি ছুটে এসেছেন।

বাচ্চা ছেলের গলা নকল করে ভদ্রলোক এমন ভাবভঙ্গি করলেন যে, সারথি শব্দ করে হেসে ফেলল। অনিলেন্দুবাবুর বাইরেটা আভিজাত্যের আবরণে বেশ কঠিন দেখালেও ভেতরটা হয়তো শিশুর মতো সরল। মানুষটা নিশ্চিত খুব আমুদে। হাসি থামিয়ে সারথি বলল, না, তাও নয়।...আসলে একটা কুকুর পোষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অনেকটা বাধ্য হয়ে।

—তার মানে? অনিলেন্দুবাবু নড়ে-চড়ে বসলেন।

—জানেন, আমাদের লোকালিটিতে ইদানিং দিনে-দুপুরে চুরি-ছ্যাঁচড়ামি হচ্ছে। সবাইকে প্রতিমুহূর্তে তটস্থ থাকতে হয়। এই অবস্থায় বাড়িতে একটা পোষা কুকুর থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

—সে কী, আপনি বাড়ি গার্ড দেওয়াবেন বলে কুকুর কিনতে এসেছেন? অনিলেন্দুবাবু সটান উঠে দাঁড়িয়ে গমগমে গলায় বললেন।

—হ্যাঁ। সারথি বিস্মিত হয়ে গেল।

—আপনি আসতে পারেন। এক্ষুনি। আমি বাচ্চা বিক্রি করব না। যারা কুকুর ভালবাসে না, নিছক ভালবাসবে বলে কুকুর পোষে না, তাদের হাতে আমি ডিউক-কুইনিব সন্তানদের দেব ভেবেছেন! নো, নেভার।

—ভালবাসব না আপনাকে কে বলল? সারথি নিজেকে এবার গার্ড দেওয়ার চেষ্টা করল।

—সত্যি কথাটা আগেই বলে ফেলেছেন।...বিনে পয়সার দারোয়ান না-বানিয়ে, আপনার ছেলেকে আপনি যেভাবে ভালবাসেন, একটা কুকুরকে সেভাবে আদর-যত্ন করতে পারবেন! বলুন পারবেন! আমি জানি, পারবেন না, ওসব আমার জানা আছে।

সারথি এতক্ষণ বসে বসে কথা বলছিল। এবার উঠে পড়ল। হাত নাড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, আপনি অযথা রেগে গিয়ে যা তা বলছেন।

—আপনার দেশ কোথায় ছিল? অনিলেন্দু চৌধুরী হঠাৎ চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন। বিকেলের শেষ আলো এখন মিলিয়ে যাচ্ছে। বসার ঘরে সন্ধ্যা নামছে।

অনিলেন্দুবাবুর চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে সারথি বলল, পূর্ববঙ্গে। কুমিল্লায়।

—ঠিক যা ভেবেছি। উদ্বাস্তু, রেফিউজি। এখানে এসে ব্যবসা-ট্যাবসা করে দু'পয়সা কামিয়ে কুকুর পোষার শখ হয়েছে। যত্তো সব!

—আপনি কিন্তু দুর্ব্যবহারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। জানেন, আমি এল. আই.সি.-র একজন সিনিয়র অফিসার। বিজ্ঞাপন দিয়ে ডেকে এনে আপনি আমাকে অপমান করছেন। সারথি ঠাণ্ডা গলায় বলল।

—ওসব অফিসার আমি অনেক দেখেছি। আপনি আসুন। পশুপক্ষী পোষার নাম করে যারা তাদের সঙ্গে বুচারের মতো বিহেভ করে, তাদের আমি ঘেন্না করি। যান, বেরিয়ে যান। আমি আপনার কোনও এক্সপ্ল্যানেশন শুনতে চাই না। আগে ওদের ভালবাসতে শিখুন, তারপরে কথা বলবেন।

ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে ভদ্রলোককে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিতে গিয়েও সারথি থেমে গেল। ছাদে ডিউক আর কুইনি ঘোরাফেরা করছে। উত্তেজিত প্রভুর গলার আওয়াজ পেয়ে ধেয়ে আসতে পারে। তখন এখানেই ভবলীলা সাঙ্গ। ভদ্রলোক কুকুর দুটোকে ওর ওপর লেলিয়েও দিতে পারেন। অতএব মুখ বুজে, অপমান হজম করে, ল্যাজ গুটিয়ে সারথি রাস্তায় নেমে এল।

পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেগুলো এখনও গুলতানি করছে। মাথা নীচু করে সারথি কেটে পড়বে ভেবেছিল। কিন্তু লম্বা মতন ছেলেটা দূর থেকেই ওকে দেখতে পেয়েছে। সারথি কাছে আসতেই বলল, কি দাদা, কুকুর-ছানা কই? আপনিও ফেলিওর! দরদামে পোষাল না বুঝি! কত চাইছে?

থমকে দাঁড়িয়ে সারথি ভাবল বলবে, দুর ভাই, ভদ্রলোক একেবারে বদ্ধ পাগল। বিশ্রীভাবে আননেসেসারি অপমান করে দিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সারথি বলতে পারল না। আসলে ভালবাসা শব্দটা অনিলেন্দু চৌধুরী এমনভাবে উচ্চারণ করছিলেন! ওটা কিছুতেই পাগলের প্রলাপ হতে পারে না। প্রেমিককে ও কী করে পাগল বলবে।

ঋণী

তেতলায় গিরিজাদার সঙ্গে একটু খোশগল্প করতে গেছিল অভিজ্ঞান। প্রতিদিনই যায়। গিরিজাদা ভীষণ মজার মানুষ। সবসময় রয়ে টইটম্বুর। জীবনের কোনও দুঃখই যেন ওকে স্পর্শ করেনি। গিরিজাদার ভাঁড়ারে ডার্টি জোক্স অফুরন্ত। যে কোনও বিষয়ে একেবারে সইসই জোক্স বলতে ওর কোনও জুড়ি নেই। মানুষটার কাছে গেলে জীবনযাপনের গ্লানি কিছুটা ক্ষয়ে যায়। অভিজ্ঞান তাই না-গিয়ে পারে না। হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গেলেও উঠতে ইচ্ছে করে না গিরিজাদার সামনে থেকে। ওর ডিপার্টমেন্টের অন্যরাও এসে জোটে অভিজ্ঞান যাওয়ার একটু পরেই। অথচ গিরিজাদার রিটায়ারমেন্টের আর বেশিদিন বাকি নেই। বড়জোর এক বছর আট মাস। অভিজ্ঞান আজকাল মাঝে মাঝেই ভাবে, এই মানুষটা চলে গেলে এই স্টিরিওটাইপ অফিসটা ওর কাছে আরও অসহ্য হয়ে উঠবে। প্রাণ ছুঁয়ে মাঝেমধ্যে বসন্তের বাতাস চলে যায় বলেই এত ক্লেদ সত্ত্বেও, বেঁচে থাকার শত বিড়ম্বনা মানুষ সহ্য করতে পারে।

তেতলা থেকে নীচে নামতে নামতে অভিজ্ঞান পুরনো কথাগুলো আবার ভেবেছে। ঠিক ভাবেনি, বরং স্বতই বেঁচে উঠেছে ওর হৃদয় গহনে।

ঘরে ঢুকেই অভিজ্ঞান একটু অবাক হয়ে গেল। ওর টেবিলের সামনে মুখ কালো করে বসে আছে শিলাজিৎ। এর আগে অভিজ্ঞান যে-প্রাইভেট অফিসে কাজ করত সেখানকার হেডক্লার্ক শ্যামাপ্রসাদবাবুর ছেলে। আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টে আছে। শ্যামাদার সঙ্গে ওর অনেক স্মৃতি। প্রাইভেট ফার্মের উদ্বেগী আবহাওয়ার মধ্যে অভিজ্ঞান ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। সেই প্রথম চাকরি নামক একটা শৃঙ্খলিত ব্যবস্থার সঙ্গে অভিজ্ঞানের পরিচয়। মাস গেলে আড়াই হাজার টাকা। কিন্তু তার জন্য সাতঘণ্টা ধরে শিরদাঁড়া সোজা রাখার আপ্রাণ অথচ ব্যর্থ চেষ্টা।

সেই সংকোচন ও আত্মপীড়নের মধ্যে অভিজ্ঞানকে শ্যামাদা কাছে টেনে নিয়েছিলেন। অ্যাকাউন্টসের কাজকর্ম শিখিয়েছিলেন পরম মমতায়। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, আমি চলে যাওয়ার পরে তুমিই এখানকার সব দায়িত্ব নেবে। প্রাইভেট ফার্মের ক্ল্যারিকাল কাজের ঝক্কি অনেক। এখানে সরকারি চাকুরেদের মতো ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। বুঝলে।

অভিজ্ঞান মৃদুস্বরে বলত, কী যে বলেন, শ্যামাদা! আপনার মতো টেনাসিটি আমার নেই। আপনি এতদিন ধরে কাজ করতে করতে সব কিছুকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছেন।

—তা যা বলেছ! শ্যামাদা মৃদু গর্ব অনুভব করতেন, তোমার চেয়ে কম বয়সে ঢুকেছিলাম। তখন সব বিলিতি সাহেব। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলেও তাঁরা সব ছিলেন। এতবড় ব্যবসা! ফেলে দিয়ে তো আর চলে যাওয়া যায় না। তাঁদের সামলেছি, এখন এই দিশি সাহেবদের সামলাচ্ছি। কাজ জানলে কাউকে তোয়াক্কা করতে হয় না, বুঝলে। তোমার এফিসিয়েন্সিই তোমাকে চিনিয়ে দেবে।

অভিজ্ঞান গলা নামিয়ে বলেছিল, আমি বেশি দূর যেতে চাই না, শ্যামাদা!

—ও আবার কী কথা! শ্যামাদা বেশ বিরক্ত হয়ে নাক ফুলিয়ে বলেছিলেন, এই সবে শুরু করলে, এরই মধ্যে স্বপ্নভঙ্গ! এখনও কতটা পথ যেতে হবে জানো! সে হিসেব করেছ কখনও।

বোকার মতো হেসে অভিজ্ঞান বলেছিল, আমি আপনার মতো এত লোড নিতে পারব না।

জিভ আর ঠোঁট দিয়ে আশ্চর্য শব্দ তুলে শ্যামাদা বলেছিলেন, কাউকে-না-কাউকে ভার নিতে হয়। তা না হলে সমাজ নামক এই বিশাল আর জটিল যন্ত্রটা কীভাবে চলছে বল তো!

অভিজ্ঞান ওঁর সামনে মাথা নীচু করে বসে থাকত।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ওর পিঠে মৃদু চাপড় মেরে শ্যামাদা বলতেন, এখনই তোমাকে এত ভাবতে হবে না। ভয় পাওয়ার মতো কিচ্ছু হয়নি। আমি আছি।

কেন যে ভয়, কীসের ভয় অভিজ্ঞান স্পষ্ট করে নিজেও বুঝতে পারত না। ওর কেবলই মনে হত প্রাইভেট ফার্মে চাকরি ব্যাপারটা একটা সরু সুতোর ওপর ঝুলে থাকে। ট্র্যাপিজের খেলায় খুব দক্ষ না-হলে যে-কোনও সময় ও পড়ে যেতে পারে। অথচ অভিজ্ঞানের কোনও অ্যাক্রোবায়োটিক স্কিলই নেই।

শ্যামাপ্রসাদ যে-বছর অবসর নিলেন, সেই বছরই মাস পাঁচেক পরে অভিজ্ঞান এই সরকারি চাকরিটা পেয়েছিল। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষায় প্রথমবারই উতরে যাবে ও ভাবতে পারেনি। শ্যামাদার বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে খবরটা দিতে গিয়েছিল অভিজ্ঞান। মানুষটা খুব খুশি হয়েছিলেন, সরকারি চাকরির স্বাদই আলাদা। গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টদের কত স্ট্যাটাস! কত প্রতিপত্তি! একেবারে স্থির নিশ্চিত চাকরি, নো টেনশন! তুমি দারুণ কাজ করেছ।

সার্ভেন্ট শব্দটা সেদিন অভিজ্ঞানের বুকের মধ্যে কোথাও ধাক্কা মেরেছিল। একদম ভাল লাগেনি। সারাজীবন করণিকের চাকরি করতে করতে শ্যামাদার চিন্তাভাবনা আর ভাষা যেন ওই চাকর-বাকর পর্যায়েই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে! অভিজ্ঞান বিরক্তি চেপে রেখে ফিকে হেসে বলেছিল, সবাই তো বলছে সরকারি চাকরি খুব আরামের! তাই শ্যামাদা!

প্রবর দার্শনিকের মতো চোখ ভাসিয়ে শ্যামাদা বলেছিলেন, কাজ কখনও আরামের হয়! কাজের পেছনে খাটনি থাকবেই। আসলে সবটাই নির্ভর করবে তুমি কীভাবে নেবে! কাজ না করলেই আরাম! সরকারি অফিসে তো ওপরওয়ালা বলে কিছু নেই! সবাই বস অ্যান্ড বিগ বস! কেউ কাউকে মানে না। অতএব কাজ না-করলে তোমাকে

কে শাসন করবে।

ছবিটা সত্যি সত্যিই অনেকটা এই রকমই। অভিজ্ঞান সরকারি অফিসে ঢোকার পর মিলিয়ে দেখেছে। অথচ শ্যামাদা ওর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন। ওঁর বাড়িতে সেদিনই শিলাজিতের সঙ্গে অভিজ্ঞানের আলাপ হয়েছিল। অঙ্কে অনার্স নিয়ে পাস করে শ্যামাদার ছেলে তখন বাবার ফেলে-আসা অফিসে ঢোকার স্বপ্ন দেখছে। বাবারই শূন্যস্থানে। শ্যামাদাও সেই রকমই বলেছিলেন, বুঝলে, সাহেবরা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, শিলুকে ওঁরা নিয়ে নেবেন। প্রাইভেট ফার্মে এমন আকছার হয়। বলতে পার, এটাই দস্তুর। ওই যে পারচেজের বৈদ্যনাথ, ও ব্যাটা তো ওর বাপের মৃত্যুর পর চাকরিটা পেল। ওর বাপ আদ্যনাথ ওখানেই তো কাজ করত।

অভিজ্ঞান সেদিন ভেবেছিল, এসব ঘটতেও পারে। একেবারে অঙ্কের নিয়মের মতো। তার ওপর শ্যামাদা একজন লয়াল ওয়ার্কার হিসেবে খুব ভাল ভাবমূর্তি রেখে এসেছেন। তাছাড়া শিলাজিতেরও একটা চাকরি পাওয়া দরকার। অবসর জীবনে শ্যামাদা যেটুকু টাকা পেয়েছেন, তা তো আর বাড়বে না, বরং খরচ হতে থাকবে।

আড়াই বছর পরে ওদের অফিসের বারান্দায় একদিন শিলাজিৎকে দেখে ও অবাক, তুমি!

অভিজ্ঞানকে চিনতে শিলাজিৎ কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়েছিল। তারপর হেসে বলেছিল, এখানে চাকরি পেয়েছি। আরবান ডেভেলপমেন্টে পোস্টিং।

—কবে? অভিজ্ঞান খুব খুশি হয়েছিল।

—মাস তিনেক আগে।

—তিন মাস! তা, আমার সঙ্গে একবারও দেখা করলে না কেন? শ্যামাদা কেমন আছেন?

চোখ নামিয়ে শিলাজিৎ বলেছিল, ভাল। বাবা আপনার কথা বারবার বলেছে। কিন্তু আমি অনেক খোঁজ করেও আপনাকে পাইনি। আসলে ঠিক ঠিক ডিপার্টমেন্টটা না-বলতে পারলে...এতবড় অফিস। এতগুলো ফ্লোর! আপনি কোথায় আছেন, অভিদা!

—ইরিগেশনে।

—তার মানে ব্লক জে? শিলাজিৎ ঠোঁট কামড়ে বলেছিল।

—হ্যাঁ। এই তো তুমি জান। অভিজ্ঞান চোখ সরু করেছিল।

মৃদু হেসে শিলাজিৎ বলেছে, ওইটুকুই জানি। আপনি যে সেচ দপ্তরে আছেন, তা তো বাবাও জানে না।

একটু ইতস্তত করে অভিজ্ঞান জিজ্ঞেস করেছিল, ওই অফিসে শ্যামাদার জায়গায় তোমার চাকরিটা হওয়ার কথা ছিল না!

চোখেমুখে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে শিলাজিৎ বলেছিল, বাদ দিন তো বাবার কথা! ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অফিসাররা ওইরকম কিছু একটা বলেছিলেন। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওঁরা স্পষ্ট বললেন, আমাদের এখন নতুন লোক নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। তাছাড়া এইভাবে ব্যাক ডোর দিয়ে কাউকে নেওয়া হবে না।

শূন্যপদের জন্য ভবিষ্যতে ওঁরা বিজ্ঞাপন দেবেন। তখন প্রতিযোগিতায় পাশ করলে চাকরি।

—সে কী! শ্যামাদা যেখানে এত বছর সার্ভিস দিলেন, সেখানে তাঁর ছেলের জন্যে কোম্পানি কিছু করবে না!

শিলাজিৎ বেশ ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, কেন করবে বলুন তো।

—বাঃ, মানুষের প্রতি একটা গ্রাটিচিউড বলে কিছু থাকবে না।

চোয়াল শক্ত করে শিলাজিৎ বলেছে, যুগ পাল্টে গেছে অভিদা। সেটা আপনিও ভালই জানেন। দেখুন, বাবার ভরসায় আমি বসে থাকিনি। ওখানকার দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই আপনার কথা মনে পড়ে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে এইসব কমপিটিটিভ এগজামগুলোর জন্য তৈরি করতে শুরু করি।

ও যে কারও প্রেরণা হতে পারে, এটা জানতে পেরে অভিজ্ঞান বেশ অবাক হয়ে গেছিল। সেই সঙ্গে একটা হালকা ভাল-লাগা ওকে তখন সাদা মেঘের মতো ভাসিয়ে দিয়েছে শূন্যে। অভিজ্ঞান বলেছিল, চল, তোমাকে আমার ঘরটা দেখিয়ে দিই। যখনই দরকার হবে চলে আসবে।

সেই মুহূর্তে একটা চাপা আবেগ অভিজ্ঞানকে চালনা করেছিল। প্রথম অফিসের স্মৃতি, ওর প্রতি শ্যামাদার সতর্ক অভিনিবেশ আর স্নেহ, শিলাজিতের সার্ভেন্ট হয়ে যাওয়া—সব মিলিয়ে তখন অভিজ্ঞান অন্য আর এক অভিজ্ঞান হয়ে গেছে।

মাসের মধ্যে দু'একবার শিলাজিতের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়। শ্যামাদা কেমন আছেন—এই প্রশ্নটা এখন একটা অভ্যাসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। শিলাজিতের উত্তরে অবশ্য নানা স্তর, মাত্রা কিংবা স্বরক্ষেপ থাকে। 'বাবা ভালই আছে।' 'প্রস্টেটের গণ্ডগোলে ভুগছে তবু কথা শোনে না।' 'বয়স হয়ে গেলে যা হয় টুকটাক অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে।' 'বাবার শরীরটা কদিন ভাল নেই।' 'পা-টাগুলো মাঝে মাঝে ফুলছে, হজমের গণ্ডগোল। তার ওপর আজকাল খুব মেজাজ হয়েছে।'

অনেকটা বিবৃতির মতো শোনে অভিজ্ঞান। নিজের মতামত দেয়। এক-একদিন বলে শ্যামাদাকে দেখতে যাব। অফিস ছুটির পরে অথবা সামনের রবিবার।

কেন কে জানে, শিলাজিৎ তখনই উৎসাহিত হয়ে বলে, আজ যাবেন, অভিদা?

অযথা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে অভিজ্ঞান বলে, আজ হবে না ভাই। বিরাটিতে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।

—তাহলে আগামী রবিবার! শিলাজিৎ খুব আশা নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, বাবা একসময় হয়তো সব কিছু ভুলে যাবে কেবল আপনাকে ছাড়া। আপনাকে আমার চেয়েও বাবা ভালবাসে।

অভিজ্ঞান ম্লান হাসে, দুর, তা কখনও হয়। আসলে শ্যামাদা খুব স্মৃতিকাতর মানুষ। ওঁর কাছে আমার অনেক ঋণ।

শিলাজিৎদের বাড়িতে যাওয়ার প্রসঙ্গটা ধীরে ধীরে পাল্টে যায়। তখন অন্য কথা ওদের ঘিরে ধরে হয়তো। অথবা খানিক নীরবতার পরে অভিজ্ঞান জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, যাব, একদিন যাব। আমিও নানান ঝামেলায় রয়েছি ভাই। শ্যামাদাকে

বোলো, একদিন সারপ্রাইজ ভিজিট দেব।

স্মিত হেসে শিলাজিৎ মাথা নাড়ে। হয়তো ওর কথা বিশ্বাস করে, কিংবা করে না। অভিজ্ঞান ওর দপ্তরে ঢুকে যায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গিরিজাদার কাছ থেকে শোনা রসালো ঠাট্টাগুলো মনে করে হাসে।

টেবিলের সামনে এসে একটু ঝুঁকে অভিজ্ঞান বলল, কী ব্যাপার।

ওকে দেখে চেয়ার ছেড়ে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়ে শিলাজিৎ ভয়ংকর শুকনো হাসল, আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছ?

প্রশ্নটা শিলাজিৎ এইভাবে, এমন সরাসরি করবে অভিজ্ঞান ভাবতে পারেনি। দারুণ দুর্যোগ এবং সংক্ষোভে মানুষের চেহারা এমন হয়ে যায়। অনতিক্রম্য কোনও বেদনা মানুষকে এমন তিমিরময় করে তোলে। আবার শারীরিক কোনও বৈকল্য কাউকে কাউকে পাণ্ডুর বর্ণে ঢেকে দেয়। একটু থমমত খেয়ে অভিজ্ঞান বলল, তোমার শরীর খারাপ!

—আমার নয়, অভিদা, বাবার। শিলাজিৎ এবার আর হাসল না।

—কী হয়েছে, শ্যামাদার? অভিজ্ঞান মুহূর্তে যেন রহস্যের আবর্তে পড়ে গেল। একজন বয়স্ক মানুষ কতদূর অসুস্থ হলে তার পুত্রের চেহারা এমন বিধ্বংসী হতে পারে, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞানের কোনও ধারণা নেই। ওর বাবা মৃত। মায়ের স্বাস্থ্য ষাট বছর পেরিয়েও চমৎকার। ওর স্ত্রী কিঙ্কিণী এখন সন্তানসম্ভবা। সমস্ত রকম মধ্যবিত্ত সতর্কতার ঘেরাটোপে অভিজ্ঞান ওর স্ত্রীকে নজরবন্দি করে রেখেছে।

—রেনাল ফেলিওর। স্থির চোখে, অকম্পিত গলায় শিলাজিৎ বলল।

—তার মানে? অভিজ্ঞান স্পষ্টতই কেঁপে উঠল, হঠাৎ!

মৃদু মাথা নেড়ে শিলাজিৎ বলল, হঠাৎ কেন হবে। এসব রোগ তো আর হঠাৎ হয় না অভিদা। কিডনি দুটো ভেতরে ভেতরে আগেই ড্যামেজ হয়ে গেছিল। এখন একেবারে ফাইনাল স্টেজ।

—তোমরা আগে থেকে কিচ্ছু ধরতে পারনি। অভিজ্ঞান হঠাৎ ক্ষুব্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল!

—কিছু কিছু সিম্পটম তো ছিলই। শিলাজিৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথার দু'পাশের চুলের গোছা পেছনে ঠেলে বলল, অতটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি।

শ্যামাদার ছেলের কথাগুলো ভীষণ নিষ্ঠুর শোনাল। অভিজ্ঞান বিরক্তি ঝরিয়ে জানতে চাইল, এই লাস্ট স্টেজটা কবে জানলে?

ঠোঁট উল্টে শিলাজিৎ বলল, মাসখানেক আগে। তারপর থেকেই আমার দিশেহারা অবস্থা। বুঝতেই পারছ।

—আমাকে একবারও জানালে না। অভিজ্ঞানের গলায় অযথা অভিমানের ছোঁয়া। একটু চুপ করে থেকে শিলাজিৎ ফিকে হেসে বলল, জানালে আর কী করতে পারতে, অভিদা। সব কিছু তো হাতের বাইরে চলে গেছে। এখন রেগুলার ডায়ালিসিস ছাড়া বাবা আর বাঁচবে না। আমি পি জি হসপিটালে বাবাকে নিয়ে গেছিলাম। ওখানে বাবাকে ওরা ভর্তি নিল না।

—কেন? অভিজ্ঞান গভীর উৎকণ্ঠায় আবার কেঁপে উঠল। একটা সির সির অনুভব ওকে অস্থির করে তুলছে।

হতাশা, তাচ্ছিল্য আর অন্ধকার মিশিয়ে শিলাজিৎ বলল, বাবার যা বয়েস তাতে ওঁরা এই ফালতু চিকিৎসায় যেতে নারাজ। ওখানকার এক ডাক্তার আমাকে আড়ালে ডেকে বুঝিয়ে বললেন, আপনার বাবা যে-বেডটা দখল করে রাখবেন, সেটা কোনও তরুণ কিংবা মাঝবয়সী মানুষের পক্ষে আরও জরুরি। এরপর আমি আর কোনও অ্যাপ্রোচ করতে পারিনি।

—তাহলে এখন কী হবে? অসহায় স্বরে অভিজ্ঞান বলল।

—বাড়িতে ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু আমার পক্ষে...

শিলাজিৎ থেমে গেল। ওর মুখের রঙ এতটুকু বদলায়নি। বরং এই মুহূর্তে আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে।

অন্ধকার যতই জমাট বাধা হোক, যতই ঘন হোক যে-কোনও আলোর স্পর্শে এক লহমায় তা দূর হয়ে যায়। সেই স্বল্পতম চকিত আলোর জন্যেই কি শিলাজিৎ ওর কাছে এসেছে। অভিজ্ঞান বুঝতে পারছে না। এইসব দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় জলের মতো টাকা খরচা হয়ে যায়। তবু মৃত্যুব দ্বার থেকে মানুষ ফিরে আসেন না। অথচ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষটির আত্মীয়স্বজনরা লড়াইয়ে নামে। যদিও একপেশে লড়াই, হার অনিবার্য জেনেও মানুষ পুরুষকারকে পণ করতে ভালবাসে। কিংবা পণ করতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে জেনেও রোগ আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

মৃত্যু যখন তার কাজ শেষ করে দিয়ে চলে যায়, তারও অনেক পরে, শূন্যতা আর হাহাকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জীবিত মানুষেরা ভাবে, এই সংগ্রামের কোনও দরকারই ছিল না। পুরোটাই অর্থহীন। কিন্তু ততদিনে আর্থিক দুর্বলতা তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে নেয়, ঋণের জাল জড়িয়ে ধরে অচ্ছিন্ন বন্ধনে। তখন তার এক করুণ অবস্থা। পরাজয়ের গ্লানির সঙ্গে জীবনযাপনেব সংকট।

এই অবস্থায় শিলাজিৎ নিশ্চয়ই ওর কাছে সহানুভূতি কিংবা সহমর্মিতার জন্য আসেনি। তাহলে কি টাকা? কিন্তু কত? কিছু টাকা তো অভিজ্ঞান দিতেই পারবে। শ্যামাদার চিকিৎসায় সেই টাকা যদি কোনও কাজে লাগে তাহলে ও স্বস্তি পাবে। মানুষটার প্রতি ওর ঋণ অপরিমেয় নয়, বাইরে থেকে সেটা দেখাও যায় না। কিন্তু তা গাছের সঙ্গে মাটি আর জলের ঋণের মতো। শিলাজিৎ যদি অনেক টাকা চায় তাহলে অভিজ্ঞান কিছুতেই দিতে পারবে না। আর দু'মাস পরেই কিঙ্কিণী ওর সন্তানের জন্ম দেবে। নর্মাল ডেলিভারি না-হলে নার্সিংহোমের পেছনে তখন বিস্তর খরচা। তারপর নবজাতক কিংবা নবজাতিকার নতুন পৃথিবী সাজাতে গিয়ে অনেক টাকার দরকার হবে। কয়েক মাস আগে থেকেই অভিজ্ঞান সব কিছু গুছিয়ে পরিকল্পনা করে রেখেছে। টাকা-পয়সার সংস্থান নিয়েও ও এখন মোটামুটি চিন্তামুক্ত। শিলাজিৎকে টাকা দিতে হলে দিতে হবে জমানো পুঁজিতে। যদিও শিলাজিৎকে টাকাটা দেবে ওর প্রিয় শ্যামাদার জন্য। অভিজ্ঞান ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করল।

আচমকা শিলাজিৎ উঠে পড়ল। এক মিনিট কী ভেবে বলল, অভিদা, তোমাকে সব

জানিয়ে গেলাম। পারলে একদিন বাবাকে দেখতে যেও। অসুখের গুরুত্ব বুঝতে পেরে বাবা কদিন খুব গুম মেরে আছে। তবে ওষুধ-টষুধ খেয়ে একটু চাঙ্গা হলেই তোমার কথা বলবে। বাবা কিছুতেই যেন বুঝতে চায় না, প্রত্যেকের আলাদা জগৎ, প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ আছে। আচ্ছা চলি। দেখা করতে যদি যাও তাহলে বাবাকে বোলো, আমি তোমাকে সব জানিয়েছি। ওর ধারণা তোমার সঙ্গে আমি কোনও যোগাযোগই রাখি না।

ধীর পায়ে শিলাজিৎ সার সার টেবিলের প্যাসেজগুলো দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে। অভিজ্ঞান শ্যামাদার ছেলের কাছে হেরে গেল। শিলাজিৎ একটা পয়সাও ওর কাছে চাইতে আসেনি। শুধু দুর্বিপাকের নির্মম খবরটা দিয়ে রাজার মতো চলে যাচ্ছে। শিলাজিতের কোথাও কোনও ঋণ নেই। বাবার শূন্যপদে ও চাকরি পায়নি। নিজে পরিশ্রম করে পরীক্ষা দিয়ে এই সরকারি অফিসে ঢুকেছে। ওকে কেউ পেছন থেকে ব্যাক করেনি, চেনাজানার কোনও সূত্রই শিলাজিতের নেই।

ঘরের হট্টগোলের মধ্যে অভিজ্ঞান, পরাজিত অভিজ্ঞান স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকের টেবিল থেকে রণজিৎ মুখার্জি হেঁকে বলল, অভি, আমাকে কল্যাণী সাব-ডিভিশনের ফাইলটা একটু দাও তো। আমি অনেকক্ষণ বসে আছি। তোমাকে তো আবার সিটেই পাওয়া যায় না।

রণজিৎ সকলকে শুনিয়ে ওকে অযথা অপমান করল। অন্যদিন হলে অভিজ্ঞান হয়তো পাল্টা জবাব দিত। কিন্তু আজ ওর মনের সমস্ত বাঁধনগুলো আলগা হয়ে গেছে। হৃদয়ে জলপ্রপাতের দুরন্ত প্রবাহ। অভিজ্ঞান ফাইল-র‍্যাকের সামনে নীচু হয়ে খোঁজার কাজটা শুরু করতেই আবার শিলাজিৎ। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, অভিদা, তোমার কাছে শ'দুয়েক টাকা হবে! আমার পিসতুতো ভাই রন্টু বলেছিল তিনটের মধ্যে আসবে। ওর টাকা নিয়ে আসার কথা। কিন্তু এখনও তো এল না। অথচ টাকাটা ভীষণ দরকার। বাবার জন্য মেডিক্যাল গুড্স নিয়ে যেতে হবে। অন্তত একটা জিনিস খুব জরুরি।

মাত্র দু'শো টাকা! অভিজ্ঞান যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। দু'শো কেন, শিলাজিৎ যদি হাজার খানেক টাকা চাইত, তাহলেও আজ দেওয়ার ব্যাপারে ওর কোনও অসুবিধে হত না। ওর কাছে এই মুহূর্তে হাজার দেড়েক টাকা আছে। উড স্ট্রিটের একটা ল্যাব থেকে আজ কিঙ্কিণীর প্রেগন্যান্সির আলট্রা-সোনোগ্রাফির রিপোর্ট আর প্লেটগুলো নিতে হবে। আগামীকাল গাইনি ডাক্তারবাবু দেখবেন। অবশ্য রিপোর্টগুলো কাল দুপুরে নিলেও হয়। কেননা ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাত আটটায়। আসলে কিঙ্কিণীই ওর আত্মজর সোনোগ্রাফিটা দেখার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে। পেটের ভেতরে যে নড়ছে তাকে দেখার জন্য একজন নতুন মায়ের কৌতূহল অস্বাভাবিক কিছু নয়। সোনোগ্রাফির খামটা না-নিয়ে গেলে কিঙ্কিণী হয়তো রাগ করবে। তবে শ্যামাদার খবরটা শুনলে, শান্ত হতে ওর দেরি লাগবে না। মৃত্যুর দরজার দিকে যিনি পা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর ওপর রাগ করা না-করা সমান। তাঁর প্রতি অনুকম্পা ছাড়া এখন আর কী-ই বা অবশিষ্ট থাকতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞান ওর অফিস ব্যাগ থেকে পার্স বের করল। একশো টাকার পাঁচটা নোট শিলাজিতের হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখো।

—আরে, এত দিচ্ছ কেন? শিলাজিৎ অবাক বিস্ময়ে টাকার গোছাটা ওর দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, দু'শো হলেই চলবে।
—ঠিক আছে। জানি। তুমি রাখো তো! যদি তোমার পিসতুতো ভাই আদৌ না আসে।
শিলাজিৎ আনমনে মাথা নাড়ল। তারপর উদাসী গলায় বলল, ঠিক আছে, দাও।
অভিজ্ঞানের বুকের ওপর থেকে যেন পাথর নেমে গেল। অথচ এমন অনুভূতির কোনও উপলক্ষই নেই। অভিজ্ঞানের ভেতরটা যেন পালকের মতো হালকা হয়ে গেছে। আবেগে বুজে আসছে গলা। অভিজ্ঞান কোনও কিছু না ভেবে বলল, আজ যদি শ্যামাদাকে দেখতে যাই, কোনও অসুবিধে হবে।
—অসুবিধে! শিলাজিৎ আকাশ থেকে পড়ল, অসুবিধে হবে কেন! তুমি যাবে...বাবা কত খুশি হবে জানেন! ওর অফিসের পুরনো কলিগরা তো কেউ খোঁজই নেয় না!
—তাহলে তোমার সঙ্গেই যাব।
—আমার একটু বেরোতে দেরি হতে পারে অভিদা।
—ঠিক আছে। আমি ডিপার্টমেন্টেই থাকব। এখানে আমাকে না-পেলে তিনতলায় গিরিজাশঙ্করবাবুর কাছে একটু খোঁজ করবে কিন্তু। আই অ্যান্ড সি ডিপার্টে। আচ্ছা, শোন, আমিই তোমার কাছে যাব। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। কেমন!
মাথা ঝুঁকিয়ে শিলাজিৎ চলে গেল। ছেলেটা হয়তো ভেতরে ভেতরে এক ভয়াবহ পরিণতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছে। শ্যামাদাকে কি আদৌ ডায়ালিসিস চিকিৎসা করাবে শিলাজিৎ? অস্বাভাবিক খরচের কথা ভেবে ও হয়তো নিষ্ঠুরের মুখোশ পরে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো বাড়িতেই ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করবে। যতই যা হোক, শ্যামাদা তো শিলাজিতের বাবা!
কাজে আর মন বসছে না। একটি নির্লোভ, সহমর্মী মানুষের এই রোগ-যন্ত্রণাময় পরিণতির কথা ভাবাই দুঃসাধ্য। অথচ এমনভাবেই শেষ হচ্ছে একটি করুণ গল্প।
অকস্মাৎ অভিজ্ঞানের মনে পড়ে গেল, আজ কিঙ্কিণীর জন্যে কমলালেবু নিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে বসেছে ও। এখন বর্ষার শেষ, শরতের শুরু। এই সময় কমলালেবু পাওয়া যায় না। কিন্তু একজন গর্ভবতী নারীর মনে খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে এমন সব বিচিত্র ইচ্ছা এই সময় নাকি জেগে ওঠে। শীতকালের ফল বর্ষাকালে খাওয়ার জন্য কিঙ্কিণী ক'দিন ধরে ছটফট করছে। রোজই অভিজ্ঞান এটা-ওটা বলে ওকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজ যেখান থেকে হোক কমলালেবু নিয়ে না-গেলে কিঙ্কিণী ভীষণ অশান্তি করবে, কাঁদবে। গিরিজাদা কালই বলেছিলেন, নিউ মার্কেটে পেয়ে যাবি। ওদের কাছে অকালের ফল থাকে। তবে দাম বেশি।
আজ নিউ মার্কেট থেকে কমলা নিয়ে যেতেই হবে। তালেগোলে অভিজ্ঞান একদমই ভুলে গিয়েছিল। তার মানে আজ শ্যামাদার বাড়িতে যাওয়া অসম্ভব। অথচ এই একটু আগে ও শিলাজিৎকে বড় মুখ করে বলল শ্যামাদাকে দেখতে যাবে।
অ্যালট্রা-সোনোগ্রাফির রিপোর্ট কিংবা কমলালেবু—এই দুটোর একটা নিয়ে যেতেই হবে। কিঙ্কিণীর এই শারীরিক অবস্থায় ওকে কোনওরকম আঘাত দেওয়া চরম

অপরাধ। ডাক্তার চক্রবর্তী অভিজ্ঞানকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন।

অভিজ্ঞান মহা সমস্যায় পড়ল। এই অবস্থায় চুপিচুপি বাড়ি পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই। কিন্তু সেটাও চরম অসভ্যতা। অমানবিক অভিঘাত। অভিজ্ঞান আবার ঘামতে শুরু করল।

আজ যদি ও শ্যামাদাকে দেখতে যেতে না-পারে, তাহলে আগামীকালও পারবে না। ডাক্তার চক্রবর্তীর চেম্বারে যেতে হবে কাল। এরপরে আগামী পরশু অন্যতর কোনও উৎপাত এসে হাজির হবে। আর হয়তো যাওয়াই হবে না। শ্যামাদার বাড়ি ব্যারাকপুর। ষষ্ঠীতলায়। স্টেশনের কাছেই। তবু কলকাতা থেকে যাতায়াত এবং ওঁর বাড়িতে কিছুটা সময় থাকা—সব মিলিয়ে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা লেগে যাবে।

অভিজ্ঞান ভাবল, এখুনি একবার নিউ মার্কেট থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়! কমলালেবু নিয়ে রাত করে বাড়ি ফিরলেও কিঙ্কিণী খুশি হবে। এখন বাজে চারটে পাঁচ। এরই মধ্যে অফিসের দু'-একটা চেয়ার ফাঁকা হতে শুরু করেছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ওর দপ্তরের হেড মণিময়বাবুকে বলে অভিজ্ঞান বেরিয়ে এল। হেঁটে এবং কিছুটা বাসে নিউ মার্কেটে দশ মিনিটে পৌঁছে গেল অভিজ্ঞান। গিরিজাদা যেভাবে বলেছিল, তাতে কমলালেবু পাওয়ায় ব্যাপারে ওর ধারণা ছিল স্থির এবং নিশ্চিত। কিন্তু ব্যাপারাটা ঠিক উল্টো। সাজানো-গোছানো কোনও ফলের দোকানেই কমলালেবু নেই। একজনের কাছে কমলার মতো দেখতে নওরঙ্গ নামে একটা ফল কিছু ছিল। কিন্তু মুসলমান দোকানি সন্তানসম্ভবা মা খাবে শুনে কিছুতেই রাজি হলেন না। বরং উল্টো বললেন, পৃথিবীতে যে-শিশু এখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি তাকে মিথ্যে কোনও কিছু দিয়ে ভোলানো মহাপাপ। পাপ-পুণ্যের চেয়ে বড় কথা, গর্ভবতী বা যদি জানতে পারে, কমলার বদলে সে নওরঙ্গ খেয়েছে, তাহলে দারুণ আঘাত পাবে। সেই আঘাত ক্ষতি করবে পেটের সন্তানের।

অভিজ্ঞান ব্যর্থ হয়ে আবার অফিসে ফিরে এল। এখন পাঁচটা কুড়ি বাজে। অফিস অর্ধেক ফাঁকা। ভিজিটর আর প্রত্যাশীদের ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। কমলালেবুর বদলে কিঙ্কিণীর আকাঙ্ক্ষা কিছুটা পূরণ করবে সোনোগ্রাফির রিপোর্ট। সাড়ে সাতটার মধ্যে ল্যাবে না গেলে রিপোর্ট পাওয়া যাবে না।

মুখের মধ্যে একগাদা থুথু এসে জমা হয়েছে। বিধ্বস্ত অভিজ্ঞান ধীর পায়ে নগরোন্নয়ন দপ্তরের নির্দিষ্ট ঘরে এল। শিলাজিৎ ওর চেয়ারে বসে আছে। ওর পাশে একটি তরুণ। কাছে এসে শিলাজিতের পিঠে হাত রেখে অভিজ্ঞান নিদারুণ লজ্জায় বলল, আজ আর তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। আমার অন্য কাজ আছে। খুব খারাপ লাগছে ভাই।

শিলাজিৎ অপলকে ওকে দেখে ম্লান হাসল। তারপর পকেট থেকে পাঁচশোটা টাকা বের করে বলল, অভিদা, আপনার টাকাটা নিন। এই যে রন্টু এসেছে। আমি টাকা পেয়ে গেছি। এই নিন।

নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট গাছের মতো মুহূর্তে ঝলসে গেল অভিজ্ঞানের সমস্ত সত্তা।

একটি আত্মজীবনীর ছেঁড়া পাতা

আমার সেই কোন ছেলেবেলায় একটা গান শুনেছিলাম। বাউল গান। এখনও আবছা আবছা মনে আছে। নানা কাপড়ের তাপ্পি মারা গেরুয়া আলখাল্লা গায়ে, মাথায় সরু কাপড়ের পাগড়ি, হাতে একতারা। ভরদুপুরে ভিখিরি বাউলটি ঝিনুকখোলতলার চওড়া মাঠ ভেঙে, গান গাইতে গাইতে আমাদের পাড়ায় এসেছিল। গানের কথাগুলো যতদূর মনে পড়ে এইরকম ঃ

আমার চৌদ্দপোয়া নৌকাখানি
ভাসলো কত সাগরজলে
এখন দীঘিব জলে টানাটানি।

সেদিন অবাক চোখে বাউলকে দেখেছি। মনে মনে ওর পেছু নিয়ে চলে গেছি কতদূর! পাড়া ছাড়িয়ে, মাঠঘাট পেরিয়ে মহানন্দার পাড় ধরে ধরে পুব বাংলার দিকে। সেই চলে যাওয়ার পেছনে কোনও বন্ধন ছিল না। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কত অনন্ত পথ আমরা হেঁটে চলে যাই সারাজীবন! তখন গানের মানে বুঝিনি এতটুকু। বোঝার বয়সও হয়নি। এখন একটু একটু বুঝতে পারি। আর নিজের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে-কৌতুকে ছটফট করে উঠি। এ গান যেন আমারই জীবনকথা। সেই বাউল কোত্থেকে যে নিয়ে এসেছিল! পুরো গানটা কি সেদিন শুনেছিলাম? মনে নেই। প্রায় ষাট বছর আগের কথা। এতদিনে কত জীর্ণ পাতা ঝরে গেছে আমার জীবনবৃক্ষ থেকে। ঝরা পাতারা কোথায় উড়ে গেছে কে জানে! সেইসব পাতায় কি লেখা আছে অনল বসুর জীবনের ইতিহাস! আমি স্পষ্ট করে জানি না। শুধু বুঝতে পারি, কত সাগরের হাতছানি পেরিয়ে এসে একটা সীমার মধ্যে, সীমানার মধ্যে এখন আটকে গেছি। এ যেন চেনা জল, চেনা জলজ। আর হয়তো কোনওদিন বেরোতে পারব না। আমি সেই বাউলের মতো বৈরাগী হতে পারিনি। আবার কোনও বন্ধনকে স্বীকার করিনি কখনও। যদিও মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক মিলনকে আমি চিরদিন বড় করে দেখেছি। এই মিলনের সংযোগগুলিই কি নৌকোর মতো জীবনসমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসছে, দুলছে, চলে যাচ্ছে এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে? তারপর সাগর থেকে নদী, নদী থেকে দিঘিব বদ্ধজলে সেই নৌকোগুলো কখন এসে পৌঁছে যায় বুঝতে পারে না কেউ। জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে মানুষ এইভাবেই এগিয়ে চলেছে। কত নৌকোয় কতবার।

এক একসময় সেই ছেলেবেলার দিনগুলোতে, কৈশোরের মুহূর্তগুলোতে, যৌবনের

পরমলগ্নে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। নদীর ধারে আমাদের সেই ছোট্ট একতলা টিনের চালের বাড়িটা এখন আর নেই। সেই ভয়ংকর বন্যার জলছবি কোনওদিন আমার মন থেকে মুছে যাবে না। প্রথমে একটু একটু করে তারপর হঠাৎ মহানন্দা গিলে নিয়েছিল সেই ছোট্ট বাড়িটাকে। আমার একবার মনে হয়েছিল, নদী যে কোনওদিন বাড়িটাকে হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে। হলও তাই।

মা নদীর জলে স্নান করতে কী ভালবাসত। পুজোর পব থেকে নদীর জল কমতে শুরু করত একটু একটু করে। বর্ষার আগে পর্যন্ত কোথাও হাঁটু জল, কোথাও তার চেয়েও কম। মা তারই মধ্যে টুক করে চান করে নিত। অদ্ভুত কায়দায়। হাঁস যেভাবে পালক ভেজায়। আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে মায়ের স্নান দেখতাম। মা কখনও ঘাট দিয়ে জলে নামত না। নদীর ঢালু পাড় ধরে খানিকটা হেঁটে এসে মা কোনও একটা জায়গা আবিষ্কার করত। এমন জায়গা যেখানে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। ফলে মায়ের প্রতিদিনের স্নান হয়ে উঠত ভীষণ পবিত্র। কুমারী মৃত্তিকার সঙ্গ আর বন্ধনহীন জলের নিষ্কলুষতা মা আজীবন পেতে চেয়েছে।

মহানন্দার সঙ্গে মায়ের সখ্য কখন যেন আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে গেছিল। কৈশোরের দিনগুলোতে সেই মাতৃসমা নদীর জলে কী অবাবিত আশ্রয় পেয়েছি। নদী আমাকে কখনও বকাবকি করেনি। কষ্ট দিয়ে ফিরিয়েও দেয়নি। আমার জীবনে যেটুকু দস্যিপনার দিন এখনও স্মৃতি হয়ে আছে, উদ্দাম, দামাল এক কিশোরের অস্পষ্ট ছবি অতীতের অ্যালবামে এখনও থেকে গেছে, তা ওই মহানন্দার প্রশ্রয়ে। বেঁচে থাকার তাড়নায় যেদিন মহানন্দাকে ছেড়ে গঙ্গাব কাছে চলে এলাম, সেদিন টের পেয়েছিলাম শুধু মালদার মাটি নয়, নদীও বুকের মধ্যে ঝড় তুলেছে। গঙ্গা অনেক বড়, অনেক উদার, বিস্তৃত, ঐতিহ্যে মহান, বহু বহু মানুষের জীবন-মরণের সাক্ষী। গঙ্গার অনেক কিছু আছে, কিন্তু মহানন্দার মতো স্বপ্নিল নয়। উজাড়-করা ভালবাসা দিয়ে গঙ্গা আমাকে টেনে নিতে পারেনি। খেয়া পেরিয়ে এই নদীর বুকের ওপর দিয়ে কতবার গেছি-এসেছি। কিন্তু একবারও মনে হয়নি, এ নদী আমার। আমি নদীর। গঙ্গাকে আমি ভালবাসতে পারিনি। গঙ্গা পেরেছে কি। এই স্রোতস্বিনীর কাছে আমি এখনও দূরের স্বজন।

এক একদিন মহানন্দার পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে কতদূর চলে গেছি। চলতে চলতে পেছনে ফেলে এসেছি কিশোর বয়সের দিনগুলি। তখন আমার বয়স যৌবন ছুঁয়েছে। যৌবনের বসন্তরাগ ধ্বনিত হচ্ছে আমার সারা শরীর থেকে। আমার কাছে মহানন্দা তখন আর খেলার সাথী শুধু নয়, জীবন-দর্শনের এক একটি পাতা। পূর্ণিমা রাতে একলা নদীর পাড়ে চুপটি করে বসে থাকতাম। ভাবতাম, কত ক্লেদ বয়ে নিয়ে চলেছে এই জল অথচ ওর নিজের বুকে কোথাও এতটুকু কালিমা লেগে নেই। মানুষের ভেতর ও বাইরেটা কেন এমন হয় না! তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম. মহানন্দা আমি তোমার মতো হব। কেবলই বহমান, কেবলই চলমান।

কত প্রতিজ্ঞা আমাদের জীবনে ফুলের কুঁড়ির মতো থেকে যায়, আর ফুল হয়ে ফোটে না। শেষ পর্যন্ত আমি চলিষ্ণু হতে পারলাম কই। ঝিনুকখোলতলার মাঠ বেয়ে

যে-গান বুকের মধ্যে এসে মিশে গেছিল একদিন, সেই গান আজ সত্যি হয়ে উঠেছে। ও বাউল, অজানা বাউল, তুমি কেন ওই গান শুনিয়েছিলে? না-হওয়ার বেদনা আজকাল আমার মধ্যে প্রবল হয়ে বেজে ওঠে।

যে-বছর বন্যায় আমাদের স্বপ্নের বাড়িটা জলের শরীরে মিশে গেল, সেই বছরই আমার দিদির বিয়ে হল। আর আমরা চলে এলাম ইংলিশবাজার পুরসভার কাছে একটা ভাড়াবাড়িতে। দোতলা বাড়ি। বাড়িওয়ালার নাম আনন্দবাবু। আনন্দ মজুমদার। কালো, একটু বেঁটেখাটো পেটানো চেহারার ভদ্রলোক একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে অনল না কি আগুন বলে ডাকব? আমার মৃদুভাষিণী মা ভদ্রলোককে বলেছিল, ওকে আপনি ওর ডাকনাম ধরে ডাকবেন না হয়!

—কী যেন তোমার ডাকনামটা? মজুমদার জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমি বোকার মতো হেসে বলেছিলাম, লালা।

—লালা! ভদ্রলোক চোখ নাচিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন। ঈষৎ বাঁকা হেসে বলেছিলেন, হিন্দিতে বলে মেরি লাল! তার থেকে আদর করে লালা! তাই না!

—সেটা মা-ই বলতে পারবে। আমি তখন হাসছিলাম, আমার দিদির ডাকনাম নীলা।

—ও, আই সী। রেড অ্যান্ড ব্লু। তার মানে রঙে চোবানো নাম। ভেরি গুড। আনন্দ মজুমদার খুব মজা পেয়েছিলেন।

মা সামান্য লজ্জা পেয়ে ঘরে ঢুকে গেছিল। যতদূর মনে আছে ভদ্রলোক বাজারে যাচ্ছিলেন। ছুটির দিনের বাজার। তাই একটু দেরি করে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন। কোনও তাড়া ছিল না। কী মনে করে আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, ইয়ংম্যান, যদি একটু খুঁটিয়ে দেখ, তা হলে দেখবে আমাদের সারা জীবনটাই রঙ মাখানো। আবার একরকম রঙ নয়। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন মুহূর্তে এক একরকম রঙ। বড় অদ্ভুত। এই যে এখন তোমার যা বয়স তা সবুজ রঙে মাখামাখি হয়ে আছে। সবুজের মধ্যে হয়তো তারতম্য আছে। শ্যামলিমার বিভিন্ন শেড! কিন্তু এককথায় তোমার বয়স সবুজ বয়স।

—আর আপনার রঙ? আমি মৃদু কৌতুক অনুভব করেছিলাম।

—পেল ইয়োলো। অনুজ্জ্বল। পাতা ঝরে যাওয়ার আগে যেমন রঙ হয়। মজুমদারের গলায় একটু হতাশার ছোঁয়া ছিল।

—তাই কি! সেদিনের সেই কলেজ পড়ুয়া আমি আর একটু সাহসী হয়ে বাড়িওয়ালার কথায় মৃদু সংশয় প্রকাশ করেছিলাম।

—নিশ্চয়ই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলাবেই। আলবাত। অবধারিত। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

—কিন্তু কত মানুষ আছেন, বৃদ্ধ বয়সেও কী ভীষণ চনমনে, ডায়নামিক! যুবকদেরও হার মানিয়ে দেন।

—অকালের ফল বলে একটা কথা আছে জানো?

আমি নীরবে হ্যাঁ জানাতেই আনন্দ মজুমদার বলেছিলেন, গুড। শীতকালে আম, গরমকালে কমলালেবু এইসব আর কি! এগুলোর পেছনে একটাই কারণ—প্রকৃতির খেয়াল। নাথিং বাট এ ক্যাপ্রিস অর হুইম। অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো রিজন। কোটি কোটি লোকের মধ্যে ওরা একেবারেই একসেপশনাল। ওই লোকগুলোকেই সত্যি ধরে নিয়ে কোনও বিচার বা সিদ্ধান্ত চলে না। ওদের বাদ দিয়ে অন্যদের দিকে তাকাও, দেখবে আমি যা বললাম পুরোপুরি ঠিক।

হাত নাড়িয়ে, আঙুল নাচিয়ে ভদ্রলোক একনাগাড়ে কথাগুলো বলেছিলেন। আমি ভেতরে ভেতরে অবাক হয়ে গেছিলাম। মানুষটি বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না, জীবন সম্পর্কে এইভাবে চিন্তা করেন। জীবনের রঙ বদল নিয়ে এমন গভীরে ভাবেন। আনন্দবাবু আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। প্রত্যেক মানুষকে অন্তরের সঙ্গে, প্রত্যয়ের সঙ্গে, গভীরতার সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য প্রথমেই যে-দৃষ্টির প্রয়োজন, তার উদ্বোধন আমার জীবনে, সেই ছুটির দিনে, সকাল ও দ্বিপ্রহরের কোনও একটা লগ্নে যেন সমাধা হয়েছিল। এরপর থেকে আনন্দ মজুমদারের সঙ্গে আমি সুযোগ পেলেই কথা বলতাম। ভদ্রলোক শহরের সাব পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন। ওঁর দুই ছেলে অসীম আর নিলয়ের সঙ্গে আমার তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ওদেরকে আমার ঠিক পছন্দ হত না। দু'জনেই স্কুল লেভেলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আড্ডাবাজদের জীবন বেছে নিয়েছিল। আনন্দ মজুমদার এ নিয়ে কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে মনে পড়ে না। তবে একটা বেদনা তো ছিলই। আর ছিল বলেই, একদিন বিকেলে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই যে তুমি সদর দরজার কাছে একলা চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছ আর ওই যে স্তম্ভিত কালো মেঘ—তোমাদের দু'জনের মধ্যে কোথাও একটা মিল আছে। মানুষ যখন একলা থাকে তখন ভেতরে ভেতরে কাঁদে। ওই মেঘও কাঁদছে। একটু পরেই তা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে। মানুষ অবশ্য খুব চালাক। কান্না লুকিয়ে ফেলতে পারে।

উনি কী বলতে চাইছেন আমি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারিনি। আমার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে তিনি বলেছিলেন, সব মানুষই কাঁদছে। কেন কাঁদছে জানো? পাওয়া এবং না-পাওয়ার হিসেব মিলছে না। চাওয়া এবং না-চাওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক।

এমন আচমকা, কোনও উপলক্ষ ছাড়াই আনন্দ মজুমদার কথা শুরু করে দিতেন। আমার কোনও মানসিক প্রস্তুতি থাকত না সেই মুহূর্তে। আমি ওঁর কথা মন দিয়ে শুনতাম, নীরবে হাসতাম। কথার তালে তালও মিলিয়েছি। কিন্তু ভদ্রলোককে কখনও ভাবিনি পাগল কিংবা টকেটিভ বা নিছক কথাপ্রিয় মানুষ বলে। কেননা, কোনও নির্জন অবসরে যখন মজুমদারের কথাগুলো ভাবতাম তখন নানা চিন্তার আশ্চর্য সব দ্বার খুলে যেত। আমার বোধের জগৎ আরও পূর্ণ হয়ে উঠত। মনে মনে কতদিন আমি আনন্দবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

বড় রাস্তা, অনেক গলি, বাড়ি, পুরসভা, বাসস্ট্যান্ড, সরকারি অফিস—সব মিলিয়ে

আমাদের দ্বিতীয় আবাসের জায়গাটা ছিল জমজমাট। মহানন্দার দু'কূলে যে কোলাহলহীন বসতির মধ্যে আমার আকৈশোর কেটেছিল, তা এখানে ছিল না ঠিকই, তবে এখানে কত নতুন মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম। এখানকার জন-অরণ্যের মধ্যেই আমি আবিষ্কার করি সুদর্শন আর দিব্যনাথকে। আমারই বয়সী দু'জন কলেজের ছাত্র। সুদর্শনের ডাকনাম ছিল সতু। দিব্যনাথ সংক্ষেপে শুধু দিব্য। ওদের দু'জনের সঙ্গে একদিন হঠাৎই ডাকবাংলোর মাঠে আলাপ হয়ে গেল। কলকাতা থেকে ডাক্তার বিধান রায় গেছিলেন একটা সভা উপলক্ষে। সেই আপরাইট, টল, ব্রাইট, এভার মেমোরেব্‌ল মানুষটিকে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে স্বগতোক্তির মতো বলেছিলাম, এইসব স্মরণীয় মানুষদের একটি কণাও যদি পেতাম।

সুদর্শন আমার কথাটা শুনে ফেলেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছে। হয়তো দিব্যনাথও। সভার শেষে দিব্যনাথ বলেছিল, তুমি ঠিকই বলেছ।

আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। দিব্যনাথ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তবে কয়েক মুহূর্ত পরে নিজের উক্তি মনে করে নিজেই লজ্জা পেয়েছি।

—আমরা কোনওদিন ওঁদের ধারেকাছে যেতে পারব না। সুদর্শন ফিকে হেসে বলেছিল।

দিব্যনাথ ওর কথা মানতে পারেনি। বলেছিল, পেসিমিস্টদের মতো কথা বলছিস কেন রে! হতেও তো পারি। হয়তো বিধান রায় নয়, কিন্তু ওঁর কাছাকাছি। ডাক্তার রায়ের প্রফেশন, ওঁর পলিটিক্যাল ক্যারিশমা, দেশপ্রেম ইত্যাদি হয়তো কোনওদিন ছুঁতে পারব না। কিন্তু মহান মানুষ হতে বাধা কোথায়? যে কোনও মানুষই তো মহৎ হতে পারে তার সততা, নিষ্ঠা, ভালবাসার ভেতর দিয়ে। তাই না, বলো!

দিব্যনাথ আমাকে ওর ভাবাবেগের সমর্থক হিসেবে পেতে চেয়েছিল। আমি ওকে হতাশ না-করে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই।

সুদর্শন শব্দ করে হেসে উঠে বলেছিল, আমি বাবা এত বড় বড় স্বপ্ন দেখি না। এসব নিয়ে ভাবিও না। যা হওয়ার হবে।

—ভাবতে দোষ কি। স্বপ্নের পোলাওয়ে বেশি করে খাঁটি ঘি দিতে আপত্তি হবে কেন? আমি বলেছিলাম।

ওরা দু'জনে হেসেছিল। সেদিন থেকে আমাদের তিনজনের জীবনেই আমরা হয়ে উঠেছিলাম তিন নতুন বন্ধু। জীবনের এই পর্বের বন্ধুত্বে কোনও ছদ্মবেশ থাকে না। থাকে না শৈশবের মান-অভিমান-অবুঝপনা আর দোলাচল। অনেক গভীরে ঢুকে যায় এই সময়কার বন্ধুত্বের শেকড়। পড়াশোনার চেয়ে আমরা অনেক বেশি তন্নিষ্ঠ ছিলাম অন্যান্য বিষয়ে।

মুখে না-বললেও কিংবা অস্বীকার করলেও আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখত সুদর্শন। বড় হওয়ার স্বপ্ন, সচ্ছলতার স্বপ্ন, এমনকী একটা নিজস্ব বাড়ি করার স্বপ্ন। স্বপ্ন ছাড়া সুদর্শন থাকতে পারত না। আমরা বলতাম, সতু স্বপ্ন দেখে না, স্বপ্নের জাল বোনে। কী আশ্চর্য, কয়েক মাস আগে দিব্যনাথের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কত

বছর পরে। ও তেমনই আছে। ছটফটে। ব্যস্ত। শরীরে মেদ জমেছে। মধ্যদেশ বেশ স্ফীত। কোমরে চওড়া বেল্ট লাগিয়েও ঠেকাতে পারছে না। হাতে অ্যাটাচি কেস। আমি, সুদর্শন আর দিব্যনাথ—তিনজনেই নানা উলটপালটে মালদা থেকে ছিটকে গেছিলাম। কেউ আর সেই গৌড়-পাণ্ডুয়ার অতীত স্মৃতিসৌরভের অন্তস্থলে ফিরে যেতে পারিনি। দিব্যনাথকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, তুই দিব্য না!

হতচকিত হয়ে গিয়ে দিব্যনাথ কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়েছিল। তারপর প্রবল উচ্ছ্বাসে দ্রুত পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলেছিল, লালা! অনল! কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল! ওঃ, আমি তো ভাবতেই পারছি না।

এইসব চকিত, অপ্রত্যাশিত মিলন বহু পুরনো গল্পের, হারিয়ে-যাওয়া কথার ঝাঁপি খুলে ফেলে। সময় সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না। বহুদিনের অবরুদ্ধ আবেগ দুরন্ত নদীর মতো হৃদয়ের গুহা থেকে লাফিয়ে নেমে আসে। অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম আমরা। সবই মালদাকে ঘিরে। দিব্যনাথ প্রতিবারই উচ্চারণ করছিল মালদহ। একবার বর্ষার মুখে মুখে মহানন্দা নদীতে আমাদের তিনজনের উদ্দাম জলবিহারের কথা বলেছিলাম। দিব্য মনে করিয়ে দিয়েছিল, পাণ্ডুয়া যাওয়ার পথে কালিন্দী নদী ও মহানন্দার সংযোগস্থলে ঘটেছিল এমন একটা ছোট্ট, ন্যূন অথচ কী গভীর স্মৃতিবাহী একটি ঘটনার কথা। আর সেই সূত্রেই কোন অতল থেকে উঠে এসেছিল সুদর্শনের নাম। মালদা ছেড়ে চলে আসার পরে ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি শুনে দিব্য বলেছে, সে কী রে! আমার সঙ্গে তো সুদর্শনের মোটামুটি যোগাযোগ আছে। আমার ব্যবসার জন্য একটা লোনের ব্যাপারে সতুর ব্যাঙ্কে যেতে হয়েছিল। ওখানেই ওকে খুঁজে পেলাম। তাও বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। সতু তো দমদমে বাড়ি করেছে। দাঁড়া দাঁড়া, ওর বাড়ির ঠিকানাটা আমার কাছে আছে হয়তো।

অ্যাটাচি কেস খুলে দিব্যনাথ একটা মাঝারি মাপের ডায়েরি বের করেছিল। বহু ঠিকানার ভিড়ে সুদর্শনের ঠিকানা খুঁজে বের করে হেসে বলেছিল, লিখে নে। জানিস তো, সতুও তোর কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু আমি রাম-রহিম কিছুই বলতে পারিনি। তুই হারিয়ে গেছিলি বটে!

—আচ্ছা, দিব্য, আমরা কখনও কি ভেবেছিলাম, এইভাবে দূরতর দ্বীপের মতো আলাদা হয়ে যাব। আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিলাম। সেই মুহূর্তে কিছুতেই আবেগকে দমিয়ে রাখতে পারিনি।

ব্যবসায়ী দিব্যনাথ হেসেছিল। কোনও কথা না-বলে লিখে দিয়েছিল সুদর্শনের ঠিকানা। আমি ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে আবার বলেছিলাম, কী রে তুই কিছু বললি না!

—কী আর বলব! এমনটাই হয়। দিব্যনাথ ঠোঁট কামড়ে একটু উদাস চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কাছাকাছি থাকলেও কি দূরত্ব রচিত হয় না! একই পাড়ার মধ্যে হয়তো তুই আর আমি আছি। হয়তো সুদর্শনও আছে। অথচ কালেভদ্রে দেখা হয়। একটা কি দুটো কথার বেশি হয় না।

আমি চুপ করে গেছিলাম। দিব্যনাথ বিষয়টাকে অন্যদিক থেকে ভেবেছিল। ওর ভাবনাটাকে আমি অস্বীকার করতে পারিনি। কিন্তু একই সঙ্গে বুকের মধ্যে কষ্টের পাথরটা আরও চেপে বসেছিল। নিজের নাম-ঠিকানা-টেলিফোন নম্বর লেখা একটা ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে তুলে দিয়ে দিব্য বলেছিল, আমাদের সবার বয়স হয়ে গেছে রে। আমরা কি আর মালদহের সেই তিনটে স্ট্যাম্পড ভাল ছেলে আব আছি! সেই ছবি, সেই রঙ বদলে গেছে।

—তোর সঙ্গে দেখা হল—ব্যাপারটা কত আনন্দের। অথচ দেখ, আমার কেমন যেন মনখারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—অনল, তুই এখনও তেমনই আছিস। নিশ্চয়ই বিয়ে করিসনি। তুই যে সেই বলতিস, প্রকৃতির মতো বন্ধনহীন জীবন বেছে নিবি, তাই নিয়েছিস হয়তো। ঠিক বলেছি!

মাথা নীচু করে ওর হাত স্পর্শ করে স্বল্পোচ্চারণে বলেছিলাম, হ্যাঁ রে। সংসার করিনি। সেই অর্থে আমার কোনও বন্ধন নেই। তবে একেবারে উধাও হয়ে যেতে পারলাম না।

—উধাও হয়ে গেলে তোর সঙ্গে আর দেখা হত না। দিব্যনাথ হো হো করে হেসে বলেছিল, তুই অবশ্যই যোগাযোগ করবি। দেখা যখন হয়ে গেল, তখন সেই পুরনো দিনগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালই লাগবে। আজ চলি রে! আবার দেখা হবে।

কী অবলীলায় আমার হাত ছাড়িয়ে দিব্যনাথ চলে গেছিল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ভেবেছি, একদিন আমাদের বাড়িওয়ালা আনন্দ মজুমদার বিষণ্ণ হলুদ নামে একটি বর্ণের কথা বলেছিলেন। আজ, এই একটু আগে দিব্যনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর স্রষ্টা কি সেই রঙেই ছবি আঁকলেন এতক্ষণ ধরে! বয়সের সঙ্গে রঙবদলের যে-পালার কথা মজুমদার বলেছিলেন তা কি তাহলে সত্যি! এই নিষ্ঠুর সত্যটা বুঝতে আমার এতগুলো বছর লেগে গেল।

দিব্যনাথকে ওর বাড়িতে পাইনি' দু'বার ফোন করেছিলাম। প্রায় এক মাসের ব্যবধানে। দুদিনই ও বাড়ি ছিল না। দ্বিতীয় দিন ওর মেয়ে অথবা স্ত্রী বলল, উনি ফরাক্কায় গেছেন। কয়েকদিন পরে ফিরবেন।

ফরাক্কা! আমি শুনে চমকে গেছিলাম। ফরাক্কা ব্যারেজ পেরিয়ে এলেই মালদার মাটির গন্ধ নাকে এসে লাগে। দিব্যনাথ সেই গন্ধ পাবে কি? ও হয়তো ব্যারেজ নগরীতে কোনও কাজে গেছে। হয়তো প্রায়ই যায়। আশ্চর্য, দিব্য তো কথায় কথায় একবারও বলল না! ও কি ভুলে গেছিল! যেমন ভুলে গেল আমার ঠিকানা জেনে নিতে! ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার সমস্ত দায়টা আমার ওপরে চাপিয়ে দিয়ে দিব্যনাথ কেটে পড়েছিল। আমি সংযোগের চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারলাম না। ওদিকে সুদর্শনের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাইনি। ওকে ছোট্ট একটা চিঠি দিয়েছি। অনেক কথা লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করেছি। দিব্যনাথের চেয়েও হয়তো সুদর্শন আরও বেশি আবেগশূন্য হয়ে গেছে। সেই চিঠির উত্তর এখনও পেলাম না।

আমার চিঠিটা কি আর ওর কাছে পৌঁছয়নি! আমার যৌবনের নতুন বন্ধুরা এতদিনে অনেক পুরনো হয়ে গেছে জেনেও, আমি আবার নতুন করে শুরু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওদের দিক থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া নেই। আমি তবু আশা করে আছি। আনন্দ মজুমদার একবার রসিকতা করে বলেছিলেন, বুঝলে ভাই, আমরা সবাই ভাবি, জীবনের যা কিছু সব, খ্যাপলা জাল ফেলে নিজের ডাঙায় তুলে আনব। তা কি হয়! কিছু মাছ জালের তলা দিয়ে, কিছু জালের গর্ত দিয়ে, কিছু পাশ দিয়ে, ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাবেই। হঠাৎ সেই কথাগুলো কদিন ধরে মনে পড়ছে। সতু, দিব্য আর লালার বন্ধুত্বের দিনগুলো কি সেই পালিয়ে যাওয়া মাছ! বহমান জল যাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বিস্মৃতির উজানে!

আনন্দ মজুমদারের বাড়িতে আমরা আড়াই বছরের কিছু বেশি সময় ছিলাম। বাবা হঠাৎ একদিন রাত্রে খেতে বসে বলল, এই বাড়িটা ছেড়ে দেব। এখানে আর থাকব না।

—কেন গো! মা তো অবাক, হঠাৎ কী হল! এখানে তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বাড়ির মালিকরাও ভাল।

মাথা নীচু করে থালায় আঁক কাটতে কাটতে বাবা বলেছিল, জানি, সবই ঠিক আছে। তবু...। একটু চুপ করে থেকে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে জোরে শ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, লালা, আনন্দবাবুর সঙ্গে তোর অনেক কথা হয়। ভদ্রলোক কেমন রে?

আমি চমকে গেছিলাম। এমন একটা জিজ্ঞাসার জন্য একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি বিস্ময় গোপন না-করে বলেছিলাম, নো ডাউট, ভাল। কিন্তু কেন বলো তো!

—তোর সঙ্গে উনি কি জ্যোতিষ-টোতিষ নিয়ে কথা বলেন? বাবা তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল।

—ন্-না। না তো! আমি ভুরু কপালে তুলে বলেছিলাম, জ্যোতিষ, মানে অ্যাস্ট্রোলজি! কই না তো! কখনও বলেননি!

—অ! বাবা স্পষ্টতই হতাশ হয়েছিল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর বলেছিল, তোকে হয়তো বলেন না। কিন্তু আমাকে বলেন। আমাকে ভেতরে ভেতরে কাবু করে দিতে চান।

—তার মানে? মা আর আমি একই সঙ্গে বলে উঠেছিলাম।

—এই দেখ না, আগে আগে ভদ্রলোক আমাকে বলতেন, আপনার কিন্তু ভাড়াবাড়িতে আদৌ থাকার কথা নয়। মঙ্গলের কুদৃষ্টির ফলে বন্যায় বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ওই জায়গাতেই আবার ম্যানস উঠবে। আপনার রাজপ্রাসাদে থাকার কথা। যত্তসব!

—এতে রাগ করার কী আছে! মা মৃদু হেসে বলেছিল, বাড়িটা বন্যায় ভেসে গেছে ঠিকই, কিন্তু জমি-জায়গা তো এখনও আছে। বাড়ি করার ব্যাপারে তুমি তো ইচ্ছে করেই গড়িমসি করছ। চাইলে তো কাল থেকে শুরু করে দিতে পার।

—তা বলে ম্যানসন! এগুলো কী ধরনের রসিকতা!

আমি চুপ করেছিলাম। বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম, আনন্দ মজুমদার কি বাবার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছেন। নাকি ওর নিজেরই কোনও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কথা বলে হালকা হতে চেয়েছেন!

—নিজের বাড়ি, তা সে কুঁড়েই হোক, আর পাকাই হোক—সকলের কাছেই রাজপ্রাসাদ। মা স্মিত হেসে বাবাকে শান্ত করেছিল।

—গত মাসে ভদ্রলোক বললেন, আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ আছে বসুমশাই। হঠাৎ কোনও দুর্যোগ নেমে আসতে পারে। শনি বক্রী। রাহুর কুদৃষ্টি পড়ছে চন্দ্রের ঘরে। যমে মানুষে টানাটানি হলে, যমই জিতে যাবে। শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেছিল। সেদিন আবার বললেন, আপনার ছেলের দুটো বিয়ে। মাথার পেছনে দেখবেন দুটো কেশচক্র। একটা ভিজিবল, অন্যটা লুকনো আছে। আমি কিন্তু ঠিক দেখেছি। শুনলি!

শব্দ করে আমি হেসে উঠেছিলাম। মা মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে। বাবার মুখ থেকে অবশ্য গাম্ভীর্য সরে যায়নি। আমি হাসি থামিয়ে বলেছিলাম, তোমাকে এসব উনি কখন বলেন?

—মেনলি বাড়ি ভাড়া দিতে গেলে। বাজারে কিংবা রাস্তাঘাটেও বলেন। বাবার গলার স্বর কর্কশ হয়ে উঠেছিল।

—তুমি এতদিন বলনি তো! আমি একটু বিরক্ত হয়েছিলাম, তা হলে ওঁকে এসব তোমাকে বলতে বারণ করে দিতাম।

—ওইজন্যই তোকে বলিনি। বাবা ক্ষুব্ধস্বরে বলেছিল, পরের বাড়িতে থাকি। এসব নিয়ে কোনও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হোক, আমি চাইনি। এ-বাড়ি ছেড়ে দিলেই তো আপদ চুকে যায়। আমাকে আর বিরক্তি পোয়াতে হবে না। আমি অন্য বাড়ি ঠিক করে ফেলেছি।

—কোথায়? আমি বিষাদগ্রস্তের মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—নদীর দিকেই। সিদ্ধেশ্বরহাটিতে। বাবা হেসে বলেছিল। যাবি তো! এখান থেকে তো বেশি দূরে নয়।

মহানন্দা আমাকে আবাল্য মোহগ্রস্ত করে রেখেছে। এখনও তো আমি সেই নদীর স্রোত আপন রক্তের স্রোতে অনুভব করি। এই তো কবে যেন কাকে যেন মহানন্দার কথা বলেছিলাম। আবার নদীর পাড়ে ফিরে যাচ্ছি শুনে আমি আর দ্বিরুক্তি করিনি। মা-ও নয়। নদীতে স্নান করার সুযোগ আবার হয়তো আসবে—এই ভেবে মা চুপ করেছিল। সিদ্ধেশ্বরহাটি মানে ইংরেজবাজার পুরসভার শেষ প্রান্ত। টাউনের দক্ষিণে। আবার একটা নতুন জায়গার স্পর্শ।

খাওয়া শেষ করে বাবা আমাকে বলেছিল, কাল সকালে একবার তোর মাকে নিয়ে বাড়িটা দেখে আসিস। সিদ্ধেশ্বরহাটি ঢুকে তৃতীয় বাড়িটা। হরনাথ পালের বাড়ি। ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। দোতলায় থাকেন। একতলায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা ব্যাঙ্কপ্লটে বাড়ি করে উঠে গেছেন। লালা, কাল একবারটি যাস। নীলাকে আমি চিঠি লিখে দেব আজই।

হঠাৎ এইভাবে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য আনন্দবাবু অবাক হয়ে গেছিলেন। বাবাকে কারণ জিজ্ঞেস করেও কোনও সদুত্তর পাননি। আমি কিছু একটা মিথ্যে বলতে গিয়ে ইতস্তত করেছি। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে ওঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলাম, অন্য কোনও কারণ নেই মেসোমশাই। আসলে বাবা-মা কেউই একেবারে শহরের মাঝখানে থাকতে অভ্যস্ত নন তো, তাই...। হাঁপিয়ে উঠেছেন।

আমার কথায় মজুমদার সন্তুষ্ট হতে পারেননি। উনি আমার পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে আমার মনের মিল কিছু ছিল। সেটা হয়তো তুমি অনুভব করেছ। তাই মাঝে মধ্যে এসো। তোমাব সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে। চতুর্দিকে পাঁঠাদের রাজত্ব। কাউকে কিছু বলার উপায় নেই। ব্যা ব্যা করে শুধু শিং নাড়াচ্ছে।

আমি ওঁকে কথা দিয়েছিলাম, আসব। প্রথম প্রথম এসেওছি। কিন্তু তারপর আবার মহানন্দার পাড় আমাকে টেনে নিয়েছিল। আমাকে হারানোর ভয়ে যেন আরও বেশি করে আকড়ে ধরেছিল সতু আর দিব্য।

নদীর সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হওয়ার উত্তেজনা ছাড়া ডাক্তার হরনাথ পালের বাড়িতে আমরা খুব একটা সুখে ছিলাম না। খিটখিটে ডাক্তার, তাঁর অসুস্থ রুগ্ণা স্ত্রী আর একটি বয়স্ক আইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে আমার কারুবাকী মায়ের কিংবা সুভদ্র বাবার কোনও সুসম্পর্ক কখনও গড়ে ওঠেনি। আবিষ্কার করেছিলাম, ডাক্তারের পুরো ফ্যামিলিটিই রোগগ্রস্ত। নীচের তলায় আমরা আমাদের অস্তিত্ব গোপন করে ফেলেছিলাম অনেকটা বাধ্য হয়ে, অনেকটা পরিপার্শ্বের চাপে। এর মধ্যে আবার মা ক'দিন লক্ষ করেছিল, ডাক্তারের আইবুড়ো মেয়েটি আমার দিকে বিশ্রী চোখে তাকিয়ে থাকে। আমি যখন কলেজে যাই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে। সিদ্ধেশ্বরহাটির বাড়িতে উৎপাত লেগেই থাকত।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যেসব জ্যোতিষী-প্রবচন বাবাকে দুর্বল করে দিয়েছিল, যাদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বাবা মজুমদারের বাড়ি ছেড়ে দিল, তার কোনওটাই ঘটেনি। বরং সব ক'টাই হল উল্টো। মজুমদারের কোনও ভবিষ্যদ্বাণীকেই গ্রহ-নক্ষত্ররা সফল করে তুলল না। এখন গভীর নিশীথে এক একদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি, অনন্তের পথে জীবন তার নিজের মতো হেঁটে চলেছে। এই চলে যাওয়া কী ভয়ংকর নির্বাধ, নিঃশঙ্ক! আমরা কেবলই জ্যোতিষের দোহাই দিচ্ছি, সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করছি অন্য কোনও আশ্রয়ের শরণাপন্ন হয়ে। বাবা অবশ্য নিজের পুরুষকারের ওপরে জোর দিয়েছিল। কিন্তু তাতেও জীবন থমকে যায়নি। সে তার নিজের মতো যেদিকে খুশি চলে গেছে।

পাল ডাক্তারের বাড়িতেই আমাদের ছোট পরিবারের ওপর হঠাৎ নেমে এল এক অভাবনীয় বিপর্যয়। আমার মায়ের মৃত্যু। আজ মৃত্যু শব্দটা কত সহজে উচ্চারণ করতে পারছি। কিন্তু সেদিন! শীত তখনও পড়েনি, তবে তার আমেজ চতুর্দিকে। বর্ষা যাই যাই করেও যায়নি। মাঝে মাঝে কয়েকটা কালো মেঘ আকাশে উঁকি দিয়ে

যাচ্ছে। মহানন্দার সারা বুকে জলের প্লাবন। বাবার শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না। আমি সাইকেলে চেপে বাজারে গেছিলাম। যাওয়ার সময় দেখে গেছি মা বাথরুমে যাওয়ার তোড়জোড় করছে। একগাদা বাসি জামাকাপড় ডিটারজেন্টে ভিজিয়ে রাখা আছে বাথরুমের দরজার সামনে। এই বাড়িতে এসে মায়ের কাচাকুচির বাতিকটা যেন বেড়ে গেছিল।

বাজারে দেখা হয়েছিল শ্রীজীবশরণ দাস বৈষ্ণব বাবাজির সঙ্গে। ভারি সজ্জন মানুষ। বৈষ্ণবীয় বিনয়ের চেয়েও ওঁর মাধুর্যময় ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করত। বেশিরভাগ সময় রামকেলিতেই থাকতেন। শহরে ওঁদের একটি আশ্রয় ছিল। সেখানেই মাঝেমধ্যে আসতেন। শ্রীজীবশরণের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল রামকেলিতে। আমি, সতু আর দিব্য একবার প্ল্যান প্রোগ্রাম করে পাণ্ডুয়া, গৌড় আর রামকেলিতে বেড়াতে গেছিলাম। তিন যুবকের সেই ভ্রমণ তাদের জীবনে কতটা দরকারি ছিল, তা পরে বুঝেছি। দেশের মাটিকে শুধু প্রণাম জানানো নয়, মাটির সঙ্গে আত্মপরিচয়ের সেই নিবিড় পর্ব ও সুযোগ দ্বিতীয়বার আর এ জীবনে আসেনি।

শ্রীজীবশরণ দাস একটু গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন। যদিও বারংবার বলছিলাম, তোমার দেরি করিয়ে দিচ্ছি না তো! কলেজে যাবে, তোমার বাবা আপিসে বেরুবেন!...আসলে কি জান, তোমার মতো যুবক ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে। তোমাদের চোখে স্বপ্ন, বুকে বল। মন শুদ্ধ, চিত্ত শুদ্ধ।

এসব প্রশস্তি শুনতে লজ্জা হচ্ছিল। অথচ শ্রীজীবশরণের কথামালার বন্ধন ছিঁড়ে বেরোতে পারিনি। ফলে বাড়ি ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গেছিল। গলির মুখে ঢুকেই দেখি বাবা উদ্বিগ্ন মুখে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটে এসে বলেছিল, লালা, তোর মা বাথরুমে পড়ে গেছে। শিগ্‌গির আয়। আমার কেমন যেন লাগছে!

—কখন? কখন পড়ল! সাইকেল থেকে নেমে আমি ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম।

নির্দিষ্ট সময়টা জানানোর মতো বাবার মনের অবস্থা ছিল না। ভাঙা ভাঙা গলায় বাবা বলেছিল, তোর মা অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমি কোনওরকমে পাঁজাকোলা করে খাটে শুইয়ে দিয়েছি।

সাইকেলটাকে বাড়ির গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি পাগলের মতো শোয়ার ঘরে চলে এসেছিলাম। মা শুয়ে আছে। নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মতো। একটা হাত অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে আছে। ডান হাতটা, না বাঁ-হাত! এখন আর মনে নেই। কপালের ওপরে এক জায়গায় কালশিটে দাগ। আমি আলতো ছুঁয়ে মাকে ব্যগ্র গলায় ডেকেছিলাম, মা, মা।

মা সাড়া দেয়নি। কোনও অভিব্যক্তিও ফুটে ওঠেনি মায়ের মুখে। দুটো চোখ ছিল তেমনই নিমীলিত, স্থির।

—বাবা, তুমি ওপরের ডাক্তারবাবুকে ডাকনি। ডাক্তার পাল।

নীরবে মাথা নাড়িয়ে বাবা বলেছিল, না রে, কাউকে ডাকিনি। তুই যা ভাল

বুঝবি কর।

আমি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিনি। দোতলায় উঠে গেছি খ্যাপা ষাঁড়ের মতো। ডাক্তারের অনূঢ়া মেয়েটি মনে হয় আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। দোতলার বন্ধ কোলাপসিবল গেটটার ওপারে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বিশ্রী হেসে বলেছিল, বাবার শরীরটা ভাল নেই।

—আপনি কি জানেন, আমার মা বাথরুমে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে! একজন ডাক্তারকে না দেখালে...। খুব সিরিয়াস...

—জানি। মেয়েটি নিষ্ঠুরের মতো বলেছিল, এসব কেসে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই তো ভাল। তা ছাড়া আমার বাবা তো হোমিওপ্যাথ...

—তবু তো একজন ফিজিশিয়ান! প্লিজ..।

মেয়েটি স্থির চোখে আমাকে কেন জানি না জরিপ করার চেষ্টা করছিল। ওর চোখের ভাষায় করুণা বলে কোনও শব্দ ছিল না। আমি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াইনি। নিজের অসহায়তাকে জয় করার মতো কোনও শক্তিই আমার সেদিন যেন ছিল না। আবার ঘরে ফিরে এসেছিলাম। আবার মাকে ডেকেছি। ডুকরে কেঁদেও উঠেছি।

মেঝেতে বসে মায়ের সেই ঝুলন্ত হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে বাবা বলেছিল, লালা, তুই একবার তোর বন্ধুদের খবর দে। ওরা এলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সতুর বাড়িতে যাওয়ার পথে ডক্টর চক্রবর্তীকে একটা খবর দিয়ে যাস। উনি যদি একবারটি আসেন।

কেন জানি না, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল। আমি চিৎকার করে বলেছিলাম, এই কাজটা তুমি এতক্ষণ কেন করনি?

—তোর মাকে একা ফেলে রেখে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব! লাল, ওকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না রে! কথা বলতে বলতে বাবার মাথা মেঝের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল গভীর বেদনায়। বাবা হয়তো চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। সেটা লক্ষ করার মতো এক মুহূর্ত অবসরও আমার সেদিন ছিল না। যদি থাকত, তা হলে আমার বোধ, আমার চৈতন্য আমাকে জানিয়ে দিত—মা চলে যাচ্ছে। প্রায়ান্ধকার, শ্যাওলায় আচ্ছাদিত, তেল ও সাবানে পিচ্ছিল বাথরুমে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কোমলপ্রাণ মা, পাখির পালকের মতো হালকা শরীরের মা পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে।

আধঘণ্টা ছোটাছুটি করে আমি আর সতু ডক্টর চক্রবর্তীকে ডেকে এনেছিলাম। ভদ্রলোক আদতে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। তবু জেনারেল ফিজিশিয়ানদের মতো যত্ন করে মাকে দেখেছিলেন। তখনও আমাকে আর বাবাকে বুঝতে দেননি দুর্ঘটনার ফলাফল যা হওয়ার তা অনেক আগেই হয়ে গেছে। মিনিট পনেরো পরে শৌখিন চশমাটা চোখ থেকে খুলে গম্ভীর গলায় আমাকে বলেছিলেন, ভাই যে কোনও মিজারেব্‌ল সিচুয়েশনের জন্য প্রস্তুত থাকবে। আমি একটা চিঠি করে দিচ্ছি। ইমিডিয়েটলি ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাও। ওরাই যা বলার তোমাকে বলবে।

আমার গলায় কেউ যেন বিষ ঢেলে দিয়েছিল। বুকের ওপর চেপে ধরেছিল কালো পাথর। চোখের সামনে নেমে এসেছিল অনন্ত অন্ধকার। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে দিব্য এসে গেছিল। আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, চেনা ছেলে।

হাসপাতালের ডাক্তার শুধু অফিসিয়ালি জানিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের মৃত্যুসংবাদ। সেরিব্রাল হেমারেজ। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। সেই মুহূর্তে মায়ের তেইশ বছরের জীবনসঙ্গীকে দেখে মনে হয়েছিল, বাবা বিশ্বাস-অবিশ্বাস, শোক-অশোকের পরপারে কোথাও চলে গেছে। সেখান থেকে বাবা আর ফিরে আসবে না। বোধহীন মানুষের মতো এরপরের কৃত্যগুলো করেছি—মায়ের শ্রাদ্ধ, মায়ের কম বয়সের একটি ছবিকে সুন্দর করে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা এবং বুকের গভীরে মায়ের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা।

এইসব দুর্দৈবের কিছুদিন পরেই জাঁকিয়ে শীত পড়ল মালদায়। পশ্চিম দিক থেকে বিহারের শীত ঢুকে পড়ল হিমানী রাতের বাঘের মতো। জলস্ফীত মহানন্দা আস্তে আস্তে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেল। কোথায় যেন একটা সুর কেটে গেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারছিলাম, আর কিছুই ভাল লাগে না। মালদার বাতাস সর্বক্ষণ ভারী মনে হয়। সূর্যালোক কেমন যেন ম্লান। চারদিকে ঘন কুয়াশার অদৃশ্য আবরণ। প্রায় দু'মাস আমি কলেজে যাইনি। সতু আর দিব্য আমাকে চাঙ্গা করার অনেক চেষ্টা করেছে। পারেনি। সম্ভবত ওই সময় থেকেই ওদের সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্বের মাঝখানে সূক্ষ্ম চিড় ধরে যায়। পরে যা বিরাট ফাটল হয়ে গিয়ে আমাদের তিনজনকে দূর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

মা আর নেই, কোনওদিন আর ফিরবে না—এই সহজ এবং অনিবার্য সত্যটাকে বোঝার, মেনে নেওয়ার বয়স ও মানসিকতা আমার নষ্ট হয়ে কিংবা হারিয়ে যায়নি। তবু আমি কিছুতেই যেন সুস্থ স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। মনে আছে, সতু আমাকে একদিন বিষণ্ণ স্বরে বলেছিল, লালা, আমরাও তোর ব্যথার ব্যথী। তোর কষ্টটাকে নিজের কষ্ট বলে ভাবি। তুই এটুকু ভাবতে পারিস, আমরা বন্ধুরা তোর চোখের জল মোছাতে পারব না হয়তো, কিন্তু কষ্টটাকে তো ভাগ করে নিতে পারব।

সেদিন আমি ওর কথার গুরুত্ব দিইনি। উল্টে বাবার দু'ব্যান্ডের ফিলিপ্‌স রেডিওর ভল্যুম নবটা জোরে ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোনও শিল্পী গান করছিলেন। সতু হতবাক হয়ে গেছিল। এরপর ও দুদিন আসেনি। আঘাত পেয়েছিল, কেননা ও যা বলেছিল, তার মধ্যে কোনও কপটতা ছিল না। সুদর্শন কি এখনও সেইসব মান-অপমান, আঘাত-বেদনার দিনগুলো মনে রেখেছে? ওর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় কখনও কোনও শুভ্রসকালে কিংবা গোধূলিবিকেলে কিংবা সন্ধ্যা-রাত্রির সন্ধিলগ্নে, সেদিন ওকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব।

বি. এ.-র রেজাল্ট বেরনোর আগেই প্রায় নিঃশব্দে কলকাতায় চলে এসেছিলাম। আমার চলে আসার ব্যাপারে বাবা আপত্তি করেনি, কেননা বাবা একথা বুঝতে পেরেছিল, আমি ক্রমশ বদলে যাচ্ছি। বদলের চেহারা-চরিত্রটা ছিল এত অন্তর্মুখীন

যে, সতু বা দিব্য কেউই ঠিক ঠিক ধরতে পারেনি। কলকাতায় চলে যাচ্ছি—এই সংবাদটা ওদের দু'জনকে ভাসা ভাসা দিয়েছিলাম। অথচ মা বেঁচে থাকলে হত ঠিক উল্টো। আমার এই অদ্ভুত এবং কিছুটা নিষ্ঠুর আচরণ বন্ধুরা নিশ্চয়ই সহজভাবে মেনে নেয়নি সেদিন।

কলকাতার মির্জাপুরে বাবার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য উঠেছিলাম। তারপর বি. এ. পাস করে ল' পড়ার জন্য ইউনিভার্সিটির হার্ডিঞ্জ হস্টেলে। এখান থেকেই আমার সঙ্গে মালদার সম্পর্ক আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেল। শুধু বাবাকে নিয়ে একটা অপরাধবোধ আমাকে মাঝেমধ্যে অস্বস্তিতে ফেলে দিত। বাবা একলা মানুষ। কীভাবে আছে, কে দেখাশোনা করছে—এসব নিয়ে ভাবতাম। ভাবনাটা কাঁটার মতো বিঁধত। বাবার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছি···একজন মফস্বলের ছেলে যেভাবে তখনকার দিনে বাড়ির সঙ্গে সংযোগ রাখত। পাশাপাশি নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য আমি ততদিনে কলকাতা শহরটাকে শুষে নিতে শুরু করে দিয়েছি। ডুবে গিয়েছিলাম পড়াশোনার জগতে। এই চলমান শহরটা আমাকে যেন পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রে সঞ্জীবিত করে দিয়েছিল সেই দিনগুলিতে। মালদার লালা থেকে আজকের অনল বসুতে আমার যে রূপান্তর, তার পেছনে কলকাতার অবদান অনেকখানি। আমার জীবনের অনেকগুলো বছর ওই শহরের বুকের মধ্যে কত অবলীলায় নিঃশেষিত হয়ে গেছিল। আজ কলকাতা থেকে চোদ্দ-পনেরো কিলোমিটার দূরে বসে সেটা আরও গভীরভাবে অনুভব করতে পারি। কত বছর আগে মালদা নামে যে ছোট্ট শহরটা থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিলাম, যার পোশাকি নাম ছিল ইংলিশবাজার বা ইংরেজবাজার, সেই শহরটা, সেই জেলার জল-মাটি-মানুষ আজকাল আমার বুকের মধ্যে যে-আলোড়ন তোলে, কলকাতা হয়তো ততটা অভিভূত করে না আমায়। কিন্তু তার প্রতিও আছে আমার আনত গোপন কৃতজ্ঞতা। তার ঋণ আমি কখনও ভুলতে পারব না।

প্রথম প্রথম মাসে একবার করে মালদায় গেছি কলকাতায় চলে আসার পর। যাওয়ার ব্যবধানটা এরপর বেড়ে গেছে—দু'মাস, তিনমাস তারপর চার মাসে একবার। আমি কীভাবে কলকাতায় আছি তা বাবা কখনও দেখতে আসেনি। বাবা প্রতি চিঠিতেই লিখত—'যেখানেই থাকো, ভাল থেকো। বড় হও, সুখী হও।'

'ভাল' শব্দটা আমার জীবনের সঙ্গে কেমন যেন লতায়-পাতায় জড়িয়ে গেছে। বাবা আশীর্বাদ করতেন, আশা করতেন, 'ভাল থেকো।' প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে ভাল থাকতে হয়, তা আমি একটু একটু করে আয়ত্ত করেছি। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের চারপাশের নানা আয়োজনের ভেতর থেকে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভাল তাকেই ধীরে ধীরে গ্রহণ করেছি। একাকী মানুষের জীবনে এ ছাড়া আর কীই বা করার আছে! তবে এই যে মানুষজন আমাকে প্রকাশ্যে অথবা আড়ালে বলে 'লোকটা ভীষণ ভাল', এটা তাদের উদার হৃদয়ের অভিব্যক্তি। তারা আমাকে অনেক বেশি দেয়। আঙুল তুলে চিহ্নিত করার মতো ভালমানুষ আমি নই। আমার নিস্তরঙ্গ, বন্ধনহীন জীবনে মন্দ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, আমিও তাকে উঠতে দিইনি।

মন্দর সঙ্গে এখনও আমার নিরন্তর যুদ্ধ। তার মানে এই নয় যে, ব্যক্তি হিসেবে আমি ভালমানুষের অনন্য উদাহরণ। আমি কখনও তা হতে চাই না। সবসময়েই ভাবি 'জীবন আমার চলেছে যেমন তেমনিভাবে দুঃখসুখের দ্বন্দ্বেছন্দে' চলে যাক। মানুষের চোখের জলের মর্ম যেন বুঝতে পারি। তাদের জীবনবীণার তার ছিঁড়ে যাওয়ার আওয়াজ যেন শুনতে পাই। আমার হৃদয় যেন সজাগ থাকে। আর কিছু চাই না। ভাল শব্দটা নিয়ে আমার আর মাথ্যব্যথা নেই।

এক একসময় মনে হয়, আমি কি আদ্যোপান্ত ভাল? কোনও মানুষ কি কখনও তাই হতে পারে! দুঃখ-সুখের মতো ভুলত্রুটি মানুষের জীবনে প্রতিমুহূর্তে অবশ্যম্ভাবী। আমি কি কখনও কাউকে আঘাত দিইনি? আমার অহংকার কি কাউকে বেদনায় প্লাবিত করেনি? নিশ্চয়ই করেছে। আমি ভুলে গেছি। তারাও হয়তো ভুলে গেছে। নিশ্ছিদ্র ভাল মানে তো আমি মহামানব। আমি তা কখনও হতে চাই না।

বাবা এখনও বেঁচে আছেন কিনা জানি না। মায়ের মৃত্যুশোকে ছেলেকে তিনি অন্যরকম ও উদাসী হয়ে যেতে দেখেছিলেন। তাই হয়তো মরণের আগেই বাবা নিজেকে সরিয়ে ফেলেছেন আমাদের শত সহস্র চক্ষুর আড়ালে। একদিন রাত দশটা নাগাদ হস্টেলের ঘরে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল ঃ ইয়োর ফাদার মিসিং। কাম শার্প।—বি কে দে।

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে আমি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। দিব্যর বাবা বিষ্ণুকান্তবাবু ওটা পাঠিয়েছিলেন। টেলিগ্রামের বার্তায় কোনও ভনিতা ছিল না, অথবা কোনও রহস্য। আমার রুমমেট বাণীব্রত টেলিগ্রামটা পড়ে বলেছিল, আশ্চর্য! স্ট্রেইঞ্জ! মৃত্যুসংবাদের চেয়েও খারাপ খবর। বয়স্ক মানুষরা তো হারিয়ে যান না, ওঁরা চিরকালের মতো চলে যান। কোথায় চলে যান কেউ জানে না! আমার মায়ের জ্যাঠামশাই আমার জন্মের আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। এখনও ফিরে আসেননি।

বাণীব্রতর প্রতিটি শব্দ চোখের সামনে চরম শূন্যতা, বুকের মাঝখানে তীব্র হাহাকার ছাড়া আর কিছুই জাগিয়ে তোলেনি। অনেক রাত্রে আমি অবোধ শিশুব মতো কেঁদে উঠেছি। কান্নার তরঙ্গ হস্টেলের ওপরে নীচে ছড়িয়ে গেছিল। আবাসিকরা ছুটে এসেছে, আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে নানা ভাষায়। অনেকেই বলেছিল, বাবা হঠাৎ রেগে গিয়ে বা কোনও দুঃখ পেয়ে কোথাও চলে গেছেন। আবার ফিরে আসবেন। ঘটনাটা নিতান্তই সাময়িক।

আমি কিন্তু গভীরভাবে অনুভব করতে পারছিলাম, বাবা শেষবারের মতো চলে গেছে। আর কোথাও বাবাকে খুঁজে পাব না। মানুষের জীবনে এই অগস্ত্যযাত্রাটা এক বিশেষ লগ্নে অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংসারের কোনও বন্ধনই আর তখন তাকে টেনে রাখতে পারে না। পৃথিবীর সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, মানসলোকের সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক, তখন তা ছিঁড়ে যায়। গাছের সঙ্গে শিকড়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো। মৃত্যুর অনিবার্যতার চেয়েও এই চলে যাওয়া আরও ভয়ংকর, আরও অনতিক্রম্য। সব মানুষের জীবনেই মৃত্যু আসে কিন্তু এমনভাবে চলে যাওয়ার পরম

লগ্ন আসে না। যাদের জীবনে আসে তারা আমার বাবার মতোই হারিয়ে যায়। বাণীব্রত ঠিকই বলেছিল।

দুদিন পরে বিধ্বস্ত মন আর শরীর নিয়ে মালদায় গেছিলাম। সুদর্শন বা দিব্যনাথ কাউকেই কাছে পাইনি। ওরাও সেই সময় আমাদের সেই প্রিয় বাসভূমি ছেড়ে কলকাতায় পড়তে চলে এসেছিল। অথচ সে খবরটা আমি জানতাম না। সতু বা দিব্য কেউই জানায়নি। ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা মনে হয় তখন থেকেই সরু সুতোয় ঝুলছিল। অভিমান, পাল্টা অভিমানের অভিঘাতে আমাদের বড়-হয়ে-যাওয়া-মন ক্রমশ পাথরের মতো শক্ত হয়ে আসছিল। মালদার বাড়ির জিনিসপত্র, মা-বাবার স্মৃতিচিহ্ন শ্রীজীবশরণদের আশ্রমে দিয়ে এসেছিলাম। কিছু দামি জিনিস, মায়ের কিছু গয়নাগাঁটি দিব্যর বাবা বিলিয়ে দিতে দেননি। জোর করে নিজের কাছে রেখে দিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে তুমি যদি সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী হয়ে যাও, তা হলে এগুলো কোনও মঠ-মিশনে দিয়ে দেব। কিন্তু তা যদি না-হও, তখন এগুলোর মূল্য বুঝতে পারবে। অনল, তুমি সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছ।

এই অন্যরকম হয়ে যাওয়ার পালাবদল কি এখনও আমার জীবন জুড়ে ঘটে চলেছে! এক একদিন গভীর রাতে আমার এই এক কামরার ঘর সংলগ্ন বারান্দায় বসে ভাবি। আকাশের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকি। কোথাও উত্তর খুঁজে পাই না। মুক্তি থেকে বন্ধন, বন্ধন থেকে মুক্তি, আবার বন্ধন, আবার মুক্তি—এইভাবেই আমি সেই অনন্তের দিকে এগিয়ে চলেছি! রবীন্দ্রনাথের একটি গান মনের মধ্যে বেজে ওঠে ঃ

যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে দুঃখধারার ভরা স্রোতে
তারে ডাক দিলে আজ কোন্ খেয়ালে
আবার তোমার ওপার হতে॥...
এ পার হতে ও পার করে বাটে বাটে ঘোরাও মোরে।...

কখনও কখনও সুরে তালে গেয়ে উঠি কত গান। বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর গানের জগৎ আমাকে বিরাট মানস-আশ্রয় দিয়েছিল। আমি কোনওদিনই সেই অর্থে গানের চর্চা করিনি। গান ভাল লাগে—এটুকুই শুধু জানতাম। বাণীব্রত একদিন কী কথার সূত্রে বলেছিল. তুই গম্ভীরা গান জানিস? মালদার বিখ্যাত গম্ভীরা গান! আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, তুই গম্ভীরা গান কোথায় শুনলি? জানিস নাকি এর সম্বন্ধে কিছু!

—নামটুকুই শুনেছি। প্রতি গানেই নাকি থাকে—'শিব হে' এই কথাগুলো। বাণীব্রত ঘন উৎসাহে বলেছিল।

হস্টেলের ছোট্ট ঘরে, ভাগ্যান্বেষী ল' স্টুডেন্টদের ব্যারাকে হঠাৎ মাটির গন্ধ ছুটে এসেছিল। আমার দেশ ভুঁইয়ের মাটির গন্ধ, ইতিহাসঋদ্ধ, সংস্কৃতিসমৃদ্ধ মালদার মাটির সুগন্ধ। আমি মুহূর্তে উন্মনা হয়ে গেছিলাম। অনেকদিন পরে আমার ব্যক্তিগত জীবনের ভাঙচুরের বাইরে কেউ যেন আলাদাভাবে মালদার অন্তর্লীন ছবির কথা জানতে চাইল। আমি বিহ্বল হয়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ রে জানি। একটু একটু গাইতেও পারি।

—তাই নাকি! তা হলে একটু গেয়ে শোনা না। বাণীব্রত যেন কোনও নতুন আবিষ্কারের আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল।

—আমি তো গম্ভীরা গানের শিল্পী নই। ভাল করে ওদের মতো গাইতে পারব না। কথাগুলো বলতে বলতে আমি দূরতর স্মৃতির রাজ্যে চলে গেছিলাম। এক বৈশাখী মেলার প্রাঙ্গণে গম্ভীরার আসর বসেছে। বাবা-মায়ের হাত ছাড়িয়ে আসরের একেবারে সামনে তেরপলের আসনে বসে গান শুনছে একটি বালক। বয়স তার দশ অথবা বারো। দু'চোখে মুগ্ধ বিস্ময় ঃ 'শিব হে মাথায় বাইন্ধাছ ক্যানে জটা।/ম্যালেরিয়ায় ভুইগ্যা ভুইগ্যা ভুঁড়ি কইরাছ ক্যানে মোটা॥'

বাণীব্রতকে সেদিন ওই গানটিই স্মৃতি খুঁড়ে তুলে এনে শুনিয়েছিলাম। ডাইনিং হলে আগুনের মতো ছড়িয়ে দিয়েছিল আমার গান গাওয়ার সংবাদ। রাতারাতি আমি যেন বিখ্যাত হয়ে গেছিলাম। পরের বছর ল' কলেজের ফাংশানে আমাকে গানটা শোনাতে হয়েছিল। বহুদিন পরে সেই আমার নবজন্ম—বহু মানুষের সামনে, গ্রামীণ শিল্পের হাত ধরে, লোকসংস্কৃতির আশ্রয়ে আমার বিষাদগ্রস্ত প্রাত্যহিকতা সেদিন ভেঙে গেল। নিজেরই অজান্তে বাণীব্রত আমার গহন হৃদয়ে এই কথাটা চকিতে জাগিয়ে তুলেছিল : 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।'

আমি এখন যেখানে থাকি সেই এলাকার মানুষজন আমাকে ভালবাসে, পছন্দ করে—আমাব এই অনুভব ভুল, না ঠিক, আমি বলতে পারব না। তবে ওই যে আগে বলেছি, ভালমানুষ হিসেবে আমি চিহ্নিত হয়ে গেছি এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত। গত বছর সামান্য চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার পর মানুষের নিবিড় সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা আমাকে ক্রমশ দিঘির জলে আবদ্ধ করে ফেলছে। অনেকের বাড়ি যাই, গল্প করি, উদ্দেশ্যহীন মুহূর্তগুলো উদাসী পথিকের মতো খরচ করে ফেলি। কেউ কেউ হয়তো মনে মনে বিরক্ত হয়। যদিও আমাকে মুখের ওপর কিছু বলে না। আমার বাইরে ভালত্বের আবরণের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। যেমন কৃষ্ণেন্দুর মতো প্রাক্তন নকশালবাদী ছেলেও আমাকে ওর সহমর্মীর তুল্যমূল্য ভেবেছে। ওব মনের দরজাটা ও একদিন আমার সামনে খুলবেই খুলবে। অথচ কৃষ্ণেন্দুর চোখের চারপাশে এখনও সেই আগুনের পোড়া দাগ। যে-চোখ দিয়ে একদিন ও ভেঙে যেতে দেখেছিল জীর্ণ পুরনো বহু ভাববিগ্রহ। দেখেছিল বিশ্বাসের মৃত্যুসমারোহ আর গলিত শব। ওর ওই অগ্নিস্রাবী চোখ দুটোতে জ্বলন্ত স্বপ্ন ছিল, ছিল প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা, ছিল মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার। সেই আগুন আজ নিভে গেছে। তবু কৃষ্ণেন্দুর জীবনজিজ্ঞাসা এখনও তীক্ষ্ণ। বর্শার মতো, তীরের মতো। আমি বুঝতে পারি, দুর্বিপাকে পঙ্গু হয়ে যাওয়া ড্রিমার ছেলেটা কিছু বলতে চায়। এবং সেটা আমাকেই বলবে! কবে ও বলবে জানি না! তবে আমি শোনার জন্য প্রস্তুত।

তপতী নামের একটি মিষ্টি গৃহবধূ আমাকে একদিন রাতে রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়ে পাগল করে দিয়েছিল। আমার এই আবাস থেকে তপতীদের বাড়ি অনেকটা দূরে। ওদের বাড়িতে আমি মাঝেমধ্যে যাই। তপতীর স্বামী শমিতকে আমি মনে মনে বন্ধু বলে ববণ করে নিয়েছি। ওর সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে আমার ভারি ভাল লাগে।

এই তরুণীটির মা মালদহের মেয়ে। সম্ভবত আমার বাবার এক পিসিব সঙ্গে শমিতের মায়ের কোনও যোগসূত্র ছিল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার ঘণ্টাখানেকের জন্য কথা বলে তেমনই মনে হয়েছে। আমি অবাক হয়ে গেছি এই দেখে যে, শমিত কিংবা ওর মা—কেউই মালদা বা মহানন্দা সম্পর্কে কোনও টানই অনুভব করে না। এই বিচ্ছিন্নতার উৎসমুখ আমি এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। দেশের মাটি ও নদীকে নিয়ে আমার উচ্ছ্বাস ও বাঁধভাঙা উল্লাসে শমিত হয়তো বিরক্ত হয়। কিন্তু আমি কখনোই সংযত হতে পারি না। শমিতকে দেখলেই আমার মনে হয়, আমরা দু'জনে একই ভূমি থেকে চিরজীবনের মতো প্রাণরস টেনে নিয়েছি। যদিও তা আমাদের কারও জীবনেই সর্বাংশে সত্যি নয়।

পথে, প্রান্তরে, গৃহাঙ্গনে কত জনের সঙ্গে আমার দেখা হয়, কিন্তু সেই সামান্য ব্যাপারি লোকটিকে আর কোথাও দেখতে পাই না। কী যেন নাম লোকটির। সে কি বেঁচে থাকার লড়াই করতে করতে শেষপর্যন্ত হেরে গেল? তাই বা কেমন করে হবে। লোকটির লুব্ধ দৃষ্টিতে আমি অন্য ইঙ্গিত দেখেছিলাম। দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় পৃথিবীর প্রতি এক তীব্র টান, অবিচ্ছিন্ন আকুলতা লোকটিকে কী সতেজ, কী প্রাণবাহী করে রেখেছে! এই লোকালয়ে ওর মতো মানুষ হয়তো আরও আছে। তাদের সবার সঙ্গে এখনও আমার দেখা হয়নি।

সব মানুষের কাছেই কি আমাকে পৌঁছতে হবে? এমন তো কথা ছিল না! নিজেও কখনও ভাবিনি। সুপ্ত ইচ্ছা বা কামনার মতো আমার হৃদয়ে তা লুকনোও ছিল না। অথচ আজকাল মানুষের অনেক কাছাকাছি চলে আসতে ইচ্ছে করে। ভালবাসতে ইচ্ছে করে, কথা বলতে ইচ্ছে করে। প্রায় সবসময়।

কোনও কোনওদিন শমিত কিংবা প্রতিবেশী অতীনবাবু অথবা জগদীশ ব্যানার্জি কিংবা মণিলালদের বাড়ি থেকে বেরোতে রাত হয়ে যায়। গল্পকথার শেকল ছিঁড়তে পারি না নির্দিষ্ট সময়ে। ওঁদের নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়। যদিও ওঁরা মুখে কিছু বলেন না। সবাই ভীষণ ভদ্র। আমার কাছ থেকে শমিত কিংবা অন্যরা নিশ্চয়ই কিছু প্রত্যাশা করেন না। অবশ্য আমি ওঁদের কী-ই বা দিতে পারব! তবু ওঁরা আমাকে সঙ্গ দেন। ভালবাসেন।

আমার অতীত জীবন সম্পর্কে ওঁদের কেউ এখনও কোনও ঔৎসুক্য দেখায়নি। যদি কেউ তা জানতে চায়, আমি কোত্থেকে শুরু করব জানি না। আমার শৈশব, আমার কৈশোর, যৌবন এবং এই দিনান্তবেলার প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে কোনও পারম্পর্য নেই। আবার হয়তো আছে। জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছি। শৈবালের মতো, নৌকোর মতো। বাবার মতো নিরুদ্দেশযাত্রায় আমি বেরোইনি। কোথাও হয়তো পৌঁছতে হবে।

কামাদি কুসুম সকলে

কৃষ্ণকামিনী মরিতেছে।

সীমান্তে সিঁদুর লইয়া তাহার মরিবার সাধ ছিল। সে আহ্লাদ পূর্ণ হইতেছে না। স্বামী বিনোদচন্দ্র পূর্বেই গত হইয়াছেন। বৎসরের হিসাবে তাহা অনেক দিনের কথা। কৃষ্ণকামিনীর শিয়রে বিনোদচন্দ্রের যে ছবিখানি দৃশ্যপটের ন্যায় রাখা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়, ছবিটি নিতান্তই পুরাতন। কাঁচের উপর ধোঁয়ার মালিন্য স্পর্শ করিয়াছে, উর্ণনাভতন্তুর সবিশেষ চিহ্ন বর্তমান এবং একটি অথবা দুইটি চন্দনের ফোঁটা বিনোদচন্দ্রের ললাটে প্রতীয়মান।

পুরাকালিক বোম্বাই খাট নামক সুবিশাল পালঙ্কে কৃষ্ণকামিনী বেঘোরে পড়িয়া আছে। পদদ্বয় যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয় নাই। তাহার বাম হস্তটি কনিষ্ঠা কন্যার করতলগত। কন্যা নীরবে অশ্রু ফেলিতেছে ও হস্তমথিত করিতেছে। কৃষ্ণকামিনীর বাম হস্তটি বড়ই মূল্যবান। তিনখানি সোনার চুড়িতে মৃতপ্রায় হস্তটির শোভা এখনও পর্যন্ত কিছুমাত্র কমে নাই। দক্ষিণ হস্তটি সেই তুলনায় আপাতত বড়ই নগণ্যবৎ শয্যার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। সামান্য এই হস্তটি, স্যালাইন ওয়াটার শরীরে প্রবেশ করাইবার দ্বার হিসাবে পূর্বে ব্যবহৃত হইতেছিল। এই হস্তে স্বর্ণনির্মিত যে রুলি দুইখানি ছিল তাহা কৃষ্ণকামিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনীতার শক্ত মুঠিতে ধরা রহিয়াছে। মধ্যমা কন্যা নবনীতা আড়চোখে দিদি ও ভগিনী পরিণীতার উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। এমতাবস্থায় পড়শিরা তাহাকে দেখিয়া অবশ্যই ভাবিতেছে, আহা, কন্যা মাতৃশোকে বড় অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষের জল পর্যন্ত ফেলিতে পারিতেছে না।

কৃষ্ণকামিনী বিগত প্রায় একশো দিন ধরিয়া শয্যা নিয়াছে। স্নান করিতে গিয়া কলঘরে পতন ও তাহা হইতে পক্ষাঘাতের উৎপত্তি। বিনোদচন্দ্রের বড় সাধের এই সুবৃহৎ গৃহের দ্বিতলে কৃষ্ণকামিনী ও তাহার কাজের মেয়ে চঞ্চলা বস্তুত একাই থাকিত। একতলায় তাহার নকুল নামীয় স্কুল-শিক্ষক চতুর্থ পুত্রের বসবাস। কৃষ্ণকামিনীর পঞ্চপুত্রের মধ্যে নকুলের অবস্থাই কিঞ্চিৎ দারিদ্র্যলাঞ্ছিত। তাহার অর্থভাণ্ডারের অবস্থা—পূর্ণ হইতে পূর্ণ চলিয়া গেলে যাহা থাকে, তেমনিই। অন্যান্য ভ্রাতৃগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সে এখনও পর্যন্ত নিউ আলিপুর, লেকটাউন অথবা লবণহ্রদে নিজ গৃহ নির্মাণ করিয়া তথা পৈতৃক ভিটার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক চলিয়া যাইতে পারে না। যদিও নিয়ম স্বপ্ন দেখিতেছে। নকুল, নকুলের স্ত্রী শমিতা ও তাহাদের একমাত্র কন্যাসন্তান সেঁজুতি নিকটে ছিল বলিয়া বুড়ি শয্যা ও সেবালাভের প্রাথমিক পর্বটুকু লাভ করিতে পারিয়াছিল। ইহারা না থাকিলে কৃষ্ণকামিনী কলঘরে মরিয়া

পড়িয়া থাকিত বলিয়া অন্যান্য ভ্রাতারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল। বড়দাদা যুধিষ্ঠির প্রকাশ্যেই বলিয়াছে, নান্টু না থাকলে কী যে হত! ভাগ্যিস মায়ের কাছাকাছি তুই আছিস! নকুলের স্ত্রী উক্ত প্রশংসাবাক্যটিকে নিংড়াইয়া যাহা বাহির করিয়াছিল তাহার সারমর্ম এই—তুমি যে এখনও এ বাড়ি ছাড়তে পারনি, সে কথাটাই বট্‌ঠাকুর ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে। তুমি তো হন্দবুদ্ধু, তাই বুঝতে পারনি। নকুল এতদূর ভাবিয়া দেখে নাই। নকুলের রাগ হইয়া গিয়াছিল—দাদার উপরে নহে, অসুস্থা কৃষ্ণকামিনীর উপর। আর একটি ভয় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মাতৃদেবীর অঞ্চলচ্ছায়ে থাকিয়া তাহার গৃহ সমস্যার সুরাহা হইতেছিল। বুড়ি চোখ বুজিলেই এই দ্বিতল বাড়িখানিতে তাহার আর কোনও অধিকার থাকিবে না। ভাগাভাগির কথা অচিরাৎ আসিয়া পড়িবে। উইল অনুযায়ী তাহাব ভাগে দুইখানি ঘর ও বারান্দার অংশবিশেষ পড়িবে মাত্র। সেদিন আসিতে আর দেরি নাই। নকুলকে এই মুহূর্তে শয্যাপার্শ্বে দেখা যাইতেছে না। আসন্ন গৃহচ্যুতির বেদনাকে ভুলিতে সে ভ্রাতাদের কাছ হইতে টাকা তুলিয়া শ্মশানযাত্রার আয়োজন করিতেছে।

বিনোদচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে বহুসন্তানবতী করিয়া ছাড়িয়াছেন। তিনি চাহিতেন, তাঁহার সংসার পুত্র-কন্যায ভরিয়া উঠুক; খাইবার অর্থের যখন অভাব নাই, তখন পুত্র-কন্যাদের লইয়াই পঙ্‌ক্তি-ভোজনের সমারোহ হউক। কৃষ্ণকামিনী স্বামীর এই উৎকট স্বপ্ন সফল করিবার জন্য সপ্তদশ বৎসরে প্রথম সন্তানের মা হইয়াছিল এবং বত্রিশ বৎসরে অষ্টম তথা শেষ সন্তানেব জন্মদান সুসম্পন্ন করিয়াছিল। সর্বশেষটি জন্মিবার পর বিনোদচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে মাঝখানে বসাইয়া পুত্রকন্যাদেব সহিত ছবি তুলাইয়াছিলেন। তাহার পর ছবিটির তলায় অতি পরিচিত একটি গানের কলি লিখিয়া দিয়াছিলেন—'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা।' সে ছবি আজ হারাইয়া গিয়াছে।

প্রথম দানে পুত্র। পূর্বাপর কিছু না ভাবিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছিল যুধিষ্ঠিব। দ্বিতীয়বারেও যখন পুত্র হইল, তখন ছন্দ মিলাইয়া সেটির নাম বাখা হইল ভীমদেব। ভীমদেবের জন্মের সময় কৃষ্ণকামিনীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। বৃহদাকার শিশুটি যখন তাহার নাড়ি ছিঁড়িয়া ভূমিষ্ঠ হইল, তখন কৃষ্ণকামিনীর বাঁচিবার আশা বিনোদচন্দ্র ত্যাগ কবিয়াছিলেন। অবশ্য সে-যাত্রা কৃষ্ণকামিনী অদৃশ্য দৈব-আশীর্বাদে বাঁচিয়া গেল। ভীম তাহার মৃত্যুর কারণই হইয়াছিল বলিয়া কৃষ্ণকামিনী এই পুত্রটিকে একটু ভিন্ন চোখে দেখিত। ইহাকে অধিক স্নেহ দান করিত তাহাও নহে, ভীমদেব সম্পর্কে তাহার একটি গোপন ভীতি ছিল। মৃত্যুর দ্বার হইতে তাহাকে যে ঘুরাইয়া আনিয়াছে, তাহার শক্তি উপেক্ষা করিবার নহে। ভীমদেব বড় হইয়াও ইহা বুঝিতে পারে নাই। কেবল তাহার আশ্চর্য লাগিয়াছিল, মা তাহার বিবাহ দিবার জন্য জোরাজুরি করে নাই। একবারই মাত্র সে বলিয়াছিল, বিয়ে আমি করব না মা। কৃষ্ণকামিনী পুনরায় বিবাহের কথা ভুলিয়াও তুলেন নাই। শুরুতেই এই নির্লিপ্ত যবনিকা পতনের ফলে ভীবদেবের আর বিবাহ হয় না। কৃষ্ণকামিনীর আজ মৃত্যু হইবেই—এমন সংবাদ পাইয়া ভীমদেব মাতাকে শেষবারের মতো জীবিতাবস্থায় দর্শন করিবার জন্য আসিয়া জুটিয়াছে। ইহাতে তাহার কাজের অবশ্যই ক্ষতি হইয়া

গিয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডঃ বি ডি মুখার্জি নামে তাহার যে খ্যাতি, তাহা অদ্য কৃষ্ণকামিনীর শেষ যাত্রা উপলক্ষে ব্যাহত ও ধূসরিত হইতেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গতরাত্রে অকস্মাৎ কৃষ্ণকামিনী যখন যমের দক্ষিণদুয়ার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় তৃতীয় পুত্র অর্জুনকুমার ভীমদেবকে ফোন করিয়াছিল। ভীমদেবকে নিশ্চিত ও অবধারিতভাবে পাওয়া যায় নাই। তাহার সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে ফোন ধরিয়াছিলেন কোনও এক অজানা মিস গীতালি, যিনি পুরা সেপ্টেম্বর মাসটি ভীমদেবের সহিত গভরনেস ও শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে দিবারাত্র থাকিতে চুক্তিবদ্ধ। প্রবল মদ্যপানের ঘোরে মহিলা ইংরাজি-বাংলা মিশাইয়া এমত আত্মপরিচয় দিয়াছিল এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আগামী সকালেই ডঃ মুখার্জিকে পাঠাইয়া দিবেন। মা মরিতেছে বলিয়া কথা! ভীমদেব বেলা আট ঘটিকা নাগাদ নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন মুখে নিয়া আসিয়াছে। এবং কৃষ্ণকামিনীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ায়া নাই। তাহাকে দেখা যাইতেছে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেবের সহিত কথা বলিতে। অলিন্দে দাঁড়াইয়া।

বাঙ্গালোর তোর কেমন লাগছে?

খারাপ না মেজদা। ভালই। তবে খাওয়ার খুব কষ্ট।

ডোন্ট ফরগেট, কষ্ট না করলে—আই মিন কেষ্ট পাবি কী করে?

তা ঠিক। তবে হঠাৎ এইভাবে বদলি হয়ে যাব ভাবিনি। তুমি যদি একটু ঘোষরায়কে বলতে...

মিঃ ঘোষরায় মানে তোদের ওই হামবাগ সেলস্ ম্যানেজার! নো ব্রাদার। তুই ভাবলি কী করে এ কথা! তুই কি জানিস না, ওই লুম্পেনটা দু-পেটি রিয়েল ইটালিয়ান অলিভ অয়েল নিয়ে আমার সঙ্গে কী ব্যবহারটা করেছিল?

ভীষণ বাজে ব্যাপার—আমি জানি।

তবে! নো, নো, তুই আমাকে এমন রিকোয়েস্ট করতে পারিস না।

আচ্ছা, মাকে তোমার নার্সিংহোমে রাখলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি...

হয়তো, তবে আমি আন্‌ডান। নার্সিংহোমে কেউ জায়গা জুড়ে থাকবে—এমন জায়গা নেই। সবচেয়ে বড় কথা মাদার ইজ ডাইং। আউট অফ হ্যান্ড।

না, আমি বলছিলাম, ছোড়দার উপর দিয়ে তাহলে এত ধকল যেত না, তাছাড়া তুমিও মায়ের শুশ্রূষা করতে পারতে।

আঃ, একটা কথা তুই কিছুতেই বুঝছিস না যে, আমার তেমন সময়ও নেই অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু সে, আমার তেমন কারুকে মরতে দেওয়ার জায়গাও নেই। ইজ্ নট্ ইট?

হ্যাঁ মানে—

নো, কোনও মানে নয়; অল থিঙ্কস্ আর ভেরি ক্লিয়ার। বাই দা বাই, তুই মায়ের ট্রিটমেন্টের জন্যে যে সব ওষুধ ডোনেট করেছিস, সেগুলোর দাম আমার থেকে নিয়ে নিস। দ্যাট্ পুওর নান্টুর কাছ থেকে চাইবি না কিছু। দাদা আউট অব কোশ্চেন। অর্জুন দেবে কিনা জানি না। বাট আই উইল পে, ইয়েস আই হ্যাভ টু পে, রিমেমবার।

বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও সহদেবের অন্তরাত্মা ভীমদেবের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাহার এই দাদাটি কাহাকেও আপন জ্ঞান করে না। সহদেব জ্ঞানপ্রাপ্তির সময় হইতে দেখিয়া আসিতেছে, ভীমদেব অন্যান্য ভ্রাতা-ভাগিনী হইতে স্বতন্ত্র। প্রবল মেধাকে সম্বল করিয়া স্বকীয়ভাবে বড় হইয়াছে। চিকিৎসক হিসাবে আজ অর্থ ও খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহদেব বাল্যকালে ভীমদেবকে অনুসরণ করিয়া চলিত। কিন্তু কৈশোর ও প্রাক্‌যৌবনে আসিয়া সে অনুভব করিয়াছিল, মধ্যম ভ্রাতা তাহাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনিতে চাহে না। বরং কৃপা প্রদর্শন করে।

সহদেব জীবনের সোপান অতিক্রম করিয়া আজ যে-স্থানে উঠিযাছে, তাহার পিছনে ভীমদেবের কিছুমাত্র ভূমিকা নাই, তাহা বলিলে ভুল হইবে। সহদেব সে-কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার করিলেও মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সহদেব একবার স্ত্রীকে বলিয়াছিল, মেজদার মতো ডাক্তার কলকাতায় খুব কম আছে! জয়া বিন্দুমাত্র সময় না দিয়া মুখের উপর উত্তর দিয়াছিল, তোমার মতো ওষুধ-বিক্রি-করা লোকেরাই সে কথা ভাল বলতে পারবে। সহদেব স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ শব্দদ্বয়ের এতদ্দৃশ অনুবাদ তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সেদিন হইতে সহদেব এই ধারণা পোষণ করে—ভীমদেবের জন্যই তাহার কিছু হইল না। মানুষটি এই মুহূর্তেও তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইল ভ্রাতাকে কঠোর ভাষায় বলে, তোমার টাকায় আমি ইয়ে করি.. । সহদেব পারিল না। তাহার অপ্রকাশ্য ক্রোধ নিষ্ফল অস্ত্রের ন্যায় তাহাকেই বিদ্ধ করিতে লাগিল। সহজে মাতার শায়িত ও নিস্পন্দ দেহখানির দিকে ফিরিয়া বিমূঢ় হইয়া রহিল।

যুধিষ্ঠির বারংবার কৃষ্ণকামিনীর কপালে হাত দিয়া জীবনের উত্তাপ অনুভব করিতেছিল। পিতার মৃত্যুর দিন সে নিকটে থাকিতে পারে না। শ্বশ্রূমাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিলাসপুরে যাইতে হইয়াছিল। পিতা প্রায়শই পরমানন্দে বলিতেন যাহাকে তাহাকে, বড়খোকার বৌ এনেছি বিলাসপুর থেকে। বৌমার অমন রূপের সন্ধান কসবা-ঢাকুরিয়া-বালিগঞ্জে গোয়েন্দা লাগালেও খুঁজে পাবে না। সেই বিলাসপুরই তাহার কাল হইল। মৃত্যুর সময় জ্যেষ্ঠপুত্রের হাত হইতে গঙ্গাজল পাইলেন না; পুত্রমুখ সন্দর্শন বিনা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে একটি কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছে তাহার স্ত্রী কমলা। বিলাসপুরের কন্যার তনুলতায় সেই বহুকথিত লাবণ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। কাল আদ্যন্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। নিয়তদৃশ্য বয়স্কা বঙ্গমহিলা বিনা তাহাকে আজকাল আর কিছুই মনে হয় না। পলিতকেশ একষট্টি বৎসর বয়স্ক যুধিষ্ঠির কমলাকে এখনও সেই ষোড়শী সুন্দরী বলিয়া মনে করে। ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকেই দেখিতেছিল যুধিষ্ঠির অদ্যকার এই একাধারে দুর্বিষহ ও করুণাঘন আবহাওয়ার মধ্যেও স্ত্রীরত্নটিকে পার্শ্বে লইয়া বসিতে ভুলে নাই। চিরদিন সে যেভাবে এই ধনটিকে আগলাইয়া রাখিয়াছে, আজও তাহার ব্যত্যয় হইতে দিতেছে না। কমলা যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু সেজ দেওরের অধ্যাপিকা-স্ত্রী তাহাকে মাঝে মাঝে বড় কঠিন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া সুযোগ পাইতেছে না। অর্জুনের স্ত্রী রমা চোখের জল রুখিতে পারিতেছিল না।

সে কাল রাত হইতেই কৃষ্ণকামিনীর কাছে রহিয়াছে। রমার চক্ষু দুইটি রীতিমতো রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দ্বিপ্রহরে যুধিষ্ঠির ও কমলা আসিবার পর তাহার কান্না পুরাপুরি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। কমলাকে সে চোখে চোখে রাখিয়াছে। কী মনে করিয়া রমা উঠিয়া গেল। তাহার অশ্রুসিক্ত রুমালখানি মেঝেতে শতরঞ্চির উপর পড়িয়া রহিল। রুমালটির দিকে একবার রোষপূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া কমলা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া চুপিচুপি যুধিষ্ঠিরকে বলিল, আমার কাঁকাল ব্যথা করছে। আর বসে থাকতে পারছি না!

সে কী, এই সময় উঠে যাবে। নিন্দে হবে যে—

হোক নিন্দে, আমি আর পারছি না। তোমার মা, তুমি বসে থাক। বুড়ি যাচ্ছেও না, নিস্তারও দিচ্ছে না। যতদিন কাছে ছিলাম জ্বালিয়েছে, মরণকালেও জ্বালাচ্ছে।

ছিঃ ছিঃ, তুমি এমন কথা বলবে ভাবতে পারছি না।

ভাবাভাবির কী আছে? যা সত্যি, তাই বলছি।

আঃ, চেঁচিও না, সবাই শুনতে পাবে।

আমি চেঁচিয়েছি! তুমি তো চেঁচাচ্ছ। মায়ের প্রতি দরদ দেখানোর জন্যে জোরে জোরে কথা বলতে চাইছ। আমি বুঝি না, আমাকে সবার সামনে ছোট করার চেষ্টা।

আজকের দিনেও তুমি মায়ের ওপর এমন রেগে থাকবে! সব ভুলে যাও, এসো দু'জনে মিলে মায়ের জন্যে একটু কাঁদি। মা শান্তিতে যেতে পারবেন।

রমাদের মতো দেখন-কান্না কাঁদতে আমি পারি না। সে তুমি ভালই জানো। আর যার জন্যে কাঁদব তিনি কী আর...

কমলার কথা শেষ হয় নাই। রমা কাহাকে কী নির্দেশ দিয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল। কমলা চুপ করিয়া গেল এবং মুখে কাপড় চাপা দিয়া গুম মারিয়া বসিয়া রহিল।

কমলা নববধূটি হইয়া এই বাড়িতে প্রবেশ করিবার পরপরই কৃষ্ণকামিনী তিনজন ঝি-র মধ্যে একজনকে বলিযাছিল, তোমাকে আর দরকার নেই মঙ্গলার মা। ছেলের বউ এনেছি, এখন থেকে সে-ই সব দেখাশোনা করবে। তুমি টাকাপয়সা বুঝে নিয়ে কালই দেশে চলে যেও। কৃষ্ণকামিনীর এই বধূবরণের অভিনব প্রথায় কমলার অন্তস্থলে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বৃহৎ সংসারের কর্মহীন চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কমলা লুকাইয়া চোখের জল ফেলিত।

কৃষ্ণকামিনী রূপবতী কমলাকে খাতির করিত না। সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হিসাবে কৃষ্ণকামিনী কমলাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করিয়াছে। প্রাচীনা শ্বশ্রূমাতাটি বুঝিতেও পারে নাই যে, পুত্রবধূর ভিতরে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অগণন ক্ষত জন্মিতেছিল। যুধিষ্ঠির যেদিন নিজগৃহ নির্মাণ করিয়া পিতৃগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সেইদিন কমলা স্পষ্টতই অনুভব করিল দীর্ঘদিনের ক্ষতগুলি বিষাক্ত হইয়া তাহার সমগ্র দেহমন গ্রাস করিয়াছে। এবং কৃষ্ণকামিনী সম্পর্কে তাহার সত্তা শূন্যপ্রাণ বৃক্ষের ন্যায় কাষ্ঠবৎ হইয়া পড়িয়াছে। আপন সংসারে আজ পূর্ণরূপে অধিষ্ঠাতা হইয়াও কমলা তাহার বধূজীবনের প্রাথমিক পর্বের দিনগুলিকে ভুলিতে পারে না। কৃষ্ণকামিনীর প্রতি তাহার ঔদাসীন্য ও বিরাগ আজ বড় নিষ্ঠুর আকার ধারণ করিয়াছে। বিশেষ অনিচ্ছায়

অর্ধমৃতা কৃষ্ণকামিনীকে সে দেখিতে আসিয়াছে এবং বুড়ি মরিতেছে না দেখিয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। কেবল রমার চোখে তাহার এই অস্বাভাবিক নিস্পৃহ মনোভাব ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কমলা ইহাতেই কিছুটা বিব্রত।

অর্জুন ঘরের কোণায় দাঁড়াইয়া তাহার এক বাল্যবন্ধুর সহিত কথা বলিতেছে। কথা বলিলেও তাহার দৃষ্টি বারংবার কৃষ্ণকামিনীর মৃত্যুব্যথাতুর বিশুষ্ক মুখখানির দিকে চলিয়া যাইতেছিল। সেখান হইতে দৃষ্টিরশ্মি অন্তঃস্থলে ফিরিয়া আসিবার পথে এমন একটি স্থানে ধাবিত হইতেছিল যে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া অর্জুন মরমে মরিয়া যাইতেছে। অথচ তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার কোনো প্রচেষ্টাও তাহার চিত্ত গ্রহণ করিতেছে না। ভিতরবাড়ি হইতে কৃষ্ণকামিনীর ঘরখানিতে ঢুকিবার যে দরজাটি আছে, সেখানে সহদেবের যুবতী শ্যালিকা দাঁড়াইয়া আছে। সহদেবের স্ত্রী সম্প্রতি গর্ভবতী হইয়া পিত্রালয়ে আছে। সে তাহার ভগিনীকে আজিকার মৃত্যু-উৎসবে তাহার প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। যুবতীটি এমনভাবে দণ্ডায়মান যে তাহার পীনোন্নত স্তনের ডৌল সুস্পষ্ট আকারে প্রতিভাত। তাহার নাভিপদ্ম হইতে স্তনদ্বয় পর্যন্ত উদরের অনাবৃত অংশ, অঙ্গবস্ত্র সরিয়া যাওয়ায়, লোভন হইয়া উঠিয়াছে। যুবতীর ভ্রূক্ষেপ নাই। সম্ভবত সে তাহার এই কামোদ্রেকী রূপবিভঙ্গ সম্বন্ধে অবহিত নহে। অর্জুনের নিকট নারীদেহ নতুন নহে। তাহার স্ত্রী রহিয়াছে। নগ্ন সৌন্দর্যের ভয়ংকরতা সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। তথাপি তাহার দৃষ্টি পতঙ্গের ন্যায় বহ্নি সমীপে ধাবমান। এখন মাতৃশোকে তাহার চিত্ত বাহির হইতে পারিতেছে না। পলাইয়া যাইবারও ক্ষমতা নাই। অর্জুন নিজের কাছে পরাজিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাল্যবন্ধুটি হঠাৎ বলিয়া বসিল, হ্যাঁ রে, তোর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি না। অর্জুন যেন বাঁচিয়া গেল। রমাকে ডাকিয়া আনিয়া চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইল। মামুলি কথাবার্তার অবকাশে অর্জুন পুনরায় অনুভব করিল, রমার দেহখানি তাহার সম্মুখে যে প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া আঁখিপাখি দরজার নিকটে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। অর্জুন শত চেষ্টা করিয়াও নিজেকে দমন করিতে পারিল না। কৌশলের আশ্রয় লইয়া দ্রষ্টব্য স্থলে তাকাইল। ততক্ষণে যুবতীটি সেখান হইতে অন্য কোথাও সরিয়া গিয়াছে।

দেহপিঞ্জরে আত্মা আর কিছুক্ষণ হয়তো আবদ্ধ থাকিবে। সময় যতই অগ্রবর্তী হইতেছে, ততই কৃষ্ণকামিনীর বোধশক্তি অবসিত হইয়া আসিতেছে। প্রাতঃকালেও তাহার সামান্য জ্ঞান ছিল। কোনও এক পুত্রবধূ তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিল, মা আপনার সব ছেলেমেয়ে আসবে, সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণকামিনী পুত্রবধূটিকে চিনতে পারে নাই। সে রমা। লোক চিনিবার ক্ষমতা তখন হইতেই বিলুপ্ত হইতেছিল। বর্তমানে সে ক্ষমতার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। কৃষ্ণকামিনীর পরিণীতা নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যাটি শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে লক্ষ করিল, মায়ের ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু নড়িতেছে। সে প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, মা কি যেন বলছে, বড়দা মা কি যেন বলছে। বুড়ির সমগ্র নিকট-আত্মীয়ের দল বিধবার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কৃষ্ণকামিনী কিছুই বলিল না। প্রত্যেকেই হতাশ হইল। কৃষ্ণকামিনীর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া কেবল করুণ সুরে বলিল, দিদি মনে হয় গঙ্গাজল চাইছেন। বাবা যুধিষ্ঠির, একটু গঙ্গাজল দে বাবা।

কৃষ্ণকামিনীর ঠাকুরঘর হইতে গঙ্গাজল আনিতে গেল নকুলের স্ত্রী।

নবনীতা হতাশ হইল। সে আশা করিয়াছিল এই ডামাডোলের মাঝখানে পরিণীতা হয়তো মায়ের হাতখানি ছাড়িয়া দিবে এবং সে ওই হাতখানির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবে। পরিণীতা হাত ছাড়িল না। আরও দ্বিগুণ উদ্যমে মথিত করিতে লাগিল। নবনীতা বিনোদচন্দ্রের মুখে চুনকালি মাখাইয়া প্রেম করিয়া এক কায়স্থ সন্তানকে বিবাহ করিয়াছিল। ফলত, পিতা তাহাকে বিবাহোপলক্ষে কানাকড়িও দেয় নাই। বিনোদচন্দ্র কন্যাটিকে ত্যাজ্য করিতেই কেবল বাকি রাখিয়াছিলেন। পিতা যারপরনাই বঞ্চনা করিলেও মাতা তাহাকে গোপনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়াছে। নবনীতার স্বামী একটি প্রাইভেট কোম্পানির মেজকর্তা। তাহারা সংসারে সুখী হইয়াছে। কিন্তু নবনীতার মনে ততোধিক শান্তি নাই। তাহার দুই বোনের প্রত্যেকের গাড়ি আছে, সমাজে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠা আছে, সর্বোপরি নিজস্ব বাড়ি রহিয়াছে। তাহাকে এখনও ভাড়াবাড়িতে থাকিতে হইতেছে। তাহার স্বামী গত পনেরো বৎসর ধরিয়া 'বাড়ি করব, বাড়ি করব' বলিয়া নাচিতেছে; হয়তো আগামী বৎসরগুলিতেও নাচিবে। স্বপ্নের বাড়ি স্বপ্নেই বিলীন হইতেছে। পিতৃবঞ্চনার কারণে নবনীতা যত না কাতর, তাহার অধিক কাতরতা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠার বৈভবের ক্রমবর্ধমান বহর দেখিয়া। নবনীতা অবশ্য একটি দিকে তাহার ভগিনীদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালিনী। তাহা হইল, তাহার দুই পুত্র মানুষ হইয়াছে। বড়টি সম্প্রতি ব্যাঙ্কে চাকুরি পাইয়াছে; ছোটটি ডব্লু বি সি এস-এর জন্য প্রস্তুতি লইতেছে। অপর দিকে দুই ভগিনীর পুত্রকন্যারা নিজদিগকে অকালকুষ্মাণ্ড ও মাকাল ফলরূপে সংসার-উদ্যানে পরিচিত করাইয়াছে। নবনীতা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, প্রবঞ্চনা-প্রাপ্তির বহুতর কথা ভাবিতেছিল। শমিতা গঙ্গাজল আনিয়া দিয়া নবনীতার কাছে আসিল। উদাস স্বরে বলিল, তুমি সারাদিন কিছু মুখে দিলে না। চল, এখন একটু চা অন্তত খাও।

না ভাই, কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। এই ভাল আছি। তুমি বরং কিছু খেয়ে নাও। সেই কাল রাত থেকে চরকির মতো ঘুরছ, খাটছ।

শমিতা কিছু বলিল না। সে বিলক্ষণ বুঝিল তাহার এই ননদটি 'এ বাড়ির জলস্পর্শ করব না' বলিয়া পূর্ব-প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল, তাহাই আপ্রাণ চেষ্টায় জিয়াইয়া রাখিতেছে। শমিতা অন্য কাজে চলিয়া গেল।

ভীমদেব মাতার নাড়ি-স্পন্দন একবার অনুভব করিয়া গেল। তাহার মুখ দেখিয়া ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইল যে, কৃষ্ণকামিনীর চরম সঙ্কটকাল উপস্থিত। যে-কোনও মুহূর্তেই চলিয়া যাইতে পারেন। পুত্রের দিক হইতে কনিষ্ঠ সহদেব ও কন্যার দিক হইতে সর্বশেষ পরিণীতা—উভয়ের মধ্যে চোখে চোখে কী যেন কথা হইয়া গেল। মায়ের হস্তসেবা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছে না। বড়ই বিচিত্র ফ্যাসাদ! অথচ সহদেব পরিণীতার নিকট হইতে যাহা জানিতে চাহিতেছে, তাহা না জানিলে সে স্বস্তি পাইতেছে না। অবশেষে সহদেব অনেক ভাবিয়া বড়দিদি বিনীতাকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিনীতা মাতার রুলি দুইটিকে জামার তলায় চালান করিয়া সহদেবের সকাশে বাহিরে আসিল। সহদেব ইতস্তত করিয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল,

বাড়ি নিয়ে তোর সঙ্গে সেজদার কোনও কথা হয়েছে?
হ্যাঁ হয়েছে তুই কিছু শুনিসনি!
না, পরি সামান্য কিছু বলেছে, পুরোটা শুনিনি।
ও। হ্যাঁ, সেজদা এই বাড়ি কিনতে চাইছে। আমরা তো আর এই বাড়িতে থাকব না। আমাদের যদি কোনও আপত্তি না থাকে। তোর কী মত?
আমার কোনও মত নেই। তোরা যা বলবি তাই হবে। তোর মত কী?
আমি অনেকদিন থেকেই ভেবেছিলাম বাড়িটা আমি কিনব। এত বড়, এত ভাল, এমন পজিশনে কোনও বাড়ি এ তল্লাটে নেই। তোর জামাইবাবুর অবশ্য ইচ্ছা নেই। ও বলছিল, কী সব আইনের ঝামেলা হবে।
ছোড়দাকে আমরা যদি লিখে দিই...
সেখানেও তো সবার মত চাই। আমি কিনলে অবশ্য নান্টুকে থাকতে দিতাম। যা ভাড়া দিত—দিত। বাড়িটার প্রতি আমার মায়া-মমতা কতদূর তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না!—এই বলিয়া বিনীতা অন্যমনস্কভাবে তাহার সম্মুখের বারান্দার বাহারি রেলিঙগুলিতে হাত বুলাইল।
ছোড়দা এসব ব্যাপার জানে?
জানে না বোধহয়। তুই এখনই কিছু ওকে বলিস না। মায়ের কাজকর্ম ভালয় ভালয় হয়ে যাক। নইলে নান্টু মুষড়ে পড়বে।
সহদেব বিনীতার সাবধানবাণীতে সম্মতি জানাইল। এবং তৎসহ সে তাহার লবণহ্রদস্থিত ওনারশিপ ফ্ল্যাটটির কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে খুবই আনন্দিত হইল।
সন্ধ্যা নামিতে আর বাকি নাই। সূর্যদেবতা পাটে যাইতেছেন। আকাশ গোধূলির রঙে রঙিন হইয়া আছে। চতুর্দিকে একপ্রকার মায়াবী আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অপরাহ্নে কালেভদ্রে এজাতীয় আলো দৃষ্ট হয়। ইহাই কনে-দেখা-আলো বলিয়া খ্যাত। বিনোদচন্দ্রের বাড়িটি ক্রমে ক্রমে পাড়া-প্রতিবেশীদের আগমনে ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলেই যেন অধীর প্রতীক্ষা করিতেছে কৃষ্ণকামিনী কখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে। বুড়ির পুত্র ও কন্যার ভাগ্য দেখিয়া কোনও কোনও প্রবীণ মানুষ অল্প ঈর্ষান্বিত হইয়াছে। একজন ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণকামিনীকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; অথচ সুখের বিষয় তাহারা মৃত্যুলগ্নে সবাই উপস্থিত। মহিলাটিকে ভাগ্যবতী বলিতে হইবে!
ইহাকে কাকতালীয় বলিলেই যথার্থ বলা হয়। ঘটনাটি হইল নান্টু পুষ্প-ধূপ-খৈ-ধামা ইত্যাদি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল আর কৃষ্ণকামিনীর প্রাণবায়ু নির্গত হইল। মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামে অবশেষে অষ্টসন্তানবতী মাতাটি হার স্বীকার করিল। মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণকামিনীর ঘর হইতে মড়াকান্নার রোল উত্থিত হইয়া বাতাস ভারী করিয়া তুলিল। নান্টু নীচতলা হইতেই বুঝিল, মা চলিয়া গেলেন এবং তাহার পায়ের তলা হইতে মাটিটুকু সরিয়া গেল।
কন্যা এবং পুত্রবধূরাই তারস্বরে কাঁদিতেছে। পুত্রেরা নীরবে চোখের জল ফেলিল। ভীমদেবের অকস্মাৎ মনে হইল, সমগ্র পৃথিবীতে তাহার আর আপনজন বলিয়া কেহ রহিল না। অর্জুন মায়ের কোমল পা দুইটি ধরিয়া চক্ষের জল লুকাইতে চেষ্টা করিতে

করিতে দেখিল সহদেবের শ্যালিকা বাহিরের অলিন্দে বিরস বদনে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখ অশ্রুশূন্য। কৃষ্ণকামিনীর মৃত্যু তাহার অন্তরে কিছুমাত্র আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। সে যেন এখান হইতে যাইতে পারিলে বাঁচে! কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে এমনই বিবশা হইয়া পড়িল যে, টাল সামলাইতে না পারিয়া শ্বশুরের ছবিখানির উপর পড়িয়া গেল। ছবিখানি পালঙ্ক হইতে ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল।

অশ্রুমোচনের গতি স্তিমিত হইয়া আসিল। সকলেরই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। যাহা ঘটিল, সে-সম্বন্ধে এখনও কেহই ধাতস্থ হইতে পারে নাই। মাঝে মাঝে কেবল কৃষ্ণকামিনীর চন্দনা পাখিটি ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে। ভিতর বাড়ির উঠানে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিটি তারস্বরে কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিতেছে—সাড়া পাইতেছে না। এই সময়ে তাহার দুগ্ধ সহযোগে ভিজা মুগ ডাল খাইবার কথা। পাখি শোকস্তব্ধ পরিবেশকে উপেক্ষা করিয়া চেঁচাইতেছে। ঘরের মধ্যে বিনীতা কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত করিয়া বেদনাবিজড়িত কণ্ঠে, কনিষ্ঠাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, পরি, মায়ের হাত থেকে চুড়ি তিনটে খুলে নে। হাত শক্ত হয়ে গেলে আর পারবি না। পরিণীতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জ্যেষ্ঠার নির্দেশ পালন করিল। সহদেব এই কাজে আদরণীয়া ছোটবোনটিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার সহায়তার অবশ্য দরকার হইল না। নবনীতা সমগ্র দৃশ্যটি দেখিয়া তীব্রস্বরে আর একবার কাঁদিয়া ফেলিল। কেহই তাহার এই আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজিতে তৎপর হইল না। সকলেই ভাবিল ইহা নিদারুণ শোকের বহিঃপ্রকাশ।

যাত্রাপর্বের সূচনা করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। পুত্র-কন্যারা পরমস্নেহময়ী মাতাকে সযত্নে অজস্র শ্বেতপুষ্পে সাজাইয়াছে। অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারিদিক পূর্ণ। রমা শ্বশ্রূমাতার পা-দু'খানি অলক্তকে রাঙাইয়া স্মৃতিচিহ্ন লইয়াছে। যুধিষ্ঠির আর অপেক্ষা করিতে রাজি হইতেছে না। রাত বাড়িয়া যাইতেছে।

অবশেষে শ্মশানযাত্রার সমস্ত পর্ব সমাপ্ত হইল। কৃষ্ণকামিনীর দেহখানি রাস্তায় আনা হইয়াছে। রাত্রি হইলেও প্রতিবেশীদের ভিড় কম নয়। নান্টু ছবি তুলিবার যে লোকটিকে আনিয়াছে সে সুযোগ খুঁজিতেছে আরও কয়েকটি ছবি গ্রহণের। সুযোগ পাইতেছে না দেখিয়া সামনের বাড়ির রোয়াকে উঠিয়া যন্ত্রখানি তাক্ করিতেছে। লোকটি বড়ই রসিক। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, দিদিমার মেয়েরা দয়া করে এগিয়ে আসুন। খাটের বাঁ-দিকে বসে একটু কাঁদুন—আমি একটা শট নিয়ে নিই। নবনীতা অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, লোকটি ছবি তুলিবার কালে যাহা বলা হয় ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলিতেছে। অথচ এই পরিস্থিতিতে তাহা সাযুজ্যহীন নহে। কন্যারা কেহই ছবি তুলিতে আগ্রহী হইল না।

পুষ্পচন্দনে সজ্জিতা কৃষ্ণকামিনীকে বিসর্জনলগ্নের সহাস্য দেবী প্রতিমার ন্যায় লাগিতেছে। কিন্তু রমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, অজস্র ফুলের ভারে কৃষ্ণকামিনী ক্লিষ্ট হইয়া আছেন। পুত্রেরা হরিধ্বনি দিয়া মাতাকে স্কন্ধে চাপাইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া রমা সবার অলক্ষ্যে কৃষ্ণকামিনীর বুক হইতে একটি পদ্ম তুলিয়া লইল। ফুলটি কৃষ্ণকামিনীর প্রতি তাহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধার দ্যোতক। ইহা শ্মশানের আগুনে পুড়িতে দিবার নহে।

খেয়াঘাট

এখান থেকে খেয়াঘাটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভটভটি লাগানো দিশি নৌকো, বাঁশের ছোট সেতু, লোকজনের ভিড়। নৌকোয় ওঠানামার জন্য ছোটখাটো হুড়োহুড়ি। ওপারে শ্রীরামপুর। গঙ্গার এদিক আর ওদিক। মাঝখান দিয়ে বহমান জল। অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে। ইন্দ্রজিৎ পাড়ের কিনারে বসে একটা খুরি-ভাঙা জলে ছুঁড়ে দিল। খুব জোরে নয়। একটু অলস হাতে। ইন্দ্রজিতের দু'পাশে এলেবেলে পড়ে আছে দুটো ক্রাচ। ওর ভাঙাচোরা জীবনের চলমান সাথী। এই গাঢ় জলের সঙ্গে একদিন মিশে গেছিল দিব্যেন্দুর বাবার রক্ত। লাল, তাজা, উষ্ণ রক্ত। ঘাটের ডান দিকে ওই যে একটা ভাঙা নৌকো অর্ধেক জমির ওপরে অর্ধেক জলের শরীরে পড়ে আছে, ঠিক ওইখানটা, ওই ঢালু জায়গাটায় দিব্যেন্দুর বাবাকে ওরা খুন করেছিল। ওরা মানে পাঁচজন-- ইন্দ্রজিৎ, শঙ্কর, মনোতোষ, অতনু আর রঘু।

মুক্তির দশকে কোনও শ্রেণীশত্রুকেই কোথাও বাঁচতে দেওয়া হয়নি। স্কুলমাস্টার, দোকানি, বর্ধিষ্ণু চাষি, অধ্যাপক, পুলিশকর্মী, ছাপোষা গৃহস্থ, ছাত্র, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী---কাউকে ওরা ছাড়েনি। সন্দেহের ধোঁয়া একটু একটু করে যেখানেই গাঢ় হয়ে উঠেছে, সেখানেই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল রক্তপাত। যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখার কিংবা সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোনও সময় ছিল না তখন। খতমের তালিকাটা কারা করত, ইন্দ্রজিৎ কখনও জানতে পারেনি। তবে সেই তালিকায় একবার নাম উঠে গেলে আর কোনও বোধ কাজ করত না। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে যেত। তারপর সেই চরম মুহূর্তের জন্য নির্বিকার, নিরাবেগ অপেক্ষা।

দিব্যেন্দুর বাবা মহাদেব সাহাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল ইনফরমার হিসেবে। ভদ্রলোক বারাকপুর আউট পোস্টে পুলিশের ছোট্ট ক্যান্টিনে চা-চিনি-দুধ-ঘুঘনি---এইসব মাল সাপ্লাই দিতেন। ভারী শরীর, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। সাইকেলে করে যাতায়াত করতেন। নাকের চারপাশে ঘাম চিকচিক করত। দিব্যেন্দুর বন্ধু হিসেবে ইন্দ্রজিৎ, মনোতোষদের চিনতেন। ইছাপুরের রঘু একদিন সন্ধেবেলায় এসে হঠাৎ বলল, তোদের লোকালিটিতে এক শালা গেরস্ত পুলিশের টিকটিকির কাজ করছে। আমার হাতে ডেফিনিট খবর আছে। তোরা কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি।

---লোকটা কে? চিনিস! শঙ্কর দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করেছিল।

---তার নাম জানিস? মনোতোষের দু'চোখ দিয়ে ঝরে পড়েছিল আহত স্বপ্নের আগুন।

---আমাদের লোকালিটিতে থাকে বলছিস? ইন্দ্রজিৎ বিস্ময় গোপন করতে পারেনি সেদিন।

—তার মানে ঘাড়ের ওপর বিপদ নিঃশ্বাস ফেলেছে। অতনু হিসহিস করে বলেছিল।

ক্রূর হেসে রঘু জিজ্ঞেস করেছিল, তোদের এখানে দিব্যেন্দু বলে একটা ছেলে আছে না। চিনিস?

—হ্যাঁ, আমাদের বন্ধু। ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে গিয়েছিল ওর বুক, ওর পা, হাত, মাথা—সমস্ত শরীর। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ইন্দ্রজিৎ অপলকে তাকিয়েছিল শঙ্করের দিকে।

—বন্ধু! প্রচণ্ড অবজ্ঞায় রিভার সাইড রোডের মসৃণ পিচ রাস্তায় একদলা থুতু ফেলেছিল রঘু।

অতনু বলেছিল, আমরা ওকে চিনি। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গেই আমরা...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। রঘু মুখ বিকৃত করে বলেছিল, ওর বাবা কী করে তোরা নিশ্চয়ই জানিস। বারাকপুর আউট পোস্টে পুলিশের সঙ্গে লোকটার মাখামাখি অনেকদিন থেকেই আমাদের নজরে এসেছে। এতদিন পাত্তা দিইনি। কিন্তু এখন, সেন্ট্রাল কমিটির কাছে নিশ্চিত খবর আছে, লোকটা টিকটিকি। আমাদের এই আন্দোলন, এই যুগান্তকারী রিভলিউশন ভেস্তে দেওয়ার পক্ষ লোকটা যথেষ্ট। ওকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

—শ্রেণীশত্রু! মহাদেববাবু! মনোতোষ আর ইন্দ্রজিৎ প্রায় সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠেছিল।

—কেন তোরা অবাক হয়ে গেলি নাকি? রঘু খিঁচিয়ে উঠেছিল, এসব ডেঞ্জারাস এলিমেন্টস সম্পর্কে তোদের কোনও ধারণাই নেই। লোকটাকে আমি আজ একবার নিজের চোখে দেখে যেতে চাই।

—মহাদেববাবু খুব ভালমানুষ, নির্বিরোধী। কারও সাতেপাঁচে থাকেন না! ইন্দ্রজিৎ আর্তনাদ করে বলেছিল, ভীষণ খাটিয়ে লোক। আগে ওষুধের ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। বছর চারেক আগে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন নানা অফিসে-নার্সিংহোমে ক্যান্টিন গুডস সাপ্লাই করে সংসার চালাচ্ছেন। বিশ্বাস কর...।

আপদ তাড়াবার মতো বাতাসে বাঁ-হাতটাকে দুবার ছুঁড়ে দিয়ে রঘু বলেছিল, আস্তে, আস্তে। এসব শোনার বা জানার কোনও দরকার নেই। লোকটা অলরেডি ডিটেকটেড। ইন্দ্র, তুই কি ভাবছিস, তোর সার্টিফিকেটে মহাদেবের বাচ্চা পার পেয়ে যাবে? ওকে সরিয়ে দেওয়া হবেই। দ্যাট ডে উইল মাস্ট কাম। বাট দ্য ডে হ্যাজ নট ইয়েট বিন ফিক্সড।

পৃথিবীর বুক থেকে এক নিদারুণ শৈত্যপ্রবাহ পা বেয়ে মাথায় উঠে এসেছিল। সেই মুহূর্তে ইন্দ্রজিৎ চোখের সামনে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। কেবল দিব্যেন্দুর মুখ আর ওর বাবার মুখ পাশাপাশি ভেসে উঠেছিল অনবরত। অতনু চোখ নামিয়ে বসেছিল। মনোতোষ উদাস। কেবল শঙ্করের কোনও ভাবান্তর ছিল না। বরং ওর দু' চোখে হিংসার আগুন দপদপ করে জ্বলছিল—স্পষ্ট দেখেছে ইন্দ্রজিৎ। অসহায়ের মতো রঘুর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিল সে, পারেনি।

সিগারেটের নিভন্ত টুকরোটা টুসকি মেরে রাষ্ট্রগুরু কলেজের ক্যাম্পাসে ফেলে দিয়ে রঘু ফিকে হেসে বলেছিল, বাবা তো দিব্যেন্দুর, তুই এত কাঁদছিস কেন? মহাদেববাবু তোর কাকা-জ্যেঠা হয় নাকি!

এমন অসহনীয় আক্রমণের জন্য ইন্দ্রজিৎ এতটুকু প্রস্তুত ছিল না। রঘুর কথার চাবুক ওকে নুইয়ে দিয়েছিল।

---এবার আমাদের কী করতে হবে? শঙ্কর নিস্পৃহ, নিষ্কম্প গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

---ক'দিন পরেই জানতে পারবি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হয়তো আমাদেরই ওপর কাজের ভারটা ছেড়ে দেবে। তোরা পারবি তো! আগে থেকে বল। শেষকালে যদি কেঁচে যায়, তা হলে আমরাও আর বেঁচে থাকব না। রঘু অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল।

ইঙ্গিতটা একেবারে স্পষ্ট। জলের মতো স্বচ্ছ। পৃথিবীর বুকে মহাদেববাবুর হেঁটে-চলে বেড়ানোব মেয়াদ এবার শেষ। অদৃশ্য সেন্ট্রাল কমিটি তাদের চেয়েও অদৃশ্যতর এক পরোয়ানা জারি কবে দিয়েছে। কে বেঁচে থাকবে কে থাকবে না, তার তালিকা আর কত বড় হবে---সেদিন এই রহস্যের উত্তব পায়নি ইন্দ্রজিৎ। ওরা চারজন রঘুকে বাধা দিলে মহাদেববাবু হয়তো বেঁচে যেতেন। চারজনের বাধার জোর কি কম হত! অথচ সেদিন অতনু আর মনোতোষ নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিল, ইন্দ্রজিৎ অসহায়। এর পাশে শঙ্করের হিংস্র প্রবৃত্তি এবং রঘুর রক্তাক্ত বিপ্লবের জঘন্য পিপাসা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। মহাদেববাবুকে ইন্দ্রজিৎ বাঁচাতে পারেনি। এক সময় তো রঘুর চেয়েও শঙ্কর প্রবল হয়ে উঠেছিল, যেন আগামীকালই মহাদেববাবুর লাশ ফেলে দেওয়া উচিত। হায়, সেই শঙ্কর এখন ফিলাডেলফিয়ায় না কি টেনেসিতে সফ্‌টওয়্যারের ব্যবসা করে কোটিপতি। রঘু অবশ্য খড়দহের একটা এনকাউন্টারে মারা গেছে। অতনু দিল্লি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। মনোতোষ রাইটার্সের আপার ডিভিশন ক্লার্ক। আর ইন্দ্রজিৎ নিজে...। সবাই কোথাও না কোথাও পৌঁছেছে, পৌঁছতে পেরেছে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে মুক্তির দশক খোঁড়া করে দিয়েছে। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই। এই অঞ্চলে তার পরিচয় ওই শারীরিক বিপর্যয়ের চিহ্নসূত্র---খোঁড়া ইন্দ্রজিৎ। অঙ্ক, সায়েন্সের ক'টা সাবজেক্ট আর গানের টিউশন করে ওর স্তিমিত, স্বপ্নহীন জীবন কেটে যাচ্ছে। জলের চিরবহমানতার স্পর্শ পেতে এই নদীর কাছে এসে ইন্দ্রজিৎ প্রায়ই বসে থাকে। এখানে এলেই অবশ্য চোখ চলে যায় ওই নাবাল জমিটার দিকে। দিব্যেন্দুর বাবার রক্ত যেখান দিয়ে গড়িয়ে নেমেছিল জলে।

রঘু সেদিন অনেক রাত করে ইছাপুর ফিরে গেছিল। সম্ভবত লাস্ট ট্রেনে। যাওয়ার আগে পর্যন্ত, শুধু মহাদেব সাহা নয়, আরও অনেক কাজের কথা নিয়ে আলোচনা করেছিল। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সেই সময় রাতে পেট্রোল ট্র্যাফিক বাদ দিয়ে আর কোনও ঝামেলায় সামনাসামনি হতে হয়নি। রাস্তা বা কোনও গাছতলায় দাঁড়িয়ে কিংবা বসে রাষ্ট্রগুরু কলেজের ক্যাম্পাসের মাঠে দিব্যি আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যেত। কোনও চোখ, কোনও লোক কখনও ওদের অনুসরণ করেনি। ঘনবসতির লোকালয়ে নকশাল সম্পর্কে একটা ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গেছিল। ফলে নিজেকে বাঁচানোর

জন্য, সমস্ত উত্তাপ থেকে দূরে থাকার জন্য পারতপক্ষে কেউ ওই চারটে বর্ণ উচ্চারণ করত না। তাই ওদের নিয়ে কেউ কখনও মাথা ঘামায়নি। খুব নিঃশঙ্ক না হলেও ইন্দ্রজিৎরা তলায় তলায় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তবু কেন যে মহাদেববাবুকে ইনফরমার বলে সন্দেহ করা হয়েছিল কে জানে! কোন এলাকার নকশালদের খবর উনি জানতেন! কাদের সম্পর্কে পুলিশকে জানাতেন! ধোঁয়া, ধোঁয়া, এখনও ইন্দ্রজিতের কাছে সব ধোঁয়া। সেদিন এইসব ঘন ধূম্রজাল সরিয়ে আলোর দিকে যাত্রা করার কোনও অবকাশ হয়তো ছিল না। কিন্তু প্রতিরোধ করার মতো শক্তি মেরুদণ্ডও কি নষ্ট হয়ে গেছিল! এবং ইন্দ্রজিৎ এবার অদূর জলে ছোট্ট একটা ঢিল ছুঁড়ল। খুব সামান্য হলেও টুপ করে একটা শব্দ ভেসে গেল অবাধ, দুরন্ত বাতাসের ডানায় ভর দিয়ে।

দিব্যেন্দু এখন কোথায় আছে কে জানে! মহাদেব সাহাকে সরিয়ে দেওয়ার পর ওঁর পরিবারের লোকজন যত না দারিদ্র্যকে ভয় পেয়েছে, তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছিল পরিপার্শ্বকে। ওরা সবাই যেন মৃত্যুর আতঙ্কে ভুগছিল। সাতাত্তরে জামতাড়া থেকে ফিরে আসার পর ইন্দ্রজিৎ আর দিব্যেন্দুকে বা ওদের বাড়ির কাউকে এ তল্লাটে দেখতে পায়নি। ওরা যে বাড়িটার নীচের তলায় ভাড়া থাকত সেখানে তখন অন্য লোক, অন্য পরিবার। কে যেন সেই সময় বলেছিল দিব্যেন্দুরা অসমের দিকে চলে গেছে। ওখানে ওদের কিছু আত্মীয়স্বজন বিড়ি-পাতার ব্যবসা করে। দিব্যেন্দু তাদের সঙ্গেই ওর ভাগ্য জড়িয়ে নিয়েছে। যেখানকার মাটি ওর বাবার রক্ত শুষে নিয়েছে, সেখানে আর হয়তো কখনও ফিরে আসবে না, পা রাখবে না সেই মাটির বুকে। দিব্যেন্দুর পিঠোপিঠি ওর একটা বোন ছিল—মৌটুসি। দারুণ মুখশ্রী। কতদিন ইন্দ্রজিৎ ভেবেছে মৌটুসিকে বিয়ে করবে। ভোর রাতে মৌটুসিকে স্বপ্ন দেখেছে। ভাল কোনও স্বপ্ন। কখনও কখনও খারাপও। নিবিড় দেহ মিলনের স্বপ্ন। দিব্যেন্দু, মৌটুসি কিংবা ওদের ছোটভাই স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে কখনও যদি দেখা হয়, এই বিরাট গ্রহের কোনও প্রান্তে, কোনও কোণে, সেদিন ইন্দ্রজিৎ ওদের কাছে ক্ষমা চাইবে। ওরা নিশ্চয়ই সবিস্ময়ে তাকিয়ে অব্যক্ত ভাষায় জানতে চাইবে, কেন ক্ষমা? কোন অপরাধের জন্য?

ইন্দ্রজিৎ সেদিন বলতে একটুও দ্বিধা করবে না। কিন্তু ওরা কি আর বিশ্বাস করবে? কালের নিষ্ঠুর আবরণ সরিয়ে আর কি দেখতে চাইবে বিগত সেই মরণোল্লাস! ওরা কি ওকে ক্ষমা করবে? ইন্দ্রজিৎ কেঁপে উঠল। দিব্যেন্দু বা মৌটুসি হয়তো ক্ষমা করে দেবে। জীবনের এতটা পর্ব হেঁটে এসে ওরা আর বিবর্ণ, ধূসর, যন্ত্রণাময় অতীতে ফিরে যেতে চাইবে না। বারংবার ভাববে কী হবে ফিরে গিয়ে! ইন্দ্রজিতের আবার মনে হল, ওরা হয়তো বা...। কিন্তু স্বর্ণেন্দু ওকে কখনও ক্ষমা করবে না। কেননা ইন্দ্রজিতের কথার মোহে পা দিয়ে নিজের বাবাকে নিজেরই অজান্তে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল স্বর্ণেন্দু। অভিনেতা ইন্দ্রজিৎ, প্রতারক ইন্দ্রজিৎ, স্বপ্নবিলাসী ইন্দ্রজিৎকে স্বর্ণেন্দু সারাজীবন মনে রাখবে। অথচ নিজের এই ভূমিকাগুলো নিয়ে ইন্দ্রজিৎ কত গভীর যন্ত্রণায় ভুগেছে স্বর্ণেন্দুকে তা যদি দেখাতে পারত।

মহাদেব সাহাকে নিয়ে প্রথম বৈঠকের পর সাতদিনও কাটেনি, আবার রঘু এসেছিল। এবারে রঘুর মুখে কোনও উদ্বেগ, কোনও উৎকণ্ঠা, সংশয় কিছুই ছিল না। যেন একটা নিশ্চিন্ত ভাব। ওরা কেউই বুঝতে পারেনি। বারাকপুর গান্ধীঘাটের দিকে একটা নির্জনতম জায়গায় ওদের জড়ো করে রঘু কী ভয়ঙ্কর অথচ সহজ সুরে বলেছিল, আগামী শনিবার আমরা মহাদেব সাহাকে সরিয়ে দেব। রঘু নিজের গলার কাছে চপার চালানোর ভঙ্গি করেছিল।

—তার মানে! নিজের অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দুটাকে ভুলে গিয়ে চাপা চিৎকার করে উঠেছিল ইন্দ্রজিৎ।

—তুই কি এখনও ডিলেমায় ভুগছিস! না কি ন্যাকা সাজার চেষ্টা করছিস—কোনটা! শালা, তুমি জানো না, মহাদেবের ব্যাপারে রেড সিগন্যাল হয়ে গেছে! আগামী শনিবার। তার মানে হাতে ছদিন সময় আছে। শ্রেণীশত্রু মহাদেবকে খতম করার অপারেশনটার নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন নাম্বার টেন'। লোকটা শখ করে নাকি নাম্বার টেন সিগারেট খায়।

—কবে! ইন্দ্রজিৎ আবার আর্তনাদ করে উঠেছিল।

শঙ্কর স্থির চোখে অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, শুনিসনি! শনিবার, স্যাটারডে। রঘু, ক'টার সময়!

—লোকটা যখন বাড়ি ফিরবে। রাত দশটা নাগাদ। অতনু, ওই সময় তো মহাদেবের বাচ্চা বাড়ি ফেরে!

ভেতরের আতঙ্ক ও কম্পন লুকিয়ে রেখে অতনু কোনওরকমে বলেছিল, হবে হয়তো। আমি ঠিক জানি না।

—কেন জানিস না! অবরুদ্ধ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে রঘু বলেছিল, সব ঠিকঠাক জেনে নিবি। দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে। আমরা যদি কোনও কারণে সাকসেসফুল না হই, তা হলে পুলিশ আমাদের ছাড়বে না। একটা পাক্কা ইনফরমারের বদলে আমাদের মরতে হবে। তোরা তাতে রাজি! বল, বল। চুপ করে আছিস কেন?

শঙ্কর বাদে ওদের তিনজনের চোখের পাতা নেমে এসেছিল। ভয়ে, বেদনায়, অভাবিত আকস্মিকতায়, অভিঘাতে। সহসা রঘু ইন্দ্রজিতের কবজির কাছটায় খামচে ধরে বলেছিল, মার্ডার স্পটটা তোকে ঠিক করতে হবে! বি টি রোডের ধারে হবে না। তোদের এলাকাটা মোস্ট কনজেস্টেড। জায়গা খোঁজ, জায়গা খোঁজ। ওই সময়টায় কেউ যেন আমাদের দেখতে না পায়। কাজটা হাসিল করে তোরা যে-যার বাড়ি চলে যাবি। একেবারে ন্যাচারাল মুডে। আমি ইছাপুরে। সেন্ট্রালস কমিটি আমাদের আরও লোক দিতে চেয়েছিল। ওঁদের বলে দিয়েছি, উই আর এনাফ। তোদের চারজনের হাতেখড়ি আমি একাই দিতে পারব।

ওর ভয়ার্ত, বিহ্বল আচরণের সুযোগ নিয়ে রঘু ইন্দ্রজিৎকে সবচেয়ে কঠিন কাজটা দিয়েছিল। দু'রাত্রি ও ঘুমোতে পারেনি। তৃতীয় দিন টিটাগড় পেপার মিলের সীমানা পাঁচিল থেকে প্রায় মণিরামপুর ইন্দ্রজিৎ চষে ফেলেছিল। কোনওখানে ও নির্জন

জায়গা খুঁজে পায়নি। সর্বত্রই মনে হয়েছে বিপুল বিস্তারী জনগণের ঘনবসতি। তাদের এক জোড়া জাগ্রত চোখ সিনে ক্যামেরার মতো মুভ করছে। এই কয়েক মাইলব্যাপী জায়গার যেখানেই মহাদেববাবুর লাশ পড়ুক না কেন, ওরা নিস্তার পাবে না। ধরা পড়ে যাবে। জনগণের কাছে অজানা থাকবে না কিছুই।

মরিয়া হয়ে ইন্দ্রজিৎ স্পট খুঁজেছে। প্রায় পাগলের মতন। ধূর্ত জন্তুর মতো লক্ষ করেছে রাতের দিকে কোন পথ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে মহাদেববাবু বাড়ি ফেরেন। প্রতিদিন একই পথ দিয়ে ভদ্রলোক ফেরেন না। রাস্তা বদল করেন। দ্বিতীয় মুশকিল এখানেও। তিনদিনের মধ্যেই ইন্দ্রজিৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা ওর মা আর সেজদির চোখে এড়ায়নি। ওরা জিজ্ঞেস করেছিল। ইন্দ্রজিৎ উত্তর দেয়নি। বিরক্তি ঝরিয়ে বলেছে, কিচ্ছু হয়নি। আমাকে নিয়ে হঠাৎ পড়লে কেন! সেই ক'দিনে মায়ের দৃষ্টি বদলে গেছিল, ইন্দ্রজিতের স্পষ্ট মনে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে মা কিছু একটা খুঁজত। ওর কখনও অস্থির, কখনও চিন্তামগ্ন, কখনও উৎকেন্দ্রিক আচরণ মায়ের চোখে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল প্রথম থেকেই। যদিও জোর করে মা ওকে কিছু বলতে পারেনি। মায়ের চোখ কি কখনও ভুল দেখে!

রাত নটার পর এসব অঞ্চলে তখন শ্মশানের নীরবতা নেমে আসত। খুব দরকার না পড়লে গেরস্তরা বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইত না। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কেউ কেউ রাতের দিকে বাড়ি ফিরত। তাও দু'-তিনজন দল বেঁধে। মুক্তির দশক মানুষকে সুদিনের স্বপ্ন দেখার বদলে আতঙ্কের আবর্তে ফেলে দিয়েছিল। মহাদেববাবুর মতো কিছু মানুষ অবশ্য রাত দশটার পরও এখানে-ওখানে যেতেন-আসতেন। জীবনযাপনের ভয়ংকর তাগিদে এঁরা কেমন যেন নিঃশঙ্ক ছিলেন। কিংবা এমন শঙ্কাহীন হতে বাধ্য হয়েছিলেন। গলির কোনও বাঁকে, কারও বাড়ির পেছনের ফাঁকা জমিতে কিংবা ক্যান্টনমেন্টের কোনও জনশূন্য রাস্তায় মহাদেববাবুকে টেনে নিয়ে শেষ করে দেওয়ার কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। ভদ্রলোককে আর্তনাদ কিংবা প্রতিরোধ করার সুযোগ না দিয়ে মেরে ফেলা যায় প্রকাশ্য রাস্তায়। রঘু কি এটা জানে না? তবু ও কেন যে জায়গা খুঁজতে ওকে বাধ্য করল! ইন্দ্রজিৎ ভেতরে ভেতরে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল।

সেই ক'টা হাতগুনতি দিনে দিব্যেন্দুর সঙ্গে ওর অন্তত তিনবার দেখা হয়েছে। প্রথমবার ওকে দেখে ইন্দ্রজিৎ ভূত দেখার মতো চমকে গেছিল। তখন বিকেল। দিব্যেন্দু কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল রেললাইনের পাশের রাস্তা ধরে, শর্টকাটে। মৃদু হেসে ওর সরু গলায় দিব্যেন্দু জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে, আজ কলেজে যাসনি!

স্বপ্ন ও ঘুমের মধ্যবর্তী স্তরে এক এক সময় গলা দিয়ে যেমন স্বর বেরোয় না, বোবা আর্তনাদে বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়, তেমন একটা অবস্থা হয়েছিল সেই মুহূর্তে। দু'বার চেষ্টা করেও ইন্দ্রজিৎ জবাব দিতে পারেনি।

—তোর কি শরীর খারাপ! দিব্যেন্দু এগিয়ে এসে ছুঁয়ে বলেছিল।

—হ্যাঁ। কোনওক্রমে উত্তর দিয়েছে ইন্দ্রজিৎ। তারপর আর দিব্যেন্দুর সামনে দাঁড়াতে পারেনি। অস্বাভাবিক দ্রুততায় বন্ধুর সামনে থেকে সরে গেছে।

এরপর আরও দু'বার। দিব্যেন্দু হেসেছে। অনাবিল হাসি। ইন্দ্রজিৎ ভদ্রতাবশত সেই হাসির প্রত্যুত্তরও দিয়েছিল। কিন্তু ওর হাসিতে কোনও প্রাণ ছিল না। ছিল কৃত্রিমতা, মুখোশের আড়াল আর পাপবোধ। নিপুণ অভিনেতার মতো প্রতিটি মুহূর্তে ইন্দ্রজিৎ সজাগ থাকার চেষ্টা করেছে। পুরোপুরি পারেনি। মানুষের মধ্যে বিবেক নামক যে-অবিনশ্বর পদার্থটা আছে, সেটা মাঝে মাঝেই নড়েচড়ে উঠেছে।

নদীর পাড়ের এই জায়গাটা হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করে ফেলল ইন্দ্রজিৎ। অবশ্য ঠিক আবিষ্কার নয়, মহাদেববাবুর ছোট ছেলে স্বর্ণেন্দু নিয়তির মতো জায়গার হদিস দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার দিন সকালে মন্টুদার চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। তখনও গরম চায়ের গ্লাসটা হাতে পায়নি। মন্টুদা দ্রুতহাতে অনেকগুলো গ্লাস রেডি করছিল। নিজের মধ্যে ছিল না ইন্দ্রজিৎ। আগামী শনিবারের ছক আর প্ল্যানের মাদকতায় বুঁদ হয়েছিল। আজ একটা জায়গা খুঁজে বের করবেই, এমন একটা প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। স্বর্ণেন্দু কখন ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করেনি।

—ইন্দ্রদা। স্বর্ণেন্দু ডেকেছিল।

চমকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে দেখেছিল স্বর্ণেন্দুকে। আসন্ন শনিবারের নেশাটা কেটে গিয়েছিল এক লহমায়।

—দাদা আমাকে তোমার কাছে পাঠাল। বলল, তুমি নিশ্চয়ই জানবে। আচ্ছা, শ্রীরামপুর থেকে রাত্রে লাস্ট কখন বারাকপুরের খেয়া ছাড়ে জানো? এটাই দাদা জানতে চাইছে।

সবুজ কিশোর স্বর্ণেন্দুর সরল মুখ, ওর প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে ইন্দ্রজিৎ ভেতরে ভেতরে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। দুর্বলও। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন বলো তো! আমি ঠিক স্পষ্ট জানি না, মনে হয় দশটা কুড়ি।

স্বল্প হেসে স্বর্ণেন্দু বলেছিল, বাবা শনিবার শ্রীরামপুরে কী একটা কাজে যাবে। দিদির বিয়ের ব্যাপারে কার সঙ্গে যেন দেখা করার কথা। ফিরতে ফিরতে রাত হবে। তাই...

ইন্দ্রজিতের সমস্ত শরীরটা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ গাছের মতো কেঁপে উঠেছিল। মৌটুসির বিয়ে, এখনই! ওর বয়স কত হয়েছে? মৌটুসি, তোমার বিয়ে হয়ে যাবে! কার সঙ্গে? আমি...। ওর গলার কাছে একদলা আবেগ জড়ো হয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে। মন্টুদা চেঁচাচ্ছিল, 'ও ইন্দ্র, চা-টা নাও, চা-টা নাও।' ইন্দ্রজিৎ শুনতে পায়নি। এমন একটা অসহ্য অবস্থার মধ্যে কয়েক মুহূর্ত থাকার পরই ওর বুকের ভেতর সহসা আগুন জ্বলে উঠেছিল। মহাদেব সাহার আর বাঁচার অধিকার নেই। শ্রেণীশত্রুদের মৃত্যু অনিবার্য। খতমের তালিকায় একবার যার নাম উঠে যায়, তার আর নিস্তার নেই। পুব আকাশে মুক্তি সূর্য উদিত হওয়ার আগেই এরা লাশ হয়ে যাবে, হয়ে যেতে বাধ্য। চোখ সরু করে ইন্দ্রজিৎ জানতে চেয়েছিল, মেসোমশাই শনিবারই যাবেন!

—হ্যাঁ। স্বর্ণেন্দু অমল সরলতায় বলেছিল, ওইদিন না গেলে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা

হবে না। বাবাকে যেতেই হবে।

—ঠিক আছে, আমি একজ্যাক্ট টাইমটা জেনে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে বলে আসব।

—খুব ভাল হবে। স্বর্ণেন্দু মাথা নাড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গিয়েছিল, আর দাঁড়ায়নি।

চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ ওর চলে যাওয়া দেখেছে। মহাদেববাবুর আত্মজ গভীর বিশ্বাস নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। অথচ...। চার-পাঁচ চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে সঙ্গে খেয়াখাটের বাস ধরার জন্য চিড়িয়ামোড়ে চলে এসেছিল। শেষ খেয়া কখন, সেটা ওর ঠিক ঠিক জানার কথা নয়। তবু দিব্যেন্দু ওরই কাছে স্বর্ণেন্দুকে পাঠিয়েছিল। কেন? উত্তরটা খুঁজে না-পেয়ে ইন্দ্রজিৎ নিজের মনে হেসেছে। খেয়াখাটের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, দিব্যেন্দুটা কী বোকা!

সেদিন সন্ধেবেলায় ইন্দ্রজিৎ এসেছিল মহাদেব সাহার বাড়িতে সঠিক সময়টা জানাতে। আর মনোতোষ চলে গেছিল রঘুর কাছে মার্ডার স্পট হিসেবে জায়গাটার অ্যাপ্রুভাল আনতে। ইন্দ্রজিতের গলার শব্দ পেয়ে মৌটুসি বেরিয়ে এসেছিল। আধময়লা শাড়ি পরা, সন্ধ্যালগ্নের স্বল্প আলোয় মৌটুসিকে কেমন যেন দুঃস্থ, রেফিউজিদের মতো লাগছিল। আশ্চর্য, ওর সচকিত চোখ, লাবণ্যভরা মুখ ইন্দ্রজিৎকে এতটুকু টানেনি। মৌটুসি যেন জানত, ইন্দ্রজিৎ আসবে। ওকে দেখেই বলেছিল, টাইমটা জেনে এসেছেন!

তীব্র আগুনের হলকা যেন সেই মুহূর্তে পুড়িয়ে দিয়েছিল ইন্দ্রজিৎকে। কোনওরকমে সময়টা বলেই ও চলে এসেছে। মৌটুসি হতবাক হয়ে গেছিল। অনেকটা দূরে এসে ইন্দ্রজিতের হঠাৎ মনে হয়েছিল, মহাদেববাবুর মেয়েটাকে ও কীসের সময় বলে এল! শেষ খেয়ার, না কি মৃত্যুর!

খেয়াঘাট শুনে রঘু নাকি প্রথমে আপত্তি করেছিল। পরে কী মনে করে রাজি হয়ে যায়। ওরা পাঁচজন সেদিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘাটের কাছে অপেক্ষা করছিল। স্বল্পালোকিত এই জায়গাটায় মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামায় না। পারাপার ছাড়া এখানে আর কোনও চিন্তা বা কাজের কোনও অবকাশও নেই। যত রাত বেড়েছে, রঘু ততই উল্লসিত হয়ে বলেছে, ফাইন, চমৎকার! আইডিয়াল প্লেস।

শ্রীরামপুর থেকে পাঁচজন যাত্রীকে শেষ নৌকোটা বারাকপুরে পৌঁছে দিয়েছিল। পাঁচটি লোক পাঁচ রকমভাবে হেঁটে বড় রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছিল। নিঃসঙ্গ মহাদেববাবু, ভারী শরীরের মহাদেব সাহা, চিন্তামগ্ন, দিব্যেন্দু-স্বর্ণেন্দু-মৌটুসির বাবা ধীর পায়ে হাঁটছিলেন। যেন বাড়ি পৌঁছনোর কোনও তাগিদ ওঁর ছিল না। অতনু ওঁকে ওই জায়গাটায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, 'মেসোমশাই শুনছেন, আমি পাপু, দিব্যেন্দুর বন্ধু। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।' 'আমার সঙ্গে!' 'হ্যাঁ, আপনার মেয়ে মৌটুসির ব্যাপারে। আপনি ওর বিয়ের চেষ্টা করছেন তো!' 'তুমি সেটা জানো বাবা!' 'জানি, সেই নিয়েই দু'-চার কথা।'

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মহাদেব সাহাকে আরও কীসব বলে ওই জায়গাটায় নিয়ে গিয়েছিল অতনু। ওরা কয়েক মুহূর্তে পরেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল : রঘু, মনোতোষ আর শঙ্কর এতটুকু সময় নষ্ট করেনি। ছোরা, কুকরি, আর চপার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অতনু ওঁর মুখে ভিজে রুমাল চেপে ধরেছিল অমানুষিক শক্তিতে।
ইন্দ্রজিতের হাতে পাইপগান ছিল। সেটা আর ব্যবহার করতে হয়নি। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন মহাদেব সাহা। হতচকিত মানুষটা। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য।
সামান্য ধস্তাধস্তির শব্দ খেয়াঘাটের মাঝি-মাল্লা বা ঘাটবাসী মানুষদের কানে যায়নি। অন্ধকারের মধ্যেও রক্ত তার অস্তিত্ব জানান দিয়েছে। বিমগ্ন, বিহ্বল, ইন্দ্রজিৎ অপলকে দেখেছিল মাটির বুক বেয়ে রক্তের স্রোত জলধারার দিকে নেমে যাচ্ছে। দৃশ্যটা এ জীবনে আর ভুলতে পারল না ইন্দ্রজিৎ। এতদিনে ওর জীবনের ওপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেল, তবুও। শেষ পর্যন্ত ওর জীবনে কে দীর্ঘজীবী হয়েছে—বিপ্লব, না মহাদেববাবু! ইন্দ্রজিৎ এই ধাঁধার সমাধান কোনওদিন করতে পারবে না।
সেইসব দিনগুলো শক্ত গ্র্যানাইট পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে বসে আছে। এক এক সময় ইন্দ্রজিতের দমবন্ধ হয়ে আসে। অশক্ত শরীরটাকে টানতে টানতে এই পৃথিবীর বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, যেখানে গেলে এখানকার সব স্মৃতি মুছে যাবে। নষ্ট ফলের মতো এই জীবনটাকে ইন্দ্রজিৎ ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বীজের ভেতর যেমন নবীন প্রাণের সম্ভাবনা উপ্ত থাকে তেমনই একটি নতুন জীবন একেবারে গোড়া থেকে শুরু করবে।
এসব স্বপ্ন। ইন্দ্রজিৎ আপনমনে হাসল। এসব কখনও হওয়ার নয়। ঠোঁট থেকে হাসিটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ইন্দ্রজিতের চোখ চলে গেল খেয়াঘাটেব দিকে। কে আসছে? মৌটুসি! মৌটুসি কি? মৌটুসি তুমি! কী সুন্দর দেখতে হয়েছে তোমাকে! সুখী, ভরপুর! সঙ্গে ওই ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি কে? ও কি তোমার কন্যা! ইন্দ্রজিতের ক্রাচ-নির্ভর নড়বড়ে শরীরটা কেঁপে উঠল। বাঁশের সেতু পেরিয়ে অচেনা ভদ্রমহিলাটি পিচ রাস্তার কাছে আসতেই ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারল, ব্যর্থতা আর আশাভঙ্গের কাহিনীটা আজ যেভাবেই হোক মৌটুসিকে পেতে চাইছে, খড়কুটোর মতো। একটু পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায়।
অথচ সময়ের খেয়া ধরে, জীবনের নদী পেরিয়ে মৌটুসি এবারের মতো চলে গেছে। ইন্দ্রজিৎ আবার হাসল। ম্লান হাসি। পারাপারের টাইমটা তো মৌটুসিকে ও নিজেই বলে এসেছিল।

গঙ্গাধরপুরের অপরাহ্ন

এখনও মাইল তিনেক। মোরামের রাস্তা এই মাত্র শেষ হয়ে গেল। এবার মাটির পথ। গরুর গাড়ির চাকায় যা ক্ষতবিক্ষত। আর তেমনি ধুলো। ধুলো মানে মাটি শুকিয়ে পাউডারের মতো গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গিয়ে বাতাসে উড়ছে।

তরুময় কোনওরকমে রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরল। ভীষণ বিরক্ত হয়েছে এমন একটা ভাব দেখিয়ে বলল, সত্যি বলছি, এতটা দূর জানলে মোটেই আসতাম না। এভাবে যেচে কষ্ট করার কোনও মানে হয়! রাবিশ। আপনাদের কেমন লাগছে?

কেউ তরুময়ের কথার উত্তর দিল না। ভ্যান-রিকশায় আমরা চারজন বসে আছি। রিকশাওয়ালার ডাইনে-বাঁয়ে তরুময় আর অমলেশ। পিছনে আমি এবং অণিমাকুমার। সকলেই পা ঝুলিয়ে বসে আছি। একটা মোটর বা ম্যাটাডোর চলে গেলে যতটা ধুলোর ঝড় উঠবে, এই পুরনো, আঁশটে গন্ধে-ভরা ভ্যান-রিকশার মন্থর গতি ও সরু সরু চাকা ততটা ওড়াতে পারছে না। তবু ধুলো ধুলো। রিকশার মাঝখানে আমাদের তিনজনের অ্যাটাচিকেস, কিটস ব্যাগ। এক রাত্তির থাকার মতো জামা-কাপড় আর টুকিটাকি।

আমি জানি, তরুময় যতই বিরক্তি প্রকাশ করুক, আমরা সকলেই একটা চাপা উত্তেজনা ভোগ করছি। প্রথমে ট্রেন, তারপর বাস এবং এখন এই একেবারে আরামশূন্য কেঠো রিকশা—সব মিলিয়ে জার্নিটা একটু বেশিই হয়ে গেল। তবু...। চারপাশের প্রকৃতি দেখতে দেখতেই তিন মাইল পথ শেষ হয়ে যাবে। দু'পাশের গ্রাম্য দৃশ্য মোটামুটি একইরকম। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। ক্লান্তিকর মনে হয় না। সবুজ রঙের মধ্যে শিশুর মতো এক ধরনের নির্ভেজাল সরলতা আছে, যা মানুষকে টানে।

—হ্যাঁ ভাই, ভদ্রলোককে বাড়িতে পাওয়া যাবে তো! নাকি এত দূর এসে দেখব পাখি উড়ে গেছে। তরুময় নাকে-মুখে রুমাল চাপা দিয়েই জিজ্ঞেস করল। কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা গেল না।

অণিমাকুমার মুখ ঘুরিয়ে, লজ্জা পেয়েছে এমনভাবে বলল, না, না, সে সম্ভাবনা নেই। মিশ্রদাদু কোথাও যান না। আগে পাড়ায় পাড়ায় একটু ঘুরে বেড়াতেন। এখন তাও প্রায় বন্ধ। আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

আমরা তিনজন কেন এতটা রাস্তা ঠেঙিয়ে ওদের গ্রামের দিকে চলেছি অণিমাকুমার জানে। আমাদের সহকর্মী কিরণময় ওকে আগেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল।

বাইশ-তেইশ বছরের এই ছেলেটি বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা নামতেই নিজেই এগিয়ে এসে আলাপ করেছে, আপনাদের আজ আসার কথা। আমি কিরণময়দার চিঠি পেয়েছি। আসতে কষ্ট হয়নি তো। চলুন, ওই যে আপনাদের জন্যে রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

বাস-লরি চলার পিচ রাস্তাটার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা পশ্চিমের মোরাম পাতা পথের দিকে তাকিয়েছি। কয়েকটা ভ্যান-রিকশা অন্য যাত্রীদের নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

আমার নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগছিল। কিরণময়ের কথায় আমরা দিব্যি কেমন নেচে উঠলাম। অথচ ও ব্যাটা নিজেই এল না। 'ছোট মেয়েটা ক'দিন ধরে খুব ভুগছে। ওয়াইফেরও শরীর ভাল নেই। আমি আর যেতে পারব না। তোরা যা, কোনও অসুবিধে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'—কিরণয় গত পরশু এই সব অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়ল। ও থাকলে এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা হত না। কিরণময়ের এখানে শ্বশুরবাড়ি। তার ওপর ওর এক কাকা এখানকার হাইস্কুলের শিক্ষক। জায়গাটা ওর কাছে নতুন বা অপরিচিত নয়। অমলেশ এধার-ওধার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার নামটা যেন কী?

ছেলেটি মৃদু হেসে বলেছে, আজ্ঞে, অণিমাকুমার ত্রিপাঠী।

তরুময় আগেই শুনেছে, তবু এই যেন প্রথম শুনল, এমন ভান করে বলেছে, অদ্ভুত নাম তো! ছেলেদের নাম আবার অণিমা হয় নাকি!

—আজ্ঞে, কেন হবে না। অণিমা তো পুংলিঙ্গ সংস্কৃত শব্দ। মানে হল সূক্ষ্মত্ব। এর সঙ্গে স্ত্রীবাচক কোনও কিছুর সম্বন্ধই নেই। লোকে অবশ্য মেয়েদের নাম অণিমা দেয়।

—তোমার এই নাম কে দিয়েছেন? আমি জিজ্ঞেস করেছি। আসলে সেই মুহূর্তে আমরা কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

—আমার ঠাকুরদা। তিনি সংস্কৃতের মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। জানেন, আমার দাদার নাম সবিতাকুমার।

শব্দ করে হেসে তরুময় বলেছিল, সবিতা। এ তো পুরোপুরি মেয়েদের নাম। বেশ মজার তো।

ভ্যান-রিকশার পাটাতনটা হাত দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে করতে অণিমাকুমার বিনীত স্বরে বলেছে, আজ্ঞে না। সবিতা মানে সূর্য। মেয়েদের নাম কখনও সূর্য হতে পারে! বলুন!

নিজেদের অজ্ঞতার সামনে আমরা চুপ করে গেছিলাম। এই চেনা, গণ্ডিবদ্ধ পরিপার্শ্বের বাইরে যে-আশ্চর্য অথচ অনিন্দিত জগৎ পড়ে আছে তার সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণাই নেই। যেমন, এই যে আমরা প্রায় দল বেঁধে গঙ্গাধরপুরের দিকে চলেছি, সেখানকার একজন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি—সে সম্পর্কেও আমরা ধারণাহীন। অনেকটা হুজুগে মেতে চলে এসেছি। অবশ্য প্রথমে কিরণময়ই আমাদের উস্‌কে দিয়েছে। একদিন কী সব কথায় কথায় ও বলেছিল, জানিস, আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে বিধুভূষণ মিশ্র নামের এক বুড়ো ভদ্রলোক

আছেন। তাঁর এক পিকিউলিয়ার ক্ষমতা আছে। কেবল মুখ দেখে ঠিক ঠিক অতীত বলে দিতে পারেন। ভবিষ্যতে কী কী ঘটবে তারও ইঙ্গিত দিতে পারেন প্রায় নির্ভুল। আমি নিজে মিলিয়ে দেখেছি। অথচ এর জন্যে পয়সা নেন না। নিজের মনেই বলেন। মুড ভাল থাকলে তো কথাই নেই।

আমাদের মধ্যে অমলেশ ওর কথাগুলোকে খুব সিরিয়াসলি নিয়ে বলেছে, তাই নাকি! তা হলে কিরণদা, চলো না একবার আমাদের নিয়ে। দেখে আসি। ভবিষ্যৎ জানতে পারার এমন সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

অমলেশের সঙ্গে আমি আর তরুময় যোগ দিয়েছি। কেউ হাত দেখতে পারে, ছক দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, কিংবা মুখের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে জানলে বহু মানুষই আর নিজেকে সংযত করতে পারে না। রহস্যের পর্দা সরিয়ে বিস্মৃত-অতীত অথবা অজানা-ভবিষ্যতের ঘরে উঁকি দিতে চায়। মানুষের এই স্বভাবটা খুব বাজে না ভাল, সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তবে সব দিক থেকেই যে এটা শিশুসুলভ, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই।

একটু খুঁটিয়ে অমলেশ বিধুভূষণ মিশ্রের খোঁজখবর নিয়েছিল। একেবারে হঠাৎ করেই নাকি ওঁর মধ্যে এই ক্ষমতাটা জন্ম নিয়েছে। ভদ্রলোক কিছু লেখাপড়া জানেন। বেশ খানিকটা জমি-জায়গাও আছে। খাওয়া-পরার অভাব নেই। বিধুভূষণ বিপত্নীক। এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটি আজ থেকে বাইশ-তেইশ বছর আগে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেছে। আর ফেরেনি। মেয়েটি বড়। বিধবা। এখন বাবার কাছেই থাকে। বিধুভূষণের দেখাশোনা করে।

তরুময় বলেছিল, আচ্ছা, ভদ্রলোক ওঁর এই সুপার-ন্যাচারাল পাওয়ার ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছেন না কেন? এসব বেচে অনেকেই তো করে খাচ্ছে।

কিরণময় সামান্য অখুশি হয়ে বলেছে, তোমরা সবাইকে একই ছাঁচে ঢালাই করতে চাও কেন বলো তো। ভদ্রলোককে দেখলে বুঝতে পারবে, কেমন যেন সর্বক্ষণ মগ্ন হয়ে আছেন, আকাশ-পাতাল কী সব ভাবছেন। মুখটা সবসময় বিকারহীন। কেবল একটা বিষাদের ছোঁয়া লেগে আছে।

আমি বলেছিলাম, তা হলে তো ক্ষণজন্মা পুরুষ রে!

ঠিক ব্যঙ্গ করতে চাইনি, তবু কিরণময় রেগে গিয়ে বলেছে, ধ্যেৎ, তোদের বলাই ভুল হয়েছে। তোরা গিয়ে একটা অনাসৃষ্টি করে আসবি। না, না, তোরা যাস না।

আমরা অবশ্য কিরণময়কে কথা দিয়েছি, কোনও বিপত্তি বাধবে না। বিধুভূষণকে উত্ত্যক্ত করব না কোনও মতেই। এমন কী উনি যদি ভুলভাল কিছু বলেন, তা হলেও আমরা চুপচাপ হজম করে নেব। ওঁকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করব না। মোট কথা, শিক্ষিত ভদ্রলোক হিসেবে কখনই আমরা আমাদের মুখোশ খোলার চেষ্টায় যাব না। তরুময় ঠিক করেছে, ও কেবল অতীতের কথা জানতে চাইবে। ভবিষ্যতে কী হবে, না হবে সে-সম্পর্কে ওর কোনও আগ্রহ নেই। আর একটা ব্যাপার, ভদ্রলোককে পরীক্ষা করার সবচেয়ে ভাল উপায় অতীত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা। যেসব ঘটনা তরুময়ের জীবনের সঙ্গে জড়িত, যা ওর নিজের জীবনে ঘটে গেছে, যেগুলোর ও

সাক্ষী, সেগুলো বিধুভূষণ কতটা নির্ভুল বলতে পারেন, সেটাই তরুময় দেখতে চায়। ও ব্যাপারটাকে বেশ মজার বলে ধরে নিয়েছে। একই সঙ্গে এর মধ্যে কোনও বুজরুকি আছে কিনা তরুময় সেটাও পরীক্ষা করবে।

ভেতরে ভেতরে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে অমলেশ। অতীত এবং ভবিষ্যৎ—দুটো নিয়েই ওর চরম ঔৎসুক্য। অমলেশ এমনিতে একটু ভিতু টাইপের মানুষ। খুব ভাল তাস খেলতে পারে। এ ছাড়া ওর আর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। ভিতু বলেই হয়তো অনাগত জীবন সম্পর্কে অমলেশ মনে মনে ভয় পায়। আগেভাগে জানতে পারলে, ও যেন কোনও একটা ব্যবস্থা নিয়ে জীবনকে নিজের মতো চালনা করবে। অমলেশের ধারণা যাঁরা অকালটিস্ট, তাঁরা কোন পথে গেলে ভাল হবে, দুঃখ ঘুচবে, আর কোন পথে গেলে খারাপ—তা বলে দিতে পারেন, এঁদের চোখের সামনে ত্রিকালের ছবি স্পষ্ট ভেসে বেড়াচ্ছে। এঁরা তাই সর্বজ্ঞ। সাধারণ মানুষের তুলনায় স্বতন্ত্র। গঙ্গাধরপুরে আসার শুরু থেকে অমলেশ প্রায় চুপ করেই আছে। বেশি কথা বলছে না। হয়তো মনে মনে প্রশ্নগুলোকে সাজিয়ে নিচ্ছে।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি এখনও সংশয়ে ভুগছি। কিরণময় কি একটু রঙচং লাগিয়ে বিধুভূষণের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে প্রচার করেছে। বলা মুশকিল। আমি সামান্য কয়েকটা সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইব। যদি দেখি, ভদ্রলোক জেনুইন, অঙ্কের মতো সব কিছু মিলিয়ে দিচ্ছেন তা হলে বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। আমিও ভবিষ্যৎ দেখতে চাই। তবে অমলেশের মতো খুব একটা আশা করছি না। এসব ক্ষমতার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আমি ভাল মতন জানি। খানিকটা ইনটিউশন, খানিকটা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বিধুভূষণরা কথা বলেন। আমার ধারণা, অনেকটা জ্যোতিষীদের মতন, খানিকটা মেলে, খানিকটা মেলে না। আর অনেকটাই কমন টু অল। এগুলো মানুষকে এক একসময় বিস্ময়ে হতবাক করে দেয় ঠিকই, কিন্তু ওই পর্যন্ত। কোনও কিছু জানার চেয়ে, বিধুভূষণ নামক একজন অতিসাধারণ গ্রাম্য মানুষটিকে আমি দেখতে চাই। নিজের অতীত বা ভবিষ্যৎ জানবার শিহরণ এখনও আমার কাছে একমাত্র কাম্য বস্তু নয়।

এটা তিন নম্বর কালভার্ট। অন্য দুটোর চেয়ে বেশ উঁচু এবং বড়। আর একটু লম্বা হলেই পুল হয়ে যেত। রিকশাওয়ালা লোকটি নিজে নেমে গাড়ি টানতে টানতে কংক্রিটের ওপরে তুলে আনল। আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে অণিমাকুমার হেসে বলল, ও কিছু না। আমরা তো মোটে চারজন। ওরা ছ'সাতজনকে এইভাবে টেনে তোলে। রাস্তাটা এখানে বড্ড চড়াই।

প্রকৃতির একটা নিজস্ব প্রাচুর্য আছে। মানুষ থাবা না বসালে তা এতদিনে আরও বেড়ে যেত। তবু এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তার কাছে মানুষের গরিমা খুবই নগণ্য। প্রকৃতির রূপ এই ধুলিময় রাস্তার দু'পাশে টুকরো টুকরো ছবির মতো সাজানো। বড় বড় গাছ তো আছেই, সেই সঙ্গে সবুজ বাঁশঝাড়, বুনো গাছের ঝোপ, খড়ের চারচালা কিংবা দোচালা ঘরবাড়ি, গ্রামের মানুষ, ছোট-বড় পুকুর, দিগন্ত-ছোঁয়া চাষের জমি, আরও কত কী! সব মিলিয়ে বিরাট ক্যানভাসে নানা রঙের খেলা।

আমরা কলকাতার তিন অতিথি হাঁ করে দেখছি। অবশ্য যে যার নিজের মতো করে। রাস্তার ডান দিকে একটা লম্বা টিনের একতলা বাড়ি দেখিয়ে অণিমাকুমার বলল, ওই দেখুন, আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুল। বহুদিনের পুরনো। আমিও ওখানে পড়েছি।

—তোমাদের গ্রামে শিক্ষিতের হার কেমন? তরুময় স্কুল-ইন্সপেক্টরদের মতো জিজ্ঞেস করল।

—দারুণ। প্রায় সব বাড়িতে বি. এ. পাস ছেলেমেয়ে পাবেন। পোস্ট গ্র্যাজুয়েটও অনেক আছে। তবে অনেকেই বেকার। লেখাপড়া শিখে আমারও হয়তো এই দশা হবে। অণিমাকুমার একটু হতাশ স্বরেই কথা শেষ করল। অথচ শুরুতে বেশ উচ্ছ্বসিত দেখাচ্ছিল ওকে।

আমি বললাম, চিন্তা কোরো না। কিছু একটা জুটে যাবেই।

—আপনাদের আশীর্বাদ। অণিমাকুমার মাথা নোয়াল।

হঠাৎ ঘড়ি দেখে তরুময় আঁতকে উঠল, দেখেছেন, চারটে বেজে গেছে। একটু পরেই তো বিকেল, তারপর ঝুপ করে সন্ধে নেমে যাবে। আর কতক্ষণে পৌঁছব ভাই? যে-রেটে ধুলো খেতে খেতে চলেছি, তাতে গন্তব্যস্থলে গিয়ে হয়তো আর মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না। কিরণদা আচ্ছা ফাঁসিয়েছে বটে!

একটু বিরক্ত হয়ে এবার আমি বললাম, সেই থেকে তুমি ধুলো-ধুলো করছ কেন তরুময়! গাড়ির ধোঁয়ার চেয়ে এ অনেক অনেক ভাল। আর যাই হোক তোমার আয়ুক্ষয় হবে না।

—আর কতটা যেতে হবে ভাই? এবার ঘুরিয়ে অমলেশ জিজ্ঞেস করল।

—এই চলে এসেছি বলতে পারেন। আর একটু এগিয়ে ডান দিকের একটা রাস্তায় ঢুকব। ওটাই শীতলাক্ষীপাড়া। মিশ্রদাদুর বাড়ি ওখানেই। আমি থাকি পশ্চিমপাড়ায়। আরও খানিকটা এগিয়ে। কিরণময়দার শ্বশুরবাড়ির কাছে। শীতলাক্ষীপাড়ায় ঢোকার আগে আপনাদের চা খাওয়াতে হবে। রতনমণির চায়ের দোকানে বলে রেখেছি। আপনাদের জন্যে ভাল পাতা চা তমলুক থেকে আনিয়ে রেখেছে। অণিমাকুমার এতক্ষণ পরে অনেকটা কথা বলল।

—বাঃ চা পাওয়া যাবে! আমার অনেকক্ষণ গলা শুকিয়ে গেছে। খুব ভাল। ...ভাই অণিমা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বিধুভূষণবাবুকে কি বলা হয়েছে? অমলেশ বলল।

ঠিক বুঝতে না পেরে অণিমাকুমার জিজ্ঞেস করল, কী বলুন তো।

—এই যে আমরা আসব, ওঁকে আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে হবে...এই সব আর কী। অমলেশ একটু থেমে বলল।

—না, না। প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকালো অণিমাকুমার, মিশ্রদাদুকে আগে থেকে এসব বলা চলে না। তাহলে উনি নিজেকে গুটিয়ে নেন। মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে করতে পাস্ট-প্রেজেন্ট নিয়ে দু'চার কথা বলেন। তবে যেটুকু বলেন, একেবারে নির্ভুল। বাঘা বাঘা জ্যোতিষী ওঁর কাছে হার মেনে যাবেন।

—তোমাকে কখনও কিছু বলেছেন? তরুময় ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল।

রাস্তার পাশে খড়ের নীচু এক চালার তলায় চায়ের দোকান। সামনে একটা নড়বড়ে বেঞ্চি পাতা আছে। সামান্য এগিয়ে গিয়ে রিকশাটা থামল। সাদরে আমাদের নিয়ে এসে বেঞ্চিতে বসাল অণিমাকুমার। তারপর চা আর বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে তরুময়কে বলল, স্যার, আপনি কিরণময়দার বন্ধু হন, আপনাকে একটা সত্যি কথা বলি। মিশ্রদাদুকে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করে নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমি তা চাই না। দাদুকে দেখলে আমার ভারি কষ্ট হয়। বুকেব ভেতর সবসময় যেন একটা পাথর বয়ে বেড়াচ্ছেন। বিশ্বাস করুন। গ্রামের লোকেরা প্রথম প্রথম একধার থেকে ভেঙে পড়ত।...তারপর সবাই বুঝল, এটা ঠিক নয়। অন্যান্য গাঁয়ে এ খবর ছড়িয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। সারাদিন লোক আসবে। এমনটা ঘটলে মিশ্রদাদু বাঁচতে পারবেন না। এমনিতেই শোকে-তাপে কেমন যেন মরে আছেন।

—তুমি আমাদের ওপর রেগে যাচ্ছ না তো! তরুময় বলল।

— ছি, ছি, রাগব কেন? কিরণময়দা আপনাদের পাঠিয়েছেন। তবে দেখবেন, উনি যেন কষ্ট না পান।

—তুমি সে ভয় পেয়ো না। আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, কিউরিসিটি আমাদের টেনে এনেছে। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।

—আসলে কী জানেন, উনি জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছেন। গ্রামের বড়দের কাছে থেকে শুনেছি, মানুষটা বড় একা। আবার ওঁর এই দৈবী ক্ষমতা নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। ওঁকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি। অণিমাকুমার বয়স্ক লোকের মতো বলল।

একটু বেশি মিষ্টি দেওয়া দুধ-চা। প্রায় গেলাস ভর্তি-ভর্তি। সঙ্গে লোকাল মেড নিমকি বিস্কুট। চা খেতে খারাপ লাগছে না। ঘণ্টা চারেকের এই যাত্রায় বলতে গেলে এই প্রথম আমরা বিশ্রাম পেলাম। সঙ্গে চা। চায়ের আমেজ ভেঙে দিয়ে আমাদের কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। অপরাহ্ণের আলোয় রাঙানো একটি গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই চা-পানের মুহূর্তটা জীবনে আর ঘুরে আসবে কি? নীরবতা ছাড়া এমন একটা বিকেলের মাধুর্য উপভোগ করা যায় না। এমন আড়ম্বরহীন চায়ের দোকান দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। কিছুক্ষণ আগেও আমি তরুময়ের জন্যে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। ও হয়তো এই চা-খাওয়ার পর্বটাকে নিয়ে ব্যঙ্গের তীর ছুঁড়ে দেবে। তেমন কিছু এখনও হয়নি। তরুময়ও চুপ করে আছে। ওর চোখের ভাষায় অসহিষ্ণু শব্দটা আপাতত নেই।

চা-ওয়ালা রতনমণি গলা নামিয়ে অণিমাকুমারকে বলল, হ্যাঁগো অণিমা, বাবুদের মামলেট ভেজে দেবে নাকি!

কথা শুনে অণিমাকুমার আমার দিকে তাকাল। চোখের ইশারায় আমি না বলে দিলাম।

চায়ের গেলাসটা উনুনের পাশে নামিয়ে রেখে অমলেশ বলল, এবার রিকশাটা ছেড়ে দিলে হয় না! আর যতটা যেতে হবে হেঁটেই যাওয়া যাক।

—বেশ তো, চলুন না! এখান থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। অতটাও নয়। কথা বলতে বলতে এক্ষুনি পৌঁছে যাবেন। অণিমাকুমার নিজের খুশি আর চেপে রাখতে পারল না।

আমি ও তরুময় ওদের ইচ্ছেটাকে মেনে নিলাম। গ্রামের মাটির বুকে পা রাখা উচিত। কলকাতা থেকে এসেছি বলে এরা সকলে আমাদের যত্ন করছে। কিন্তু মাটির স্পর্শ পাওয়ার জন্যে এই যত্নআত্তির বেড়া ভেঙে ফেলতে আমরা কেউই হয়তো দ্বিধান্বিত নই।

বেশ ধীরে ধীরে সকলে হাঁটছি। শীতলাক্ষীপাড়ার রাস্তা আরও সরু। হাওয়া এখানে হুটোপুটি করছে না। গাছপালা, বাড়িঘরদোরের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে। অণিমাকুমার হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনারা সকলে মুরগির মাংস খান তো?

—কেন ভাই? আবার মুরগির মাংস! তরুময় অবাক।

—রাত্রে আমাদের গরিব বাড়িতে আপনাদের জন্যে দুটিখানি ভাত-মুরগির ঝোলের ব্যবস্থা করেছি। সামান্য আয়োজন। আপনারা একটু নিজের মনে করে মানিয়ে নেবেন। বেশ কুণ্ঠিত মনে হল অণিমাকুমারকে।

আমি বললাম, একটা রাত্রির ব্যাপার। তুমি বৃথাই চিন্তা করছ। তা ছাড়া, আমরা কি তোমাদের এখানে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছি! নিজেদের প্রয়োজনে আসা। তুমি ছায়ার মতো যেভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছ, তাতেই আমরা যথেষ্ট লজ্জিত।

আরও খানিকটা নিশ্চুপে হেঁটে আসার পর, অণিমাকুমার সামান্য দূরে, খড়ের চাল দেওয়া একটা মাটির বাড়ি দেখিয়ে বললে, ওই যে মিশ্রদাদুর বাড়ি।

আমরা সকলেই হয়তো ভেতরে ভেতরে চমকে গেলাম। এতক্ষণে পথ শেষ হল। যাঁর জন্যে এতদূরে আমরা ছুটে এসেছি, এবার তাঁর মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্ত। রাস্তাটা এখানে সামান্য বাঁক নিয়েছে। অণিমাকুমার একটু এগিয়ে গিয়ে কী যেন দেখে এসে বলল, মিশ্রদাদু দাওয়ায় বসে আছেন। আমি প্রথমে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তারপর আপনারা কথা বলবেন, কেমন।

—সে তো নিশ্চয়ই। উনি আমাদের চেনেন না, জানেন না।..অমলেশ বলল।

ঢালু মতন খড়ের চাল অনেকটা নীচু হয়ে দাওয়ার ওপর ঝুঁকে আছে। এখান থেকে মাত্র হাত পাঁচেক, বিধুভূষণকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দুটো বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা একটা দড়ির দোলনায় আধশোয়া আধবসা অবস্থায়। বেশ ফরসা গায়ের রঙ। তবে কৃশ। মুখে বয়সের স্মৃতিচিহ্ন। চোখ দুটো বড় উদাস। সচরাচর যেমন দেখা যায়, তার চেয়ে অনেকটা মোটা পইতে বিধুভূষণের বুকের ওপর পড়ে রয়েছে। উনি স্থির হয়ে আছেন। তবু দোলনাটা তার স্বভাব অনুযায়ী সামান্য দুলছে। আমাদের দেখে উনি একটু অবাক হয়ে গেলেন।

অণিমাকুমার দাওয়ায় উঠে ওঁকে প্রণাম করে বলল, দাদু, এঁরা সবাই কলকাতা থেকে এসেছেন। শ্রীবৎস-খুড়োর জামাই কিরণময়দার বন্ধু। আপনার সঙ্গে সকলে আলাপ করবেন।

এলোমেলো ধুতি ঠিক করতে করতে বিধুভূষণ উঠে বসলেন। মৃদু হেসে বললেন, কী সৌভাগ্য, আসুন, আসুন। মা বিভা, এখানে একটা মাদুর পেতে দিয়ে যাও তো। কলকাতা থেকে বাবুরা এসেছেন।

—আবার দিদিকে ডাকছেন কেন? মাদুর কোথায় আছে বলুন, আমি পেতে দিচ্ছি। অণিমাকুমার সঙ্গে সঙ্গে বলল। এবং দাওয়ার ওদিকটায় চলে গেল মাদুর খুঁজতে।

বিধুভূষণকে প্রণাম করব, না নমস্কার জানাব ঠিক করতে করতেই অণিমাকুমার মাদুর এনে বিছিয়ে দিয়ে বলল, আপনারা বসুন।

বৃদ্ধ মানুষটিকে আরও একটু সোজা হয়ে বসতে সাহায্য করে অণিমাকুমার বলল, আমি তা হলে এখন আসি। আপনারা দাদুর সঙ্গে কথাটথা বলুন। আমি ঘণ্টাখানেক পরে আসব আপনাদের নিয়ে যেতে। আমি আসছি দাদু।

দাওয়া থেকে আমাদের এই যুবক সঙ্গীটি নামতেই বিধুভূষণ ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো তর্করত্ন মশায়ের নাতি হও। তাই না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অণিমাকুমার উত্তর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মুখ নীচু করে কী যেন ভেবে বৃদ্ধ বললেন, এসো বাবা, এসো। ফিরে আসার সময় হাতে করে একটা আলো এনো। একটু পরেই সাঁঝ নামবে। পথে ওদের আলো দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।

অণিমাকুমার অন্তত তিন মিনিট আগে চলে গেছে। অথচ এখনও আমরা নীরবতা ভাঙতে পারিনি। ঠিক কোন প্রসঙ্গ থেকে কথা শুরু করব, তা বুঝতে পারছি না। আমরা পরস্পরের দিকে বেশ কয়েকবার তাকালাম। জানি, এভাবে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। কিন্তু কীভাবে আরম্ভ করা উচিত সে সম্পর্কে কিছু স্থির করতে পারছি না। আমার নিজের খুব অস্বস্তি হচ্ছে। এই কৃশ, শুদ্ধসত্ত্ব মানুষটিকে বিরক্ত করে লাভ নেই—আমার মতো তরুময় এবং অমলেশও কি এমনটা ভাবছে?

—আপনারা কি আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছেন? এই বেড়াতে-টেড়াতে...। সারাটা মুখ মৃদু হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে বিধুভূষণ জিজ্ঞেস করলেন।

নীরবতা ভাঙল, কিন্তু আমাদের অস্বস্তি কাটল না। বরং বেড়ে গেল। ওঁর এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব! আমরা মোটেই বেড়াতে আসিনি। এখানে আসার উদ্দেশ্য স্বয়ং বিধুভূষণ। সে-কথাটা ওঁকে কীভাবে বলব! আমার দিকে একঝলক তাকিয়ে অমলেশ বলল, আসলে আমরা এসেছি আপনার কথা শুনে। আপনাকে দেখতে। আপনার সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলতে। কাল ভোরের ট্রেনেই ফিরে যাব। এ যাত্রায় আর গ্রাম দেখা হল না।

বৃদ্ধ আবার হাসলেন। স্মিত অথচ অর্থপূর্ণ হাসি। মনে হয় বুঝতে পেরেছেন আমাদের আসার উদ্দেশ্য! তরুময় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আমি বললাম, কিরণময়ের কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। তাই সকলে মিলে ঠিক করলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

মানুষটি এবার আর হাসলেন না। আর একটু সোজা হয়ে বসে, দাওয়ার কোণের

দিকে লাগানো একটা ফলন্ত লেবু গাছের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে নরম গলায় বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন—গল্প। মানুষের সারাটা জীবনই গল্পে ভরা। নানা রঙের গল্প। যত বয়স বাড়বে দেখবেন, এর মধ্যে কিছু কিছু গল্প হারিয়ে যায়। আবার কিছু কিছু ফিরে আসে। তাই না, বলুন! আবার সব মিলিয়ে জীবনটা একটা গল্পের মালা।

আমি মাথা নাড়লাম। তরুময় বলল, কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো।

অমলেশ আর আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। তরুময়ের হঠাৎ এমন মনে হল কেন! বৃদ্ধ মানুষটি একটু থেমে থেমে কথা বলছেন ঠিকই, কিন্তু কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয় না।

বিধুভূষণ তরুময়ের দিকে তাকালেন। দৃষ্টিতে সামান্য কৌতুক। বললেন, কষ্ট সব সময়ে আছে। তা মানুষের জীবনসঙ্গী। খেয়াল করে দেখবেন, জীবনের অর্ধেকটাই কষ্টের ইতিহাস। এর হাত থেকে কারও রেহাই নেই। বড়লোক অথবা গরিব যেই হোক না কেন। এই যেমন ধরুন না, আপনি আগে ছিলেন ঈর্ষা করার মতো ধনী। ছোটবেলা বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে কেটেছে। কিন্তু আপনার বাবা মারা যাওয়ার পর এক ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য পুরো পরিবারটাকে গ্রাস কবে নিয়েছিল। সেই সময় আপনার মা কত কষ্ট স্বীকার করে এবং কষ্টকে জয় করে আপনাদের দু'ভাইকে মানুষ করেছেন। আপনি চাকরি করছেন, ভাল মাইনে পাচ্ছেন, তবু আপনার কষ্ট এখনও ঘোচেনি। অতীতের দিনগুলো মনে করে প্রায়ই আপনি যন্ত্রণা অনুভব করেন। মাঝে মাঝেই একটা হতাশ্বাস আপনাকে তাড়া করে ফেরে।

তরুময়ের চোখ দুটো প্রবল বিস্ময়ে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যে-অতীত ও শখ করে জানতে এসেছে তা ওর চোখের সামনে সিনেমার মতো ভেসে উঠছে। তরুময় কোনওরকমে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, ঠিক বলেছেন, কিন্তু আপনি কী করে এসব জানলেন?

—জানি না! আমার মনে হল, তাই বললাম। পৃথিবীর সর্বত্র কষ্টের সুর যে ভাই একই রকমের। নিজেব ভেতর একটু কান পাতলেই শোনা যায়। চোখের দৃষ্টিটা ভেতরের দিকে অমলিন হতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপনার প্রথম বাচ্চাটি অকালে, মাত্র তিন মাস বয়সে মারা যাওয়ার পরে কেঁদে কেঁদে আপনার মনের অবস্থা কয়েক দিনের জন্যে তেমন নিষ্কলুষ হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে আপনি বুঝতে পেরেছিলেন জনক হওয়ার দায় কতদূর। মা কেন আপনাদের নষ্ট হয়ে যেতে দেননি। তখন থেকে আপনি মাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আপনার ছোটখাটো অশান্তি লেগেই আছে। একদিন রেগে গিয়ে আপনি স্ত্রীর দেহে আঘাতও করেছেন।

অমলেশ আর আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তরুময়ের ঠোঁট কাঁপছে। বিধুভূষণ ওকে নির্মম অতীত আর নিষ্ঠুর সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন কি? আশ্চর্য, আমাদের নিজের থেকে কিছু বলতে হল না। কথায় কথায় মানুষটির দৈবীক্ষমতা জেগে উঠেছে। তরুময় হাত তুলে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, আপনি অন্য কিছু বলুন।

আমি আর এসব শুনতে চাই না।

বিধুভূষণের চোখে আবার ঔদাসীন্য নেমে এল। তরুময় মাথা নীচু করে বসে আছে। ভয়ে অথবা লজ্জায় ও আর মাথা তুলতে পারছে না। আমরা যেখানটায় বসে আছি, তার পাশেই বাড়ির ভেতরে যাওয়ার সরু প্যাসেজ। এখান থেকে ভেতর-বাড়ির উঠোনের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যামালতী আর বনতুলসীর ঝোপ। জ্বালানি কাঠের ছোট একটা স্তূপ। চড়াই পাখির চেয়ে সামান্য বড় এক ঝাঁক ধূসর রঙেব পাখি ঝোপটার সামনে ঝটাপটি করছে। সূর্যাস্তের লালচে আলোয় ভরে আছে উঠোনটা। আমাকে চকিত করে এক মাঝবয়সী ছোটখাটো চেহারাব বিধবা মহিলা প্যাসেজ ধরে এগিয়ে আসছেন। ইনি হয়তো বিধুভূষণের সেই একমাত্র মেয়ে। একটু আগে বৃদ্ধমানুষটি যাঁকে বিভা বিভা বলে ডাকছিলেন। ভদ্রমহিলার মুখে সামান্য লাবণ্য আছে, কিন্তু অসম্ভব কঠিন। আমাদেরকে এক মুহূর্ত দেখে সোজা বিধুভূষণের কাছে এসে বললেন, বাবা, তুমি আর দোলনায় বসে থেকো না। কোমরে ব্যথা হয়ে যাবে। এসো, নীচে বসো। ওঠো।

মুহূর্তের মধ্যে বিধুভূষণ যেন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। মেয়ের হাত ধরে মাদুরের ওপ্রান্তে বসলেন।

ভদ্রমহিলা কাজটুকু শেষ কবে তেমনই কঠিন মুখে চলে গেলেন। বৃদ্ধ ওঁর চলে যাওয়ার ছন্দটি দেখলেন নির্নিমেষে। তারপর বললেন, আমার জন্যে মেয়েটা সব সময় ভাবছে। ভেবে ভেবে শেষ হয়ে গেল। বড় দুঃখিনী মেয়ে আমার।

অমলেশ আব চুপ করে থাকতে পারল না। তরুময়েব করুণ অবস্থা দেখে নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়েছিল। এখন বিধুভূষণ আবার সহজ স্বাভাবিক হয়েছেন মনে করে ও বলল, মানুষের জীবনে দুঃখই কি সব! এর থেকে মানুষ কি কখনও মুক্তি পাবে না।

—এ বড় কঠিন প্রশ্ন. চোখ বুজে একটু ভেবে দেখবেন, জীবনে যা কিছু ঘটছে তা সৃষ্টিই বলুন কিংবা লয়—সব কিছুর মূলে আছে দুঃখ। এমন কী সুখের পেছনেও দুঃখ। আমার সুখ আপনার দুঃখের কারণ। আবার এর উল্টোটা। বিধুভূষণেব চোখের পাতা বুজে এল।

ওঁর দিকে তাকিয়ে আমাব মনে হল জগতের আবহমানকালের লোককথা. বিবেকগাথা বিধূভূষণের ভেতর থেকে নতুনভাবে বেরিয়ে আসছে।

—দাদু, আর কতদিন দুঃখ পেতে হবে বলতে পারেন? দুঃখ, অশান্তি, চোখের জল—এসব আর ভাল লাগছে না। অমলেশ কেমন যেন কঁকিয়ে উঠল।

অমলেশের ভিতু ধরনের চেহারাটা এই মুহূর্তে আরও কুঁকড়ে গেছে। চরম ভাল কিছু শোনার আশায় ঝুলে আছে ওর মুখ। বিধুভূষণ চোখ খুললেন। শব্দ করে হেসে বললেন, দুঃখ নিয়ে অত ভাববেন না। আনন্দে থাকুন, আনন্দে থাকুন। আপনি এখন কতদিন বাঁচবেন। কত সুদিন আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

—সুদিন! অমলেশ এই শব্দটাকে ধরে যেন লাফিয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, কিছু চিন্তা করবেন না। আপনার দুটি মেয়ের ভাল বিয়ে হবে। বিত্তশালীদের

ঘরে। ছোট মেয়েটি তো রাজরাজেশ্বরী হবে বিবাহসূত্রে। আপনার রুগ্ণা স্ত্রীর শরীর আবার সেরে উঠবে। আপনি তাস খেলাটা একটু কমিয়ে ফেলুন। আপনার কাছ থেকে সংসার আর একটু সময় চায়।

—দাদু আপনি সব দেখতে পাচ্ছেন! ভিতু অমলেশ দু'হাত বাড়িয়ে বিধুভূষণের পা ছুঁতে চেষ্টা করল, বলুন, আর কিছু বলুন। আমি অনেক কিছু জানতে চাই। আপনি সব জানেন।

অমলেশের তীব্র আবেগকে নিরস্ত করে বৃদ্ধ বললেন, আপনি ছোটবেলায় একটা ছবি এঁকেছিলেন। আপনার আঁকার হাত খুব ভাল ছিল। সেই ছবিতে আপনি এঁকেছিলেন—অজানা এক নদীর ঘাটে একটা নৌকো বাঁধা আছে। পারাপারের নৌকো। একজন মাত্র মাঝি নৌকোর গলুইয়ে বসে আছে বইঠা হাতে। দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সবাই বলেছিল, চমৎকার ছবি। কিন্তু কেউ ভেবে দেখেনি কেন একটি ছোট্ট ছেলে পারাপারের কথা ভাবল।

—কেন ভেবেছিল ছেলেটি? আমি প্রবল বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম। ভুলে গেলাম, অমলেশ আমার পাশেই বসে আছে। এটা ওরই জীবনকাহিনী।

—আসলে সেই বালকটি স্বপ্ন দেখেছিল। নদীর ওপারের স্বপ্ন। জানেন ওই স্বপ্নটাকেই আমরা ভবিষ্যৎ বলি। ছবির মতো, কল্পনার রঙে আঁকা। একটু থেমে বিধুভূষণ অমলেশের হাঁটুর কাছটায় ছুঁয়ে বললেন, আপনার নাম জানি না, শুধু আপনার কেন, এঁদেরও জানি না।...ভাই, আপনাকে একটা কথা বলি, অত চিন্তা করেন কেন সব বিষয়ে? যেটা হবার হবেই। দুর্দিন যখন আসবে, আপনাকে জানিয়ে আসবে না। সুদিনের মর্জিও তেমনই। মানুষের ভূমিকা ওই মাঝির মতন। ক্রমাগত সুদিন-দুর্দিন পেরিয়ে স্বপ্নের জগতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর কিছু নয়।

অমলেশ বিহ্বল হয়ে গেছে। আমি অভিভূত। আমার মনে হচ্ছে, কোনও একজন উচ্চমার্গের সাধকের কাছে বসে আছি। যিনি জীবনের সত্যাসত্য জেনেছেন। অতীত-ভবিষ্যৎ এঁর কাছে তুচ্ছ। পরম কৃতজ্ঞতায়, চরম প্রশান্তিতে আমাদের মাথা নুয়ে আসছে। আমার নিজের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না। নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। এমন একজন মানুষের কাছে আমরা স্বার্থ আর চালাকি নিয়ে এসেছি। হাতজোড় করে বিধুভূষণকে নমস্কার জানিয়ে বললাম, আমরা বিস্মিত, তৃপ্ত। আপনি ঋষিতুল্য। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ—সব যেন আপনার হাতের মুঠোয় ধরা আছে। আপনার এই আশ্চর্য ক্ষমতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই। আমরা সামান্য চাকুরে, ছা-পোষা লোক। আপনার কাছে এসে শান্তি পেলাম।

শান্ত, শমিত মানুষটি হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলেন। বিকৃত গলায় বললেন, বাজে কথা বলবেন না। আশ্চর্য ক্ষমতা আর কী মশাই! ও বিভা, মা আমার, একবারটি এদিকে আয়। দ্যাখ, এই ভদ্দরলোকেরা কী সব বলছেন। আশ্চর্য ক্ষমতা। হুঁ...।

আমাদের দ্বিতীয়বার হতবাক হওয়ার পালা। বিধুভূষণ সহসা এমনভাবে খেপে উঠবেন আমরা ভাবতেই পারিনি। আমি বিনীত কণ্ঠে বললাম, আপনাকে কোনও আঘাত দিয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি যেভাবে আমাদের সব বলে

দিলেন, তা কী করে উপেক্ষা করব। সব ঠিক ঠিক। তাই না গুরুময়। কী রে অমলেশ...

ওরা কিছু বলার আগেই বিধুভূষণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে বড় করুণ স্বরে বললেন, বিশ্বাস করুন, আমার কোনও ক্ষমতা নেই। সব মিথ্যে, মিথ্যে। যদি ক্ষমতাই থাকবে, তা হলে কেন দেখতে পাই না আমার প্রাণপ্রিয় ছেলেটা কোথায় আছে? কী করছে? কবে বাড়ি ফিরে আসবে? কেন বুঝতে পারিনি, ছেলেটা আমার সব কিছু ত্যাগ করে উধাও হয়ে যাবে? একমাত্র মেয়ে বিধবা হবে? বলুন বলুন। সত্যি বলছি, আমি কিছুই দেখতে পাই না—না অতীত, না ভবিষ্যৎ। আমি অন্ধ, অন্ধ...।

সন্ধ্যার পাখি ঘরে ফেরার সময় যেমন ডানায় বিষাদের শব্দ তুলে উড়ে যায় তেমনই বিধুভূষণের কান্নাভেজা আর্তনাদ গঙ্গাধরপুরের নীল আকাশে মিলিয়ে গেল। কোনও চিহ্ন রেখে গেল না কোথাও, কেবল একটু রেশ। অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যার সন্ধিলগ্নে যেমন আলোর রেশটুকু থাকে। আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে আছি। চোখের সামনে আঁধার নেমে আসছে।

আমাদের নিয়ে যেতে অণিমাকুমার কখন আলো নিয়ে আসবে?

জ্যোৎস্নাবাড়ি

কেন যে লিলিদিদের বাড়িটাকে সবাই 'জ্যোৎস্নাবাড়ি' বলত, তা এখনও জানি না। কতবার ভেবেছি। পূর্ণ চাঁদের মায়া যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তখন তো বটেই, চাঁদ ডুবে গেলেও আমার মনের মধ্যে জ্যোৎস্নাবাড়ির স্মৃতি পাতলা কুয়াশার মতো স্থির হয়ে থাকে। অথচ একটা বিবর্ণ পাথরের টুকরোয় বাড়িটার নাম লেখা ছিল 'সোনার তরী'। কেন সোনার তরী—তাও আমার কাছে অজ্ঞাত। একটা লিখিত নাম, অলিখিত নামে বদলে যেতে কতটা সময় নিয়েছিল! জ্যোৎস্না কি কেবল ওই বাড়িটার মাথার ওপরেই নীরবে এসে নামত! এসব আজও রহস্য। কিছুটা বিস্ময় কিছুটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আমার বুকের ভেতর ঝুলে আছে। আরও কতদিন থাকবে কে জানে! হয়তো যতদিন চাঁদ উঠবে, চাঁদ ডুবে যাবে।

আমাদের দোতলা বাড়ির ছাদে উঠলে জ্যোৎস্নাবাড়ি দেখা যেত। পাড়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কদমকুঁয়া বলে যে একটু নীচু অসমতল জমিটা আরও নীচু হতে হতে সুরতিয়া নদীর জলের সঙ্গে মিশে গেছে, সেই জমিতে ছিল ওই বাড়িটা। আশ্চর্য, ওই একটি মাত্র বাড়ি কদমকুঁয়ায়। আর কিছু শাল ও পলাশ গাছ। দেখলে মনে হত, একটা শূন্য প্রান্তরের মাঝখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। একা, নির্বান্ধব। যেন এই বাড়ির নির্মাতা আর কারও সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখতে চাননি। অথচ প্রবাসী বাঙালিদের সেই মহল্লায় একদমই ভিড় ছিল না। কেবল হাওয়া বদলের সময়টাতে এর-তার বাড়িতে নতুন মুখের মেলা। লিলিদিদের আমি কখনও ভিড়ের মধ্যে দেখিনি। উৎসবে অথবা পার্বণে ওদের অনুপস্থিতি আমাকে অবাক করে দিত। আমি ওদের অযথা খুঁজতাম, আশা করতাম। অন্যরা ওদের নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাত না। আমি ছাড়া আর সবাই ধরে নিত লিলিদিরা আসবে না। মিলনের মাঝখানে কেন ওরা আসে না—একথা যেন সবাই জানে, একমাত্র আমি ছাড়া। ওদের নিয়ে নানা অবান্তর কথা আমাদের মহল্লায় চালু ছিল। ওরা তিন বোন—লিলি, মিলি আর নিলি। ছাব্বিশ অথবা চব্বিশ, চব্বিশ অথবা বাইশ, বাইশ অথবা আঠারো। তিনজনের বয়স এরই মধ্যে ঘোরাফেরা করত বছরের পর বছর। যদিও আমি বড় হয়ে যেতাম। বালক থেকে কিশোর থেকে বয়ঃসন্ধি থেকে প্রথম যৌবন।

লিলিদিদের বয়স বাড়েনি। অন্তত আমি কখনও বাড়তে দেখিনি। ওদের তিন-জনেরই মুখের মধ্যে সামান্য সৌন্দর্যের ছোঁয়া ছিল আর ছিল চোখে পড়ার মতো মগ্নবিষাদ।

একদিন একটা হনুমানের পেছনে ধাওয়া করতে করতে আমি জ্যোৎস্নাবাড়ির

একেবারে সামনে চলে গেছিলাম। শীতের নির্জন দুপুর। সূর্য তেজহীন। স্নিগ্ধ চাঁদের আলোর মতো রোদ্দুর। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। এক পঙ্গু ভদ্রমহিলা, হুইল-চেয়ারে আধশোয়া হয়ে রোদের উষ্ণতা মাখছেন। চোখ অপলক। ওঁর পেছনে ভাঙাচোরা পুরু ইটের পাঁচিলের প্রেক্ষাপট। আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম ভদ্রমহিলার আঙুলগুলোয় কোনও মাংস নেই। কেবল সারবন্দি হাড়। আমার ভয় পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সেই কঙ্কালের হাত আমাকে ডাকছিল। আয় খোকা, এদিকে আয়। মহিলার নিথর দুটি চোখ, ঠোঁট কাঁপছে। আমি এক-পা দু'-পা হয়তো এগিয়েছি, মিলিদি ওদের দোতলার গোল বারান্দার সামনে এসে জোরে ডেকেছিল, মা!

একটিমাত্র শব্দ, একটিমাত্র ধ্বনি। চকিতে সেই মাংসশূন্য হাতের রঙ বদলে গেছিল। শীর্ণ দুটি হাত ভদ্রমহিলার কোলের ওপর পড়ে আছে। নীল শিরার আঁকিবুকি। জ্যোৎস্নাবাড়ির একাকিত্ব, ভয়ংকর নির্জনতা আর বিবর্ণ মুহূর্তগুলোর মতো। দ্বিতীয়বার ওপরে তাকিয়ে দেখেছিলাম মিলিদি নেই। ওর ক্ষয়াটে বেগুনি রঙের শাড়ির রেশ তখনও যেন গোল বারান্দার চারপাশে লেগেছিল। মিলিদি কি আমাকে দেখতে পায়নি! না কি অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখছিল! কেনই বা চেঁচিয়ে উঠল অমন আকস্মিক উন্মাদনায়! অনেকদিন পরে পরিতোষকে আমি সেই অদ্ভুত দুপুরের কথা বলেছিলাম। পরিতোষ আমার বন্ধু। সমবয়সী। তবে ও মনের বয়সে অনেক এগিয়েছিল। সব শুনে পরিতোষ আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, মিলিদিকে কেমন দেখলি রে! ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলি নিশ্চয়ই!

আমি বুঝতে পারিনি। সহজ সুরে বলেছিলাম, অনেকক্ষণ কোথা! দুর, মাত্র কয়েক সেকেন্ড! মিলিদি একটা বেগুনি রঙের শাড়ি পরেছিল।

—বাজে কথা বলিস কেন? মিলিদির পরনে কোনও শাড়ি ছিল না। ওর ফিগার, দুটো বুক, পেট—আঃ! কেমন দেখতে বল!

পরিতোষের কণ্ঠে রুক্ষতার ছোঁয়া ছিল, সেইসঙ্গে অজানা পুলক।

—বিশ্বাস কর, এসব কিছুই ..। আমি হতবাক হয়ে গেছিলাম।

—ফের লুকোচ্ছিস। আমাদের মহল্লায় সবাই জানে লিলিদিরা দিনের বেলায় কেবল সায়া পরে থাকে। সেইজন্যে কোথাও বেরোয় না, যায় না। সবসময় বাড়িতে। আর বাড়ির ভেতরেই এইভাবে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রি হলে পুরো উদোম। গভীর রাতে ওরা ছাদে উঠে আসে, নিজেরা খেলা করে। বিশেষত পূর্ণিমার রাতে। অনেকেই বহুদূর থেকে এসব দেখেছে।

আগুনে ছেঁকা-খাওয়া মানুষের মতো আর্তনাদ করে আমি বলেছিলাম, এ হতে পারে না। মিথ্যে, মিথ্যে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, মিলিদির পরনে বেগুনি রঙের শাড়ি..

—তুই ভুল দেখেছিস। অথবা সত্যি কথা বলতে চাইছিস না। বল না, বল না, কী দেখেছিলি! খুব সুন্দর, টসটসে তাই না।

আমার সমস্ত শরীর সির সির করে উঠেছিল। পরক্ষণেই আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম।

পরিতোষের দু'চোখে চাপা নিষ্ঠুরতার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছিল। কেন সেদিন আমার বন্ধু আমাকে দিয়ে ওইরকম একটা দৃশ্য আঁকিয়ে নিতে চাইছিল। তা কি কেবলই মজা! না কি, লিলিদিদের রহস্যময় জীবনযাপনের প্রতি অতৃপ্ত অদম্য কৌতূহল! দৃশ্যটা আমি অনেকদিন আঁকার চেষ্টা করেছি। পারিনি। আমার শরীর কেঁপে উঠেছে, শরীরের গোপন স্তরে শুরু হয়েছে আদিম ভাঙনের নৃত্য-উৎসব।

পরিতোষ সম্ভবত স্কুলের ছেলেদের বলে দিয়েছিল। অনেকেই আমার দিকে তাকাত, মৃদু হাসত। কেউ কেউ বলেছিল, তুই একটা আস্ত ছাগল। ঝাঁপিয়ে পড়লি না কেন! আমি কাউকে বোঝাতে পারিনি, তখন পৃথিবী ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল। আলোর ঝরনায় সুস্নাত। কেবল মিলিদির পঙ্গু, অসুস্থ মা নিজের মৃতপ্রায়, কঙ্কালসার দিনটিকে রোদের ওমে সেঁকে নিচ্ছিলেন। এরপর থেকে আমি আর কোনওদিন দুপুরে জ্যোৎস্নাবাড়ির কাছে যাইনি। অশান্ত কৈশোর আমাকে কতবার হাতছানি দিয়েছে। পরিতোষের ভয়ে আর নিজস্ব অসহায়তার হাতে মার খেতে খেতে আমি দ্বিপ্রহরের জ্যোৎস্নাবাড়িকে ভুলতে চেয়েছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম অনেকদিন। সুরতিয়ার জলে প্রতিদিন স্নান করত আমাদের মহল্লার ডাকপিওন উপাধ্যায়জি। প্রৌঢ়, মৈথিলি ব্রাহ্মণ। বাড়ি ফেরার পথে আমাদের বাড়ির ঠাকুরদালানের সিঁড়িতে এক লোটা জল ঢেলে দিয়ে যেত। দিনের পর দিন। গতানুগতিক, একঘেয়ে কাজ। তবু কখনও এর অন্যথা হয়নি। বাবার সঙ্গে উপাধ্যায়জি এক-একদিন গল্প করত। পরিষ্কার বাংলায়। গল্প মানে ওঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। উপাধ্যায়জি-ই এক বর্ষামুখর সকালে বাবাকে বলেছিল, এই যে দেখছেন বৃষ্টি হচ্ছে, এর অনেক মানে, এর পেছনেও কারণ আছে।

বাবা উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিল, কীরকম, কীরকম!

উপাধ্যায়জি মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছে, বৃষ্টি মানে শুধু জলভারী মেঘের কেরামতি ভাববেন না। মেঘ তো আকাশে সবসময়েই থাকে। অথচ বৃষ্টি হচ্ছে না কেন?

—তার পেছনে একটা বিজ্ঞান আছে উপাধ্যায়জি। বাবা চোখ নাচিয়ে বলেছিল।

—ওসব বিজ্ঞান পুঁথি লেখার জন্য আপনারা সব বানিয়েছেন। আসল কথা কী জানেন, মানুষের জমানো দুঃখ, না-বলা কষ্ট জল হয়ে ঝরে পড়ে।

বিজ্ঞানের ছাত্র বাবা হো হো করে হেসে উঠেছিল। উপাধ্যায়জি বলেছিল, ব্যানার্জিবাবু, আপনি হাসছেন! অথচ মানুষের কান্নার কোনও কারণ নেই, অঙ্ক নেই। আমি কি কম দেখলাম। মানুষ কী জন্য কাঁদছে, কেন কাঁদছে বুঝতেই পারবেন না। অথচ চোখে জল।

—যেমন! বাবা কংক্রিট কোনও উদাহরণ চাইছিল।

—এই দেখুন না, প্রতিমাসে কলকাতা থেকে একটা মনিঅর্ডার আসে জ্যোৎস্নাবাড়ির মালকিনের নামে। আমার কাছ থেকে লিলিদিদি টাকাটা নেয়। ধীরে গোনে, তারপর চোখের জল ফেলতে শুরু করে।

—কে ওদের নামে টাকা পাঠায় হে! কত টাকা! বাবা চাপা গলায় জানতে চেয়েছিল। যেন নিষিদ্ধ কোনও বইয়ের পাতায় বাবা চোখ রাখছে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে।

—কে এক বিমলানন্দ সেন। হ্যারিসন রোডের ঠিকানা। মাত্র দেড়শো টাকা।...হ্যাঁ যা

বলছিলাম, লিলিদিদি কাঁদে। ঝরঝর করে জল পড়ে। আবার ও যখন কাঁদে ঠিক সেই সময়ে মিলিদিদি থমথমে মুখে এসে দাঁড়ায়। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, দিদি, শুনে নিয়েছিস তো! তারপর টাকাগুলো নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। আমি যখন চিঠির ঝোলা তুলে নিয়ে জ্যোৎস্নাবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি, তখন শুনতে পাই ওদের ছোট বোনটা...কী যেন নাম!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম, নিলি। বাবা অবাক-চোখে আমার দিকে একঝলক দেখেছিল।

উপাধ্যায়জি শব্দ করে হেসে বলেছিল, হ্যাঁ নিলি। সেই মেয়েটা চেঁচিয়ে বলে, আমার সোনার দুল এ মাসে ছাড়াতেই হবে দিদি। আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। সোনা বন্ধক রাখা ভীষণ খারাপ।

—প্রতিমাসে একই রকমের ছবি দেখতে পাও! বাবা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—হ্যাঁ, ব্যানার্জিবাবু! জ্যোৎস্নাবাড়ির মেয়েগুলো যেন কেমন! আমি খারাপ বলছি না। ঠিক মানুষের মতো নয়, অদ্ভুত!

উপাধ্যায়জির ছবিটা নিয়ে আমি খুব ভাবতাম। কোনও সূত্র খুঁজে পেতাম না। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছিল, লিলিদিরা দুপুরে কেউ সায়া পরে থাকে না। তাহলে অন্তত উপাধ্যায়জি বলত! মৈথিলি ব্রাহ্মণটি জিভ কাটত লজ্জায়! সবার আগে খবরটা জানিয়ে দিত। আর একটা ব্যাপার, ওরা নিশ্চিত খুব গরিব। দারিদ্র্যের লজ্জাই হয়তো ওদের গৃহবন্দি করে রেখেছে।

দুপুরের জ্যোৎস্নাবাড়ি আমাকে নিষ্কৃতি দিলেও, রাতের অন্ধকার দেয়নি। যত রাত হত তত পরিতোষের কথাগুলো বুকের মধ্যে চেপে বসত পাথরের মতো। গভীর রাতে ওরা ছাদে উঠে আসে। নগ্ন হয়ে নাচে। নিবিড় জ্যোৎস্নায় ওরা খেলা করে। কতদিন পড়তে পড়তে নানা অছিলায় আমি ছাদে উঠে এসেছি। জ্যোৎস্নাবাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকেছি নির্নিমেষে। কৃষ্ণপক্ষের রাতের চরাচর জুড়ে ঘন কালোর সমুদ্রে জ্যোৎস্নাবাড়িটা প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। দোতলার কোনও ঘর থেকে হয়তো একটুখানি অনুজ্জ্বল আলোর আভাস দেখতে পেতাম। আমার অস্থির দৃষ্টির সামনে সেই আলো তিরতির করে কাঁপত।

জ্যোৎস্নাবাড়ির ছাদের কোনও ভূগোল অন্ধকার ভেদ করে আমার ক্লান্ত চোখের সামনে ফুটে ওঠেনি কখনও। একদিন কেবল একটা গানের কলি ভেসে এসেছিল : 'হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে'। আমি অনেক পরে আবিষ্কার করেছিলাম ওটা রবীন্দ্রসংগীতের একটা লাইন। কিন্তু কে গেয়েছিল? নিলিদি! মিলিদি! লিলিদি! কে? কে? কে? না কি ওদের তিনজনের একই রকমের বর্ণহীন জীবনের, স্বেচ্ছাবন্দি জীবনের একটিই মাত্র কোরাস। উদিত চন্দ্রের দিনগুলোতে জ্যোৎস্নাবাড়িটাকে স্তূপের মতো মনে হত। যেন অনেক দূরে কোনও মৃত মানুষের সমাধির ওপরে নির্মিত মৃত্যুসৌধ। তেমনই শাল-পলাশের ডালে, পাতায় হাওয়ার খেলা, তেমনই জনহীন কদমকুঁয়া। চাঁদের আলোয় ওদের ছাদটাকে স্পষ্ট-অস্পষ্টের মাঝামাঝি একটা স্তরে দেখতে পেতাম। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতাম নগ্ন

পরীদের জন্য। সময় চলে যেত। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারতাম না। পড়ার টেবিলে ফিরে যাওয়ার দায় আমাকে স্বাধীনতা দিত না। শুধু ভাবতাম, ওরা একটু পরেই ছাদে উঠে আসবে। চাঁদের আলো আর একটু গাঢ় হলেই শুরু হবে লিলিদি, মিলিদি, নিলিদির নাচ। চাঁদকে সাক্ষী রেখে, চাঁদকে দর্শকের আসনে বসিয়ে রেখে।

আমি এক-একদিন ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রেগে যেতাম। নিজের ওপবে নয়, চাঁদের ওপরে। মায়াবি আলোর জাদুতে ভুলিয়ে-ভালিয়ে চাঁদ লিলিদিদের নগ্নতা উপভোগ করে—এই ভেবে। এই সময় আমার পড়াশোনায় বেশ ক্ষতি হয়েছিল। পরিতোষের সঙ্গে, চাঁদের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে তখন আমাকে যুদ্ধ করতে হত। আমি কেবলই হেরে যাচ্ছিলাম। এমনও ভেবেছি, সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অদৃশ্য বাধার প্রাচীরগুলোকে ভেঙে ফেলে জ্যোৎস্নাবাড়িতে একদিন ঢুকে পড়ব। ওদের তিন বোনকে জিজ্ঞেস করব, তোমরা কেন আমাকে পাগল করে দিচ্ছ! আর পাঁচটা মেয়ের মতো কেন তোমরা স্বাভাবিক নও! কেন তোমাদের লাবণ্য, তোমাদের দেহ, তোমাদের মন এমনভাবে শৃঙ্খলিত! তোমাদের দিন আর রাত্রি কেন আলাদা, কেন এত রহস্যে মোড়া!

ছিঁচকে চুরির আশঙ্কায় রাত্রে চিলেকোঠার দরজায় তালা দেওয়া থাকত। ছাদে আসার উপায় ছিল না। অথচ গভীর রাতে, যখন সুরতিয়া নদীর বহমান জল আর কিছু রাতজাগা পাখি বাদে সমস্ত মহল্লা ঘুমে অচেতন, সেই সময় জ্যোৎস্নাবাড়ির ছাদের জগৎ নিশ্চয়ই পরিতোষদের আঁকা ছবির মতো হয়ে যায়—এমন একটা ধারণা আমার মাথার মধ্যে ক্রমশ চেপে বসছিল। আমি বাবার দেরাজ থেকে ছাদের চাবি চুরি করেছিলাম। তখন আমার বয়স ষোলো বছর তিন মাস। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। তৈরি হচ্ছিলাম মানে আমার খাতা ভর্তি, বইয়ের পাতা ভর্তি কেবল অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস আর অভিশপ্ত চাঁদের আলোর আভা। চাবি চুরি করার দিনই, অনেক সাহস বুকের মধ্যে শক্ত হাতে বেঁধে, আমি ছাদে উঠে এসেছিলাম। না এলেই ভাল হত। কেননা, আমাকে প্রথমেই জোরে এক চড় মেরেছিল চাঁদ। সেই মারের দাগ এখনও আমার গালে থেকে গেছে। বয়স মুছে ফেলতে পারেনি। প্রায় নিটোল আলোকবৃত্তটা হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে এসে আমাকে আঘাত করেছিল। চাপা গর্জনে বলেছিল · কেন এসেছিস তুই! জানিস না আমি রজনীনাথ! নারীরা এখন আমাকে ভোগ করে। এই রাত্রির প্রতিটা মুহূর্ত থেকে চুঁইয়ে পড়বে কাম। এখন ষোলোকলায় পূর্ণ আমার শরীর। আর কোনও পুরুষকে আমি সহ্য করব না! তুই অন্ধকারে ফিরে যা।

আমি যাইনি। যেতে পারিনি। অভিভূত আমি, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম চাঁদের অনন্ত রূপ। কী সর্বগ্রাসী! কী মোহময়! আমি যে-চাঁদকে দেখতে অভ্যস্ত, তার থেকে এ আলাদা। এতই অন্যরকম যে, মার খেয়েও প্রতিবাদ করতে পারিনি। আমার পৌরুষ ধুলোয় লুটিয়ে গেছিল। কামমুগ্ধ পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র অংশ হয়ে গেছিলাম আমি। আকাশলগ্ন চাঁদের দিকে আমি কতক্ষণ তাকিয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ নূপুরের শব্দে চমকে উঠেছি। আমার বিহ্বল দৃষ্টি সোজা ছুটে গেছিল জ্যোৎস্নাবাড়ির দিকে। কিন্তু এ কী, বাড়িটা কোথায়! যেখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকার কথা সেখানে চাপ চাপ অন্ধকার। জ্যোৎস্না কি ওইখানটায় পৌঁছতে পারেনি? তা কী করে সম্ভব!

আর যাই থাক, অন্ধকার সৃষ্টির ক্ষমতা আলোর নেই। তাহলে! নূপুর বাজল কোথায়? আমার চোখের দৃষ্টি তীব্র বর্শার ফলার মতো অন্ধকার ভেদ করতে চাইছিল। আমি পাগলের মতো ছাদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছি। তারপর একসময় তীব্র হতাশায়, অন্বেষণের ব্যর্থতায়, শিশুর মতো কেঁদে ফেলেছি।

কতক্ষণ কেঁদেছিলাম মনে নেই। হয়তো একটা প্রহর জুড়ে। আমার চোখের পাতা অশ্রুভারে আনত হয়ে গেছিল। একসময় আবার তাকিয়েছিলাম জ্যোৎস্নাবাড়ির দিকে। আশ্চর্য, তখন আর সেই ভয়ংকর অন্ধকারের চিহ্নমাত্র ছিল না। বাড়িটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, চাঁদ দুষ্টুমি করে ওই বাড়িটার ওপরেই স্থির হয়ে আছে। ঘুঙুরের শব্দটা আর পাইনি। আর দেখতে পাইনি লিলিদি-মিলিদি-নিলিদিকে। গভীর রাত, গাঢ়, জ্যোৎস্না, নিদ্রামগ্ন পৃথিবী, উন্মুক্ত ছাদ—সব কিছুই প্রস্তুত, অথচ ওরা কেউ নেই! লিলিদি, চাঁদ কি তোমাদের লুকিয়ে রেখেছে? না কি তোমরা আমার অস্তিত্ব টের পেয়ে আত্মগোপন করে আছ! বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের নগ্নতা দেখতে আসিনি, আসিনি নাচের আস্বাদ নিতে, চুরমার করে ভাঙতে আসিনি রাত্রির নৈঃশব্দ্য। আমি শুধু তোমাদের ঘিরে আছে যে-রহস্যের পর্দা, সেটাকে একটু সরিয়ে একঝলক উঁকি দেব। মাত্র একবার! জ্যোৎস্নারাতে তোমরা কি সত্যিই উৎসবে মেতে ওঠো! ওই তো, চাঁদ তোমাদের কামনা করছে। তোমরা না-এলে, চাঁদের এই আলোর আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তীব্র আকুলতায় আমি থরথর করে কাঁপছিলাম, কাঁপছিলাম, কাঁপছিলাম। তারপর একসময় স্তব্ধ হয়ে গেছি।

বেলার দিকে ঘুম ভেঙেছিল অদ্ভুত পরিবেশে। আমার খাটের পাশে ডাক্তার নন্দী এম. ডি., ভ্রূকুঞ্চিত বাবা আর অশ্রুসজল মা। ডাঃ নন্দী বলছেন, চিন্তা করবেন না। ক'দিন রেস্টে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে। সাউন্ড স্লিপ আর পেটপুরে খাওয়া-দাওয়া, ব্যস!

মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে, একবার নিশিতে পেলে, আর ছাড়ে! না ডাক্তারবাবু। কাল ছাদে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, এরপর হয়তো নদীতে টেনে নিয়ে যাবে। তখন কী হবে ভাবুন তো!

—আঃ, তুমি চুপ করবে! বাবা প্রচণ্ড বিরক্তি ঝরিয়ে বলছে, ওসব আনসায়েনটিফিক কথাবার্তা বলার সময় এটা নয়। ঠিকঠাক রোগটা ধরে চিকিৎসা হওয়া দরকার। কাল ঘোর পূর্ণিমা ছিল। ডাক্তারবাবু, এটা লুনাটিক কোনও ব্যাপার নয় তো!

এই পর্যন্ত শুনে আমি ভেতরে ভেতরে খুব হেসেছিলাম। হাসতে হাসতে ভুলতে চেয়েছিলাম নৈশ-উন্মাদনার স্মৃতি। কিন্তু পারিনি। চাপা কষ্টে আমার বুকের ভেতরটা ভরে উঠেছিল।

জানি না, সেই জ্যোৎস্নাবাড়ি, সেই শাল আর পলাশ গাছগুলো, সুরতিয়া নদী, কদমকুঁয়ার অস্তিত্ব আজও আছে কিনা। যৌবনের শুরুতে সেই প্রবাসভূমি ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলাম। বাবা-মাও আর ওখানে থাকেননি। এও জানি না, লিলিদিরা এখন জীবনে এপারে, না ওপারে! কেবল আকাশে এখনও চাঁদ আছে, জ্যোৎস্না আছে, আমি আছি। আর আছে একটা স্মৃতির সেতু। যার ওপরে এসে দাঁড়ালেই আমি জ্যোৎস্নাবাড়িটিকে দেখতে পাই। কখনও সুদূরে, কখনও অদূরে। কখনও আলোয়, কখনও আঁধারে।

দীঘায় ভোর

হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে আসার পর প্রবীর একটু স্বস্তি পেল। এতক্ষণ কেবলই ভয় হচ্ছিল, কেউ যদি দেখে ফেলে। চেনাশোনা কেউ। নিজের ডানপাশে এক মহিলাকে বসিয়ে প্রবীর দূরপাল্লার বাসে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। জানাশোনা কারও চোখে এই দৃশ্য পড়া মানেই নানা প্রশ্ন, নানা অনুমান, ঔৎসুক্য। তাই এতক্ষণ কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হতে পারছিল না প্রবীর। বঙ্কিম সেতু পেরিয়ে বাসটা হাওড়া শহরে ঢুকে পড়তেই প্রবীরের মনে হল, আর ভয় নেই। চেনা বৃত্তের বাইরে এবারে ও চলে এসেছে।

সিটের ওপরে নিজেকে সামান্য ভাসিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে আনল প্রবীর। জয়া একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। তবে তাকাল না। ও কি বুঝতে পারছে, আমি অস্বস্তিতে ভুগছি!—প্রবীর মুখ মুছতে মুছতে ভাবল। এখনও পর্যন্ত জয়ার সঙ্গে মাত্র দু'বার কথা বলেছে। তাও নিতান্ত মামুলি। ট্যাক্সি বুথের সামনে প্রবীর এসে দাঁড়াতেই মেয়েটা এগিয়ে এসে বলেছিল, 'আমি জয়া। আপনি নিশ্চয়ই প্র...'।

সাদা মেটাল ফ্রেমের সানগ্লাস পরা মাঝারি উচ্চতার জয়াকে দূর থেকে দেখেই প্রবীর চিনতে পেরেছিল—এই সেই জয়া। রতন দাস বলে রেখেছিল, তোর আগে মেয়েটা ট্যাক্সি বুথের ওখানে চলে যাবে। দেখবি, সাদা মেটাল ফ্রেমের সানগ্লাস চোখে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওটাই জয়াকে চিনতে পারার মার্কিং। প্রবীর বেশ চমকে গেছিল ব্যাপারটা উল্টো হওয়াতে। মেয়েটাই প্রথমে ওকে চিনে নিয়েছে। তার মানে রতন দাস জয়াকেও বলে রেখেছিল প্রবীরের কোনও শরীরী বৈশিষ্ট্য, কোনও অদ্ভুত চিহ্ন। জয়া কথা শেষ করার আগে প্রবীর একটু জড়ানো স্বরে বলেছিল, হ্যাঁ, আমি।... আসুন। ঠোঁট কামড়ে কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভেবে জয়া বলেছে, চলুন। ওর ঠোঁটের চারপাশে সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত হাসি খেলে গেছিল—প্রবীর দেখেছে। ঠিক তখনই, সারা শরীর জুড়ে একটা সিরসিরে ভাব অনুভব করেছিল প্রবীর।

সরকারি বাস স্ট্যান্ডে এসে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি। সিট বুক করা ছিল। একদিন আগে প্রবীর এসব সেরে রেখেছে। কোনওরকমে ঝামেলায় যাতে পড়তে না হয়। একটা ছোট লাইনে দাঁড়াতেই টিকিট আর বাসের নম্বর হাতে এসে গেল। সাতসকালে কোনও বাস টার্মিনাসে এত ভিড় হতে পারে প্রবীরের ধারণা ছিল না। নানা পথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানা মানুষ। ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে এসেছে দূরে কোথাও যাবে বলে। চিৎকার-চেঁচামেচি, কাগজওয়ালা, হকার, বাসের হর্ন—সব মিলিয়ে একেবারে

বাজার। প্রবীরের মোটেও ভাল লাগেনি। এই ভিড়ের মধ্যে চেনা মানুষ কেউ যদি মিশে থাকে! কথাটা মনে হতেই প্রবীর চুপসে গেছে। যে উত্তেজনা নিয়ে ও উল্টোডাঙা থেকে সকালের নরম আলোয় অনেকটা চুপিসাড়ে, নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এসেছিল, তা এখানে এসে হঠাৎ মিইয়ে গেছে।

নির্দিষ্ট বাসের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রবীর বলেছিল, আমাদের সিট নম্বর সাত-আট। আপনি গিয়ে বসুন। আমি একটু পরে আসছি। জয়া ওর পাশে দাঁড়িয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়েছে। নীরব সম্মতি জানিয়ে কাঁধ থেকে ছোট কিটস ব্যাগটা হাতে নামিয়ে এনে জয়া বাসে উঠে গেছিল। বাসের পিছন দিকে চলে গিয়ে প্রবীর তীক্ষ্ণ নজরে লোকজন দেখেছে। মনে মনে বানিয়ে রেখেছে সম্ভাব্য উত্তর। বাস ছাড়ার দু'মিনিট আগে ভেতরে উঠে এসে প্রবীর দেখেছিল, জয়া জানলার ধারে বসে আছে। প্রবীর সামনে এসে দাঁড়াতেই মিষ্টি হেসে বলেছে, এখানে বসবেন? চারিদিকে দেখে নিজের ব্যাগটা বাঙ্কের ওপর তুলে দিয়ে প্রবীর বলেছিল, না, ঠিক আছে। জয়া আবারও হেসেছে। ছড়িয়ে থাকা শাড়ির আঁচল গুছিয়ে নিয়ে প্রবীরের বসার জায়গা করে দিয়েছে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত জয়ার সঙ্গে তার কোনও কথা হয়নি। প্রথমত, ঠিক কী বলবে বা বলা উচিত প্রবীর বুঝে উঠতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, এতক্ষণ অন্যের চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে প্রবীর ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে ছিল। জয়াও কথা বলছে না। বাইরের চলন্ত দৃশ্যে চোখ আটকে রেখে বসে আছে।

পকেটে রুমাল রাখার অজুহাতে জয়াকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল প্রবীর। কালো ব্লাউজ আর হালকা গোলাপি ছাপা শাড়ি। মাথার চুল টানটান করে বাঁধা। কাঁধের কাছে এসে চুলের গতি থেমে গেছে। দু'হাতে তামাটে রঙের দুটো মোটা বালা। বাঁ-হাতে বালার সঙ্গে কিছু রং-বেরঙের কাচের চুড়ি। কব্জির উল্টো দিকে ঘড়ি পরেছে জয়া। ব্যান্ড দেখে মনে হচ্ছে সস্তা ইলেকট্রনিক ঘড়ি। একটা হালকা সুবাস এসে প্রবীরের নাকে লাগছে। হয়তো জয়ার শরীর থেকে আসছে কিংবা বাসের অন্য কোনও মহিলার কাছ থেকে। প্রবীর চোখ নামিয়ে দেখল, নিজের কিটস ব্যাগটা জয়া পায়ের কাছে নামিয়ে রেখেছে।

সামনের সিটের পেছনে দু'হাত ঝুলিয়ে রেখে প্রবীর অবাক হয়ে ভাবল, এর নাম জয়া। আবার জয়া নয়। অন্য কিছু। রতন দাস বলেছিল, তোর সঙ্গে যে মেয়েটাকে ফিট করে দিচ্ছি, তার নাম জয়া।

—জয়া কী? প্রবীর ফিসফিস করে মেয়েটার টাইটেল জানতে চেয়েছে।

—ঘোষ না দাস, ধর না মুখার্জি—ওসব জেনে কী হবে! আর আমিও ওর পদবি-টদবি জানি না। জানার দরকার হয়নি কখনও। আরে বাবা, জয়া কি ওর আসল নাম! তুই ওকে ওই নামে জানাবি। ব্যস, হয়ে গেল। আমার সঙ্গে যে ওকে প্রথম আলাপ করে দিয়েছিল, সে বলেছিল ওর নাম মিতা। আমি তো এখনও ওকে মিতা বলেই ডাকি। এ সব লাইনের মেয়েদের অনেক নাম।

—তার মানে? প্রবীর বেশ ঘাবড়ে গেছিল।

রতন বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছিল, মানে-ফানে জানি না। আচ্ছা, তোর এত জেনে কী

হবে শুনি? যা করতে যাচ্ছিস তার সঙ্গে নামের কী সম্পর্ক! কাজ হয়ে যাবে, পয়সা মিটিয়ে দিবি—ব্যস ফুরিয়ে গেল। তুই চলে যাবি উত্তরে, মেয়েটা দক্ষিণে। আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

কথা বলতে বলতে রতন দাসের গলা চড়ে যাচ্ছিল। খুব নিষ্ঠুরের মতো মনে হচ্ছিল ওর ভাবভঙ্গি। প্রবীর বেশ বিব্রত হয়ে বলেছে, প্লিজ আস্তে।...তুই বড্ড চেঁচাচ্ছিস।

অফিসের করিডরে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল। ঠিক কথা নয়, গোপন শলা-পরামর্শ। সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের বাইরে মানুষ যেসব কাজ করে, যেসব কাজ আড়ালে, অন্তরালে করতে হয়, তার একটা ছক তৈরি করে দিচ্ছিল রতন দাস। মাস দুয়েক আগে একদিন কথায় কথায় প্রবীর বলেছিল, আর ভাল লাগছে না মাইরি। চারদিকে এত সমস্যা। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভাবছি কয়েক দিনের জন্য কোথাও ঘুরে আসব।

—তোকে কতদিন বলেছি, বিয়েটা করে ফেল। দেখবি সব ভাল লাগবে। এই যে সব কিছু তোর খারাপ লাগছে, দিন দিন খিঁচিয়ে যাচ্ছিস, এর একমাত্র কারণ মেয়েছেলের স্বাদ নিতে পারিসনি এখনও। রতন পুরনো কথাগুলো আবার বলেছিল।

প্রবীর সেদিন আর প্রতিবাদ করেনি। রতন খুব ভাল করেই জানে এই আটত্রিশ বছর বয়সেও কেন প্রবীর বিবাহিত জীবনের স্বাদ নিতে পারছে না। উল্টোডাঙার সি আই টি কোয়ার্টারের মাত্র দেড়খানা ঘরে, অবিবাহিত দুই বোন, রিটায়ার্ড বাবা, অসুস্থ মাকে নিয়ে প্রবীরের যে-সংসার সেখানে বিয়ের কথা ভাবাও অন্যায়। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক তাদের ওই সমস্যা-জর্জরিত নরকে ফেলে রেখে নিজে অন্য কোথাও সংসার পাতবে—এ চিন্তাও কেরানি প্রবীর করতে পারে না। দমিত কামনার আগুন, শখ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন দাউ দাউ করে মাথার ভেতরে জ্বলে ওঠে তখন প্রবীরের মনে হয় একটা ভয়ংকর কিছু করে ফেলি। যা হয় হবে। অবশ্য দুর্ভাগ্যকে পায়ে লাথি মেরে বেরিয়ে পড়ার কোনও প্রতিজ্ঞাই প্রবীর রাখতে পারেনি। নিজের কাছে নিজে হেরে গেছে। বয়স ওকে বাধা দিয়েছে। পা টেনে ধরেছে নানা সেন্টিমেন্ট। অথচ আগুন নেভেনি। রতন বারবার এই আগুনের দিকেই আঙুল তুলে দেখায়। প্রথম প্রথম প্রবীর জোর প্রতিবাদ করত। আগুনটাকে আড়াল করতে চাইত তর্ক করে। রতন অবশ্য কোনওদিন প্রবীরের সমস্যাগুলোকে পাত্তা দেয়নি, গুরুত্ব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেনি। ওর জীবন সম্পর্কে ধারণাই অন্যরকম। রতন কেবল সমাধানের পথ দেখিয়েছে। একটা আগুন নেভানোর জন্য আর একটা আগুন জ্বালানোর পরামর্শ দিয়েছে রতন। প্রবীর মানুক, না মানুক, রতন ওর ধারণা থেকে এতটুকু সরে আসেনি। সেদিনও রতন একই কথা বলেছে। মাঝখান থেকে চাপা পড়ে গেছে বেড়াতে যাওয়ার প্রসঙ্গ।

হঠাৎ একদিন ক্যান্টিনে রতন বলল, ঘুরতে যাবি বলেছিলি, গেলি না!

একটু অবাক হয়ে প্রবীর বলল, হ্যাঁ রে, কিন্তু হয়ে উঠছে না।

—তোমার কোনওদিনই হয়ে উঠবে না। স্বর বিকৃত করে রতন বলেছে। তারপর কী

ভেবে গলা নামিয়ে জানতে চেয়েছিল, তুই কি একা যাবি?

প্রবীর ঠিক বুঝতে পারেনি। ভুরু কুঁচকে বলেছিল, কেন বলত! একাই তো যাব! আমার সঙ্গে....

---না এমনি জানতে চাইছিলাম।...তবে তুই যদি কাউকে সঙ্গে নিতে চাস তা হলে নিতে পারিস! আমার হাতে লোক আছে। সে যাবে।

—কে? প্রবীর সবিস্ময়ে জানতে চেয়েছে।

—মেয়ে। হ্যাঁ, একটা মেয়েছেলে। এর বেশি আর কিছু জানতে চাইবি না। যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাস, আমাকে বলবি। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তখন অন্যান্য কথা হবে।

বিস্মিত প্রবীরের সামনে টোপটা ঝুলিয়ে দিয়ে রতন চলে গেছিল। মুহূর্তে প্রবীরের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে রতন কীসের কথা বলেছে। এসব ব্যাপার প্রবীরের অজানা নয়। ঘুরতে যাওয়ার অছিলায় কিংবা নিছক সঙ্গিনী হিসেবে অনেকেই এই মেয়েগুলোকে ভাড়া করে নিয়ে যায়। কয়েকটা দিনের জন্য চেনা-পরিচিত জগতের বাইরে গিয়ে ফুর্তি আর শরীরের খেলা। এও এক ধরনের জীবন। ছকে বাঁধা জীবনের বাইরে আর এক জীবন। প্রায় দশদিন সময় নিয়েছিল প্রবীর। এই জীবনের চেহারাটা দেখবে কি দেখবে না---এই দুটোর একটিকে বেছে নিতে গিয়ে প্রবীরকে কম যুদ্ধ করতে হয়নি! রুচির প্রশ্ন, সততার প্রশ্ন, রোগের প্রশ্ন, সাহসের প্রশ্ন, খরচের প্রশ্ন---সব একসঙ্গে প্রবীরকে ঘিরে ধরেছিল। উচিত-অনুচিতের দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে বহুবার নিজেকে মাপতে হয়েছে। শেষকালে সামান্য দ্বিধা আর সংশয় নিয়ে প্রবীর রতনকে বলেছে বুঝলি, যেতে চাই। কিন্তু..

--এতে আর কিন্তু কেন? তুই তো খারাপ কিছু করছিস না। বিয়ে করা বউ ভোগ করতিস, তা এখানে নয় ভাড়া করা মেয়ে ভোগ...। যাক গে, কবে যাবি বল? আমার সাজেশন কী জানিস---যাকে দেব তাকে নিয়ে এখান থেকেই সিধে দীঘায় চলে যা। বহু হোটেল, থাকার কোনও অভাব নেই। তিন-চারদিন থেকে ফুর্তি করে চলে আয়। মেয়েটাকে তিনশো টাকা দিয়ে দিবি। কোনও ভয় নেই। এ সব আকছার হচ্ছে। ঘুরে এসে দেখবি ফ্রেশ হয়ে গেছিস। এই দেখ না, যেমন আমি। বিয়ে-ফিয়ে তো করিনি। কেমন মজায় আছি। আমার অবশ্য তোর মতো বাড়ির সমস্যা নেই। ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারি। তবে করব না। এই বেশ আছি। তোকে যে মেয়েটা দেব, ওইরকম অনেকগুলো মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসা আছে। তারাই আমাকে আনন্দে রেখেছে। যখন যার কাছে ইচ্ছে হয় চলে যাই। কোনও বাঁধন নেই।

সেদিন প্রবীর প্রথম জানল, রতন দাস বিয়ে করেনি। পারসোনেল সেকশনের এই ছেলেটির সঙ্গে সবারই কমবেশি হৃদ্যতা। রতনকে অনেকেই বন্ধু বলে মনে করে। তাদের মধ্যে প্রবীর একজন। রতন প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু করে দেয়। কিংবা করার চেষ্টা করে। কিন্তু রতনের এই জীবনযাপন সম্পর্কে অনেকে জানে কিনা সন্দেহ। জানলেই বা কী করার আছে। রতন ওর নিজের পয়সায় নিজস্ব স্টাইলে বেঁচে থাকার উপায় বের করে নিয়েছে। এখানে কারও কিছু বলার নেই। এদিক থেকে

দেখলে এই যে মেয়ে নিয়ে প্রবীর দীঘায় বেড়াতে যাবে, তা ওর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। রতন বলেছিল, কোনও দুশ্চিন্তা নিয়ে যাবি না। যদি জানাজানি হয়ে যায়, লোকে হয়তো নিন্দে করবে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তোর সমস্যা নিয়ে কে ভাবছে যে তুই নিন্দে নিয়ে মাথা ঘামাবি! দুর, দুর, ওসব বাদ দে তো। কীভাবে, কেমন করে বাঁচবি সেটা সম্পূর্ণ তোর হাতে।

খুব বড় বড় কথা বলেছিল রতন। ওর মুখে এগুলো মানিয়েও গেছে। কেননা এইভাবেই ও বেঁচে আছে। জীবনটাকে ভোগ করছে। প্রবীর এতটা ডেয়ার হতে পারবে না। সাহসী যদিও বা হতে পারে, দুঃসাহসী হওয়া প্রবীরের পক্ষে অসম্ভব। বাড়িতে ওকে বলতে হয়েছে—অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে যাচ্ছি। প্রবীর বলতে পারেনি—জয়া নামের একটা মেয়েকে দীঘায় নিয়ে ভোগ করতে চললাম, চারদিন পরে ফিরব। এগুলো বলা যায় না। তবে সংশয়, দ্বিধা আর প্রশ্নমালাকে দূরে সরিয়ে রেখে এই দীঘা ভ্রমণ প্রবীরের কাছে স্বপ্নের মতো। একটা অদ্ভুত ঝিমধরা আনন্দ ওর মাথার এক কোণে যেন ঘাপটি মেরে বসে আছে। এই আনন্দ, নিজেকে যেমন-খুশি-চালানোর আনন্দ, নিজের ওপর অত্যাচারের আনন্দ, শেকল ছেঁড়ার উদ্দাম আনন্দ।

ওরা যেদিকে বসেছে, সেদিকেই সকালের প্রথম রোদ কচি হাত বাড়িয়ে জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ছে। বাঘের মতো এখনও লাফিয়ে পড়েনি। তবু জয়ার কি কষ্ট হচ্ছে? কথাটা ভাবতে ভাবতেই প্রবীরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আপনার মনে হয় রোদে খুব অসুবিধে হচ্ছে!

জয়া দ্রুত ঘাড় ফেরাল। মুখে সেই হাসি। সানগ্লাসটা চোখের ওপর থেকে নামিয়ে এনে বলল, কই না তো! জানলার ধারে বসে বেশ লাগছে।

ঢোক গিলে প্রবীর বলল, আপনি মনে করলে এ ধারটায় বসতে পারেন। আরও বেলায়...।

—না, না। কিছু হবে না। জয়া মাথা নীচু করে বলল। তারপর একটু থেমে চোখ তুলে নরম আদুরে গলায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি সেই তখন থেকে আমাকে আপনি আপনি করছ কেন গো? তুমি বলতে কি জিভে আটকাচ্ছে? কি গো, বল না...।

গলার কাছে এসে সারা জীবনের আবেগ যেন দলা পাকিয়ে মুহূর্তে আটকে গেল। এই প্রথম একটি অপরিচিত মেয়ে, হোক না সে দেহজীবিনী, হোক না সে দু'দিনের শয্যাসঙ্গিনী, প্রবীরকে বড় আন্তরিক স্বরে গহন অতলের দিকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি, তুমি, তুমি, এক অব্যক্ত আনন্দে প্রবীর বিহ্বল হয়ে গেল।

মেচেদায় বাস থেমেছিল মিনিট কুড়ি। জলখাবারের ব্রেক। জয়া প্রথমে বলেছিল, আমি কিছু খাব না। একদম খাওয়ার ইচ্ছে নেই। তুমি যাও। খেয়ে এসো। আমাকে একটা চায়ের গ্লাস দিয়ে যেও। তাতেই হবে।

মাত্র ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে প্রবীর অনেকটা সহজ হয়ে গেছিল। একটা চাপা উত্তেজনা আর জয়ার শরীর ছুঁয়ে টুকরো-টুকরো আলাপ—এই দুয়ে মিলিয়ে প্রবীর ওর পুরনো

সত্তা, খোলসের মতো একটু একটু করে ছেড়ে ফেলেছে। জয়ার অনিচ্ছা দেখে প্রবীর একটু আশ্চর্য হয়ে বলেছে, সে কী! সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছ। খিদে পায়নি! না, না, এসো।

ঠিক আন্তরিকতা নয়, আবার অভিনয়ও নয়। এর মাঝখানে আরেক অনুভব প্রবীরকে প্রতি মুহূর্তে বদলে দিচ্ছিল। হাতের মুঠোয় একটা জ্যান্ত নারীদেহ পেয়ে ওর ক্লান্ত অথচ বুভুক্ষু চেতনা অতি দ্রুত জেগে উঠেছে। দীঘায় পৌঁছে একটা কমদামি হোটেলে উঠে আজই দুপুরে জয়াকে কীভাবে ভোগ করবে তার ছবি এঁকে রেখেছে প্রবীর। প্রথমে জয়ার নগ্ন সৌন্দর্য দেখবে। জয়া নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। প্রবীর ওকে যেমন খুশি ব্যবহার করার জন্যেই তো নিয়ে এসেছে। মেয়েটাকে দেখতে সুন্দরী নয়। অথচ একটা আলগা চটক সারা দেহে ছড়িয়ে রেখেছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে চোখে পড়ে, ওর মুখ সহস্র কামনার ছোবলে নীলচে হয়ে আছে। যারা এই সমস্ত মেয়েদের কাছে জীবনের মানে খুঁজতে যায়, তারা এক লহমায় ধরে ফেলবে জয়া লাইনের মেয়ে। জয়ার দিকে অনেকেই তাকাচ্ছে, দেখছে। মেয়েটা যে স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহের বাইরের একজন, এটা যেন কীভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অন্তত প্রবীরের তাই মনে হয়েছিল। তবে এসব ভাবাব আর কোনও মানে হয় না। খেলতে নামাটাই এখন বড় কথা। খেতে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রবীর দাঁড়িয়েছিল। জয়া এবার ম্লান হেসেছে। সিট থেকে উঠিয়ে নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছে প্রবীরের দিকে। তারপর ওপাশের সমান্তরাল সিটে বসা বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে মিষ্টি সুরে বলেছে, মাসিমা, আমাদের ব্যাগগুলো একটু দেখবেন! আমরা চা খেয়ে এক্ষুনি আসছি।

নীচু টালির চালের খাবারের দোকানে ওরা গরম গরম কচুরি-তরকারি নিয়ে বসেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবীরের চোখে পড়েছিল মিষ্টির শো-কেসের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক জয়াকে নানাভাবে দেখার চেষ্টা করছে কিংবা স্মৃতির পাতা উল্টে চিনতে চাইছে—মেয়েটা কে? প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েও প্রবীর সামলে নিয়েছে। মনে পড়ে গেছে, রতন বলেছিল, বুঝলি, জয়া এই করে পেট চালায়। একটা নড়বড়ে সংসারে হয়তো কিছু দিতে চেষ্টা করে। দীঘায় ওর যদি কোনও পুরনো খদ্দের ওকে দেখতে পেয়ে কথা বলে, ইয়ার্কি করে তা হলে রেগে যাবি না। ফালতু তড়পাবি না। এমনটা হতেই পারে।

সেই লোকটা হয়তো জয়াকে আগে কোথাও দেখেছে। অন্য কারও সঙ্গে। তাই মিলিয়ে নিতে চাইছিল। বেশ অনিচ্ছা ভরে জয়া সামান্য কিছু খেয়েছে। ওর এই বিতৃষ্ণার কারণ খুঁজে পায়নি প্রবীর। জিজ্ঞেস করলেই জয়া বলেছে, ইচ্ছে করছে না গো! দীঘায় গিয়ে ভাল করে খাব। চান করিনি, কাপড়-চোপড় ছাড়তে হবে। তুমি মিথ্যে ভাবছ!

একটা অপরিচিত, দেহব্যবসায়ী মেয়ে খাবে কি খাবে না, তা নিয়ে প্রবীরের ভাবনা-চিন্তা করার কোনও দরকার ছিল না। জীবনে আর দ্বিতীয়বার জয়ার সঙ্গে দেখা হবে কি না সন্দেহ। সব ঠিক। কিন্তু প্রবীর, ওর রক্তের স্রোতে, সুদূর থেকে বয়ে আসা একটা ঝরনার মিশে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

সিটের পেছনে মাথা রেখে জয়া আয়াস করছিল। এই একটু আগে ওর ঘুমন্ত মুখ ঢলে পড়েছে প্রবীরের কাঁধে। রতন বলেছিল, জয়া খুব ছলবলে। দেখবি, সবসময় তোকে গরম করে রাখবে। কথায়-কাজে একেবারে তাওয়ায় ভাজা মাল। খুব সম্ভবত রতন ওর অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে জয়াকে গুলিয়ে ফেলেছে। প্রবীর এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু দেখেনি। দু'-একবার মেয়েটা প্রবীরের থাইয়ে হাত রেখেছে, খুনসুটির ছল করে একবার আলতো চিমটি কেটেছে। আর কিছু নয়। তবে জয়া প্রাণবন্ত। হালকা ইয়ার্কি করতে ওস্তাদ। প্রবীর ভাবল, খুব ভোরে উঠে বাস ধরতে এসেছে বলেই হয়তো ও ঘুমিয়ে পড়ছে।

পেছন থেকে কে যেন বলল, এই তো রামনগর চলে এসেছি। আর মিনিট চল্লিশেক পরেই দীঘা।

কলেজে পড়ার সময় পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে একবার দীঘায় বেড়াতে এসেছিল প্রবীর। সময়ের হিসেবে প্রায় বছর কুড়ি আগে। এদিকের রাস্তা বা জনপদের কোনও স্মৃতিই এখন আর তেমন উজ্জ্বল নয়। শুধু মনে আছে, ওরা খড়গপুরে ট্রেন থেকে নেমে বাস ধরেছিল। সেবার পথ যেন শেষই হচ্ছিল না। কাঁথি কোর্টের কাছাকাছি একটা দোকানের সামনে বাস থেকে নেমে সবাই পেটভরে টাটকা রসগোল্লা খেয়েছিল। এই সব নরঘাট, হেঁড়িয়া, বাজকুল, রামনগর, ঠিকরা প্রভৃতি লোকালয়ের নাম প্রবীরের কাছে একেবারে নতুন।

একটানা মসৃণ, ফাঁকা রাস্তা। বাস ঝড়ের বেগে দীঘার তট ছুঁতে চলেছে। প্রবীর দেখল, বাইরের চড়া রোদ আর এই একটানা বসে থাকার বিরক্তিতে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সকালের সেই চনমনে ভাব, অকারণ কথা বলার নেশা কেটে গেছে প্রায় বিরতিবিহীন জার্নির ধাক্কায়। সমুদ্রের নীল দিগন্ত এবং অনাহত গর্জন যতক্ষণ না বুকে এসে আছড়ে পড়ছে ততক্ষণ হয়তো কেউ তরতাজা হয়ে উঠবে না। এমন কী জয়াও নয়।

দীঘায় নেমে একটা ছোট্ট কাজ নিপুণভাবে সমাধা করতে হবে প্রবীরকে। হোটেল রেজিস্টারে পাকা হাতে লিখে দিতে হবে দুটো মিথ্যে নাম আর একই পদবি। যাতে বোঝা যায় ওরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী। হোটেল-ম্যানেজার যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করেন। সন্দেহ করলেই সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। ব্যবসার খাতিরে ম্যানেজার হয়তো কিছুই বলবেন না, কিন্তু প্রবীরের মনে অকারণে একটা খিঁচ ঢুকে থাকবে। কাজের কথাটা মনে পড়তেই প্রবীর চোখ ঘুরিয়ে জয়ার সিঁথির দিকে তাকাল। মাথার মাঝখানে নয়, একটু পাশে সরানো সিঁথি। ঠিক সিঁথি যাকে বলে তা নয়, সিঁথির আভাস এবং তাতে সিঁদুরের কোনও চিহ্ন নেই। অথচ রতন হাত তুলে আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলেছিল, জয়াকে বলে দেব, যেন শাঁখা-সিঁদুর পরে বউ সেজে যায়। হাজব্যান্ড-ওয়াইফের মতো যদি চলাফেরা করিস, তা হলে তোকে কেউ সন্দেহ করবে না।

একটু বিরক্ত হয়ে নড়েচড়ে বসল প্রবীর। জয়ার ঘুম ভাঙল না, মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে আবার নেতিয়ে পড়ল। এখন কী হবে! জয়া কি সঙ্গে সিঁদুরের কৌটো নিয়ে

এসেছে? মেয়েটা যদি কিছু মনে না করে, তাহলে প্রবীর নিজেই ওর সিঁথিতে সিঁদুর ছড়িয়ে দিতে পারে। হোটেল ভাড়া করার আগে এটা করে নিতে হবে। যতই যা হোক, সিঁদুর এখনও পর্যন্ত বিবাহিতা মহিলাদের বেস্ট রেজিস্টার্ড মার্ক। সব জানা সত্ত্বেও জয়ার উচিত হয়নি এইভাবে নিপাট কুমারী হয়ে আসা।

অলঙ্কারপুর গ্রামটাকে পিছনে ফেলে রেখে প্রবীবদের বাস দীঘায় ঢুকে পড়ল। হোটেল, কটেজ, প্রশস্ত রাস্তা, ঢেউ-এর একটানা শব্দ, রোদজর্জর দুপুরের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে টুরিস্টদের ইতস্তত ভ্রমণ—সব মিলিয়ে দীঘা যেন নতুন অতিথিদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

দীঘার মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই একজন দালাল গোছের নাছোড় লোক প্রবীরকে যে-হোটেলে নিয়ে এল, সেটা বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। নীচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া একটা গলির মুখে। তিনতলা বাড়ি। বেশ রংচঙে। দালাল লোকটা হেসে বলল, স্যার তিনতলার বারান্দা থেকে পষ্ট সমুদ্দুর দেখতে পাবেন। একটু দূরে ঠিকই, কিন্তু আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট ফাস্টোকেলাস। রেটও অন্যদের চেয়ে কম। একদিন থাকলেই বুঝতে পারবেন এই হোটেলের নাম কেন ইন্দ্রপুরী।

রিসেপশন কাউন্টারের সুবেশী-স্মার্ট যুবকটি ওদের ঢুকতে দেখেই বলে উঠল, আসুন স্যার, আসুন বউদি। ...এই যে, এই নিন আমাদের রেট কার্ড। বউদি, আপনি ওই সোফায় বসুন।

চমকে গিয়ে প্রবীর জয়ার দিকে তাকাল। আশ্চর্য, এরই মধ্যে কখন জয়া সিঁথিতে মোটামুটি চোখে পড়ার মতো সিঁদুর দিয়ে নিয়েছে। কপালে লাল রঙের বিন্দিয়া। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রবীর অবাক হয়ে গেল।

হাত সামান্য কেঁপে গেলেও প্রবীর মিথ্যে নাম-পরিচয় লিখে কলম বন্ধ করতেই যুবকটি ফিক করে হেসে বলল, স্যার, আপনাদেব তা হলে তেতলার সি-ফেসিং ঘরটাই দিচ্ছি। আপনি কিছু অ্যাডভান্স করে দিন। আপাতত একশো দিলেই হবে।... যখনই দরকার হবে বেল বাজাবেন। উই আর অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস। বেয়ারা ছাড়াও, আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা পাবেন। আমার নাম বরুণ মাইতি। অ্যাই কালু, স্যারের জিনিসপত্তর পাঁচ নম্বরে দিয়ে আয়। যান বউদি, চান-টান করে আসুন। সামনেই ভাতের হোটেল আছে। আমি ভাল ব্যবস্থা করে দেব।

ঘরের দরজা বন্ধ। পেলমেট থেকে ঝোলানো ভারী পর্দা জানলার গায়ে। প্রবীরের একেবারে হাতের মুঠোয় একটা নারী-শরীর। পয়সা দিয়ে কিনে আনা। যেভাবে খুশি এই শরীরটাকে নিয়ে প্রবীর এবার খেলা করবে। যতক্ষণ না বিগত যৌবনের উপোসী খিদে মিটছে ততক্ষণ ছাড়বে না।

—এই দেখবে এসো, সমুদ্রটাকে এখান থেকে কেমন দেখাচ্ছে। পর্দা সরিয়ে জয়া সমুদ্র দেখছে। উচ্ছ্বাস আর বিস্ময় মাখানো গলায় জয়া ডাকল।

জামার তৃতীয় বোতামটা খুলতে গিয়েও বন্ধ করে দিল প্রবীর। উবু-হয়ে-থাকা জয়ার পিছন দিকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জানলার কাছে সরে এল। এখান থেকে অনেকটা দূর, তবু দীঘার ধূসর সমুদ্র আর সমুদ্রতট ছবির মতো লাগছে। ছুটে আসা ঢেউয়ের

শব্দ এলোমেলো বাতাসের ভেলায় চেপে ছড়িয়ে যাচ্ছে দূর-দূরান্তরে। জয়ার পিছন দিকে নিজের শরীরের ভার ফেলে দিয়ে প্রবীর বলল, এই, সমুদ্রে চান করতে যাবে। চলো না, খুব মজা হবে তা হলে!

—না লক্ষ্মীটি, আজ থাক। কালকে যাব। অদ্ভুত কায়দায় নিজেকে ঘুরিয়ে প্রবীরের মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াল জয়া।

—তোমার সব কিছুতেই না কেন বলো তো! খাবে—না, যাবে—না।...প্রবীর মাথা ঝাঁকিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল, এবার তো দেখছি শুতে বললে বলবে—না।

—এই, তুমি মিছিমিছি রেগে যাচ্ছ। শোনো, শোনো আমার দিকে তাকাও। আমি না তোমার বউ, আমার ওপর রাগ করতে আছে ছিঃ! আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে...। জয়া চোখ মটকে বলল। তারপর প্রবীর কিছু বোঝার আগেই জয়া ওকে দু'হাতে বুকের মাঝখানে টেনে এনে চুমু খেল। প্রথম অভিজ্ঞতার বিহ্বলতা কাটিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরে জয়াকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে প্রবীর টের পেল, রক্তের ঢেউ উঠেছে বুকের ভেতরে। সেই সঙ্গে ঝড়। যে-ঝড় ভাঙচুর করবে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে চেতনার ঘরবাড়ি। জয়ার ঠোঁটে প্রথমবার আনাড়ির মতো চুমু ফিরিয়ে দিল প্রবীর। দ্বিতীয়বার পাগলের মতো মুখ নামিয়ে আনতেই জয়া অসম্ভব শান্ত ঠাণ্ডা গলায় বলল, প্লিজ, এসব এখন নয়, তুমি আগে চান করে এসো। ভাত-টাত খেয়ে নাও। তারপর সারাটা দুপুর...।

এরপর আর জোর করতে পারল না প্রবীর। ওর শরীরের সমস্ত টানটান স্নায়ু মুহূর্তে যেন শিথিল হয়ে গেল। জয়ার বলার মধ্যে কোনও আদেশের সুর নেই, তবু প্রবীর সরে এসেছে। একেই কি বলে মেয়েমানুষের ব্যক্তিত্ব! তারা যেমন খুশি পুরুষদের চালাতে পারে, যে-ব্যক্তিত্বের জোরে, এমন কী বন্ধ ঘরে কামনার আগুনের সামনে দাঁড়িয়েও! তোয়ালে, সুগন্ধী সাবান, শ্যাম্পুর পাউচ, পাজামা-পাঞ্জাবি আর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে পরাজিত মানুষের মতো প্রবীর বাথরুমে ঢুকে গেল।

ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। বেশ সাজানো-গোছানো। প্রবীরদের দেড় কামরার ফ্ল্যাটের বাথরুমের পাশে একেবারে নরক। চারটে প্রাণীর ক্রমাগত ব্যবহারে কদর্য, জীর্ণ। এর মেঝেতে জল ঢালতে গেলে হাত কাঁপবে। বাথরুমটার জিওগ্রাফি দেখতে দেখতে অন্যান্য কৃত্য শেষ করে প্রবীর শাওয়ারের তলায় এসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা পবিত্র জল। সারা দেহ থেকে সমস্ত ক্লেদ ধুয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। জলের তলায় দাঁড়িয়ে প্রবীরের হঠাৎ মনে হল, জয়া এখন কী করছে? কাপড়-চোপড় ছাড়ছে কি? বাথরুমের দরজায় একটা ফুটো থাকলে এসব দেখা যেত। আচ্ছা, মেয়েটা আবার ব্যাগ-ট্যাগ খুলছে না তো। ব্যাগে অনেক টাকা আছে। এসব মেয়েদের স্বভাব মোটেই ভাল হয় না। সুযোগ পেলেই পার্স থেকে মাল বের করে নেবে। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। জড়িয়ে ধরার সময় জয়ার গা-টা কেমন যেন গরম লাগল। জ্বরটর হলে যেমন লাগে। ওর শরীর খারাপ হয়নি তো! না-ও হতে পারে, হয়তো ওই উষ্ণতা জয়ার নিজস্ব কামনার উত্তাপ।

পায়ের তলায় জমে যাওয়া সাবান জলে পা ডুবিয়ে খেলতে খেলতে প্রবীরের হঠাৎ

মনে হল, হোটেল-ম্যানেজার ছোঁড়াটা ফিক করে একবার হেসে ফেলেছিল। ওর এই হাসির মানে কী? ছেলেটা কি ধরতে পেরেছে ওদের আসল উদ্দেশ্য! প্রবীরের ভুরু কুঁচকে গেল। কৃত্রিম জলধারার তলায় ভিজতে ভিজতে প্রবীর ঠোঁট উল্টিয়ে বিড় বিড় করে বলল, আর শালা কাউকে পরোয়া করি না।

কতক্ষণ ধরে স্নান করেছে প্রবীরের খেয়াল নেই। দরজা খুলে ঘরে পা দিয়েই প্রবীর দেখল, জয়া শুয়ে পড়েছে। চোখ দুটো অল্প লাল, গায়ের কাপড় এলোমেলো।

—কী হল! শুয়ে পড়লে যে! প্রবীর জিজ্ঞেস করল।

কোনও উত্তর নেই। জয়া স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। মুখে ম্লান হাসি। দ্রুত এগিয়ে এসে জয়ার কপালে সদ্যস্নাত ঠাণ্ডা হাত রাখতেই ছ্যাঁক করে উঠল। বেশ ঘাবড়ে গিয়ে প্রবীর বলল, একী, তোমার যে জ্বর এসে গেছে!

—না, না, ও কিছু না। একটু গা-টা গরম হয়েছে। কতক্ষণ বাস জার্নি করে এসেছি তো! একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো! জয়ার গলা ভারী হয়ে এসেছে।

—কী কথা? বলো, রাগের প্রশ্ন আসছে কেন? বলো...

—লক্ষ্মীটি, তুমি গিয়ে ভাত খেয়ে এসো। আমি আর এই রোদে বেরবো না।...আমার এমন কখনও হয় না, বিশ্বাস করো।

—আশ্চর্য, সেই সকাল থেকে তোমার এই গা-ছাড়া ভাব আমার একদম ভাল লাগছে না। প্রবীরের কণ্ঠস্বর বেশ রূঢ় হয়ে এল, তুমি ইয়ার্কি মারছ! ওঠো, ওঠো। চান করে এসো।

জয়ার মুখটা খুব করুণ লাগছে। অপরাধীর মতো কুঁকড়ে যাচ্ছে ওর শরীর। আরও কঠোর হওয়ার চেষ্টা করেও পারল না প্রবীর। মনে হল, জয়ার চোখ দুটো যেন ছলছল করছে।

দীঘা অনেক বদলে গেছে। চারদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো হোটেল আর হলিডে হোম। দোকানপাট, বাজার। সেবার দীঘার নির্জনতায় দুদিনেই প্রবীররা হাঁপিয়ে উঠেছিল। এবার এই ঘিঞ্জি এবং লোকের ভিড় দেখে প্রবীর বিরক্ত। ভাতের হোটেলে বসার জায়গা পাওয়ার জন্য প্রায় মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। বরুণ কথায় কথায় বলছিল, ওই দিকটায় স্যার নিউ দীঘা তৈরি হচ্ছে। এখনও তেমন জমেনি। তবে কয়েক বছর পরে আর দেখতে হবে না। পুরীর মতো ভিড় হবে। আপনারা, যাঁরা স্যার লোনলিনেস পছন্দ করেন, তাঁদের আর দীঘা টানবে না।

খুব ভাল করে খাওয়া হয়নি। স্নান করে ফ্রেশ লাগলেও একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তি শরীরে থেকেই গেছে। তার ওপর জয়ার ভাবভঙ্গি মোটেই ভাল লাগছে না। মেয়েটা কোনও কারণে অসুস্থতার ভান করছে না তো! এরা সব পারে। এদের জীবন থেকে প্রায় সব কিছু হারিয়ে গেলে, ছলনা ও অভিনয় কখনও হারায় না। এই দুটোকে সম্বল করেই এরা পেট চালায়। জয়া যদি সত্যিই অসুস্থ হয়ে থাকে, তা হলেও, এটা ওর দারুণ অন্যায়। ব্যবসা করতে এসে প্রবীরের মতো অনভিজ্ঞ আনকোরা খদ্দেরকে ঝোলানো ওর উচিত হচ্ছে না। এই যে জয়া খেতে আসেনি, বরুণ মাইতির ঠিক

চোখ পড়ে গেছে। প্রবীরকে একলা নীচে নেমে আসতে দেখে ছেলেটা একটু বেশি রকম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি একা! বউদি এলেন না! উনি কি পরে খাবেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর সত্যি কথায় দেওয়া যায় না। মিথ্যের নিশ্ছিদ্র জাল বুনতে হয়। যাতে সন্দেহের পাজি বাতাস সেই জাল ছিঁড়তে না পারে। বরুণ জিজ্ঞাসা করবে প্রবীর জানত। তবু একটু থমমত খেয়ে ও বলেছে, হ্যাঁ পরে, না মানে, ওর খাওয়ার ইচ্ছে নেই। গা বমি-বমি করছে...

—ও, তাই বলুন, আমি ভাবলাম আপনার ওপর রাগ করে...। বরুণের ঠোঁটে সেই মিচকে হাসি ঝলসে উঠেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, গা বমি-বমি তো করতেই পারে, এতটা পথ বাসে করে এসেছেন। কলকাতা থেকে দীঘা কম দূর!

বরুণের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ও পুরোপুরি প্রবীরের কথা বিশ্বাস করেনি। এই সব প্রফেশনাল ছেলেগুলো মানুষ চরিয়ে চরিয়ে ঝানু হয়ে গেছে। নিজেকে খুব ছোট আর অপমানিত লাগছিল প্রবীরের। কিন্তু কিছু করার ছিল না। সব কিছু হজম করে নিতে হয়েছে।

মীনাবাজারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রবীর ঘড়ি দেখল। প্রায় আড়াইটে বাজে। এই রোদে আর ঘুরে বেড়ানো ঠিক হবে না। বেড়ানোর সময় অনেক পাওয়া যাবে। আজকের বিকেল, সন্ধ্যা। কালকের সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা। আবার তারপরের দিন। কী ভেবে জয়ার জন্য মীনাবাজারের একটা দোকান থেকে সলটেড কাজুবাদামের একটা ছোট প্যাকেট কিনে হোটেলের দিকে পা বাড়াল প্রবীর।

দরজায় ছিটকিনি দেওয়া নেই। আলতো করে ঠেলতেই খুলে গেল। জয়া দরজা বন্ধ না করে শুয়ে আছে! আশ্চর্য কাণ্ড! প্রবীরের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। দরজার একটা পাল্লা সশব্দে ঠেলে সরিয়ে ঘরে ঢুকে প্রবীর অবাক। কিছুটা বিব্রত। জয়া সায়া আর ব্লাউজ পরে খাটে এলিয়ে আছে। চোখ দুটো যেন আরও লাল। নিথর। কেমন যেন ভাষাহীন দৃষ্টি।

—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে গো! সেই তখন থেকে তোমার জন্যে শুয়ে আছি। কই এসো। জয়ার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বদলে গেছে। হাসপাতালের রোগশয্যা থেকে যেমন আর্তস্বরে, ক্লান্ত বেদনায় রোগীরা কাউকে ডাকে, তেমন করে জয়া ডাকল। তারপর অতি ধীরে সায়ার দড়ির গিঁট খুলতে আরম্ভ করল।

জয়ার অনাবৃত পা, পায়ের গোছ, পেট দেখেও প্রবীরের কোনও অনুভূতি হচ্ছে না। এক অজানা শিহরণে প্রবীর ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। জয়ার আহ্বানও কোনও সাড়া জাগায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েটা যা করতে চাইছে, তাতে প্রবীর যেন সংবিৎ ফিরে পেল। ঘরের দরজা এখনও হাট করে খোলা আছে। এক ঝলক দেখেই প্রবীর প্রথমে ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে এল।

প্রবীরের চোখের সামনে কাঙ্ক্ষিত নগ্নতার পর্দা খুলে যাচ্ছে। অথচ কী বীভৎস! দু'হাতে মুখ ঢেকে প্রবীর চিৎকার করে উঠল, তুমি কাপড় পরে নাও, প্লিজ, এমন কোরো না। তুমি সিক. অসুস্থ...তোমার জ্বর এসেছে...।

কয়েক মুহূর্তে নীরবতা ভেঙে জয়া সেই গলায় আবার বলল, না, না, আমার কিচ্ছু হয়নি। তুমি এসো। নাও, আমাকে নেবে এসো। আঃ দেরি করছ কেন? এই শোনো, আমার ব্লাউজটা কিন্তু তুমি নিজের হাতে খুলে দেবে।

অসহ্য লাগছে। মর্গের পাশ দিয়ে গেলে যে রকম বিশ্রী গন্ধ নাকে এসে লাগে, তেমন দুর্গন্ধে ঘর যেন ভরে আছে। মশারি স্ট্যান্ডের ওপর গুছিয়ে রাখা জয়ার দুটো শাড়ির একটা এক ঝট্‌কায় টেনে নামিয়ে এনে প্রবীর ওর গায়ে ফেলে দিল। নগ্নতার সবটা আড়াল হয়নি। তবু কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে। চোয়াল শক্ত করে জানলার কাছে চলে গিয়ে প্রবীর মুখ ফিরিয়ে বলল, শাড়িটা পরে নাও।

ঠিক তখনই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জয়া। পাথর-চাপা জল যেমন বাধামুক্ত হয়ে শব্দ করে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, তেমনভাবে জয়ার কান্না প্রবল তীব্রতায় ছড়িয়ে পড়ছে। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে জড়ানো গলায় জয়া বলল, ওগো, আমাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যেও না। তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে এভাবে ফেলে রেখে...।

প্রবীর আর দূরে সরে থাকতে পারল না। কাছে এসে জয়ার উত্তপ্ত কপালে হাত রেখে বলল, আঃ, কেঁদো না। আমি আছি...।

জেনারেটরের বিশ্রী শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জয়ার পাশে বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে প্রবীরের খেয়াল নেই। ঘরের মধ্যে চাপবাঁধা অন্ধকার। দিনের আলো কখন নিভে গেছে কে জানে। হোটেলের জেনারেটরের আর্তনাদ বলে দিচ্ছে—দীঘা লোডশেডিংয়ে ডুবে আছে। জয়া, জয়া কোথায়? কেমন আছে ও! জয়ার কথা মনে হতেই অন্ধকারে বিছানা হাতড়াল প্রবীর। অসুস্থ দেহটা খুঁজে পেল না। ঘরের ভেতর কেবল পাখা চলার হিশ্ হিশ্ শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে। কোনও রকমে উঠে গিয়ে আলো জ্বালল প্রবীর। আলোর জোর নেই। জয়ার দেহটা গড়াতে গড়াতে দেওয়ালের দিকে সরে গেছে। চোখ কচলে স্তিমিত আলোয় প্রবীর দেখল, জয়া পেটিকোট পরে নিয়েছে। শাড়িটা কোনওরকমে গায়ে জড়ানো। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে—প্রবীর ঘড়ি দেখে চমকে উঠল।

জয়াকে দেওয়ালের দিক থেকে সরিয়ে আনতে পাঁজাকোলা করে তুলতেই প্রবীর ভয় পেয়ে গেল। প্রবল জ্বরে জয়ার গা পুড়ে যাচ্ছে। হুঁশ নেই। ঠিক এই মুহূর্তে কী করা উচিত প্রবীরের মাথায় এল না। নিজেকে ভীষণ অপরাধীর মতো লাগছে। খুব সাবধানে বিছানার মাঝামাঝি জয়াকে শুইয়ে দিয়ে প্রবীর অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার, ডিসপেনসারি, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, নার্সিংহোম প্রভৃতি একগাদা অনিবার্য শব্দ মাথার মধ্যে ক্রমাগত ঘা মারছে। কিন্তু এর কোনওটাই এই আলোহীন বিভুঁইয়ে পথ দেখাতে পারছে না। হোটেল-ম্যানেজার বরুণ মাইতি দুপুরে বলেছিল, যখনই দরকার হবে বেল বাজাবেন। আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা পাবেন। বরুণের আশ্বাসে নিশ্চয়ই কোনও ফাঁকি নেই। কিন্তু ওকে ডাকা মানেই চরম অপমানের নিন্দাপঙ্কে ডুবে যেতে হবে। কোনও মিথ্যে দিয়েই আর জয়ার পরিচয় কিংবা ওদের বেড়াতে আসার উদ্দেশ্য ঢেকে রাখা যাবে না। অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচতে গেলে

অনেকটাই খুলে বলতে হবে। বরুণকে ডাকা অসম্ভব। তার চেয়ে নিজে যতটুকু পারা যায় প্রবীর করবে।

নিজের একস্ট্রা একটা রুমাল জলপট্টির মতো করে জয়ার তপ্ত কপালে বেশ কয়েকবার রাখতেই জয়া চোখ মেলল। মৃত মানুষের মতো দৃষ্টি। প্রবীর মুখ নামিয়ে এনে ডাকল, জয়া।

কোনও উত্তর নেই। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে। যত নষ্টের গোড়া ওই রতন দাস। ওর জন্যেই এই চরম দুর্ভোগ। রাগে, ক্ষোভে, নিষ্ফল আক্রোশে মুখ দিয়ে জান্তব শব্দ বেরিয়ে এল।

—দাদা, ও দাদা, তুই আমারে আর মারিস না রে! এই দ্যাখ, আমার ব্যাগ একেয়ারে শূইন্য। আইজ একটা পয়সাও কামাই নাই।...তরে কোত্থাইকা দিমু বল তো! মা, বলো, দাদারে বলো...আমি বেশ্যা হইয়া গেছি মা...বুড়ি, বুন আমার, তুমি কি নিবা কও...

জ্বরের ঘোরে জয়া ভুল বকছে। কিংবা চেতন-অচেতনের সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে ওর জীবনের অপঠিত গোপন পাতাগুলো মেলে ধরছে নিষ্ঠুর পৃথিবীর কাছে।

চরম অস্বস্তির মধ্যে বসে থেকে প্রবীর ক্রমাগত জলপট্টি বদল করছিল। কিন্তু রাত প্রায় দশটার সময়ে শরীরী যন্ত্রণায় নীলাভ হয়ে আসা জয়ার মুখ দেখে বরুণকে ডেকে আনতে প্রবীর বাধ্য হল। জয়ার শরীরে হাত না ছুঁইয়েই বরুণ বলল, আপনার ওয়াইফ তো দেখছি বেশ ভালরকম অসুখ বাঁধিয়ে বসেছেন। এখন তো এখানে ডাক্তার-বৈদ্য কিছুই পাওয়া যাবে না। ওষুধের দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে। সেই কাল সকালে, ন'টা নাগাদ কাঁথি থেকে এক ডাক্তারবাবু দীঘায় চেম্বার করতে আসবেন, তাঁকেই দেখাতে হবে। এর আগে আর কোনও পথ নেই।

—তোমার কাছে ভাই কোনও ওষুধ-টষুধ আছে? জ্বর কমাবার...এই এখনকার মতো! প্রায় ভিখিরির মতো অনুনয় ঝরে পড়ল প্রবীরের গলা থেকে।

—হ্যাঁ আছে। আমি এনে দিচ্ছি। তবে শুধু ওষুধে তো হবে না স্যার। বউদির মুখটা যেরকম কালচে মেরে গেছে, তাতে মনে হচ্ছে, আপনাকে সারারাত জেগে ওই জলপট্টি মারতে হবে। তেমন বাড়াবাড়ি হলে মাথা ধুইয়ে দিতে হবে কিন্তু! আপনি ভারি বিপদে পড়ে গেলেন দেখছি! বয়স্ক, পোড়-খাওয়া লোকের মতো নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বরুণ বলল।

কঁকিয়ে কেঁদে ওঠার মুহূর্তে মানুষ যেভাবে অদৃশ্য শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে, তেমনভাবে প্রবীর বলল, ভাই, এই মহিলা আমার বউ নয়। একে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এই মানে.. । এখন কি মুশকিলে পড়লাম বলুন তো। আপনি আমাকে হেল্প করুন। তা না হলে.. ।

মাথা নীচু করে বরুণ হাসল। এবারের হাসিতে কোনও ইঙ্গিত নেই। একটু ম্লান অথচ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের চকিত ঝলক খেলে গেল। বরুণ একটু চুপ করে থেকে শুধু বলল, জানি এই মহিলা আপনার কেউ নন।

—আপনি জানেন! একটা চাপা আতঙ্কে আর বিস্ময়ে ঝুলে গেল প্রবীরের চোয়াল।

—হ্যাঁ। দীঘায় এর আগেও একে দু'-তিনবার দেখেছি।

—আপনাদের এই হোটেলে উঠেছিল?

—না, না। মহিলাকে সি-বিচে বা রাস্তায় কিংবা বাজারে কোথাও দেখেছিলাম। ঠিক মনে নেই। অন্যের বউ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এবার আপনি ওকে এনেছেন। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে উঠেছেন এই হোটেলে। তাই তো!

আপন সত্তার নগ্ন রূপের সামনে দাঁড়িয়ে প্রবীর ভেঙে পড়ল। বরুণের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে ও।

—এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই দাদা। এমন অনেকেই করছে। তবে অন্যরা এমন প্যাঁচে পড়ে না, আপনি পড়ে গেছেন। আপনার ব্যাড লাক।

—আপনি আমাকে বাঁচান ভাই। আমি কখনও এসব করিনি। এই প্রথম...

প্রবল বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বরুণ বলল, ওঃ, এখন এই মহিলাকে বাঁচানো জরুরি। আপনাকে নয়। আপনি এরকম ন্যাকা-ন্যাকা করবেন না তো! এসব জানাজানি হয়ে গেলে আমরা সবাই পুলিশের কবলে পড়ে যাব। আসুন আমার সঙ্গে, ওষুধ নিয়ে যান।...শুনুন দাদা, আমি চাইব না—এই হোটেল, কোনও মেয়ে-ঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যাক। তা হলে সারা দীঘায় আমাদের রেপুটেশন খারাপ হয়ে যাবে। বুঝেছেন! আসুন...।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার একটা রাত যে এত দীর্ঘ হতে পারে প্রবীরের ধারণা ছিল না। ঘড়ির কাঁটা যেন একই জায়গায় থেমে আছে। কিছুক্ষণ আগে জয়া আরও একবার ভুল বকছিল। বিনয়দা বলে কোনও একজনকে ডাকছিল কাতর স্বরে। বিনয়দা কি জয়ার কোনও শুভানুধ্যায়ী? লোকটা কি জয়াকে ভালবাসে? কেবল বেঁচে থাকার জন্য ওর এই গ্লানিময় জীবনে সেই মানুষটাই কি একমাত্র পারফেক্ট? যে ওর শরীর কিনে নেয়নি কখনও, যে ওকে সম্মান করে—সেই লোকটাকেই কি জয়া বিনয়দা বলে ডাকছে? প্রবীর ভেবে পায়নি। অশরীরী বিনয়দার ইমেজ তৈরি করার সূত্রগুলো বারবার ছিঁড়ে গেছে।

সমুদ্রের উতরোল ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে আসছে না। কারেন্ট এসে যাওয়ায় জেনারেটরগুলো থেমে গেছে। বরুণ ঠিকই বলেছে, যে-করেই হোক জয়াকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। জয়ার সেরে ওঠার ওপর নির্ভর করছে মান-সম্ভ্রম, মিথ্যাচারের বিলুপ্তি, নিষ্কলঙ্ক হয়ে ঘরে ফেরার সুযোগ। বরুণের ওষুধে কিছুটা কাজ হয়েছে। জ্বর বেশ কমের দিকে। সেই ভয়-জাগানো উত্তপ্ত পাগলামি এখন অনেক শমিত। দ্বিধা সত্ত্বেও প্রবীর ছোট্ট করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জয়া সকলকে বাঁচিয়ে দেবে হয়তো! একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। একটা হইহই শব্দে চমকে উঠে প্রবীর দেখল জানলার বাইরে ভোরের আলো শিশুর মতন টলোমলো পায়ে একটু একটু করে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। এক ঝাঁক কাক আশপাশে কোথাও ভোরের আসর বসিয়েছে। কীসের হইচই দেখতে প্রবীর জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। শর্টস আর গেঞ্জি পরা প্রায় জনাদশেক কিশোর চলেছে সমুদ্র-সৈকতে। একজনের হাতে একটা বল। রাতে সমুদ্রের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিল প্রবীর—উত্তাল ঢেউয়ের বুকে বিন্দু বিন্দু আলোর ঝলকি।

বহু দূরে জেলে নৌকোর চিহ্ন। আর কিছুই নজরে পড়েনি। অথচ এই মুহূর্তে, প্রত্যুষের লগ্ন শুরু হতে না হতেই, বালুতট ভরে গেছে প্রাণের স্পন্দনে। ভ্রমণ-পিপাসুরা বেরিয়ে এসেছে হোটেলের চার দেওয়াল ছেড়ে। বুক ভরে ভোরের আলো-মাখা বাতাস কিছুটা নিয়ে ফিরে এল প্রবীর। জয়ার কপালে হাত রাখল। খুব সামান্য তাপ এখনও লুকিয়ে আছে। আপন মনে প্রবীর বলল, ওটা কিছু নয় জয়া। তুমি ভাল হয়ে গেছ। আমি বলছি...। আমার এই হাত তোমাকে নোংরা করেনি। সুস্থ করেছে।...

প্রবীরের চোখের সামনে এখন ভোরের আলো একটু একটু করে পাপড়ি মেলেছে। আর আঁধারের ভয় নেই।

পাঁচমুড়ার ঘোড়া

থিয়েটার রোডের মেন অফিস থেকে কাজ সেরে ফিরে এসে সলিল টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট নোটটা দেখল : ওয়ার্কস কন্ট্রোলার ইগারলি অ্যাওয়েটস্ ইউ। প্লিজ মিট। আর. সাহা। পি. এ টু ডবলিউ. সি। ছোট্ট চিরকুট। তবু দু'বার পড়ল সলিল। পাশের টেবিলের অনলকে একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, এটা কে দিয়ে গেল রে?

ফাইল থেকে মুখ না তুলে অনল অতি সংক্ষেপে বলল, বেয়ারা। বেয়ারা মোহন।

—কিছু বলেছে? অস্বস্তি কাটাতে সলিল আবার জানতে চাইল।

অনল এবার ফাইলের দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে মুখ তুলল। চোখের কোণে কৌতুকের ঝিলিক। একটু হেসে অনল বলল, বড় বড় লোকদের বড় বড় ব্যাপার। আমরা সব চুনোপুঁটি। অত শত জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারব কেন? তুমি হলে গিয়ে সেলস-এর সুপারস্টার। তোমার খোঁজ করছে ওয়ার্কসের মেগাস্টার। এইটুকুই ঘটনা। অন্তত আমরা যেটুকু দেখাতে পাচ্ছি। ইনার স্টোরি আমাদের অজানা।

—অ্যাই, চুপ কর, বড্ড বকবক করছিস। হ্যাঁ রে বল না, মোহন কিছু বলেছে? এক্ষুনি যেতে হবে কি। সলিল জামার দ্বিতীয় বোতামটা খুলে শরীরে হাওয়া লাগাবার চেষ্টা করল। অস্বস্তিতে গরম বেশি লাগছে।

—না, বাবা না। নিঃশব্দে রেখে দিয়ে গেছে। বাথরুমে যাব বলে সেইসময় উঠছিলাম। নোটটায় চোখ পড়ে গেল। ডবলিউ. সি যখন অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি করে লাভ কী। একটা ঢাউস লেজার বুক মাঝামাঝি খুলে অনল আবার কাজে ডুবে গেল।

হায়ার র‍্যাঙ্কের অফিসারদের সঙ্গে বেশি গা-ঘেঁষাঘেঁষি পছন্দ করে না সলিল। যদিও এমন একটা ডিপার্টমেন্টে বিশেষ একটি কাজের দায়িত্ব যেখানে ওর ওপর আছে, সেখানে মাথাওয়ালাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হয়। তবু সলিল যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। এ অফিসের অনেকেই প্রথম শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে লালায়িত। কিন্তু সলিল মনে মনে চায় না। এই অনীহার ব্যাপারে ওর নিজস্ব দুটো থিওরি আছে। প্রথমত, উচ্চপদস্থ মানুষগুলো প্রায়শই মুডি এবং আনপ্রেডিকটেবল হন। ওঁদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মানসিকতাটা সবসময় সরু সুতোয় ঝোলে। কার প্রতি ওঁরা কখন যে তুষ্ট হবেন কিংবা কখন রুষ্ট তা ভগবানও জানেন না। দ্বিতীয়ত, ওঁদের সঙ্গে মেলামেশা মানেই ডিপার্টমেন্টের কলিগদের সঙ্গে দূরত্ব রচিত হওয়া। সহকর্মীরা কখনই ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখে না। জরুরি কাজ ছাড়া ওয়ার্কস, সেলস্, প্রোডাকশন কন্ট্রোলার কিংবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কারও ঘরেই ঢুকতে চায় না

সলিল। কী দরকার, যেচে অশান্তি ডেকে আনার! এতটা সর্তকতা এবং বিচার করে চলে ও। তা সত্ত্বেও অনলরা সলিলকে উঁচু মহলের ক্যাটাগরিতে ফেলে দিয়েছে। অথচ অনলদের সঙ্গে রিটায়ার করার দিন পর্যন্ত কাজ করতে হবে। ও কোনওদিনই কন্ট্রোলার বা ওই জাতীয় পদমর্যাদার সমকক্ষ হতে পারবে না। বড়জোর ম্যানেজার পর্যন্ত উঠবে। তা এই কোম্পানিতে সব ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে প্রায় এক ডজন ম্যানেজার, ডেপুটি-ম্যানেজার পোস্ট। ম্যানেজারদের আলাদা কোনও আইডেনটিটি নেই।

সলিল জুতো দিয়ে মেঝেতে ঠুকঠুক আওয়াজ করল। তারপর এক চুমুক জল খেয়ে জামা-প্যান্ট ঠিক করে নিয়ে তিনতলায় নেমে এল ডবলিউ. সি-র চেম্বারের উদ্দেশে। ওয়ার্কস কন্ট্রোলারের ডিপার্টমেন্টটা বেশ ছিমছাম। ক্ল্যারিকাল কাজের ভিড়ভাট্টা কিংবা ঝামেলা নেই। মাত্র সাতজন স্টাফ। আসলে ডবলিউ. সি-র কর্মিবাহিনীর মূল যুদ্ধক্ষেত্র হল ফ্যাক্টরি। ডবলিউ. সি. মিস্টার বি. এন. দাসঘোষ ফ্যাক্টরিতেই থাকেন বেশির ভাগ সময়। সলিল সোজা ওঁর পি-এ রমেন সাহার টেবিলের সামনে এসে বলল, আমাকে সাহেব খোঁজ করছিলেন? আপনার একটা নোট পেলাম!

রমেন সাহা ভুরু কুঁচকে একমিনিট চিন্তা করে বললেন, ও হ্যাঁ। আপনি তো সেল্‌সের...। কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ আগে—

—আমি ছিলাম না। হেড অফিসে কাজে গেছিলাম।

—জানি জানি। আমি দু'বার ফোন করেছিলাম ডিপার্টে। সাহেব খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন কিনা! রমেন সাহা অকারণে হাসলেন।

—উনি আছেন? এখন যাব কি? সলিল গম্ভীর গলায় জানতে চাইল। সাহা লোকটা খুব সুবিধের নয়। বসদের কাছে একটু বেশি মাত্রায় লয়ালটি দেখানো ওঁর স্বভাব।

—হ্যাঁ আছেন। এই একটু আগে ফ্যাক্টরি থেকে ফিরলেন। দাঁড়ান বলি, আপনি এসেছেন। উনি এখন ফ্রি আছেন কি না বলা মুশকিল।

সাহা ইন্টারকমে সলিলের আগমন সংবাদটুকু জানাতেই ওপাশ থেকে গ্রিন সিগন্যাল এসে গেল। রিসিভার না-নামিয়ে রমেনবাবু আগের মতন দাঁত বের করে বললেন, সাহেব আপনাকে এক্ষুনি যেতে বলছেন।

মিঃ দাসঘোষের ঘরের চাকচিক্য অন্যদের তুলনায় কম। তবে টিপটপ, সাজানো-গোছানো। এয়ার কন্ডিশন্ড। সলিল এর আগেও কয়েকবার এসেছে। দরজায় ঠুকঠুক আওয়াজ করে সলিল ঘরে ঢুকে বলল, স্যার আমাকে ডেকেছেন?

মিঃ দাসঘোষ এক ঝলক তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, ও ইয়েস। বসুন। এক মিনিট ভাই, হাতের কাজটা সেরে নিই।

সলিল অতি সাবধানে চেয়ার সরিয়ে বসে ঘরের আশপাশে চোখ ঘুরিয়ে নিল। দাসঘোষের পেছনের দেওয়ালে হেড অফিসের পাঁচতলা বাড়িটার একটা বিরাট কালার ফোটোগ্রাফ। ল্যামিনেট করা প্রায় দেওয়াল-জোড়া। ডানপাশের দেওয়ালে ঝুলছে সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার। বাঁ-পাশে লম্বাটে ধরনের একটি ছবির ক্যানভাস। দামি ফ্রেমে বাঁধানো। মডার্ন আর্ট। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকলে কিছু একটা

বোঝা যায়।
সাহেবের টেবিলে ছোট্ট একটা ফ্লাওয়ার ভাস, কয়েকটা ফাইল, কাঠের ব্লকের আটকানো ছোট ইলেকট্রনিক ঘড়ি।
—আপনি মাল ডেলিভারি দিতে তো বাঁকুড়ায় যাচ্ছেন? তাই না! মিঃ দাসঘোষ কাজ করতে করতেই জিজ্ঞেস করলেন।
—হ্যাঁ স্যার, নেক্সট স্যাটার ডে। মেজিয়া থারমাল পাওয়ার প্রজেক্টের মাল। সলিল সামান্য চমকে উঠে জবাব দিল।
মৃদু হেসে, পেন স্ট্যান্ডে কলমটা গুঁজে রেখে মিঃ দাসঘোষ বললেন, না, না, কোনও অফিসিয়াল বিজনেস বা কোয়্যারিস নয়, আপনার সঙ্গে একটু পারসোনাল দরকার আছে সলিলবাবু। আপনাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। তাই ডেকেছি—
—হ্যাঁ স্যার বলুন। নিশ্চয়ই করে দেব।
—খুব ট্রাবলসাম কিছু নয়। সেলস কন্ট্রোলার মিঃ মুখার্জির কাছে শুনলাম আপনি বাঁকুড়ার দিকে যাচ্ছেন। ভাবলাম আপনাকে দিয়ে কাজটা হবে। তাই...
—কী করতে হবে স্যার! সলিল নরম গলায় বলল।
—বাঁকুড়া থেকে আপনাকে পোড়া মাটির ঘোড়া এনে দিতে হবে। দু' জোড়া। একটা কালো, অন্যটা লাল। লাল মানে ইট রঙ। অসুবিধে হবে! আপনি তো ট্রাক নিয়েই যাচ্ছেন। পারবেন না?
মুখে হাসি ফুটিয়ে সলিল বলল, কোনও অসুবিধে হবে না। আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার জন্য ঘোড়া নিয়ে আসব।
যেন খুব আশ্বস্ত হয়েছেন এমনভাবে মাথা নেড়ে দাসঘোষ বললেন, আমি জানতাম, আপনি গ্ল্যাডলি ব্যাপারটা নেবেন। মেনি থ্যাঙ্কস্। তবে একটা কথা সলিলবাবু, সবচেয়ে বড় সাইজের পেয়ার আপনাকে আনতে হবে। যত বড় পাওয়া যায়। কয়েকদিন আগে কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে খোঁজ করেছিলাম। বিগেস্ট সাইজটা ওদের নেই। আবার যা আছে, তাও খুব জেনুইন বলে মনে হল না। কুমোরটুলি থেকে করে এনে সাজিয়ে রেখেছে কিনা কে জানে! তারপর একটু থেমে অল্প হেসে বললেন, বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প ভাই অন্য জিনিস।
সলিল একটু অবাক হয়ে গেল। মিঃ দাসঘোষ শিল্পের ভালমন্দ, ঠিক-বেঠিক সুন্দর-অসুন্দর নিয়ে এত ভাবেন! ওঁকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না। ছোটখাটো চেহারাব মানুষ। সবসময় স্যুট পরে থাকেন। ঠোঁটের ওপরে চওড়া কাঁচাপাকা গোঁফ। চলাফেরা করেন ভুরু কুঁচকে। কম কথা বলেন। তাও একটু থেমে থেমে। গলার স্বরে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য মিশে থাকে। তবে এই মুহূর্তে ওর সঙ্গে অন্যরকম ঢঙে কথা বলছেন। হয়তো বাড়িতে এইভাবেই বলেন, কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলে দাসঘোষ এখন অন্য মানুষ। ফ্যাক্টরির কর্মীরা ডবলিউ. সি-কে খুব একটা পছন্দ করে না। ভয়ও পায়। উনি নাকি যে-কোনও বিষয় নিয়ে কর্মীদের টেনশনে রাখতে ভালবাসেন। সলিল একটু সতর্ক হয়ে আমতা আমতা করে বলল, ঠিক বলেছেন স্যার।
—আঃ আমাকে অত স্যার, স্যার করবেন না।...আপনার পদবি যেন কী? দাসঘোষ

একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—আজ্ঞে সেনগুপ্ত। সলিল আবার ঘাবড়ে গেল। কাজের কথা শেষ, এবার ওর চলে যাওয়া উচিত।

—আই সি, আপনি বদ্যি। তার মানে ওপার বাংলা। বরিশাল নাকি?

মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত হলেও সলিল প্রসন্ন মুখে বলল, হ্যাঁ।

—তা হলে তো আপনি বাঁকুড়ার ঘোড়া সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ওটা তো অ্যাবসলিউটলি এপারের কালচার।

—জানি স্যার। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। আমি আমার বিয়েতে একজোড়া কালো ঘোড়া উপহার পেয়েছিলাম। নিজের বিয়ের প্রসঙ্গটা বলেই সলিল ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল। আজ মিঃ দাসঘোষকে কথায় পেয়েছে। বিয়ে শব্দটা নিয়েই হয়তো এক্ষুনি লোফালুফি খেলতে শুরু করবেন।

—আপনি কিস্যু জানেন না। পোড়া মাটির ওই অনুপম শিল্প শুধু চোখেই দেখেছেন, কিন্তু ভেতরে ঢুকেছেন কখনও!

সলিল এবার সত্যিই বোকা বনে গেল। কারুকৃতির ভেতরে ঢোকার ব্যাপারটা যে কী—ওর মাথাতেই এল না।

—দেখলেন, আপনি কত কম জানেন। কিংবা আদৌ জানেন না। শুনুন মিঃ সেনগুপ্ত, বাঁকুড়ার ঘোড়া বলে যে বিশ্বজয়ী পুতুলগুলোকে আমরা পয়েন্ট আউট করি সেগুলো তৈরি হয় পাঁচমুড়ায়। এ স্মল ভিলেজ অফ বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট। পাঁচমুড়া ছাড়া স্যান্দরা, সোনামুখী, রাজগ্রাম, কেয়াবতী মুরলু—এসব জায়গায়ও ঘোড়া-শিল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মজা কি জানেন, এই যে সব গ্রাম-ট্রামের নাম বললাম, সেখানকার ঘোড়াগুলোর প্রত্যেকের ক্যারেকটার আলাদা আলাদা। দেখলেই বোঝা যায়, এটা রাজগ্রামের তো ওটা সোনামুখীর। এর সঙ্গে ওর মিল নেই। এর মধ্যে আবার পাঁচমুড়া সকলকে ছাপিয়ে গেছে। আহা, কী ব্যঞ্জনা। দেখলেই মনে হয়, এক্ষুনি ছুটতে শুরু করবে মাঠ-ময়দান পেরিয়ে। আমার তো মশাই বাঁকুড়ার ঘোড়া দেখলেই ছোটবেলায় পড়া সেই ছড়াটা মনে পড়ে যায়, 'হাতির পিঠে হাওদা, ঘোড়ার পিঠে জিন/জলদি আও জলদি আও ওয়ারেন হেস্টিং।' হাঃ হা...

কিনতে হবে দু'জোড়া মাটির ঘোড়া, তার জন্যে এত বড় লেকচার শুনতে হবে সলিল মোটেই ভাবেনি। প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল। কিন্তু এঁদের সামনে টেম্পার লুজ করলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে মিঃ দাসঘোষকে তোল্লাই দিয়ে সলিল বলল, আপনি কত জানেন! স্যার, আপনার দেশ কি বাঁকুড়ায়!

দাসঘোষ ওর শেষ প্রশ্নটা না-শোনার ভান করে বললেন, শুনুন, আপনি কলকাতায় ফেরার পথে, বিষ্ণুপুর থেকে ওগুলো কিনে আনবেন। ওখানে হ্যান্ডিক্র্যাফটস্-এর বড় মার্কেট আছে। পাঁচমুড়ায় যাওয়ার দরকার নেই। ঠিক আছে তা হলে। আর আপনাকে আটকাব না। আসুন। পরে দেখা হবে। কেমন!

এমন দুম করে ঘোড়া-তত্ত্ব শেষ হয়ে যাবে সলিল ভাবেনি। মাথা নেড়ে ও হতভম্বের মতো দাসঘোষের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল।

দুই

শুক্রবার অফিস থেকে ঘন্টাদেড়েক আগে বেরিয়ে সলিল সোজা ধর্মতলা-এস্‌প্ল্যানেড অঞ্চলে চলে এসেছিল। উদ্দেশ্য ঃ হ্যান্ডিক্র্যাফটসের দোকানগুলো ঘুরে মাটির ঘোড়ার দামের হদিস নেওয়া। নিজের গাঁট থেকে ঠিক কত টাকা ঘোড়া কেনার জন্যে নিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা সলিল করতে পারছিল না। দাসঘোষ আচমকা কথা শেষ করে একরকম চেম্বার থেকে বেরই করে দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে টাকার কথাটা মাথায়ই আসেনি। অবশ্য এলেও সলিল টাকা চাইতে পারত কিনা সন্দেহ। কিন্তু দাসঘোষের তো উচিত ছিল ক্যাশ অফার করা! শখের কারুশিল্প তো আর বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না। বরং এ সব জিনিসের ভয়ানক দাম। ফিক্সড মাস মাইনের লোকেরা তো ইচ্ছে থাকলেও বহু সময় তা কিনতে পারে না। তার ওপর ওঁর পছন্দ লারজেস্ট সাইজের মাটির ঘোড়া। ভদ্রলোক কি ওই জোড়া-ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলে আপিসে আসবেন।

ওয়ার্কস কন্ট্রোলারের সঙ্গে কথা হওয়ার পরও হাতে দু'দিন সময় ছিল। কিন্তু সলিল পুনরায় ওঁর চেম্বারে গিয়ে টাকার কথাটা পাড়তে পারেনি। সবসময়ই মনে হয়েছে, দাসঘোষ বিশ্রী কিছু একটা ওর সম্পর্কে ভাববেন। কিংবা ব্যঙ্গ ঝরিয়ে হেসে বলবেন, স্ট্রেইঞ্জ, এই সামান্য জিনিস কেনার মতো টাকা আপনার কাছে নেই! আপনি কি ভাবছেন আমি ওগুলো নিয়ে টাকা দেবো না! ছিঃ ছিঃ, মিঃ সেনগুপ্ত আমাকে এতটা ছোট ভাববেন না। আজ আর কাল অফিসে আসার পর থেকেই সলিল চরম অস্বস্তিতে ভুগেছে। অথচ কাউকে বলতে পারেনি। এসব জানাজানি হয়ে গেলে চাপা হাসির স্রোত বয়ে যাবে। কেউ হয়তো ঠেস দিয়ে বলেই বসবে, 'শেষকালে ঘোড়ার তেল!' ভেতরে ঢুকে কেউই সলিলের সমস্যা ও সত্যি কথাগুলো বুঝতে চাইবে না।

অনেক চিন্তা করে সলিল দোকানে দোকানে দামের চেহারাটা দেখতে এসেছিল। কিছুক্ষণ আগে ও বাড়ি ফিরে এসেছে কিছুটা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে। দাসঘোষ যে-সাইজ চাইছেন, তার দাম কলকাতায় নীট পাঁচ হাজার টাকা। তার মানে এক জোড়া আড়াই হাজার। বিষ্ণুপুরের মার্কেটে হয়তো একটু কম হতে পারে। কিন্তু কত কম? সাড়ে চার হাজার কিংবা চার হাজার। এর নীচে কখনই নয়। এতগুলো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ওকে নিয়ে যেতে হবে। সাংঘাতিক অবস্থা। সেভিংস অ্যাকাউন্ট একেবারে খালি হয়ে যাবে। তাও এই পুজোর মুখে। রঞ্জনাকে বলতেই হবে। কিন্তু ও শুনলে আর রক্ষে রাখবে না। সলিলের বোকামি নিয়ে যা-তা বলবে। পুজোর বাজার সারবে বলে রঞ্জনা বেশ কয়েকমাস আগে থেকে কিছু থোক টাকা সরিয়ে রেখে দেয়। এখন সেটাতেই হাত দিতে হবে। অথচ রঞ্জনাকে লুকিয়ে টাকা তুলে নেওয়াও অসম্ভব। দুই কন্যার জননী খুব হিসেব করে চলে বলেই বেঁচে থাকাটা এখনও 'অর্থহীন' হয়ে ওঠেনি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঠিক চলে যাচ্ছে। এই চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব রঞ্জনার।

উদ্দেশ্যহীনভাবে চৌরঙ্গি, লিন্ডসে স্ট্রিট, নিউ মার্কেট ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে একটু রাত করে সলিল বাড়ি ফিরল। অন্যদিনের তুলনায় রাতই বলতে হবে। একটু পরেই

টিভিতে শুরু হবে ইংরেজি সংবাদ। ছোট মেয়ে তিথি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর দিদি তেরো বছরের বীথি দু'পায়ে ঘুঙুর পরে শোবার ঘরে নাচ প্র্যাকটিশ করছে। বাড়িতে ঢোকার পর থেকে রঞ্জনার সঙ্গে সলিলের এখনও কথা হয়নি। রঞ্জনা রান্নাঘরে রুটি তৈরিতে ব্যস্ত।

সলিল বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাওয়ার টেবিলের ওপরে টাঙানো তারে গামছাটা মেলছিল। রঞ্জনা টেবিলের ওপরে ঠক্‌ঠক্ করে কী একটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, তোমার ফিরতে এত দেরি হল যে! ইভনিং শো মেরে এলে নাকি? কিছু খাবে কি এখন?

—না। অফিসে কাজ ছিল। চেয়ারে বসতে বসতে বেশ গম্ভীর স্বরে বলল সলিল।

—গুল দিয়ো না। যেই আসতে দেরি হল, অমনি কাজ বলে চালিয়ে দিচ্ছ! আরে বাবা, আমি কি জানতে চাইছি যে তুমি কোন্ বই দেখে এলে! মেজাজ-মর্জি ভাল থাকলে রঞ্জনা এমন হালকা চালে কথা বলতে ভালবাসে। সলিলও ওর সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু আজ সলিল একদম সাড়া দিল না।

রান্নাঘর থেকে এক পাক ঘুরে এসে রঞ্জনা আবার বলল, কই, রা কাড়ছ না যে! কী হল!

এবার কঁকিয়ে ওঠার মতো করে সলিল বলল, একটা বিশ্রী প্রবলেমে পড়ে গেছি। পালানোর কোনও পথ নেই। চারিদিকে শুধু সমস্যা, সমস্যা!

—সমস্যা! সে কি গো! রঞ্জনা খুব সিরিয়াস হয়ে বলল। তারপর একটু ঝুঁকে সলিলের মুখের দিকে তাকিয়ে গলা সরু করে বলল, তোমায় অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? আমাকে বলো। সমস্যা যখন, তখন সমাধানেরও উপায় নিশ্চয় আছে।

মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে মাথার নাড়ল সলিল। তারপর অনেকটা অপরাধীর মতো মুখ করে মিঃ দাসঘোষের বায়নাক্কার বিষয়টা জানালো রঞ্জনাকে। সেই সঙ্গে টাকা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নিজেদের সমস্যাগুলো।

স্থির চোখে সব কিছু শুনল রঞ্জনা। তখনই কিছু বলল না। রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজগুলো সেরে এসে ও সলিলের পাশে বসল। বিরক্তি আর চিন্তায় সলিলের মুখের চেহারাটাই পাল্টে গেছে। খুব নরম গলায় রঞ্জনা স্বামীকে বলল, তুমি এত ভাবছ কেন! ঠিক আছে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবে। পুজোর কেনাকাটা নয় আর সাতদিন পরে শুরু করব। জিনিসগুলো ভদ্রলোককে এনে দিলেই তো উনি তোমায় টাকা দিয়ে দেবেন।

এত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে রঞ্জনা ব্যাপারটাকে গ্রহণ করবে সলিল ভাবতেও পারেনি। ও স্ত্রীর দিকে অবাক চোখে তাকাল। নীরবে বলতে চাইল, সত্যি বলছ!

—সব বিষয় নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ দুশ্চিন্তায় ডুবে যাওয়া তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। গলায় সামান্য রুক্ষতার ছোঁয়া লাগিয়ে রঞ্জনা বলল, কাল শনিবার, ব্যাঙ্ক বারোটায় বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু! খেয়াল থাকে যেন।

ভাল ছেলের মতো নীরবে মাথা নাড়ল সলিল। রঞ্জনার এই সহৃদয়া চেহারাটাকে এখনও ও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। শ্রীমতী সেনগুপ্ত অভিনয় করছে না তো!

এসব কি ওকে বেশ করে জলে খেলিয়ে ডাঙায় তুলে আছাড় মারার আয়োজন! সলিল বুঝতে পারল না। আসলে টাকা-পয়সার ব্যাপারে রঞ্জনা খুব হিসেবি এবং কখনও কখনও ভীষণ নির্মম। এক একদিন টাকা-পয়সা নিয়ে রঞ্জনার অতিরিক্ত সতর্কতা সলিলের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। পরে অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় সলিল বহুবার ভেবে দেখেছে, মাস-মাইনে দিয়ে সংসার চালাতে গেলে কাউকে না কাউকে শক্ত হাতে হাল ধরতেই হয়। জমা ও খরচের যে-কঠিন খেলাটা মধ্যবিত্ত জীবনের অঙ্গ, সেই খেলায় রঞ্জনাকে নামতেই হয়েছে। রঞ্জনা না-নামলে হয়তো সলিলকেই নামতে হত। প্রতিটি পরিবারের একজনকে খেলোয়াড় হতে হয়। বাধ্য হয়ে, চাপে পড়ে। কিচ্ছু করার নেই। ঘোড়া কেনার ব্যাপারটাতে রঞ্জনা বেঁকে বসতে পারত। নিজের গাঁটের পয়সা বের করে বস-এর জন্য ক্ষণভঙ্গুর মাটির ঘোড়া কিনতে যাওয়াকে রঞ্জনা যদি আহাম্মকি বলত, তা হলেও তর্ক করতে পারত না সলিল। শ্রীমতী যে কেন বলল না, সেটাই ওর কাছে আশ্চর্য লাগছে! বিস্ময়টাকে চেপে রেখে সলিল আলতো স্বরে জিজ্ঞেস করল, তোমার অসুবিধে হবে না তো! কী করব বলো। বিগ বসদের খেয়াল...

—অসুবিধে হবে কেন! দুর। রঞ্জনা মিষ্টি হেসে বলল, গরিবের ঘোড়া-রোগ হয় শুনেছিলাম। এখন দেখছি বড়লোকদেরও হয়। তুমি তো কাল একটা নাগাদ রওনা হবে, তাই না!

কোনও রকম হ্যাঁ বলে রঞ্জনার কথায় সলিল শব্দ করে হাসল, পাক্কা দু'দিন পরে।

আধঘণ্টা পরে খাওয়ার টেবিলে বসে আড়চোখে সলিলকে একবার দেখে নিয়ে বড় মেয়েকে রঞ্জনা বলল, শুনেছিস, তোর বাবা ঘোড়া কিনতে যাবে।

বীথি বড় বড় চোখ তুলে একবার বাবার দিকে, একবার মায়ের দিকে তাকাল। কিছু বুঝতে না-পেরে সলিলকে জিজ্ঞেস করল, বাবা, তুমি ঘোড়া কিনতে যাবে! কার জন্যে! কোথায় যাবে?

হাসি হাসি মুখ করে সলিল বলল, তোর মায়ের কথা বলার যা ছিরি।

—না, না, কী হয়েছে বলো। তুমি কিছু লুকোচ্ছ। বীথির গলায় আবদার ঝরে পড়ল।

সলিলকে আবার বলতে হল মিঃ দাসঘোষ এবং বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়ার কথা। তবে বেশ সংক্ষেপে। মেয়েকে যেটুকু না বললেই নয়, সেইটুকু।

ও থামতেই রঞ্জনা বলল, দেখলি, আমি কি মিথ্যে কথা, বাজে কথা বলেছি! তোর বাবা ঘোড়া কিনতে যাবে কি না বল!

চোখে ও গলার স্বরে কৃত্রিম রাগ ফুটিয়ে তুলে বীথি বলল, বাপি, আমাদের জন্যও পোড়া মাটির ঘোড়া আনতে হবে। তোমাদের অফিসের বড় কর্তারা বাড়ি সাজাতে পারেন, আর আমরা পারি না!

—অ্যাই, থাম। বড্ড পাকা পাকা কথা শিখেছিস! রঞ্জনা মেয়েকে চোখ পাকিয়ে ধমকাল। যদিও ওর ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির ঝিলিক।

এই মুহূর্তে গ্রাস তুলতে গিয়ে সলিল আবার ভাবনার গভীরে ডুবে গেল।

মিঃ দাসঘোষ কি নিজের বাড়ি সাজানোর জন্যে শিক্ষিত ঘোড়া কিনতে চাইছেন—এক্ষুনি বীথি যা বলল! অনেক কথা বলেছেন দাসঘোষ। কিন্তু একবারও বলেননি দু'জোড়া ঘোড়া ওঁর কেন দরকার। বাড়ির ড্রইংরুম সাজাতে তো এক জোড়াই যথেষ্ট। তা হলে! সলিল ধন্দে পড়ে গেল। টাকার কথাটা যেমন পাড়তে পারেনি, তেমনই সলিল মিঃ দাসঘোষকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে—স্যার এতগুলো ঘোড়া কী হবে! বাড়ি সাজাবেন বুঝি! নাকি, কাউকে উপহার দেবেন? পারপাসটা জানতে পারলে সলিল যেন অনেকটা স্বস্তি পেত।

—কি গো বাপি, তুমি কোনও কথা বলছ না যে! আমার আর বোনের জন্য ঘোড়া আনবে কি না বলো! বীথি দু'হাত ঝাঁকিয়ে বলল।

একটু আনমনে সলিল উত্তর দিল, আনব মা।

—আবার তোমার কী হল? রঞ্জনা জিজ্ঞেস করল।

—কিছু না। সলিল একটু থেমে জবাব দিল।

—চলো না, দু'-তিনদিনের জন্যে বিষ্ণুপুর ঘুরে আসি। কতদিন বেড়াতে যাইনি। মেয়ে দুটো বাড়িতে বসে বসে হেদিয়ে গেল। তুমি অফিসের কাজে মাসে অন্তত একবার এখানে ওখানে যেতে পাও। রঞ্জনার গলায় অনুযোগের ছোঁয়া।

—মা ঠিক বলেছে। বীথি তুড়ি মেরে মাকে সমর্থন করল।

ম্লান হেসে সলিল বলল, এবার নিয়ে যাব। পুজোর পরে। একটু শীত পড়ুক।

—আর তুমি গেছ! প্রত্যেক বছরই তো বলো। রুটি রাখার পাত্রটার ঢাকনা ঠকাস করে টেবিলে নামিয়ে রঞ্জনা বলল।

—মাটির ঘোড়া ছাড়া বিষ্ণুপুরে আর কিছু পাওয়া যায় না বাপি।

মেয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সলিল হঠাৎ রঞ্জনাকে বলল, ছেলেবেলায় একটা ছড়া শুনেছিলুম—গরিব মানুষ ফড়িং খায়/ঘোড়ায় চড়ে বাহ্যি যায়। তুমি শুনেছ' বীথি, তুই শুনেছিস?

মা ও মেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে সকৌতুকে তাকাল। সলিলকে আড়াল করে বীথি মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে মাকে ইঙ্গিত করল—বাবার মাথাটা একেবারেই গেছে।

তিন

মঙ্গলবার অফিসে এসে সলিল টের পেল ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। প্রোডাক্ট ডেলিভারির কাজে ও এই প্রথম বাইরে গেছিল—এমন তো নয়। প্রতি মাসেই যায়। বাইরের তিন-চারদিনের ট্যুর থেকে ফিরে এমন সহজভাবেই অফিসে ঢোকে। কেউ আলাদা করে খেয়ালই করে না। এটা সলিলের চাকরির অঙ্গ। কিন্তু এবারে ঘরে ঢুকেই ওর মনে হল, সবাই মুখ টিপে হাসছে। যেন আড়চোখে সবাই ওর দিকে একবার দেখে নিল। টেবিল গুছিয়ে বসার পরই ডেপুটি সেলস ম্যানেজার প্রবীণ সুখেন্দুবাবু একটু গলা চড়িয়ে বললেন, কী সলিলভায়া, মল্লভূমি জয় করতে পেরেছ তো।

সুখেন্দুবাবুর মতন কম কথার মানুষ আচমকা এইরকম ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন সলিল ভাবতেও পারেনি। কয়েক মুহূর্ত নিজেকে সামলে নিয়ে বোকাবোকা হেসে

সলিল বলল, হ্যাঁ দাদা, আজ সকালে ফিরেছি।

অনল যেন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসেছিল। সলিল চেয়ারে বসতেই ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে এসে বলল, পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে, বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে। ডবলিউ সি সাতদিনের ছুটিতে চলে গেছেন। এবার কী করবে! বাড়িতে আস্তাবল আছে? বড় লোকের ঘোড়া, ভাল দানাপানি দিতে হবে কিন্তু!

ভেতরে ভেতরে ভীষণ রেগে গেল সলিল। মিঃ দাসঘোষ ঘোড়ার বিষয়টা এইভাবে বাজারে ছেড়ে দিলেন! আশ্চর্য! অথচ নিজেই বারবার বলেছিলেন, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অবশ্য দাসঘোষের পি-এ রমেনবাবুরও কাণ্ড হতে পারে এই রটনা। সহকর্মীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বাধ্য হয়ে হজম করে নিয়ে সলিল আবার হাসল। সকলে যাতে শুনতে পায় এমনভাবে অনলকে বলল, সোজাসুজি তো বললেই পাবতিস, আমি তোদের জন্যও ঘোড়া এনে দিতাম।

—জানলে তো বলব? তোমার তো সব কাজেই সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার। সুখেন্দুবাবু বললেন।

—না দাদা, এটা বলবেন না! সলিল মৃদু প্রতিবাদ করল।

—যাক্ গে যাক্। যা হবার হয়ে গেছে। অনল বলল, আসুন আমরা সবাই সলিলদার অনারে গাই ঃ দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা...

প্রায় সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পুরো ব্যাপারটাকে সলিল অপমান ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারল না। অনলরা ঠাট্টা ইয়ার্কির সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মুখ গম্ভীর করে সলিল কাজে ডুবে যাওয়ার পথ খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু মন বসাতে পারল না কোনওমতেই। বাঁকুড়া ট্যুরের ব্রিফ রিপোর্ট লিখতে গিয়ে দু'বার ভুল হয়ে গেল। সলিলের কেবলই মনে হচ্ছে, এতদিনের পুরনো সহকর্মীরা ওকে আড়চোখে দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে। চাবুকের মতো বারবার একটা কথাই সলিলের মাথার ভেতরে আছড়ে পড়ছে, ব্যাপারটা সারা ডিপার্ট কী করে জানল! রমেনবাবু কি আড়ি পেতে শুনেছিলেন? তাই বা কীভাবে সম্ভব। মিঃ দাসঘোষের ঘরে সলিল যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ তো কেউ ঢোকেননি! সাহাকে কি তা হলে দাসঘোষই বলে দিয়েছেন! সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই সূত্রটা সলিল বের করতে পারল না। খানিকক্ষণ পর মাথার আগুন স্তিমিত হয়ে এল অনেকটা। সলিল বহুক্ষণ রাগ পুষে রাখতে পারে না। সহকর্মীদের দোষ নেই। বিষয়টা সব মিলিয়ে হয়তো সত্যিই হাস্যকর। ঠাট্টা-ইয়ার্কি করার মতনই ব্যাপার। অনলরা হয়তো অপমান করতে চায়নি। ওর আহাম্মকির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছে। সত্যিই আহাম্মকের মতো কাজ করে ফেলেছে সলিল। ছল-ছুতো করে দাসঘোষকে এড়িয়ে গেলেই পারত। কিংবা সবিনয়ে বললেই হত, স্যার, হ্যান্ডিক্র্যাফ্টস্ কেনার ব্যাপারে আমি একেবারেই আকাট। আমি কিনে আনতে পারি। কিন্তু আপনি সন্তুষ্ট হবেন না। মাঝখান থেকে...

উপরওয়ালাকে তুষ্ট করতে গিয়ে এমন বিপাকে পড়তে হবে সলিল স্বপ্নেও ভাবেনি। এখন নিজের উপরই রাগ হয়ে গেল।

টিফিন পিরিয়ডে সলিল পারচেজ ডিপার্টমেন্টে এসে বন্ধু রণজিতের টেবিল থেকে

ফোন করল রমেন সাহাকে। অনল বাজে কথা বলেনি। সত্যিই দাসঘোষ ছুটিতে গেছেন। লিভ ফর এ উইক। রমেন সাহাকে ঘোড়ার ব্যাপারটা বলতে বা কিছু জিজ্ঞেস করতে আর প্রবৃত্তি হল না। তা ছাড়া রিসিভারটা বেশিক্ষণ হাতে রাখাও মুশকিল। সেলসের কেউ দেখে ফেললেই চিত্তির। নিজের ডিপার্ট ছেড়ে অন্য ঘর থেকে লুকিয়ে ফোন করার অপরাধে আবার সহকর্মীরা ওকে ব্যঙ্গের ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দেবে।

রণজিৎ জিজ্ঞেস করল, কী রে, তোকে এমন চিন্তিত লাগছে কেন? তোর শরীর ভাল আছে তো!

প্রায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সলিল জবাব দিল, কিচ্ছু হয়নি। তারপর কয়েক সেকেন্ড ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থেকে হনহন করে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। অফিস থেকে কোথাও চলে যেতে পারলে সলিল বেঁচে যায়। এখানে এক মুহূর্ত ভাল লাগছে না। দু'দিন পরই সকলে ঘোড়ার ব্যাপারটা ভুলে যাবে। কিন্তু সলিলের মনে হচ্ছে একেবারে ফালতু একটা বিষয়ের সঙ্গে ও জড়িয়ে গেল। দাসঘোষ অতি বাজে লোক। অধস্তন সহকর্মীদের মান-সম্মান বজায় রাখার দিকে ওঁর এতটুকু নজর নেই। কোনও মনে হয়!

শোবার ঘরের খাটের তলায় ঘোড়াগুলো রাখা আছে। কোল বালিশের মতো মোটা চটের মোড়কে পুরে। বিষ্ণুপুরের কারুশিল্পের বাজারে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ঘুরে, খোঁজাখুঁজি করে সলিল ওগুলো কিনেছে। দরদাম করার চেয়ে, ও বেশি জোর দিয়েছিল জিনিসগুলোর আর্টিস্টিক কোয়ালিটির ওপর। সবচেয়ে বড় আবার সবচেয়ে সুন্দর। লাল ঘোড়ার জোড়াটা জয়দেব কুম্ভকার নামে এক তরুণের দোকান থেকে কিনেছিল। কাঠের গুঁড়ো আর খড় এবং পাতলা চট দিয়ে ঘোড়া দুটোকে প্যাক করতে করতে জয়দেব বলেছিল, এ একেবারে আসল পাঁচমুড়ার জিনিস বড়বাবু। যে-ঘোড়ার দেখবেন ন্যাজ আর কান আলগ, সেটিই জানবেন পাঁচমুড়ার। এই ঢঙের ব্যত্যয় হবার উপায়নি।

—দেখো, ভাই, খুব সাবধান, কান আর লেজ যেন না-ভাঙে। তা হলে সব পরিশ্রম বরবাদ হয়ে যাবে।

জয়দেব এক গাল হেসে বলেছে, মাটির জিনিস বাবু বড্ড ভাঙনমুখো। তবে একেবারে খাঁটি। মাটিতে কোনও ভেজাল নেই।...এত বড় ঘোড়া দিয়ে বৈঠকখানা সাজাবেন বুঝি!

—না হে। অন্য কাজে লাগবে। সলিল এক মনে ওর বাঁধাছাঁদা দেখতে দেখতে সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছে।

—খুব লম্বা-চওড়া ঘরের দু'কোণায় রাখবেন, দারুণ মানাবে। জয়দেব বলেছিল।

কালো ঘোড়ার জোড়া খুঁজতে গিয়ে এরপর যত হয়রানি। কোনও দোকানে সাইজ মতন নেই। শেষকালে খড়ের চালওয়ালা এক নগণ্য দোকানে পাওয়া গেল। একটু সস্তাও হল। তবে দোকানিটি প্যাকিং করে দিতে পারল না। সলিলকে আবার জয়দেবের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। তারপর খুব সাবধানে ট্রাকে চাপিয়ে বাঁকুড়ার ঘোড়া এসেছে

কলকাতায়। এত কষ্ট করে, গাঁটের পয়সা খরচ করে সলিল যদিও বা ঘোড়া নিয়ে এল, এখন মাল ডেলিভারি নেবার লোকটি উধাও। ওঃ কী গেরো! রগের দু'পাশটা টিপটিপ করছে। চিনচিনে ব্যথা। সাত সাতটা দিন ঘোড়া আগলে বসে থাকতে হবে ভাবলেই সলিলের মেজাজ একটু একটু করে চড়ে যাচ্ছে। লিফটে ও নেমে এল একতলায়। অফিস বিল্ডিং ও ফ্যাক্টরির মাঝখানে যে-বিরাট ভূমিখণ্ডটা অবহেলায় পড়ে আছে, তার ডান দিকের কিনারে একটা শিরিষ গাছের নীচে এসে দাঁড়াল সলিল। একটু দম নিয়ে ম্লান হেসে নিজেকেই নিজে গালাগাল দিল, তুমি শালা একটা পাঁঠা।

রাত আটটা নাগাদ রঞ্জনার সঙ্গে একচোট কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। মিঃ দাসঘোষ ছুটিতে গেছেন, ঘোড়ার প্যাকিংগুলো সাতদিন খাটের তলায় পড়ে থাকবে ইত্যাদি জানার পর রঞ্জনার মুখের চেহারা স্পষ্টতই পাল্টে গেছিল। ও মুখে কিছু বলেনি। তবে নীরব চোখে ভর্ৎসনা করে বলতে চেয়েছে ঃ সব কিছুর একটা সীমা আছে। সলিল অবশ্য বুঝতে পেরেছিল, রঞ্জনা রাগ পুষে রেখেছে। যে কোনও সময় বোমার মতো ফেটে পড়বে। ঠিক তাই। বীথির আবদারে টিভির মেট্রো চ্যানেলের একটা আধা-অ্যাডাল্ট অনুষ্ঠান চালিয়ে দিতেই রঞ্জনা চিৎকার করে উঠল, বীথি, তুই আবার ওই সব ন্যাকা-ন্যাকা প্রোগ্রাম দেখছিস! তোরে না বারণ করেছি। কে তোকে টিভি চালিয়ে দিল?

মায়ের আচমকা চিৎকারে ভয় পেয়ে বীথি আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, বাবা।

বসার ঘরের সোফা-কাম বেডে শুয়ে সলিল বাসি কাগজের ততোধিক বাসি খবরগুলোয় চোখ বোলাচ্ছিল। রঞ্জনা এ ঘরে প্রায় দৌড়ে এসে বলল, মেয়ে দুটোকে ষোলো আনার ওপরে আঠারো আনা করে দিচ্ছ তুমি। কেন তুমি টিভি চালালে! আমার কথার জবাব দাও।

রঞ্জনার গলার স্বর চিরে যাচ্ছে, সারা মুখ লাল, দু'চোখে আগুন। ঘোরালো পরিস্থিতি দেখে সলিল শান্ত গলায় বলল, ও দেখতে চাইল তাই। এতে অন্যায়ের কী হল!

—বাঃ, কেমন সহজ কথা! প্রাণ জুড়িয়ে গেল। প্রায় ছুটে গিয়ে টিভিটা বন্ধ করে এসে রঞ্জনা বলল, মেয়ে যদি এখন ব্লু ফিল্ম দেখতে চায় দেখাবে। ছিঃ, ছিঃ।...ওহো, তুমি তো এখন কলির কেষ্ট হয়েছ। যে যা আবদার করবে, চাইবে, করতে বলবে—সব মেটানোর জন্যে তুমি তো দু'পায়ে খাড়া। লজ্জাও নেই!

শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রঞ্জনা থেমে থেমে অনেক কিছু বলেছে। সলিল তার অনেকগুলো শোনেনি। কিছু শুনেছে। পাল্টা কিছু বলেছে। কথায় কথা বেড়েছে। সোফাটাকে বেড করে নিয়ে বসার ঘরে একলা শুয়েছে সলিল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। নানান সংকটের চিন্তাবর্তে কেবলই ও ঘুরপাক খাচ্ছে। রঞ্জনার সঙ্গে ঝগড়ার পরম্পরাগুলো আর মনে পড়ছে না। পুরো ঘটনাটাই যেন অবান্তর। সারা ফ্ল্যাট জুড়ে অদ্ভুত একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন চট, খড়, কাঠের গুঁড়ো আর পোড়া মাটির গন্ধ। রঞ্জনা কি জেগে আছে! ওর অসহ্য লাগছে কি এই গন্ধ! সলিল ভেবে পেল না।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে এসে রণজিৎ খবর দিয়ে গেলো, দাসঘোষকে ও গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। রণজিৎ এমন ঝড়ের বেগে চলে গেল যে সলিল বলতেই পারল না—ওঁর তো আগামী সোমবার আসার কথা। সাতদিন তো এখনও কমপ্লিট হয়নি! সলিল একটু অবাক হয়ে গেল। রণজিৎ ভুল দেখার ছেলে নয়। অফিসের সবাই প্রায় জেনে গেছে দেখে সলিল ওর এই ত্রিশঙ্কু অবস্থার কথা রণজিৎকে বলেছিল। তা হলে কি ঘোড়াগুলোর কথা মনে পড়াতে দাসঘোষ এসেছেন! হয়তো ওঁর বাড়ি-ঘরদোর পুজোর আগে নতুন সাজে সাজছে। ঘোড়া চারটে আজই নিয়ে গিয়ে জায়গা মতন বসাতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাই ছুটির মধ্যেই...।

ভেতর থেকে কেউ যেন ওকে ঠেলে তুলে দিয়ে বলল, যা ব্যাটা, এক্ষুনি ডবলিউ-সি-র কাছে চলে যা। এই সুযোগ।

প্রায় এক ছুটে তিনতলায় চলে এল সলিল। রমেন সাহাকে বলে সময় নেওয়া বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার মানসিকতাও হারিয়ে গেছে। সাহাকে প্রায় হতচকিত করে দিয়ে সলিল সোজা দাসঘোষের ঘরে ঢুকে এল।

দাসঘোষ কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছেন। ওকে দেখে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। সলিল বসল। হঠাৎ ওর হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। গেঞ্জি-জামা শুষে নিচ্ছে শরীরের ঘাম। সেই সঙ্গে রক্তও কি?

প্রায় তিন মিনিট চিবিয়ে চিবিয়ে আধা-ইংরেজি আধা-বাংলায় কথা বলার পর দাসঘোষ রিসিভার নামিয়ে মৃদু হেসে বললেন, বলুন মিঃ সেনগুপ্ত, আপনার জন্যে কী করতে পারি?

সলিল ভয়ংকর অবাক হয়ে গেল। কোনও করাকরির প্রত্যাশা নিয়ে তো ও আসেনি। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে সলিল বলল, স্যার আপনি শুনলাম ছুটিতে আছেন। সাতদিনের...

—ও ইয়েস। স্টেটস থেকে আমার শালী আর ভায়রা এসেছে। ওদের সঙ্গে একটু আগ্রায় বেড়াতে গেছিলাম। আজ সকালের ফ্লাইটে ফিরেছি। একটা জরুরি ফাইল এম. ডি.-কে দেওয়ার জন্য অফিসে আসতে হল। বাট স্টিল, আই অ্যাম অন লিভ।

কেমন যেন মরিয়া হয়ে সলিল বলল, বাঁকুড়া থেকে আপনার ঘোড়াগুলো নিয়ে এসেছি স্যার। যেমনটি চেয়েছিলেন। ওগুলো আপনাকে—।

—ঘোড়া! ওহো, হ্যাঁ। হ্যাঁ। দাসঘোষ মিষ্টি করে হাসার চেষ্টা করে বললেন, এক্সট্রিমলি সরি মিঃ সেনগুপ্ত, ওগুলোর আর দরকার নেই। শালীকে প্রেজেন্ট করব ভেবেছিলাম। কিন্তু ওরা অলরেডি কিনে ফেলেছে স্টেট গভর্নমেন্টের এম্পোরিয়াম থেকে। হাঃ, হাঃ পাঁচমুড়ার আসল ঘোড়া দিয়ে আপনি বরং আপনার ড্রয়িং রুম সাজিয়ে ফেলুন। ও কে। আসুন তা হলে।

মুহূর্তের জন্যে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গেল সলিলের। ও কোনওরকমে বলল, স্যার, স্যার...

দাসঘোষ ওর দিকে নিথর চোখে তাকিয়ে আছেন। নতুন চট, খড়, কাঠের গুঁড়ো আর পোড়া মাটির অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছে সলিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

প্রাণ-প্রাণ

মাত্র সাত মাস বয়েস। নরম তুলতুলে পালকের মতো শরীর। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। ঠিক যেন বেবিফুডের বিজ্ঞাপন-শিশু। পিনাকীর প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়েটির শৈশব, এর মতো এত করুণরঙিন ছিল না। মেয়েটি, যত দিন যাচ্ছে ততই যেন নিজের দিকে, সবাইকে টানছে। ওর অনভিপ্রেত জন্ম নিয়ে ক্ষোভ-হতাশা, ওর প্রতি অবজ্ঞা-উপেক্ষা একটু একটু করে কমে আসছে।

অন্তত পিনাকী নিজে সেইরকমই অনুভব করছে ইদানিং। যদিও লেবার রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের সেই ভয়ার্ত চিৎকার 'ন্-না—এ হতে পারে না'—এখনও বাতাসে কান পাতলেই পিনাকী শুনতে পায়, তবু...। আসলে সেদিন জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্নভঙ্গের ধাক্কা পিনাকী সহ্য করতে পারেনি। মেয়েটা হয়েছিল সকালের দিকে। লেবার রুমের বাইরে শাশুড়ি পিনাকীর দুই মেয়েকে নিয়ে বসেছিল বড় আশা নিয়ে। হাসি হাসি মুখে। উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, চঞ্চল পিনাকীকে শাশুড়ি দুবার বলেছে, বুঝলে বাবা, আমার মন বলছে, এবার ছেলে হবে। এবার কোল আলো করে নাতি আমার আসছে। তুমি চিন্তা করো না। একটু সুস্থির হয়ে বসো দেখি।

পিনাকী উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারেনি, এদিক ওদিক ঘুরছিল। লেবার রুমের নিশ্ছিদ্র দরজা দিয়ে কোনও আভাসই আসছিল না। এষাকে ট্রলিতে করে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে বয়স্কা নার্স বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, চিন্তা করবেন না। হার কনডিশন ইজ্ ভেরি গুড। অ্যান্ড নাউ সি ইজ রেডি। এটা না-কোনও খবর, না-কোনও আশ্বাস। এষা এই নিয়ে তৃতীয়বার সন্তানের জন্ম দিতে এসেছে। ভদ্রমহিলা যা বলেছিলেন, সেগুলো একেবারে আনকোরাদের বেলায় জানানো হয়। পায়চারি করতে করতে পিনাকী ভীরু মানুষের মতো ঘন ঘন ঈশ্বরকে ডেকেছে—হে ভগবান, এবার যেন ছেলে...।

সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার কিছু পরে দরজা অল্প ফাঁক হয়েছে। পিনাকীর হৃৎপিণ্ড বুকের খাঁচার ভেতর চল্‌কে উঠেছে। পিনাকী দ্রুত পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিল। দরজার ফাঁক থেকে মাথা বের করে আর একজন নার্স চোখ মট্‌কে শুধু বলেছিল, মেয়ে।

একটা নির্জীব, নিরপরাধ শব্দ পিনাকীর গায়ের ওপর বোমার মতো আছড়ে পড়েছিল। পিনাকী প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে বুকের কাছটা চেপে ধরে ও চিৎকার করে উঠেছে : 'ন্-না...।' এমনটা হতে পারে, পিনাকী ভাবেনি। ভাবতে চায়নি কোনও মতেই। তৃতীয়বারে ছেলে হবেই, হতেই হবে, না-হয়ে যাবে

কোথায়—এমন সব ভাবনা, অবাধ আশা পিনাকী গোড়া থেকেই করে আসছে। তৃতীয়বারের ঝুঁকিটা ও এইসব অন্ধ-আকাঙ্ক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিয়েছিল। অথচ কী হল! যা আগেই পেয়েছে এবং আর যা চায়নি—তারই পুনরাবৃত্তি। সেদিন পিনাকীর শাশুড়ি কাঁদতে কাঁদতে দুই নাতনির হাত ধরে চলে গেছিলেন। পিনাকী বিপদগ্রস্ত, অসহায় এক মানুষের মতো জন্মঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

অনেকক্ষণ ঘুম ভেঙে গেছে। পাশের ঘরে টুম্পা আর মাম্পি টিভি দেখছে। বেশ জোরে চালিয়ে দিয়েছে। হিন্দি সিরিয়াল। কী বুঝছে, ওরাই জানে। টুম্পার বয়স নয়, মাম্পিটার পাঁচ। টিভি চালানোর শব্দেই ছুটির দুপুরের ভাত-ঘুমটা ভেঙে গেল কিনা বুঝতে পারছে না পিনাকী। ঘুম ভাঙার পর থেকেই ছোটটার কথা মনের চারপাশে এসে জমা হচ্ছে। পিনাকীর ডানপাশে পিছন ফিরে শুয়ে আছে এষা। ছোটটাকে বুকের দুধ দিচ্ছে। ব্লাউজ আলগা, শাড়ি অবিন্যস্ত। মেয়েটার দুধ টেনে নেওয়ার চুকচুক শব্দ দু'-তিনবার শুনতে পেয়েছে পিনাকী। মেয়েটা জন্মাবার পর থেকে এই দীর্ঘ সাত মাস ধরে এষার সঙ্গে পিনাকীর সম্পর্ক সামান্য, তুচ্ছ কারণে নিয়ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় মেয়ের জন্ম পিনাকীকে যতটা চিন্তিত, উত্তেজিত, আশাহত করেছে, তার চেয়ে যেন অনেক গুণ বেশি করেছে এষাকে। এষার মেজাজ, এষার আচরণ সেই থেকে অসম্ভব খারাপ হয়ে গেছে। ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতো ফণা তুলে চরম বিরক্তিতে দিন কাটাচ্ছে এষা। মেয়েটাকে যেটুকু মাতৃস্নেহ ও আদর না দিলেই নয়, সেটুকুই শুধু এষা দিচ্ছে। মেয়েটা জন্মে যে-অপরাধ করেছে, তার শাস্তি একটু বেশি মাত্রাতেই ওর ওপরে নেমে আসছে। এতটা পিনাকীর ভাল লাগছে না। আবার এষার বাড়াবাড়ি নিয়ে কিছু বলতেও সাহস হচ্ছে না। এষা একটা মোক্ষম উত্তর তৈরি করে রেখেছে। কিছু বললেই বলবে : লজ্জা করে না! তোমার জন্যেই তো এটা এসেছে। তুমিই জোর করেছিলে! এখন আবার ভাল সাজছ! চুপ করো, চুপ করো। মুখ নেড়ো না।

দু'বার হাতটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েও ফিরিয়ে আনল পিনাকী। এষার পিঠে হাত রাখতে ইচ্ছে করছে। এষা কি ঘুমিয়ে আছে? পিনাকী ভালবাসার ছোঁয়া লাগিয়ে ডাকল, এষা, তুমি কি আবার ঘুমিয়ে পড়লে?

একটু নড়ে উঠল এষার যৌবনের শেষ রঙ-মাখা দেহ। কোনও সাড়া দিল না।

পিনাকী আল্‌গা ব্লাউজের তলা দিয়ে এষার পিঠে হাত ছোঁয়াল। সাতমাস পরে এই প্রথম স্ত্রীর দেহের স্পর্শ পেল পিনাকী। এষা নার্সিংহোম থেকে ফিরে এসে রুক্ষস্বরে বলেছিল, তুমি আমাকে একদম ছোঁবে না বলে দিচ্ছি! আর এসব ভাল লাগে না। দুটো মেয়েকে নিয়েই জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে গেল, তার ওপর আর একটা! তুমি আজ পর্যন্ত যা যা চেয়েছ, তার যখন কিছুই পাওনি, তখন আমাকেও আর দয়া করে চেও না। পিনাকী দারুণভাবে দমে গেছে। এষা সত্যিই এই ক'টা মাস ওর ইস্পাত-কঠিন অনিচ্ছাটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। দিন ও রাত্রির জীবনটাকে একটা হিমশীতল আচরণে বেঁধে নিয়েছে। অনেকটা বাধ্য ছেলের মতো পিনাকী মেনে নিয়েছে এষার অনাগ্রহী জীবনের সুর। না মেনে উপায়ও নেই। এষার কাছে পিনাকী একরকম হেরে গেছে। হাত বুলিয়ে দেওয়ার জন্যে হাতটা নাড়াতেই এষা ঠাণ্ডা গলায়

বলল, কী হল! হাতটা সরাও।

—তোমার রাগ এখনও পড়েনি! যা হয়ে গেছে, তাকে কি তুমি আর উল্টে দিতে পারবে! আমাদের কপালে এই লেখা ছিল...

—এখনও তুমি কপালের দোহাই দিচ্ছ! যা হয়েছে সব তোমার জন্যে। তুমি দোষী। হাত সরাও।

'তোমার জন্যে', 'তোমার জন্যে' শুনতে শুনতে পিনাকীর কান পচে গেল। প্রথম প্রথম বিনা প্রতিবাদে পিনাকী শুনেছে। এখন আর ভাল লাগে না। ভাঙা রেকর্ডের মতো একটা কথা বেজেই চলেছে। এখন প্রচণ্ড বিরক্ত হয় পিনাকী। ফলে এষার সঙ্গে বিশ্রী কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। ওদের দু'জনের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ চিৎকারে মেয়ে দুটো হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। কোনও কোনও দিন ভয়ে ত্রাসে মাম্পি কেঁদে ফেলে। যদিও পিনাকী ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছে, দোষটা ওরই। অন্তত জোর-জবরদস্তি করার কথা ধরলে। এষা কিছুতেই রাজি হয়নি। সতর্ক গলায় বারবার বলেছে, তোমার এই ছেলে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা ছেলেখেলা করে তুলো না। কী দরকার! এই তো বেশ আছ!

—তুমি এমন নির্লিপ্ত ভাব দেখাচ্ছ যেন তুমি ছেলে চাও না। মেয়ে নিয়েই খুশি! তাই কি? পিনাকী অভিমানের সুরে বলেছিল।

এষা করুণ চোখে হেসেছে। বলেছে, সব মেয়েই চায় ছেলে হোক। ছেলে হওয়ার সুখই আলাদা।

—তাহলে! তুমি এমন করে বাধা দিচ্ছ কেন?

—ইচ্ছে করে বাধা দিচ্ছি না। আসলে ভয়—আমার ভয় করে। দ্বিতীয়বারে আমরা তো দু'জনই কামনা করেছিলাম, একটা ছেলে। কী হল? বলো, সেই মেয়ে! এবারেও...

—দু'বার হয়েছে বলে কি এবারেও হবে। না, না। তুমি এমন ডেফিনিট হচ্ছো কেন?

—কোথায় ডেফিনিট হচ্ছি! শেষ পর্যন্ত কী হবে তুমিও জানো না, আমিও জানি না। কিন্তু ছেলে না-হয়ে আবার যদি মেয়ে হয়। আমি তো জানি টুম্পা আর মাম্পিকে নিয়ে এরই মধ্যে তোমার দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। হয়নি—বলো!

পিনাকী কিছু একটা ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়েছে। এষা স্বামীর কাছে সরে এসে বলেছিল, তাহলে, তুমি কেন ছেলেমানুষী করছ!

একটা অদম্য আবেগ পিনাকীকে অস্থির করে তুলেছিল। এষার দু'হাত মুঠোর মধ্যে ধরে পিনাকী বলেছে, তুমি যা-ই বলো, আমি কিন্তু একটা ছেলের স্বপ্ন দেখছি। তাকে আমার নিজের মতো করে তৈরি করব। এষা, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, তখন তো ওই ছেলেটাকে দেখেই আমার কথা তোমার মনে পড়বে!

এষা চুপ করে গেছিল। পিনাকীর সেন্টিমেন্ট ওকে থামিয়ে দিয়েছে। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এষা ওর এই সাইত্রিশ-আটত্রিশ বছরের জীবনে তৃতীয়বার সন্তান ধারণ করেছে। পিনাকী অপরিমেয় আশা ও আনন্দে সেই-ক'টা মাস বিভোর হয়েছিল।

একদিন এষা হঠাৎ বলেছিল, ইস্ যদি জানা যেত, এবার ছেলে না মেয়ে—তাহলে আর কোনও চিন্তাই থাকত না!

—জানা যায়। দু'-একটা জায়গায় এরকম মেসিন-টেসিন বসেছে। কিন্তু বড্ড খরচ। নানান ঝামেলা। পিনাকী বলেছিল, ওসব বড়লোকী ব্যাপার!

বড্ড খরচ শুনেও এষা অনুনয়ের সুরে বলেছিল, একবার দেখালে হয় না? কোথায় এসব হয়?

এষার আবদারে বেশ বিরক্ত হয়ে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল পিনাকী। সেদিনের ভর্ৎসনা আজ বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। এষা কিছুতেই সহজ, নরম, স্বাভাবিক হতে পারছে না। পিনাকী হাত সরাল না। দপ্ করে জ্বলে-ওঠা রাগটাকে চেপে রেখে গম্ভীর গলায় বলল, একই কথা বারবার বলো কেন? দোষ যদি কিছু হয়েই থাকে, সে তো আমার দায়। মেয়েটাকে বড় করার জন্য যা টাকাপয়সা লাগবে, সে সব আমিই দেব—তুমি নয়। আমার চেয়ে তোমার দুশ্চিন্তাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে নাকি? যা হবে আমি বুঝব।...তোমার বাড়াবাড়িটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বুঝলে!

প্রচণ্ড বেগে চিৎ হয়েই এষা সোজা উঠে বসল। ব্লাউজের বোতাম খোলা। অবনতমুখী দুটি স্তন অপসৃত যৌবনের স্মৃতি নিয়ে অতীত ইতিহাসের ঘণ্টার মতো ঝুলছে। ডানদিকের স্তনবৃন্ত ভিজে আছে। মেয়েটা ওখান থেকেই মাতৃস্তন্য টেনে নিচ্ছিল। খোলা চুল, ঘুমে ভারী হয়ে-আসা মুখ আর অর্ধ-বিবসনা শরীর---সব মিলিয়ে এষাকে বিশ্রী লাগছে। পিনাকী চোখ সরিয়ে নিল। এষা তীব্র কণ্ঠে বলল, তুমি আমাকে পয়সার খোঁটা দিচ্ছ! তুমি এতটা নীচে নেমে যেতে পারলে? আমি যা বলি, তা তো তোমার কষ্ট দেখেই বলি! তুমি শেষপর্যন্ত টাকার গরম দেখালে?

পিনাকীর কথার ভাঁজটা বুঝতে পেরে এষা একেবারে মূলে আঘাত করার চেষ্টা করছে। আর রাগটাকে চেপে রাখতে পারল না পিনাকী। ফেটে পড়ল পুরুষালী গর্জনে, হ্যাঁ বেশ করেছি, বলেছি।

—বেশ করেছ! ক্ষোভে, অপমানে এষার কণ্ঠস্বর সরু হয়ে গেল।

—আমি যদি মনে করি আরও একটা মেয়ে হবে, তাহলে তাই হবে।

—তুমি অমানুষের মতো কথা বলছ। জানোয়ারেরাও এইভাবে কথা বলে না... ছিঃ ছিঃ..।

—তোমার সঙ্গে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা উচিত ছিল।

—করতে আর বাকি রেখেছ! ছেলে চাই, ছেলে চাই করে নেচে আমাকে জন্তুর মতো জোর করে...। আমি তখনই জানতাম তুমি আবার দয়ে পড়বে। আমার জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ ভেঙে চুরমার করে দেবে। ঠিক তাই হল।

—বাজে কথা বলো না। আজ যদি ছেলে হত, তুমি এসব বলতে পারতে! তখন তো আমার এই দোষটাই হয়ে যেত গুণ। মেয়ে হওয়ার জন্যে তুমিও দায়ী।

—আমিও দায়ী? কী বলতে চাইছ তুমি?

বাবা-মা-র অস্বাভাবিক চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে টুম্পা আর মাম্পি ও-ঘর থেকে

দৌড়ে চলে এসেছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশে। একসঙ্গে। আর যার জন্যে পিনাকীর জীবন ও সময়, এষার সাধ ও স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়েছে, সে অয়েল ক্লথ ভিজিয়ে দেবশিশুর মতো আপনমনে হেসে খেলা করছে।
পিনাকী দুই মেয়ের ভীরু উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলছি। টুম্পা হওয়ার পর থেকেই তোমার ভিতরটা বিষিয়ে আছে। মেয়ে হোক—তুমি আগাগোড়াই চাও না। এর ফলে তোমার না-চাওয়ার বিষ ভ্রূণ থেকেই শোধ তুলে নিচ্ছে। বিষাক্ত গর্ভে তুমি ছেলের জন্ম আশা কর কীভাবে? এতটুক আনন্দ নেই, আশা নেই যেখানে..
—তুমি নিজের স্ত্রীকে, ছেলে-মেয়েদের মাকে এমন ভাষায়...
—চুপ্ করো, ছেলে-মেয়েদের মাকে...বলতে এতটকু বাধছে না? ছেলে কোথায় তোমার! আবার বলা হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের মা!
—ওটা কথার কথা। আমাকে তুমি...এষা ব্লাউজের বোতাম লাগিয়ে আঁচলটা বুকের ওপর তুলে দিয়ে তীব্র ঘৃণায় বলল, দোষ দিচ্ছ কোন্ গর্বে? তোমার নিজের পোড়া ভাগ্যটার দিকে একবারও তাকাচ্ছ না কেন? আজ পর্যন্ত কোন্ কাজটায় তুমি সার্থক হয়েছ বলতে পারো? ওনারশিপ ফ্ল্যাটে টাকা ঢাললে—সে টাকা চোট্ হয়ে গেল। সস্তায় জমি কিনতে গিয়ে ডাহা ঠকে এলে! টুম্পাকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করতে পারলে না। এখান থেকে একটা ভাল কোনও বাসা বাড়িতে উঠে যাবে, উঠে যাবে করছ আজ দু'বছর ধরে—পেরেছ? বলো, বলো ..। লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারছি না—একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে মেয়ে! লজ্জা লজ্জা...।
এষা মুখ ফিরিয়ে নিল। যে-ব্যর্থতা ও বোকামির জন্যে পিনাকী ভেতরে ভেতরে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, যেগুলো দগ্‌দগে ঘায়ের মতো, সেগুলোকেই এষা খুঁচিয়ে তুলল। অবাধ্য রাগ পিনাকীকে মুহূর্তে করে দিল এক বোধবুদ্ধিহীন দানবের প্রতিমূর্তি। সাঁড়াশির মতো দুটো হাত, এষার গলা লক্ষ করে, এগিয়ে নিয়ে এল পিনাকী। এষা এতটুকু নড়ল না, চিৎকার করল না। বিস্ফারিত চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করল—মানুষটা কে?
টুম্পা আর মাম্পি যদি সুতীব্র কান্নায় চরম-মুহূর্তটাকে খানখান করে না দিত, তাহলে কী-যে ঘটত—পিনাকী ভাবতে পারছে না। খুনে হাতদুটো ধীরে ধীরে নামিয়ে পিনাকী সরে আসতেই এষা কান্নায় ভেঙে পড়ল।
অসহ্য! অসহ্য! পিনাকী খাট থেকে নেমে এল। ক্রন্দনের হাহাকারে সারাটা ঘর ভরে উঠছে। এই অসহনীয় চার-দেওয়ালের মধ্যে একমাত্র দুখের শিশুটি, ওর অবুঝ দুটি কাজল কালো চোখ মেলে বুঝতে চেষ্টা করছে—কী হল। ওর চোখে জল নেই; কেবল নির্বাক বিস্ময়।
পিনাকী মেয়েটাকে বুকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে এল।

বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিল পিনাকী, তখনও বিকেলের ম্লান আলো চোখের অনুভবে ধরা দিচ্ছিল। সন্ধ্যা ও বিকেলের সন্ধিলগ্নে। এখন রাত্রি।

একটুর জন্যে ফাঁকা বাসটা পিনাকী ধরতে পারল না। কাঁধে বাচ্চাটা না থাকলে বাসটাকে দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলতে পারত। ছুটির দিন—এমনিতেই বাস কম। তার ওপর রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের থিয়েটার হলগুলোর শো ভাঙার সময় হয়ে গেছে। এবার বাসে বা ট্রামে ওঠা দুষ্কর হয়ে যাবে। হিতেনের বাড়ি থেকে মিনিট পনেরো আগে বেরোলে খুব ভাল হত। পিনাকী মেয়ের পিঠ চাপড়ে বলল, ঘুমিয়ে পড়ো মামণি, ঘুমিয়ে পড়ো। বাসে উঠে একদম কেঁদো না—কেমন!

নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে ঢোকার পর এই প্রথম মেয়েটা বাইরের জগৎ দেখছে। এষা ওকে জনসমক্ষে বের করতে চায় না। কেমন যেন লুকিয়ে রেখেছে। একটা অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে মেয়েটা বড় হচ্ছে। আজও হয়তো ওর বেরনো হত না—এষার সঙ্গে বিশ্রী ঝগড়া ওকে বাইরে এনে ফেলেছে।

এষা তখনও কাঁদছিল। শব্দ করে। মাঝে কান্না-শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় কী সব বলেছিল। পিনাকী বুঝতে পারেনি। শুনতে চায়নি। ও তখন প্যান্ট-শার্ট পরে বাইরে বেরোনোর প্রস্তুতি নিয়েছে। মেয়েটাকে জাঙ্গিয়া আর গোলাপী রঙের সুন্দর একটা বেবিফ্রক পরিয়ে দিয়েছে। নিঃশব্দে, কাউকে কিছু না বলে পিনাকী বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। তা আর হয়ে ওঠেনি। বাইরের দরজা খুলতেই টুম্পা এক হাতে চোখের জল মুছে জিজ্ঞেস করছে, বাবা, কোথায় যাচ্ছ!

পিনাকী থমকে দাঁড়িয়ে টুম্পাকে দেখেছিল। একরত্তি মেয়েটার অশ্রুসিক্ত চোখ, করুণ মুখ পিনাকীকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ওর চিবুক ছুঁয়ে আদর করে পিনাকী বলেছিল, একটু ঘুরে আসছি মা। কাঁদিস না। এখানে একদম ভাল লাগছে না। একটু পরেই চলে আসব। লক্ষ্মী সোনা, একদম আর কাঁদবে না, কেমন!

টুম্পা আর কিছু জানতে চায়নি। বাবার চলে যাওয়া দেখছিল একদৃষ্টে। মাম্পি দিদির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এষা ফিরেও তাকায়নি।

রাস্তায় বেরিয়েই মনে হয়েছিল হিতেনের বাড়ি থেকে আজ ঘুরে এলে হয়। সেদিন অনেক করে হিতেন আসার কথা বলেছিল। বেশ কয়েক মাস আগে মানিকতলা মার্কেটে হিতেন ভিড়ের মধ্যে পিনাকীর হাত চেপে ধরে বলেছিল, কী রে, তুই এখানে? বেশ আশ্চর্য হয়ে গেছিল পিনাকী। চোখ বড় বড় করে বলেছিল, হিতেন, তুই! কত বছর, কত দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল। আমি তো ভাবতেই পারছি না। বেশ মোটা হয়ে গেছিস তো!

হিতেন বাজার কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল, বামাল তোকে ধরে ফেলেছি। তোর বাজার তো বৈঠকখানা। এখানে কী করছিস?

ভিড় থেকে ফাঁকা জায়গায় সরে এসে দুই বন্ধু গল্প করেছে। স্কুল জীবনের বন্ধুত্ব বয়স বা সময় মানে না। চিরদিনের মতো সে সত্যি হয়ে যায়। বহু, বহুদিন পরে দেখা হলেও উচ্ছল হয়ে ওঠে দুটি মানুষ। হারিয়ে যাওয়া সেই বাল্য-কৈশোরকে ও-পার থেকে টেনে নিয়ে আসে এ-পারের জীবন। ক্ষণিকের সঙ্গসুখ ভরিয়ে দিয়ে যায় বন্ধুকে। পিনাকী আর হিতেন অনেক কথা বলেছিল। স্মৃতি-বিস্মৃতি, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার নানান অ্যালবামের পাতা উলটেছে দু'জনে। বাজারের ভিড়, চিৎকার,

ঠেলাঠেলি ওদের বাধা দিতে পারেনি। যাওয়ার সময় পিনাকীর হাতে হাত রেখে হিতেন প্রগাঢ় আন্তরিকতায় বলেছে, না-না, ওসব শুনতে চাই না। কবে আসছিস বল। তোকে কথা দিতে হবে। আমার বাড়ির লোকেশন তোর মনে আছে নিশ্চয়ই। মদন মিত্র লেনে সেই বাপ-ঠাকুরদার বাড়িতেই আছি। ছুটির দিন দেখে বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে আসবি। ওঃ অনেক কথা জমে আছে। স্কুলের প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র তোর সঙ্গেই এই প্রথম দেখা হল।

যাচ্ছি, যাব করে আর হয়ে ওঠেনি। এষার তখন অ্যাডভান্স স্টেজ। অফিস-বাড়ি করে, দুটো মেয়েকে সামলে, এষাকে সঙ্গ দিয়ে আর সময় থাকত না। মাঝে মধ্যে হিতেনের কথা মনে পড়েছে। ওই পর্যন্ত। তারপর তৃতীয় মেয়েটার জন্ম সমস্ত প্রকল্পনাকে ভেস্তে দিয়েছে। হিতেনের সংসর্গ পাওয়ার ইচ্ছেটা চাপা পড়ে গেছিল। আজ হঠাৎ কেন দিনাবসানের লগ্নে হিতেনের কথা মনে এল—পিনাকী ভেবে পায়নি। শ্যামবাজারগামী একটা 'এস' বাসে উঠে পড়েছিল।

মেয়েটা সেই থেকে ভীষণ শান্ত হয়ে বাবার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছে। হিতেনদের বাড়িতে খিদের জ্বালায় একবার কেঁদে উঠেছিল। পিনাকী বুঝতে পারেনি—বিব্রত বোধ করেছে। হাত বাড়িয়ে পরম মমতায় মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে হিতেনের বউ বলেছিল, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। বিকেলে দুধটুধ দিয়েছিল আপনার মিসেস? ইস্, কেমন ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছে দেখো। তোমরা একটু গল্প করো। আমি ওকে কিছু খাইয়ে আনি।

স্লিভলেস ব্লাউজ, ববকাট চুল, তাকানো, আর চলা-ফেরা দেখে হিতেনের বউকে দারুণ আধুনিক এক নারী ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। ওদের একটাই ছেলে—হস্টেলে থাকে। হিতেনের বউ একেবারে হাত-পা ঝাড়া। নিজের পরিচর্যা করার অঢেল সময় ওর হাতে। সেই তুলনায় এষা। পিনাকীর মন খারাপ হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলাকে সহজভাবে নিতে পারছিল না পিনাকী। অন্তত হিতেনের পাশে। সে-ই নারীই যখন মেয়েটার ক্ষুধার ভাষাহীন বেদনাটুকু অনুভব করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন পিনাকী অবাক হয়ে গেছে। নারীত্ব ও মাতৃত্বকে আর পৃথক বলে মনে হয়নি। মেয়েটা তখন থেকে শান্ত হয়ে আছে।

বিনা নোটিসে, বিনা খবরে পিনাকীর হঠাৎ আগমন, হিতেনকে অকৃত্রিম আনন্দ ও খুশিতে ভরিয়ে দিয়েছে। স্ত্রীকে বারবার বলছিল, ওঃ ডার্লিং, ইউ কান্ট ইমাজিন। পিনাকী আর আমার ছোটবেলার বন্ধুত্ব এখনও লিজেন্ড হয়ে আছে! আমরা দুম্ করে বড় হয়ে গেছি বলে। তা না-হলে তোমাকে দেখাতে পারতাম আমরা দু'জনে কী ছিলাম। তাই না বল?

পিনাকী মিটিমিটি হেসে সায় দিয়েছে। বাড়িতে যে-অশ্রুপ্লাবিত ঘরদোর ও নিরাশার হাহাকার ফেলে এসেছিল, সেগুলোকে একটু একটু করে ভুলে যাচ্ছিল পিনাকী। হিতেন ভুলে যেতে বাধ্য করছিল। ওর নানান গল্প, হারানো-কৈশোরের স্মৃতিকথা পিনাকীকে আবিষ্ট করে রেখেছে। উঠতে ইচ্ছে করছিল না। বন্ধুর সামনে লুকিয়ে রাখা ব্যথায় একটু একটু করে সুখস্মৃতির প্রলেপ পড়ছিল। তবু পিনাকী বলেছে,

এবার উঠি রে। রাত হয়ে যাচ্ছে! ছুটির দিন। বাস-টাস এমনিতেই কম। তার ওপর মেয়েটা আছে।

হিতেন কোনও ওজর কানে তোলেনি। খুব আন্তরিক স্বরে বলেছে, আর একটু বোস্ না বাবা। কী এমন রাত হয়েছে। যাবি তো শিয়ালদায়। ঠিক আছে, আমি তোকে গাড়ি করে পৌঁছে দেব'খন। বোস্, বোস্। আবার কবে আসবি।

—তুই তো আমার বাসায় গেলি না। আমি প্রথমে এলাম। বেশি রাত করলে ও আবার চিন্তা করবে। পিনাকী সামান্য হেসে বলেছে।

—আরে যাব, যাব!....তোর মতো চাকরি করলে আমি কবে একজন উৎকৃষ্ট সামাজিক জীব হয়ে যেতাম। ব্যবসা করলে বুঝতে পারতিস—শালার সময়ের পেছনে ছুটতে ছুটতে লাইফ হেল হয়ে গেল...সেই সুরি লেনেই আছিস তো। সিওর যাব। ঠিক আছে, তোর এই ছোট মেয়ের অন্নপ্রাশন কবে বল্? সেদিন অবশ্যই যাব। মেয়ের কিছু নাম রেখেছিস, নাকি মুখে-ভাতের দিন রাখবি!

—আমার শাশুড়ি তো ওকে বুড়ি বুড়ি বলে ডাকছে। আমরা এখনও কোনও নাম-টাম রাখিনি।

হিতেনের বউ বুড়ি নামটা শুনে প্রথমে 'এমা' বলে নাক কুঁচকেছে। তারপর মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে আদর করে বলেছে, এমন পিওনি ফুলের মতো সুন্দর, টুকটুকে মেয়ের নাম কিনা বুড়ি! দুর! ওর নাম হওয়া উচিত...

নামটা আর শোনা হয়নি। পিনাকী ঘড়ি দেখে চমকে উঠে বলেছে, এই দ্যাখ্, প্রায় সাড়ে নটা বাজে। আর না। এসো, মা-মণি। এবার বাড়ি যাব।

পিনাকী যা ভেবেছে তাই। লোক-বোঝাই হয়ে একটা থ্রি-সি বাই ওয়ান বিবেকানন্দ রোডের দিকে বাঁক নিল। ওর পেছনে আর একটা বাস। নম্বরটা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। আগেরটার চেয়ে আরও বেশি ভিড়। ট্রাফিক পেরিয়ে বাসটা দ্রুত মানিকতলার হকার্স কর্নারের গায়ে এসে থামল। কন্ডাক্টর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকছে : শিয়ালদা-মল্লিক বাজার-বেকবাগান-মিন্টো পার্ক-রবীন্দ্র সদন..আর কোনও বাস আসছে কিনা দেখল পিনাকী। কোনও চিহ্ন নেই। পরের গাড়িটাও একই চেহারা নিয়ে আসবে। রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের মুখটায় এখন প্রাইভেট বাসগুলোর মধ্যে থিয়েটার-প্রেমী যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতা চলছে। রাস্তা আটকে ওরা এখন লড়াই করবে। পিনাকী জানে তাই দরজার মুখটায় জমে-থাকা ভিড় ঠেলে মেয়েটাকে সন্তর্পণে চেপে ধরে এই বাসটাতেই পিনাকী উঠে পড়ল।

দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়াই মুশকিল। একটা অদ্ভুত ঘনত্বে বাসের ভিতরটা ভরে আছে। মেয়েকে একটু জোর করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই পাশের লোকটি ভুরু কুঁচকে বললেন, বাচ্চা নিয়ে এই গাদাগাদিতে কেন উঠলেন মশাই? পরের বাসটায় চান্স নিলে পারতেন। লোকসংখ্যা যা বেড়ে চলেছে! আপনি এ পাশটায় একটু চেপে নিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ...

পিনাকী পিছন থেকে একটু চাপ দিতেই কে যেন বলল, বাচ্চাটাকে, যারা বসে আছে, তাদের কারুকে ধরতে বলুন না। এভাবে দাঁড়িয়ে যেতে পারবেন না দাদা! আচমকা

ব্রেক মারলেই পড়ে যাবেন।

—কী করি বলুন তো! যেতেও হবে, আবার মেয়েটারও কষ্ট! পিনাকী অসহায় গলায় বলল।

চারজনের লম্বা সিটটায় যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ একজন পিনাকীর সঙ্গে অন্য ভদ্রলোকের কথোপকথন শুনে থাকবেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, বাচ্চাকে আমার কাছে দিন দাদা!

দয়াপরবশ হয়ে কে ওর কনিষ্ঠ কন্যাটিকে আশ্রয় দিতে চাইছে পিনাকী দেখতে চেষ্টা করল। বাসটা খুব জোরে যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই থেমে গিয়ে প্যাসেঞ্জার তুলছে। সামনের দুই ভদ্রলোকের ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে আর একবার দেখার চেষ্টা করার আগেই ভদ্রলোক সিট ছেড়ে অর্ধেক উঠে মেয়েটাকে পিনাকীর কাঁধ থেকে তুলে নিলেন। পিনাকীর চেয়ে বয়সে বড়। প্রশস্ত কপাল। একরঙা হাওয়াই শার্ট পরিহিত। ঠোঁটের ওপরে ছড়ানো গোঁফ আর লম্বা নাক। মুখের কোথায় যেন কৌতুকের রঙ লেগে আছে। ভদ্রলোক চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদবে না তো!

পিনাকী মাথা নেড়ে বলল, না, না, খুব শান্ত!

মেয়েটা চোখ মিটমিট করে ভদ্রলোককে দেখছে। আশ্চর্য, এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি! এবার হয়তো ঘুমোবে---বাসের দুলুনি, জানলা দিয়ে আসা হাওয়া আর ভদ্রলোকের দুই হাঁটুর ওপরে নিশ্চিত শয্যা-- সব মিলিয়ে ঘুম নেমে আসবে ওর অবোধ নিষ্পাপ চোখে।

—হ্যাঁ মশাই, অ্যা-টা করে দেবে না তো! ভদ্রলোক গুছিয়ে বসে হাসতে হাসতে বললেন।

নির্দোষ রসিকতায় আশপাশের সবাই হেসে ফেলল। পিনাকী কিছু বলার আগেই কে একজন বললেন, বেগ চেপে গেলে মশাই বড়রাই গ্যারেন্টি দিতে পারে না, বাচ্চারা তো কোন্ ছার!

প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা পড়ে গেল। আবার সেই গুমোট, ভিড় ঠেলাঠেলি। একটু সুবিধামতন, একটু আরামে দাঁড়ানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস।

এখন হালকা লাগছে। মেয়েটা যে একটু আগেই কাঁধ জুড়ে ছিল মনেই হচ্ছে না। এইভাবে বাচ্চা নিয়ে গাড়িতে ওঠার অভিজ্ঞতা খুব সম্ভবত এই প্রথম। টুম্পা বা মাম্পির বেলায় এমন ভিড় বাসে দুধের শিশু নিয়ে পিনাকী কখনও উঠেছে বলে মনে করতে পারল না। ওঠার চেষ্টা করলে এষাই বাধা দিত। ট্যাক্সি বা রিকশার খোঁজ করতে হত পিনাকীকে। সবচেয়ে বড় কথা বাচ্চা থাকত এষার কোলে। পিনাকীর হাতে কিছুতেই দিত না এষা।

টুম্পা আর মাম্পি এতক্ষণে হয়তো শুয়ে পড়েছে। ছোট বোনটার কথা ভেবে টুম্পা হয়তো জেগে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু এষা দেয়নি। কাল সকালেই আবার স্কুল। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেলে স্কুলের বাস ধরতে পারবে না। মাম্পিটা বড্ড সরল। কেমন যেন একা একা থাকতে ভালবাসে। কোনও বায়নাক্কা নেই, আবদার করে না কোনও মন-ভোলানো জিনিসের জন্যে। ইদানিং দুটো মেয়েই এষাকে দারুণ ভয় পায়।

মারের ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। পিনাকীর সংসারে যে একটা নিরানন্দের হাওয়া দক্ষিণ-উত্তর, উত্তর-দক্ষিণ করছে, তা ওরাও কীভাবে যেন অনুভব করতে পারছে। অথচ এসব পরিস্থিতিগুলোকে বুঝে ফেলার মতো বয়স ওদের হয়নি।
ঝুলে থাকা রডটা সজোরে চেপে ধরল পিনাকী। বাসটা হঠাৎ জোরে ব্রেক কষল। 'কী হল ভাই, মাল খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছ নাকি!' 'এই যে কন্ডাক্টর, আমরা বাড়ি যেতে চাই ভাই, হাসপাতালে নয়,' 'এমন করে ব্রেক মারে! ওঃ ড্রাইভারটা কি মানুষ!' 'শালা, যখন যাচ্ছে না তো যাচ্ছেই না, যখন যাচ্ছে...' ইত্যাদি বাক্য-বাক্যাংশ সবিক্ষোভে সারাটা বাসে ছড়িয়ে গেল। বাচ্চাটার কিছু হল না তো!—পিনাকীর মনে এমন একটা দুর্ভাবনার হিল্লোল ওঠা এই মুহূর্তে উচিত ছিল। বাসটা যেভাবে থেমেছে তাতে সবাই সন্ত্রস্ত। প্রাণের গোড়া পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটার বদলে এবার মুখ মনে পড়ে গেল। জীবনের যাত্রাপথের ওপর এষা যেন নিয়ত পড়ে যাচ্ছে। শক্ত পায়ে, সব কিছুকে সহজভাবে মেনে নিয়ে কিছুতেই দাঁড়াতে পারছে না। অথচ এষা বুদ্ধিমতী, এষার অনুভূতি পিনাকীর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে গিয়েও আলো জ্বালাতে পারে। তবু কেন যে এই বিপর্যয়টাকে এমন বড় করে দেখছে ও—পিনাকী বুঝতে চেষ্টা করেছে অনেকবার। বিকেলের ঝগড়াটা এমন কুৎসিত পর্যায়ে চলে গেছিল। সবচেয়ে আপন মানুষটার সঙ্গে ওইসব নোংরা ভাষায় আমি কথা বলতে পারলাম! পিনাকী নিজের ভেতর তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল! এষা যা বলছিল তা চুপ করে শুনলে কোনও ক্ষতি হত না। মাথা গরমের বদলে সহানুভূতি জানানো যেত। কী লাভ হল এসব করে! যন্ত্রণা তো এতটুকু কমল না, বরং বেড়ে গেল। এষা হয়তো এখনও কাঁদছে। বাড়ি ফিরে প্রথমেই এষার চোখের জল মুছিয়ে দেবে পিনাকী।
তারপর অবিরত ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর বাড়িটা পেরিয়ে আসার পরই পিনাকীর মনে হল কী যেন নেই, কী যেন নেই! পিনাকী থমকে দাঁড়াল। আরেঃ! মা-মণি কই! মা-মণি...! পিনাকীর সমস্ত শরীর রক্তশূন্য রোগীর মতো টলে গেল। এ আমি কী করলাম! মেয়েটাকে বাসের মধ্যে ফেলে রেখে এসে নিজে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি! কী করে এত বড় ভুল হল, হে ভগবান! এখন কী করব?—পিনাকী গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে গেল। চেনা রাস্তা, চেনা বাড়ি-ঘরদোর অপরিচিত লাগছে। শঙ্কিত হাওয়া, বাড়িগুলোর দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে, পিনাকীর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। পাগলের মতো পিনাকী বড়রাস্তার দিকে দৌড়ে এল।
গলির মুখটায় একটা মাঝারি সাইজের বেঞ্চের উপর বসে ধনঞ্জয়, প্রিয়নাথ, গদাই এবং আরও কয়েকজন গল্প করছে। ওরা প্রত্যেকদিন এখানে বসে থাকে। বেঞ্চটা প্রিয়নাথের। এখান থেকে দশ-বারো হাত দূরে যে-লন্ড্রিটা আছে, সেখানেই বেঞ্চটা দিনের বেলায় তোলা থাকে। দোকানটা প্রিয়নাথদের। সাড়ে-সাতটা, আটটা নাগাদ বেরিয়ে আসে রাস্তায়। প্রিয়নাথদের গড় বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ! প্রায়

যৌবনোত্তীর্ণ, তবু ওদেরকে চনমনে যুবকদের মতো লাগে। পাড়ার সবাইকে ওরা অল্পবিস্তর চেনে। কাজ থেকে ফিরে এসে এখানের এই আড্ডা ওদের মানুষ চিনতে সাহায্য করে।

উদ্‌ভ্রান্ত পিনাকীকে ঝড়ের বেগে দৌড়ে যেতে দেখে গদাই আশ্চর্য হয়ে বলল, ওই দ্যাখ্‌, ওই দ্যাখ্‌! পিনাকী রায় দৌড়োচ্ছে কেন রে! কী ব্যাপার বল্‌ তো!

সবাই ঘুরে তাকাল। প্রিয়নাথ চট্‌ করে উঠে এসে জোরে ডাকল, ও পিনাকীদা, কী হয়েছে? কী হল...! ছুটছেন যে! ও পিনাকীদা...

—আমার মেয়ে...ছোট মেয়েটা কোথায় গেল? ভাই, আমার মেয়ে...। বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পিনাকী কান্না জড়ানো গলায় আর্তনাদ করে উঠল।

বেঞ্চি খালি করে উঠে এল সবাই। একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে, পিনাকীর ছুটন্ত শরীর সেই অপঘাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছে—এটা ওরা বুঝতে পারল। ধনঞ্জয় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, কী হয়েছে...আপনার ছোটমেয়ে হারিয়ে গেছে? আপনি তো এইমাত্র পাড়ায় ঢুকলেন! ছোটমেয়েটার বয়স কত! বাড়ি থেকে একা একা বেরিয়ে গেছে কি?

পিনাকী গভীর বেদনায় ভেঙে গিয়ে বলল, ন্‌-না।

—তা হলে! কী হয়েছে আপনার মেয়ের! প্রিয়নাথ বেশ অবাক হয়ে গেল। পিনাকীকে ও লন্ড্রির সূত্রে ভালরকম চেনে। ভদ্রলোককে এই মুহূর্তে খুব অদ্ভুত লাগছে।

কী উত্তর দেবে পিনাকী! এত বড় ভুল কোনও পিতা করতে পারে—একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। একটা জলজ্যান্ত কচি বাচ্চাকে ছাতা-ব্যাগের মতো বাসে ফেলে চলে এসেছে! ওরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। প্রিয়নাথদের মধ্যে যারা বিবাহিত, যারা পিতৃত্বের স্বাদ পেয়েছে, তারা পিনাকীকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্যতম প্রাণী বলে ভাববে। কেউ কেউ এর পেছনে জঘন্য অমানবিকতার গন্ধ পাবে। অথচ পিনাকী ইচ্ছে করে করেনি। একটা সুবিস্তৃত ভুল আর অন্যমনস্কতার জাল ওকে বাসের মধ্যে ছেঁকে ধরেছিল। এন আর এস হাসপাতালের সামনে বাস থেকে পিনাকীর নামার কথা। অর্থাৎ ফ্লাইওভারের এ-প্রান্তে। উল্টো দিকের ফুটপাত ধরে একটু হাঁটলেই সুরি লেন। কী যে হল—মন-হারিয়ে-যাওয়া পিনাকী ও-প্রান্তে নেমে পড়েছে। কন্ডাক্টর ছেলেটি অনবরত চেঁচাচ্ছিল : শিয়ালদা ইস্টিশান, শিয়ালদা ইস্টিশান...লামুন, লামুন...। ভুল স্টপে নেমে ফ্লাইওভারের পাশ দিয়ে দিয়ে হেঁটে এসেছে পিনাকী। এতটা পথ। তবু খেয়াল হয়নি, মুহূর্তের জন্যে মনে পড়েনি মেয়েটা কাঁধে বা কোলে নেই। ওর সত্তা বিবাগী সন্ন্যাসীর মতো সব কিছু ভুলে পথ চলেছে। আবার সেই ভুল! এবার একেবারে পরিমাপহীন, অন্তবিহীন। সমস্ত চেতনা কোন্‌ বিধ্বংসী চিন্তায় তখন আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল!—পিনাকী মনে করতে পারল না। চোখের জল কোনও রকমে ধরে রেখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে সব বলল পিনাকী।

—সে কী! কত নম্বর বাস? টিকিটটা আছে? দেখি! দেখি! গদাই হাত পাতল।

পকেট হাতড়ে পিনাকী টিকিট খুঁজে পেল না। ভাঙা গলায় বলল, দু'শো কত নম্বর যেন, ঠিক মনে নেই...। রবীন্দ্রসদন যাবে বলছিল...।

—আরে দুর! হাজারটা বাস রবীন্দ্রসদন যাচ্ছে! এক্‌জ্যাক্টলি না বললে হয়! খুঁজবেন কী করে? গদাই স্পষ্টতই বিরক্ত হল।
—ছাড়, ছাড়। চলুন চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে গবেষণা না-করে মৌলালির মোড়টায় চলুন। ওখানে হয়তো সেই ভদ্রলোক বাস থেকে নেমে আপনাকে খুঁজছে। প্রিয়নাথ বলল। তোরা এখানে থাক। যদি কেউ খোঁজ দিতে আসে...
—আমি তোদের সঙ্গে যাব? ধনঞ্জয় আগ্রহ দেখাল।
—হ্যাঁ, আয়। প্রিয়নাথ হাত ধরে ধনঞ্জয়কে টেনে নিল।
—বাড়িতে একটা খবর দিতে হবে প্রিয়বাবু। পিনাকী কাঁচুমাচু মুখ করে বলল। কেউ ওর কথায় পাত্তা দিল না। বাড়িতে খবর দেওয়াটা জরুরি বলে মনে করল না কেউ। বরং গদাই দাত খিঁচিয়ে বলল, আগে খুঁজে আসুন না মশাই। বাড়ি তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ও দিকে মেয়েটা যে গায়েব হয়ে যাবে! যা ভুল করেছেন না... একেবারে জব্বর!

মৌলালি। মৌলালি থেকে জোড়া গির্জা। তারপর নোনাপুকুর। তীরের বেগে হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়নাথ, ধনঞ্জয় আর পিনাকী এই পর্যন্ত চলে এসেছে। রাস্তার এপার-ওপারের বাসস্ট্যান্ড, বাস স্টপে অল্পবেশি মানুষজন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত ভদ্রলোক কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। মা-মণিকে কোলে নিয়ে অপেক্ষা করে নেই পিনাকীর জন্যে।
—কী হবে প্রিয়বাবু! মেয়েটাকে.. । পিনাকীর গলা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল।
—আঃ, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আরে ঠিক পেয়ে যাবেন। ভেঙে পড়বেন না। অস্বস্তিটা চেপে রেখে প্রিয়নাথ সান্ত্বনা দিল।
ধনঞ্জয় একটু ইতস্তত করে বলল, এভাবে হেঁটে খোঁজাটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। তার চেয়ে সিধে রবীন্দ্রসদনের দিকে চল্—বুঝলি প্রিয়। পিনাকীবাবু যা বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে দুশো তিরিশ নম্বর বাসটাস হবে। বাস গুমটিতে যদি মেয়েটাকে জমা দিয়ে গিয়ে থাকে...
—সে-ই ভাল! সামান্য আশার আলো দেখতে পেয়েছে, এমনভাবে সোৎসাহে বলল প্রিয়নাথ, পিনাকীদা চলুন। একটা বাস ধরে নিই।
—তার আগে ভাই আমার স্ত্রীকে খবরটা দিতেই হবে। আমি সেই বিকেলবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। ও নিশ্চয়ই দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে এতক্ষণে। না, না, ওকে এক্ষুনি জানাতেই হবে।... এত রাতে বাড়ি ফিরে আপনাদের বউদিকে কী বলব! প্লিজ, প্রিয়বাবু, একটা ব্যবস্থা করুন! পিনাকী কাতর স্বরে অনুনয় করল।
একটু ভেবে নিয়ে প্রিয়নাথ ধনঞ্জয়কে বলল, তুই শোন. একটা ট্যাক্সি নিয়ে যেভাবে হোক চলে যা। পিনাকীদার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে আয়।
ধনঞ্জয় মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই মুখের সামনে হাতের আড়াল দিয়ে প্রিয়নাথ নীচু স্বরে বলল, দেরি করিস না। পিনাকীদা একদম ভরসা পাচ্ছেন না। দারুণ ভয় পেয়ে গেছেন। ভদ্রমহিলাকে সব বলবি আর যত তাড়াতাড়ি পারিস দুশো তিরিশের

বাস গুমটিতে চলে আসবি। কেমন! যা, চলে যা।

মল্লিক বাজারের দিকে ট্যাক্সি ধরতে এগিয়ে গেল ধনঞ্জয়। প্রিয়নাথ ঘড়ি দেখল। দশটা তেত্রিশ।

কলকাতার বুকে নির্দয়, নির্বিকার রাত্রি নামতে এখনও দেরি আছে।

জানলার পর্দা সরিয়ে এষা আবার গলির দু'পাশটা দেখল। সত্যি! মানুষটা তো আচ্ছা পাগল! এত রাত হয়ে গেল, এখনও রাগ পড়েনি! দীর্ঘশ্বাস ফেলে এষা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এরকম অবুঝপানা করার কোনও মানে নেই। মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার ছিল! তোমার রাগ হয়েছে, তুমি রাস্তায় রাস্তায় ঘোরো গে...। যা খুশি করো। কিন্তু ওই দুধের মেয়েটা কী দোষ করেছে! মেয়েটা নিশ্চয়ই কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষণে ওর তিনবার দুধ খাওয়া হয়ে যেত। এষার বুকের ভেতরটা মৃদু ব্যথায় চিন্‌চিন্ করে উঠল। আজ বিকেল থেকে মানুষটার বোধশক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে।

রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল এষার। মানুষটা শেষকালে কিনা মারার জন্যে হাত ওঠাল! এষা স্বপ্নেও কখনও চিন্তা করেনি। এরপর এষাই তো চলে যেতে পারত! সে রকম পরিস্থিতিই তো সৃষ্টি হয়েছিল। তার জায়গায় উনি গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। বাঃ রে, রাগ হল একজনের, অথচ রাগ দেখাচ্ছে অন্যজন! এষার চোখ দুটো গভীর অভিমানে ভিজে গেল। এইভাবে জানলার ধারে গভীর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে বসিয়ে রাখার কোনও মানে হয়!

কিছুক্ষণ আগে বাড়িতে ঢোকার দরজার সামনে এষা দাঁড়িয়েছিল। মুখটা যতটা সম্ভব সহজ করে লোকজনের আসা যাওয়া দেখেছে। পিনাকী আর ছোটটার জন্যে যে দুশ্চিন্তা, তাকে আড়ালে রাখতে চেয়েছে এষা। কাউকে বুঝতে দিতে চায়নি। তবু দু'-একজন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছে। কিছুক্ষণ আগে বাড়িওয়ালার সেজ মেয়ে রত্না সান্ধ্য অভিসার শেষ করে ফিরল। উগ্র সাজ, চড়া সেন্টের গন্ধ আর সুতীক্ষ্ণ চাহনি মেলে রত্না হেসে জানতে চেয়েছে, কী বউদি, কার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ? টুম্পার বাবার জন্যে নাকি...

ইয়ার্কিটাকে হাল্‌কাভাবে নিয়ে এষা বলেছিল, আমাদের বুঝি এমনি এমনি দাঁড়াতেই নেই?

—না, না, তা কেন! তবে কে আর রাতদুপুরে এমনি এমনি দরজার সামনে দাঁড়ায় বল? কারুর জন্যে না-দাঁড়ালে পোষাবে কেন বউদি! রত্না কটাক্ষে আবছা নোংরামির ঝিলিক তুলেছিল।

এষা হাসি বন্ধ করে একটু গম্ভীর স্বরে বলেছে, সব কথাতেই তোমার ছ্যাবলামি। বলছি তো এমনি দাঁড়িয়ে আছি!

রত্না এষার গাম্ভীর্যকে এতটুকু গুরুত্ব না দিয়ে বলেছিল, উঁহু! ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তোমার মুখ বলে দিচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই পিনাকীদার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ। ঝগড়া-ঝাঁটি করেছিলে নাকি!

অর্থপূর্ণ এক টুকরো হাসি এষার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে রত্না ওপরে চলে গেছে। রত্নাদের

মতো এমন তুখোড় ও চতুর মেয়েদের চোখে ফাঁকি দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এরা যে-কোনও আবরণকে চিনে ফেলতে পারে। এষার বিশ্রী লাগছিল। রত্না খারাপ কিছু হয়তো ভাবল। এষা চলে এসেছে। সেই থেকে আর সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়নি। জানলার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। এই চারবার। মানুষটা এখনও এল না! আশ্চর্য!

টুম্পা আর মাম্পি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নটা নাগাদ এষা ওদের খাইয়ে দিয়েছে। ওরা ভয়ে ভয়ে বাবা আর বোনের কথা জিজ্ঞেস করেছে। এষা রাগ দেখিয়ে বলেছে, আমি কিছু জানি না। বাবা ফিরে এলে তাকেই জিজ্ঞেস কোরো—বাবা কোথায় গেছিলে? আমাকে আর তোমরা জ্বালিও না। যাও, শুয়ে পড়ো। মনে থাকে যেন, কাল সকালে স্কুল আছে। ঘুম না-ভাঙলে মেরে পিঠের ছাল তুলে দেব। যাও...।

এষা মুখ ঘুরিয়ে ঘুমন্ত মেয়ে দুটোর দিকে তাকাল। বড় করুণ ভঙ্গিতে দু'জন শুয়ে আছে। ঘুমের তৃপ্তির বদলে ওদের মুখে অনাদারের কালো ছাপ পড়ে গেছে। এই ক'টা মাস মেয়ে দুটোর ওপর দিয়ে যা চলছে, তাতে এমনটা তো হবেই। মাকে ওরা আর আগের মতো আপন করে, সহজ করে পাচ্ছে না। মা এক এক সময় এত অন্যরকম, এত পর হয়ে যায় যে বলার নয়। এষা জ্ঞানপাপীর মতো এ সবই জানে, উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু এষা আর ফিরতে পারছে না আগের জীবনে। একটা অনড়, অচল হতাশার পাথর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতে কী ঘটবে, কী হবে এষা মোটেই জানে না। অথচ ওর প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, যা হয়েছে এটাই শেষ। যবনিকা পড়ে গেছে। আর নতুন করে কিছু হওয়ার নেই। এষা ধীর পায়ে মেয়েদের কাছে এগিয়ে এল। ওদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হাত-পাগুলো ঠিক করে দিল অসম্ভব যত্নে। তারপর দু'জনের কপালে চুমু খেল সাদরে, সোহাগে। দুটো মেয়েকেই দেখতে হয়েছে অবিকল ওর মতো। বাপের মুখের ছাঁচ দু'জনের কেউ পায়নি। কেবল গায়ের রঙ ছাড়া। এষার মা আগে প্রায়ই বলত, মাতৃমুখী কন্যার কপালে অশেষ কষ্ট। তুই দেখে নিস। এ হতেই হবে। মেয়ে-জন্ম হলেও যদি পিতৃমুখী হয়, তা হলে বেঁচে গেল। না-হলে...।

একদিন এষা উত্যক্ত হয়ে বলেছিল, তোমার হাতে কোনও প্রমাণ আছে। এই যে তুমি বলছ—মাতৃমুখী কন্যা...।

মা চোখ কপালে তুলে বলেছে, প্রমাণ! প্রমাণ তো তোর চোখের সামনে। আমি একেবারে আমার মায়ের মতো দেখতে। ব্যস্, আর দেখতে হল না—ভরা যৌবনে শাঁখা-সিঁদুর গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে বিধবা হলাম। দেওরদের আশ্রয়ে এখনও লাথি-ঝাঁটা খেয়ে জীবন কাটাচ্ছি। আর তুই—ঠিক তোর বাবার মুখটি পেয়েছিস। চোখ-নাক-কপাল, মাথার কোঁকড়ানো চুল—সব সব। দ্যাখ্, তুই কত সুখে আছিস। পিনাকী আমার মনের মতো জামাই হয়েছে।

সেদিন এষা রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে গেছিল। মা বড্ড বাড়িয়ে কথাগুলো বলেছিল। 'সুখে আছিস' শব্দ দুটো কানে এসে বেজেছে! এষা ঠোঁট উল্টে মাকে বলেছিল, যত সব বাজে চিন্তাধারা তোমার। কোত্থেকে যে এসব আমদানি কর! এরকম

আবার হয় নাকি! যাঃ।
টুম্পা আর মাম্পির মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের কথাগুলো মনে পড়ে গেল। এষা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল, মাগো, এর নাম সুখে থাকা!
ভীষণ কান্না পাচ্ছে! একটু কাঁদতে পারলে এষা নির্ভার বোধ করত। সেই বিকেল থেকে যে-ক্ষোভ ও অভিমান জমা হয়েছে তার কিছুটা অন্তত ধুয়ে যেত।
—বৌদি।
এষা চমকে গেল। চকিতে ঘুরে দেখল, জানলার সামনে একজন মুখ-চেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। গলির মুখে বসে যারা গল্পগুজব করে, তাদেরই একজন বলে মনে হল এষার। গায়ের কাপড়টা দ্রুত ঠিক করে নিয়ে এষা কাছে এসে বলল, আমাকে বলছেন?
—হ্যাঁ, আপনাকে। একটু বাইরে আসবেন। ভয় নেই। খারাপ কিছু নয়।... আচ্ছা, আমি ভেতরে যাচ্ছি।
ধনঞ্জয় একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। প্রায় দৌড়ে পিনাকীদের শোবার ঘরে ঢুকে এল। ট্যাক্সিটা বড় রাস্তায় দাঁড় করানো আছে। দুঃসংবাদটা দিয়েই এষাকে নিয়ে চলে যেতে হবে নির্জন এক বাস গুমটির অন্ধকার জগতে। কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে ধনঞ্জয় মর্মভেদী শরের মতো শব্দগুলো ছুঁড়ে দিল।

—না মশাই, আমাকে কোনও কন্ডাক্টর মেয়ে-ফেয়ে নিয়ে কিছু বলেনি। আপনারা যে-টাইম বলছেন, অর্থাৎ সাড়ে নটা নাগাদ মানিকতলা...তার মানে এখানে দশটা দশ-পনেরো...মানে হরি সিংদের বাস...নাঃ মশাই ওরাও তো লাস্ট খেপে ডাইনে বেরিয়ে গেল এই কিছুক্ষণ আগে—কই, কিছু বলল না তো! আপনারা মনে হয় ভুল করছেন। দুশো তিরিশ নয়, অন্য কোনও রুটের বাস। কথা বলতে বলতে টাইমকিপার ভদ্রলোক কাগজপত্র গুছিয়ে নিলেন। হ্যারিকেনটা জোরে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে বেরিয়ে এলেন ছোট্ট চৌখুপ্পি কাঠের ঘরটা থেকে। গুমটিতে দুটো মাত্র বাস দাঁড়িয়ে আছে। একটা শেষ বাস। অন্যটা কাল সকালে এখান থেকে ছেড়ে উত্তরে যাবে। ড্রাইভার, কন্ডাক্টররা এপাশ-ওপাশে ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের একজনকেও পাওয়া যায়নি কথা বলার জন্যে, সামান্যতম কিছু যদি জানা যায়! একমাত্র টাইমকিপার ভদ্রলোক ডিপো-ঘরটায় বসেছিলেন। এবার উনিও চলে যাচ্ছেন।
প্রিয়নাথ শেষবারের মতো কাতর মুখে ভদ্রলোককে বলল, ওরা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করছিল না তো! যদি আপনার কানে এসে থাকে।
ভদ্রলোক পিনাকীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে দেখে বললেন, সে ওরা নিজেদের মধ্যে করে থাকতে পারে। এমন অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ভুল নিয়ে হাসি-তামাসা হয়তো করেছে। তবে আমি শুনিনি মশাই। আপনারা থানায়টানায় খোঁজ করুন। এ তো আর মনোহারি গুডস্ নয় যে আনন্দে বাড়ি নিয়ে যাবে ফোকটে পেয়েছে বলে! এ হল গিয়ে জ্যান্ত জিনিস। মানুষের বাচ্চা। দেখুন গে, সেই লোকটা পুলিসের কাছে এতক্ষণে মেয়েটাকে জমা করে দিয়েছে।

ডিপো-ঘরে দরজায় তালা লাগিয়ে ভদ্রলোক সামনের উত্তরমুখো বাসটার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, গুরুপদ, অ্যায় গুরুপদ, আমি চললাম। টাইমমতো গাড়িটা ছেড়ে দিস্ বাপ। দেরি করিসনি যেন!

পিনাকী স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রিয়নাথ বিরস মুখে ভদ্রলোকের চলে যাওয়া দেখল। যে জন্যে ওরা এই গুমটিতে ছুটে এল তা কোনও পথই দেখাতে পারল না। সেই ভদ্রলোক মাঝপথে কোথাও নেমে গেছেন। কিন্তু কোথায়, কোন্‌খানে? তিনিও নিশ্চয়ই এইরকম একটা অভাবনীয় পরিস্থিতিতে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। সেইসঙ্গে বিহ্বল। মেয়েটাকে নিয়ে তিনি ঠিক কী করতে পারেন বা করছেন প্রিয়নাথ ভাবতে চেষ্টা করল। মাথা কাজ করছে না। চারপাশটা একটু ঘুরে দেখে এসে প্রিয়নাথ বলল, পিনাকীদা, আপনি একটু দাঁড়ান। ওই কোয়ার্টারগুলোর পাঁচিলের গায়ে চায়ের দোকানের মতো কী একটা দেখা যাচ্ছে। আমি গুরুপদ লোকটার খোঁজ করে আসি। লোকটা মনে হচ্ছে এই বাসের ড্রাইভার।...যদি কিছু বলতে পারে।

ক্ষীণ কণ্ঠে পিনাকী শুধু বলল, হ্যাঁ, যান।

সবাই চলে গেল। পিনাকী একা। শুধু দুটো প্রাণহীন বাস আর ডিপো-ঘরটা আলো-অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। পিনাকী একটু বসার জায়গা খুঁজল। হাত-পা দ্রুত অবশ হয়ে আসছে। মেয়েটাকে সত্যিই যদি না পাওয়া যায়! চিরদিনের মতো হারিয়ে যায় যদি! এষার কাছে কী করে মুখ দেখাবে পিনাকী! এবারও পিনাকী দোষী। মেয়েটার জন্ম দিয়ে যে-দোষ করেছে সেই একই রকম দোষ আজ করল পিনাকী—মেয়েটাকে হারিয়ে ফেলে। আগের মতনই এষা তর্জনী তুলে বলবেঃ 'তুমি দোষী। সব দোষ তোমার।' যে-কোনও মুহূর্তে এষাকে নিয়ে ধনঞ্জয় এসে পড়বে। তখন, কী হবে! পিনাকী ভয় পেয়ে গেল। জ্বরো রোগীর মতো ওর সারাটা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। শেষ বাসটার পাদানির ওপর বসে পড়ল পিনাকী। প্রিয়নাথ হন্তদন্ত হেঁটে আসছে। তীর বেগে চলে যাওয়া একটা আর্মি জিপের আলো প্রিয়নাথের শরীর ছুঁয়ে চকিতে মিলিয়ে গেল। পিনাকী উঠে দাঁড়াল বুকের ওপর হাত চেপে ধরে। ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গের মতো কোনও আশার আলো প্রিয়নাথ নিয়ে আসছে কি?

—কী ব্যাপার, এখনও ধনঞ্জয় এল না। এত দেরি করার কোনও মানে হয়? আমাদের এক্ষুণি বাবুঘাট যেতে হবে।...যার নাম গুরুপদ, সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হল। প্রিয়নাথ বলল।

—মা-মণি কোথায় আছে ও জানে? পিনাকী পাগলের মতো ছটফট করে জানতে চাইল।

—না, জানে না। তবে ও বলল, বাবুঘাটে, ইনডোর স্টেডিয়ামের পিছন দিকটায় আর ইডেনের আশপাশে নানান রুটের বাস সারারাত থাকে। ওখানে গেলে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। কেউ না কেউ ঘটনাটা...

প্রিয়নাথের কথা শেষ হল না। গুমটির কাছে আকাঙ্ক্ষিত ট্যাক্সি এসে থামল। একছুটে গাড়িটার কাছে গিয়ে প্রিয়নাথ বলল, ধনঞ্জয়, নামিস না, নামিস না। বাবুঘাটে যেতে

হবে...। ওখানে গেলে হয়তো...দাদা, একটু বাবুঘাটের কাছে চলুন না! ও পিনাকীদা, তাড়াতাড়ি আসুন...

ট্যাক্সির পেছনের দরজাটা খুলে প্রিয়নাথ ঘুরে দাঁড়াল। চেষ্টা করেও পিনাকী দ্রুত আসতে পারছে না। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের জোরও নিঃশেষ হয়ে গেছে। উন্মুক্ত দরজা দিয়ে এষাকে দেখা যাচ্ছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। চোখের দৃষ্টি কোন্ দিকে ফেরানো—বোঝা যাচ্ছে না। এষা কি খবরটা শুনে কান্নাকাটি করেছে! নাকি 'আপদ বিদেয়' হয়েছে বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে! মেয়েটা তো ওর চোখে শত্রু হয়ে উঠেছিল। এষা হয়তো মনে মনে খুশি হয়েছে। শান্ত চিত্তে পুরো অঘটনটাকে গ্রহণ করেছে। এখানে এসেছে দৃশ্যটা দেখার জন্যে— পিনাকী এইসব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে এল। এষার পাশে গিয়ে এখন ওকে বসতে হবে। এষা কি কিছু জিজ্ঞেস করবে? কোনও নির্মম প্রশ্ন! নাকি বলবে : 'যা হয়েছে ভালই হয়েছে। তুমি শুধুমুধু মন খারাপ করছে কেন? মেয়েটা তো আর মরে যায়নি। অন্য লোকের হাতে চলে গেছে। সে কি আর ছুঁড়ে ফেলে দেবে! নিশ্চয়ই মানুষ করবে, বড় করে তুলবে। আমরা খুব বেঁচে গেলাম। তাই না বলো! তিন তিনটে মেয়ে—ভাবা যায়! খুব বেঁচে গেলাম—কী বল!'

—আসুন, আসুন। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। প্রিয়নাথ তাড়া লাগাল।

পিনাকী সন্তর্পণে ট্যাক্সির ভেতরে ঢুকতেই এষা অদ্ভুত চোখে এক ঝলক তাকাল। মুখ ঘুরিয়ে নিল জানলার দিকে। এই অদ্ভুত দৃষ্টিপাত পিনাকীর অভিজ্ঞতার বাইরে। ঘৃণা, ক্রোধ, অনুকম্পা কোনও কিছুই নেই ওই দু'চোখে। আবার এই সবগুলোই যেন আছে। অদ্ভুত। পিনাকী কেঁপে উঠল।

সামনে ধনঞ্জয়ের পাশে গিয়ে বসল প্রিয়নাথ। গাড়িটা স্টার্ট নিতেই এষার হাঁটু ছুঁয়ে পিনাকী অস্পষ্ট স্বরে বলল, বিশ্বাস করো, আমি ইচ্ছে করে করিনি। ভুলে গেছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ ভুলে গেছিলাম বিশ্বাস করো...। সেই সময় তোমার কথা ভাবছিলাম। এষা, তুমি কিছু বলো। তুমি আমাকে...।

প্রিয়নাথ ও ধনঞ্জয় পিছন ফিরে তাকাল। পিনাকীর গলার স্বর পুরুষের কান্নার মতো লাগছে। এষা তেমনভাবেই বসে আছে। পাথরের মতো।

এখানে অনেক বাস, সারি দিয়ে পরপর রাখা আছে। সবচেয়ে বড় কথা জায়গাটা জনহীন হয়ে যায়নি। ড্রাইভার-কন্ডাক্টরদের ছোট ছোট জটলা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। চওড়া রাস্তার ওদিকটায় খাটিয়া পেতে একদল শিখ ড্রাইভার জমিয়ে গল্প করছে। ইডেনের ব্যাণ্ড স্ট্যান্ড, বঙ্কিমচন্দ্রের স্ট্যাচু, চক্ররেলের লাইন, জলপুলিশের থানা, অনেকগুলো ডিপো-ঘর, দূরে গঙ্গার বুকে আলো-ঝলমলে মাঝারি সাইজের জাহাজ—সব মিলিয়ে গোটা জায়গাটার ওপর দিয়ে জীবনের বাতাস বয়ে যাচ্ছে। প্রিয়নাথ সামান্য ভরসা পেল। ট্যাক্সি থেকে নেমে মনে হল, একটা-না-একটা খবর এখান থেকে পাবেই। গাড়িটা একটা প্যাসেঞ্জার-শেডের গা-ঘেঁষে থেমেছে। শেডটার তলায়, কোণের দিকে নোংরা ছেঁড়া চট-কাপড়-পলিথিন শিট দিয়ে তৈরি একটা ঝুপড়ি। ওদিকে সবার চোখ চলে গেল। শতছিন্ন কাপড়ে গা ঢেকে এক বুড়ি বসে

আছে। এষার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে, ফোক্‌লা মুখে হাসির আওয়াজ তুলে বুড়ি বলল, মাইয়া, দেরি কইর‍্যা ফেলাইছ। ডামটহাবারের বাস চইল্যা গেছে। এহন যাবে কেমনে শুনি। ও মাইয়া, আমারে লইয়্যা যাইবাম নাহি! ও মাইয়া, মাইয়্যারে!

—পিনাকীদা, আপনি বৌদিকে নিয়ে এখানে দাঁড়ান। আমি আর ধনঞ্জয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে আসি। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, একটা ভাল খবর-টবর পাব।

এষার পাশ থেকে, অনেকটা ছিটকে সরে আসার মতো সরে এসে পিনাকী বলল, না, না, আমি আপনার সঙ্গে যাব। উনি বরং থাকুন...।

পিনাকীর এই অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা না-করে প্রিয়নাথ ব্যস্ত হয়ে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ধনঞ্জয়, তুই বউদির কাছে থাক। চুলন।

চক্ররেলের লাইনের ওপর দিয়ে একটা লাইট ইঞ্জিন একটানা সিটি মারতে মারতে ডকের দিকে চলে গেল। কু-ঝিক্‌-ঝিক্‌ শব্দটা তখনও মিলিয়ে যায়নি। কোনও একটা মানুষের জান্তব চিৎকারে এষা আর ধনঞ্জয় দারুণ চমকে গেল। পিনাকী ও প্রিয়নাথ রাস্তা পার হচ্ছিল। ওরা থমকে গিয়ে পিছনে তাকাল। বাস-শেডটা থেকে খানিকটা দূরে একটা ডিপো-ঘরের তলায় বসে পাগল গোছের একজন লোক গলা দিয়ে অমন বীভৎস শব্দ করছে। বাঁ-হাতটা কনুই থেকে কাটা। বড় বড় চুল দাড়ি আর বহু বছরের নোংরা ধুলো-বালি সারা অঙ্গে মেখে প্রায়-নগ্ন মানুষটা বসে আছে। রাস্তার দু'পাশের হ্যালোজেন লাইটের আলোয় ওকে আদিম পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছে। লোকটা আওয়াজ থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, এ হারামজাদা ইসমাইল, এখনও দেঁইড়ে আছিস? বসতি জায়গা দে, পাটি পাত, পাটি পাত। মেহমানদের গোস্ত আর রুটি খেতি দে...। ওরে অ ইসমাইল...।

এষা এক পা এক পা করে ধনঞ্জয়ের কাছে সরে এল। এক বিচিত্র জগতের মাঝখানে ও হঠাৎ এসে পড়েছে। এখানে প্রত্যেকের মাথা খারাপ। সবাই প্রলাপ বকছে। যাদের সুস্থ স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, তারাও হয়তো আর এক ধরনের পাগল। সারাদিন এই যন্ত্রদানব বাসগুলোর সঙ্গে থেকে থেকে ওরা নিশ্চয়ই যন্ত্রের মতো কঠিন, নিষ্প্রাণ, একগুঁয়ে হয়ে গেছে।

ধনঞ্জয় এষার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা মেয়ে-হারানোর ঘটনাটা শোনার পর থেকে নির্বাক হয়ে আছেন। শুধু ট্যাক্সিতে ওঠার মুখে বাড়িওয়ালার স্ত্রীর হাত ধরে একবার বলেছেন, দিদি, মেয়ে দুটো রইল, একটু দেখবেন। আর ধনঞ্জয়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছেন, আমরা কোথায় ঠিক যাব। ধনঞ্জয় উত্তর দিয়েছে। এবং তখন থেকেই ও অবাক। এত বড় অঘটন, নিজের পেটের মেয়ে বলে কথা—তবু ভদ্রমহিলা চোখের জল ফেলছেন না। অন্য মহিলা হলে কান্নাকাটি করে এতক্ষণে পাড়া-বেপাড়া মাথায় তুলে দিত। পিনাকীদার অনন্য ভুলের পাশে ভদ্রমহিলার আচরণও অনন্য। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না।

মিনিট পাঁচেকও হয়নি, প্রিয়নাথ ও পিনাকীবাবু ফিরে আসছে। ওদের ধীর পদক্ষেপই বলে দিচ্ছে, এখানে আসাটাও ব্যর্থ হয়ে গেল। ধনঞ্জয় শেডের তলা থেকে নেমে এসে

জিজ্ঞেস করল, কী রে প্রিয়, কিছু জানতে পারলি?

প্রিয়নাথ মাথা নেড়ে বলল, জানা যেতে পারে, তবে অপেক্ষা করতে হবে। কয়েকজন বলল, দুশো একুশ নম্বর রুটের এক ছোকরা কন্ডাক্টর নাকি এরকম একটা ঘটনা বেকবাগানের কাছটায় দেখেছে। ওর বাসে উঠে এক ভদ্রলোক নাকি একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাঁকছিলেন : কার মেয়ে কার মেয়ে। ভুলে আমার হাতে দিয়ে গেছেন। একজন বলল, ছোক্‌রা নাকি বলেছে, মেয়েটা ভদ্রলোকের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক খবরটা সেই ছেলেটা না আসলে জানা যাবে না। বাবু ধর্মতলার কোন্ হোটেলে খেতে গেছেন। কখন আসবে ঠিক নেই। কী ঝামেলা বলতো!

ধনঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পিনাকী উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে তাকিয়ে এষার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ এষা তীব্র কান্নায় ভেঙে গিয়ে পিনাকীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কিছু বোঝার আগেই পিনাকীর বুকে দুহাতে প্রচণ্ড জোরে মারতে মারতে বলল, আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। ওগো, এ তুমি কী করলে...না, না, আমার মেয়েকে...।

প্রিয়নাথ আর ধনঞ্জয় সভয়ে একটু পিছিয়ে এল। ভদ্রমহিলা সহসা যে এমন করতে পারেন ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। ওর আর্ত কান্নায় সমগ্র জায়গাটা মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠেছে। এপাশে ওপাশে অনেকে দাঁড়িয়ে গেছে।

এষাকে কাঁদতে দেখে বুড়ি পাগলী বলে উঠল, ও মাইয়া কান্দো ক্যান? আমাগো মিত্তু নাই, মিত্তু নাই...। কাইন্দো না...।

প্রায় একই সঙ্গে সারা এলাকাটা কাঁপিয়ে অঙ্গহীন উলঙ্গ মানুষটা চিৎকার করে বলল, কাঁদো, কাঁদো। ও পরাণ, পরাণ গো! কাঁদো, কাঁদো...।

ফল্‌সানগরের চাঁদ

জল-কাদা ভেঙে লোকটি আমাদের একেবারে কাছে এসে বলল, কত অচল পয়সা চইল্যা গেল গৌরাঙ্গের বাজারে। আর ওই ছোঁড়া! তারপর বাঁ-হাতটা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে মুখ দিয়ে জোরে শব্দ করল, হুঁ। আমরা সকৌতুকে দেখলাম লোকটির হাতে উল্কির কারিকুরিতে লেখা আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ। খুব সম্ভবত এটি ওর নাম। লোকটির নিজের থেকেই আমাদের এই উপকারটুকু করল।

আমি শব্দ করে হেসে বললাম, ছেলেটা তোমাকে খুব ভয় পায় দেখছি। আমরা কতক্ষণ ধরে ওকে বলছিলাম। কিছুতেই শুনছিল না। তুমি এসে হাঁকডাক করতে.. ।

লোকটি জিভ কাটল। কানের দু'পাশে হাত রেখে বলল, আমিও তখন থিক্যা বগব দ্যাখতে ছিলাম। ব্যাটা যাইব না মানে' ওর বাপ আইয়্যা করব আনে।

পবিত্র ফিসফিস করে অঞ্জনাকে বলল, এখানেও তোমাদের দ্যাশের লোক। আশ্চর্য, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও আর বাকি নেই। ওঃ!

অঞ্জনা ঠোঁট উল্টিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওকে ভীষণ ক্লান্ত এবং অবসন্ন দেখাচ্ছে। এমনিতেই ওর শরীর ভাল নেই।

লোকটি পবিত্রর কথা শুনতে পায়নি। দ্বিগুণ উৎসাহে গলা চড়িয়ে বলল, দরকার পড়লেই আমাকে স্মরণ করবেন বাবু। আমার নাম গৌরাঙ্গ। ওই যে সার সার দোচালাগুলো দেখছেন, ওগুলোরই একটায় থাকি।

অবাক-বিস্ময়ে অঞ্জনা মুখ ফেরাল। গৌরাঙ্গ নামের এই মানুষটি এখন এপারের ভাষায় স্পষ্ট কথা বলছে। পবিত্র এবার আর ফিসফিস করে বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না।

জলের কিনারে নেমে গৌরাঙ্গ ছেলেটার ওপর যখন হম্বিতম্বি করছিল, সে সময় আমরা কেউই ওর ভাষা বুঝতে পারিনি। হয়তো তখন স্থানীয় বুলিতে গৌরাঙ্গ তড়পিয়েছে। কে জানে!

—যাই বাবু। আপনারা একটুক্ষণ দাঁড়ান। শীতল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়বে। তবে অনেকটা পথ তো! চলি বাবু!

গৌরাঙ্গ চলে গেল। আমরা তিনজন একটা বয়োবৃদ্ধ! তেঁতুলগাছের ছায়ার তলায় দাঁড়িয়ে আছি। বসার মতো কোনও জায়গা নেই। গাছতলায় বড় সাইজের অজস্র লাল পিঁপড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাটি তুলছে। আমরা যে খুব স্বস্তিতে ছায়ার আশ্রয়ে আছি, তাও নয়। যে কোনও সময় পিঁপড়েগুলোর বিষাক্ত কামড় আমাদের

ছায়াচ্যুত করতে পারে।

হলদি নদীর পশ্চিম পাড়ের এই জায়গাটার নাম জানি না। মিলিন্দ বলেছিল, তেঁতুলতলা। হয়তো তেঁতুলগাছটার জন্যে। এখান থেকে নরঘাট সেতুটা লম্বালম্বি দেখা যাচ্ছে। আসলে আমরা বাস থেকে নেমেছি নরঘাট সেতুর শেষ প্রান্তে। তারপর ঢালু জমি বেয়ে আরও নিচের দিকে নেমে, নদীর পাড় ধরে খানিকটা হেঁটে এসে এখানে পৌঁছেছি। নদীতে জল আছে। তবে তেমন ভরভরন্ত নয়। পাড় থেকে জলের রেখা অনেকটা নেমে গেছে। সামান্য দূরে একটা ভাঙাচোরা ঘাট। মিলিন্দ বলেছিল, ওটার নাম স্বাধীন ঘাট। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে নাকি ওই ঘাটে এসে গভীর রাতে ভিড়ত ছোট ছোট নৌকা। ফ্রিডম ফাইটাররা সব নামতেন। ইংরেজ শাসক আর দেশি পুলিশদের চোখে ধুলো দিয়ে। আবার নৌকা নিয়ে আসার অসুবিধে থাকলে মুক্তিকামী যোদ্ধারা হলদি নদী সাঁতরে পার হয়ে এই ঘাটে এসে উপস্থিত হতেন। ভাঙাচোরা মুখ থুবড়ে পড়া ঘাটটাকে দেখে এখন আর বোঝার উপায় নেই সেই সব গরিমাময় অতীতের কাহিনী।

মিলিন্দর দেওয়া পথসূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে এই তেঁতুলগাছটার তলায় এসে আমরা যখন দাঁড়ালাম তখন ওই শীতল নামের ছেলেটিকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাইনি। কিছুক্ষণ পরে হোগলার মতো দেখতে এক ধরনের আধপাকা পাতার কয়েকটা বড় বান্ডিল জলে ধুতে এনেছিল গৌরাঙ্গ। বয়স কম বলে এবং খুব উৎসাহে নদীতে খেপলা জাল ছুঁড়ে দিচ্ছে দেখে আমি শীতলকেই অনুরোধ করেছিলাম বীরেশ সামন্তর বাড়িতে আমাদের এখানে পৌঁছনোর খবরটা দেওয়ার জন্যে। ছেলেটি কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। তা সে মাছ ধরার নেশার জন্যেই হোক কিংবা দুষ্টুমি করেই হোক। সেই সময় নিজেদের খুব নিরুপায় লাগছিল। গৌরাঙ্গ এগিয়ে না এলে আমাদের হয়তো আরও অনেকক্ষণ বোকার মতো অপেক্ষা করতে হত। ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল মিলিন্দ। পবিত্র আর অঞ্জনাকে নিয়ে ঠিক কবে যাব নির্দিষ্টভাবে বলতে না-পারাতে মিলিন্দ কপাল কুঁচকে বলেছিল, তা হলে তো অসুবিধে হবে ইন্দ্রদা। আগে থেকে বলা থাকলে সামন্তমশায়দের বাড়ি থেকে গরুর গাড়ি পাঠিয়ে দিত। আপনারা তো নিজেরা হেঁটে চিনে যেতেও পারবেন না। মেঠো পথ—এ গ্রাম, সে গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। অন্য কোনওভাবে যাওয়ার উপায় নেই। লোকে অবশ্য সামন্তদের একডাকে চেনে। যাক্‌গে, আপনাকে যেমন বুঝিয়ে দিলাম, সেই মতো তেঁতুলগাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন। যাকে দেখতে পাবেন তাকেই একটু ওঁদের বাড়িতে খবর দেওয়ার জন্যে বলবেন। আশা করি, কেউ-না-কেউ সাহায্য করবেই। গ্রামের লোকেরা এখনও সরল, আন্তরিক। বীরেশ সামন্তর নাম শুনলে ওখানকার প্রায় সকলেই সম্ভ্রম দেখায়। সম্মান করে।

শীতল অবশ্য প্রথমে মিলিন্দর সব ধ্যান-ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। বীরেশবাবুর নাম শুনেও কোনও গা করেনি। শীতল এমন একটা ভাব করছিল যেন সামন্তদের চেনেই না। শেষ পর্যন্ত গৌরাঙ্গর চাপে পড়ে ছেলেটি যাওয়াতে আমরা কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছি। অবশ্য শীতল যদি শয়তানি করে অন্য পথে চলে যায়, তা হলে

আবার ভোগান্তি। সামন্তদের বাড়ি এখান থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার। শীতলের পেছন পেছন হেঁটেও চলে যেতে পারতাম। আমার আর পবিত্রর কোনও অসুবিধে হত না। কিন্তু মুশকিল বাধত অঞ্জনাকে নিয়ে। ওর পেটে এখন আট মাসের বাচ্চা। এই অবস্থায় অঞ্জনার পক্ষে এতটা হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। তার ওপর এমন দুর্মদ রোদ। গ্রীষ্মের ভয়-দেখানো রক্তচক্ষু। দুশ্চর গ্রাম্য পথ—যেখানে গরুর গাড়ি এখনও গতির বাহন। আশ্চর্য, নরঘাট সেতুর ওপর দিয়ে মুহুর্মুহু বাস-লরি-মোটর চলাচল করছে। অথচ এই নদীর পশ্চিম পাড় ছাড়িয়ে সামন্তদের গ্রামে এখনও অতীত জীবনযাপনের স্মৃতি অব্যাহত। আমার ভারি অবাক লাগছে। ঐতিহ্য কি সত্যিই অবিনাশী! যুগাযুগান্ত ধরে অপরিবর্তিত!

একটু সময় নিয়ে পবিত্র সিগারেট ধরাল। ফস্ করে দেশলাই জ্বালানোর শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। নদীর জলে হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে, তেঁতুলগাছের ঝিরঝিরে পাতা বাতাসে কাঁপছে। জলের ছিলিক ছিলিক আর পাতার তিরতিরে শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। সেতুর ওপর দিয়ে আপ-ডাউনে যেসব গাড়ি চলে যাচ্ছে, এখান থেকে মনে হচ্ছে, ওগুলো যেন খেলনা-গাড়ি। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। পবিত্র অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ছেলেটাকে গ্রামের নামটা ঠিকঠাক বলেছ তো!

অবাক হয়ে হেসে বললাম, কেন ঠিক বলব না! ফল্সানগর —তাই না! ভুল হবে কেন?

—তাই হবে হয়তো। ফল্স না ফল্সা, আমার অত মনে নেই। ডিসগাসটিং। পবিত্র বিরক্তি দেখিয়ে মাথা ঝাঁকাল। ওর দু'চোখে অসহিষ্ণুতার আগুন।

—তুমি এমন ছোটলোকের মতো করছো কেন? তোমার চেয়ে আমার বেশি কষ্ট হচ্ছে। সেই তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। অঞ্জনা চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল।

আমি রাগ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম। পবিত্রর অবস্থায় পড়লে আমারও মন মেজাজ হয়তো এমন রুক্ষ হয়ে উঠত। অঞ্জনার পিঠে হাত রেখে বললাম, এই সময়ে তুমি একদম উত্তেজিত হবে না। এমনিতেই তোমার শরীরের ওপর দিয়ে বিশ্রী ধকল যাচ্ছে। আমারই দোষ। একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের দরকার ছিল।

—আপনি কী করে অ্যারেঞ্জ করতেন! যেভাবে চোরের মতো গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে আসতে হল! ছি, ছিঃ! অঞ্জনা শরীর মুচড়ে বলল।

—অঞ্জনা, তুমি একটা কাজ করো। তোমাদের এই সুটকেশটার ওপর কিছুক্ষণ বসো। একটু কোমরটা সইয়ে নাও।

—না ইন্দ্রদা। কোনও দরকার নেই। এর চেয়ে অনেক বড় কষ্টের সামনে পড়তে হবে। আমার ভয় শুধু পেটের শত্রুটাকে নিয়ে। নিজের জন্যে মোটেই ভাবছি না। যা হয় হবে! বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে আসতে হল। এরপর খুন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী বাকি থাকবে! অঞ্জনার গলার স্বর ভারী ভারী শোনাল।

চমকে গিয়ে আমি পবিত্রর দিকে তাকালাম। অঞ্জনার ব্যথা ও আর্তিটুকু বোঝার

ক্ষমতা ও হারিয়ে ফেলেছে। ভয়ংকর রেগে গিয়ে পবিত্র ওকে চড় মারতে পারে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এক উদ্‌ভ্রান্ত ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। অঞ্জনাকে পবিত্র কিছুই বলল না। সিগারেটটা টুস্‌কি মেরে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উন্মাদের মতো হা হা করে হেসে যাত্রার রাজার স্টাইলে তর্জনি তুলে বলল, ইন্দ্রদা, মজা কি জানেন, এই মাগীর ভাই যে-পার্টি করে, তার ক্যাডাররাই আমাকে কুকুর-বেড়ালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

—পবিত্র, আমি আর শুনতে চাই না। কিছুই আমার অজানা নয়। চিৎকার করে বললাম।

পবিত্র ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, এমন নোংরা ভাষায়, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করলে এক্ষুনি চলে যাব। বিপদ-আপদ প্রত্যেকের জীবনেই আসে। তার থেকে ওভারকাম করার রাস্তাও বেরিয়ে যায়। তোমরা দু'জনেই কেন এমন ছেলেমানুষের মতো করছ বুঝতে পারছি না। এ কী।

অঞ্জনা লজ্জায় চোখ নামিয়ে ওপাশটায় সরে গেল। পবিত্রকে একলা পেয়ে বললাম, হয়তো খুব খারাপ তবু তো একটা ব্যবস্থা করা গেছে। আমার ওপর যখন ছেড়ে দিয়েছ, তখন একটু মাথা ঠাণ্ডা করে নেক্‌সট স্টেজগুলো নিয়ে একটু ভাবো। তুমি ছাড়া এই মুহূর্তে অঞ্জনার আর কোনও অবলম্বন নেই। এটা বারবার ভুলে যাচ্ছ কেন?

আবার সিগারেট বের করল পবিত্র। কাঁপা হাতে ধরাল। কী ভেবে বলল, দেখবেন, আমি এর বদলা নেব। ছাড়ব না। ছাড়ব না।

দুপুরের নিস্তব্ধ ছবির গায়ে আমাদের কথার আঁচড় পড়ে যাচ্ছে দেখে আমি চুপ করে গেলাম। তবে ওদের এই ছন্নছাড়া জীবনের বেদনাটিকেও আমি ছোট করে দেখছি না। পবিত্র পার্টি করে। সক্রিয় রাজনীতি। বিধানসভার গত উপনির্বাচনে ওর দলের প্রার্থী হেরে গেছেন। অপ্রত্যাশিত হার। সাতাত্তর সাল থেকে যিনি ওই আসনটিতে একনাগাড়ে জিতে আসছেন, তাঁর হার পবিত্র এবং অন্যান্যদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। কূটকৌশলময় রাজনীতিতে হার-জিতের খেলাটা অবশ্যম্ভাবী। একজন হারে, একজন জেতে। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। পবিত্ররা ব্যাপারটাকে নিশ্চিত মেনে নিত। প্রথম প্রথম রিগিং, দলবাজি, সরকারি যন্ত্রের অপব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে একটু চিৎকার-চেঁচামেচি করে থেমেও যেত। এমনটা ঘটার আগেই জয়ী দল হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল—হেরোদের, অপনান্টদের, বিপরীত মেরুর সমর্থকদের মেরে পাড়া ছাড়া করতে হবে। খেদানোর লিস্টে পবিত্রর নাম অবধারিতভাবে উঠে এসেছে। আমিও ওই একই পাড়াতে থাকি, যেখানে বিজেতা দল সমূলে উৎখাতের নীতিতে বিশ্বাস করে। বিজিত পার্টির সমর্থকদের নিরাশ্রয় করে দেওয়াটাকে যারা নিরাপদ বলে বিবেচনা করেছে।

আমার সঙ্গে পবিত্রর কোনও আত্মীয়তা নেই। বি. কম. পড়ার সময় ও আমার কাছে অঙ্ক কষতে আসত। প্রথমে পাড়ার ছেলে, তারপর ছাত্র, তারপর স্নেহাস্পদ, তারপর অনুজ বন্ধু। গভর্নমেন্টের ঘর থেকে ড্রাগ লাইসেন্স বের করে পবিত্র যেদিন থেকে

ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করল, সেদিনও আমি ওর পাশে ছিলাম। জীবনযুদ্ধের শুরুর দিন। এইভাবে পবিত্রর সঙ্গে একটা যোগাযোগের বন্ধন গড়ে উঠেছে। সমগ্র লোকালয় জুড়ে প্রথমে ফিস ফিস করে, পরে হাহাকারের মতো যখন খেদানো ও খুনের রাজনীতির অভিপ্রায়টা ভেসে বেড়াতে শুরু করল, সেই সময় একদিন রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ পবিত্র আমার বাড়িতে এসেছিল। ওর ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলাম, কী ব্যাপার! তোমাকে এমন লাগছে কেন? ভয়ঙ্কর বিপদ কিছু?

—আপনি তো জানেন রবীনরা আমাদের পাড়া-ছাড়া করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। দু'-একদিনের মধ্যে না গেলে দুলাল, বিনয়, কামেশ্বর কিংবা আমার—যার হোক লাশ পড়ে যাবে। এক নিঃশ্বাসে বলেছিল পবিত্র।

—তোমরা থানায় যাওনি? পুলিশ প্রোটেকশন...

—কামেশ্বর গেছিল। গত পরশু বাজারের মধ্যে রবীন আর কে কে যেন ওকে খামোকা মারে। একেবারে ফালতু ব্যাপার নিয়ে। তা কামেশ্বর থানায় গিয়েছিল ডায়েরি করতে। জানেন, থানা ওব ডায়েরি নেয়নি। উল্টে বলেছে, জেতা পার্টি যখন ঝামেলা করছে তখন কোথাও সরে পড়াই তো ভাল। ওদের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে থাকতে পারবেন না। বুঝুন!

মাথা নামিয়ে কয়েক সেকেন্ড ভেবে পবিত্রকে বলেছিলাম, ওরা এবার বদলা নিতে শুরু করেছে। এত দিন খবরের কাগজে পড়েছি—এ ওকে ঘরছাড়া করেছে, সে তাকে পাড়াছাড়া করেছে। তোমাকেও কি ওরা...

—হ্যাঁ, ইন্দ্রদা। আজ সন্ধেবেলায় অঞ্জনাকে ওরা শাসিয়ে গেছে। থ্রেট করেছে এই বলে, পবিত্র নিজের থেকে না সরলে, আমরা অন্য ব্যবস্থা নেব। আপনি তো জানেন, অঞ্জনা প্রেগন্যান্ট। অ্যাডভান্স স্টেজ চলছে। ও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে ইন্দ্রদা। এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাইছে না।

অঞ্জনার প্রেগন্যান্সি সম্পর্কে আমার কিছু জানা কথা নয়। কেননা এখন আর পবিত্রদের বাড়িতে আমি তেমন যাই না। চতুর্দিকের চিরস্থায়ী ডামাডোল আমাকে আরও ঘরকুনো করে দিয়েছে। নিজস্ব সংসারের যে-সীমাবদ্ধ গণ্ডি তার মধ্যে স্বার্থপরের মতো স্বেচ্ছাবন্দিত্ব মেনে নিয়েছি। পাড়া এবং প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমার আর তেমন আগ্রহ ও উৎসাহ নেই। তবু পবিত্র সেদিন রাতে আমার কাছে ছুটে এসেছিল, ওইরকম একটি সংকটে ও কী করবে, না-করবে, কী করা উচিত—সে সম্বন্ধে আশাপ্রদ কিছু সাজেশান নিতে। আমার প্রতি ওর একটা অদ্ভুত আস্থা আছে। পবিত্র আমার কাছে যখন পড়ত, তখন থেকেই হয়তো এমন করে ও ভাবতে শিখেছিল। আমি পরিস্থিতির জটিলতা ও ভয়াবহতার কথা উপলব্ধি করেও পবিত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রবীনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না? পালিয়ে যাবে কেন? তুমি তো ডাইরেক্টলি পলিটিক্স করো, রুখে দাঁড়ানোর মতো মানসিকতা তোমার আছে। তা হলে!

কিছুটা ক্ষুব্ধ গলায় পবিত্র বলেছিল, আমি ভয় পাইনি। ওদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে

যাওয়ার মেন্টাল স্ট্রেংথ আমার আছে। খুন করে দেওয়া ছাড়া ওরা আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

হাঁ করে পবিত্রর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। রাজনীতির বস্তাপচা অমানবিক ও ব্যর্থ আদর্শের জন্য পবিত্র খুন হয়ে যেতেও রাজি! আশ্চর্য! আমি ওর এই শূন্যগর্ভ নির্ভীকতার মূল্যায়ন কীভাবে করব বুঝতে পারছিলাম না। একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তো স্পষ্ট ভয় পেয়ে গেছ। তোমার চোখ-মুখ বলে দিচ্ছে। অস্বীকার করতে পারবে?

ম্লান হেসে পবিত্র জবাব দিয়েছিল, ভয় অঞ্জনা আর যে আসছে তাকে নিয়ে। আমার জন্যে ওরা সাফার করবে কেন? তাই আমাকে এ তল্লাট ছেড়ে চলে যেতেই হবে। সাময়িকভাবে, তবুও। আপনি আমাদের জন্যে কোনও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন? আপনার তো বহু চেনা-শোনা। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানোর সূত্রে কত মানুষের সঙ্গে আপনার পরিচয়। যদি কোথাও কিছুদিনের জন্যে ব্যবস্থা করা যায়। অন্তত, অঞ্জনার বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত। কোনও পিসফুল জায়গা। আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের ঠাঁই দেবে না। আপনি তো জানেন, ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ খারাপ। আমার পার্টি করা ওদের অপছন্দ। পার্টিও কোনও কথা দিতে পারছে না।

পবিত্রকে সেদিন রাতে কোনও পাকা কথা আমিও দিতে পারিনি। একটা রাত্রি ভাবার সময় নিয়েছিলাম। পবিত্র কিংবা ওর দলের ছেলেরা পাড়া ছেড়ে চলে যাক, এটা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু পবিত্রর মতোই অঞ্জনা ও অনাগত শিশুটির কথা ভেবে আমি অসহায় বোধ করেছি। হঠাৎ আমার মিলিন্দর কথা মনে পড়ে গেছিল। মেদিনীপুরের ছেলে। আমাদের বাড়িতে থেকে স্ট্যাটিসটিকস-এ এম. এস-সি. পরীক্ষা দিয়েছিল। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। মিলিন্দ এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। ওর বাবা আমার স্ত্রীর সংস্কৃতের মাস্টারমশাই। মিলিন্দর কাছে একবার সামন্তদের কথা শুনেছিলাম। ওঁরা নাকি যে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষদের বিপদে-আপদে সাহায্য করেন। যথাসাধ্য খেতে-পরতে-থাকতে দেন। সামন্তদের এটা পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সংকল্প। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ দিনগুলোতে ওঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই কাজ করেছেন। এখনও ওঁদের দরজা সকলের জন্যে খোলা। পরদিনই মিলিন্দর দমদমের ফ্ল্যাটে গিয়ে যোগাযোগ করেছি। সামন্তদের গ্রামের নাম ফল্‌সানগর। মিলিন্দরা থাকে ঠিক তার পাশের গাঁয়ে। খণ্ডবেড়িয়া। কীভাবে মিলিন্দ খবর পাঠিয়েছিল জানি না। আমি আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পবিত্র আর পারছিল না। অঞ্জনা ওর অবস্থাটাকে হয়তো আরও অসহনীয় করে তুলেছিল।

কবে আসছি—এই সামান্য সংবাদটুকু সামন্তদের জানানো হয়নি। বীরেশ সামন্ত আদৌ প্রস্তুত আছেন কি না, সেখানেও সন্দেহের অবকাশ আছে। একরকম ঝুঁকি নিয়েই আমি ওদেরকে কলকাতা থেকে এত দূরে এনে ফেলেছি। শেষ পর্যন্ত কী হবে, জানি না। এই তেঁতুলতলা থেকেই হয়তো ফিরে যেতে হবে। সবটাই নির্ভর করছে

শীতলের খবর দেওয়া এবং বীরেশবাবুর সাড়া দেওয়ার ওপর।
'বদলা' শব্দটা ধক্ করে কানে এসে বাজল। বদলার রাজনীতির শিকার হয়েও পবিত্রর শিক্ষা হল না। দূর থেকে অঞ্জনা চকিতে স্বামীর দিকে আগুন-ঝরা চোখে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। আমি দেখেছি। এখনও কীসের জোরে পবিত্র বদলা নেওয়ার কথা উচ্চারণ করছে বুঝতে পারছি না। ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, শুধু আমাদের অঞ্চলে নয়, গোটা নির্বাচনী এলাকা জুড়েই একটি অন্তঃশায়ী ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষ ওপর থেকে বুঝতে পারছে না। কিন্তু হেরো পার্টির ছেলেদের চোখে ঘুম নেই। তাদের বাড়ির লোকেরাই কেবল জানে, পলিটিক্যাল অপারেশন কীভাবে বহুদিনের আশ্রয়ের ভিত নড়িয়ে দিচ্ছে। উৎখাতের রাজনীতি মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেছিল। আবার পুরো দমে চালু হয়েছে। সহাবস্থান তো দূরের কথা। ভিন্ন মতাবলম্বীদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেও পিছপা নয় কেউ। তবে একটা কথা আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকেনি, যারা এত বছর একটা সিটে জিতে এসে সমগ্র অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল, তারা একবার মাত্র হেরে গিয়ে এতটা নিঃসম্বল হয়ে গেল কী করে? ওদের পাশে পল্লীর কোনও মানুষই কেন দাঁড়াচ্ছে না? কেনই বা শেলটার দিচ্ছে না! পবিত্রদেরও তো কিছু অবদান আছে। অন্তত তথাকথিত কিছু উন্নয়নমূলক কাজের নমুনা। তা হলে! পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়, রাজনীতির মতো জটিল।
পবিত্রকে এত খুঁটিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। ওর বিপদটাকেই বড় করে দেখেছি। বিশেষত অঞ্জনা এবং ওদের ভাবী সন্তানের কথা মাথায় রাখতে হয়েছে। মিলিন্দ বলেছিল, বীরেশবাবুরা নাকি দলমতনির্বিশেষে সবাইকে আশ্রয় দেন। যে-দলেরই সমর্থক হোক, অত্যাচারিত মানুষদের ওঁরা একচোখে দেখেন, কোনও ভেদাভেদ করেন না। এই ব্যাপারটাও আমার কাছে কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। রাজনীতির আলো মানুষকে এতটা আলোকিত করে কি? সত্যিই যদি করে, তা হলে পবিত্র বাড়ি ছেড়ে অন্তঃসত্ত্বা বউকে নিয়ে পালাচ্ছে কেন? মানুষের শিকড় উপড়ে ফেলার খেলায় মেতেছে যে-রাজনীতি, সেই রাজনীতিই আবার উৎপীড়তের কান্না মুছিয়ে দিতে চাইছে! মিলিন্দর সঙ্গে গাঁ-গঞ্জের সম্পর্ক এখন বেশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ও সব ঠিক জানে তো! মিলিন্দকে আমি অবিশ্বাস করছি না। আমার শঙ্কা অন্যখানে। একই নীতির দুটি রূপ মেলাতে পারছি না। বিসদৃশ মনে হচ্ছে। আমি ঠোঁট উল্টিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম। পবিত্র দেখতে পেয়ে বলল, এনিথিং রং, ইন্দ্রদা!
—নাঃ, না। ঠিক আছে। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
—মিলিন্দ ঝুলিয়ে দেবে না তো! এখানে যদি কিছু না হয়, তা হলে কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে। কোমরে দু'হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পবিত্র ভাঙা ভাঙা গলায় বলল।
—আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন? সামন্তরা ওঁদের ট্র্যাডিশন ব্রেক করবে বলে মনে হয় না। এটা তো জীবন-মরণের প্রশ্ন। আমি গলার স্বরে দৃঢ়তা এনে বললাম বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা সিরসিরানি থেকেই গেল।

বাতাস হঠাৎ দুরন্ত হয়ে উঠেছে। অবিন্যস্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছে অঞ্জনার তুঁতে রঙের মামুলি শাড়ির আঁচল। মেয়েটি এতটুকু সাজগোজ করে বেরোতে পারেনি। সেই কাকভোরে, সমস্ত লোকালয় যখন ভোরের ঘুমের আমেজে আতুর, ওরা দু'জন চুপিচুপি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। আমি নিশ্চিত, সেই মুহূর্তে অঞ্জনার চেয়ে পবিত্রর কষ্ট হয়েছে অনেক বেশি। ওই পাড়াতেই ওর জন্ম, বড হওয়া, পরিচিতি। সব কিছুর থেকে নিজেকে ছিঁড়ে উপড়িয়ে নিয়ে আসার বেদনা যে কত গভীর, অন্যেরা বুঝতে পারবে না। আমি ওদের জন্যে যশোর রোডে ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। একজন চেনা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আগে থেকে বলা ছিল। ওরা আসতেই আমি জিজ্ঞেস করেছি, কেউ দেখেছে? পবিত্র দ্বিধা-হতাশায় দুলতে দুলতে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করেছিল—না। পরক্ষণেই আমার মনে হয়েছে, রবীনের দলবল নিশ্চয়ই পবিত্রর মহাপ্রস্থানের খবর পেয়ে গেছে। ওদের পালিয়ে যাওয়ার মুহূর্তটিকে ওরা নিশ্চিত লুকিয়ে লুকিয়ে উপভোগ করেছে। প্রাণের ভয়ে কোনও পশুও যখন পালিয়ে যায় তখন মানুষ তারিয়ে তারিয়ে দেখে গর্ব অনুভব করে। আমাদের লোকালয় ছেড়ে ট্যাক্সিটা বেরিয়ে আসতেই পবিত্র ডুকরে উঠে বলেছিল, ইন্দ্রদা আবার কখনও ফিরে আসতে পারব তো!...বাবা-মা আর ছোট বোনটা রইল—ওদের দেখো।

আমি সেইক্ষণে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক পরে ওকে বলেছিলাম, এত বড় অন্যায় কখনও স্থায়ী হতে পারে! কখনওই নয়। একটা সমাধান বেরিয়ে আসবেই। আমরা কি মগের মুল্লুকে বাস করছি না কি!

সারাটা পথ পবিত্র আর অঞ্জনা চুপ করেছিল। প্রদোষের পাতলা আঁধার কেটে গিয়ে ঝলমল করে উঠছিল সকালের আলো। কিন্তু ওরা দু'জন নিথর হয়ে বসে কেবল অন্ধকার দেখেছে। যাকে আশার আলো বলে, তা এখনও ওরা দেখতে পায়নি। দেখাতে আমিও পারিনি।

ধীর পায়ে অঞ্জনা হেঁটে এসে বলল, ইন্দ্রদা, বড্ড খিদে পেয়েছে। আর কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে বলুন না!

—আর একটু ভাই! মিলিন্দ সঙ্গে এল, এসব ঝামেলায় পড়তে হত না। সামন্তদের বাড়ি পৌঁছে গিয়ে মুড়ি জল-টল খেতে পেতাম এতক্ষণে। দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন সব দিক থেকেই...

—ওই গৌরাঙ্গকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন না, কোথাও দোকান-টোকান আছে কি না! অঞ্জনা সামান্য কঁকিয়ে উঠল।

একটু চিন্তা করে আমি গৌরাঙ্গের খোঁজে পা বাড়ালাম। খানিকটা এগিয়ে গেছি তবু স্পষ্ট শুনতে পেলাম, পবিত্র ব্যঙ্গের সুরে অঞ্জনাকে বলছে, দেখ, তোমার দ্যাশের লোক তোমারে বাঁচাইতে পারে কিনা!

মাটি রসহীন শুকনো। ফলে গরুর খুরের আঘাতে, গোযানের চাকার চাপে মাটি ধুলো হয়ে গেছে। এধার-ওধার উড়ে যাচ্ছিল হাওয়ায় হাওয়ায়। গরুর গাড়িতে পবিত্র ও অঞ্জনা এই প্রথম চড়ল। আমার অভিজ্ঞতা এই নিয়ে তৃতীয়বার। মন্থর গতির এই

যানে চাপলে মনে হয় যেন অনন্তযাত্রায় চলেছি। যেন পথ কোনও দিন ফুরোবে না। গৌরাঙ্গের ভয়ে কিংবা আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে— যে কারণেই হোক সামন্তদের বাড়িতে শীতল খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল। আরও প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর চাকায় ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ তুলতে তুলতে গরুর গাড়িটা এসেছিল। ছইয়ে ঢাকা। ভেতরে খড়ের গদি। তার ওপর খেজুর-পাটি বিছানো। তেঁতুলতলার সামনে এসে, হ-হ্-আই-আই-হ্ করে গরু দুটোকে থামিয়ে গাড়োয়ানের আসন থেকে নেমে এসে লোকটি হেসে বলেছিল, বাবুরা কেউ আসতে পারলেক নাই। সামন্তমশাই আপনাদের পত্র পেইছেন। তা আমাকেই পাঠিয়ে দিলেন। আমার নাম আজ্ঞে জিবু মণ্ডল। চলুন, আর দেরি লয়। বেলা প্রায় গড়িয়ে গেছে। আপনাদের আবার চান-খাওয়া করতি হবে।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছি। একজন সামান্য গাড়ির চালক কী নিখুঁত ও আন্তরিক আপ্যায়নে আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে! জিবু মণ্ডল নামের সামন্তদের এই প্রতিনিধি যদি এমন সুন্দর হয় না জানি বীরেশবাবুরা কেমন! স্বস্তিতে আমার চোখ বুজে এসেছিল। পবিত্র লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, এখানে ভ্যান-রিক্‌শা-টিক্‌সকা পাওয়া যায় না? গরুর গাড়িতে যেতে তো অনেক সময় লাগবে। দেশ এত এগিয়ে গেছে, অথচ তোমরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলে আটকে আছ?

জিবু হেসে উত্তর দিয়েছে, পাওয়া যাবে না কেন? সবই আছে, এমন কী অটো রিক্‌শা। তবে কি জানেন, সামন্তবাবুরা এখনও পুরনো ব্যবস্থা ছাড়তি পারেননি। কাছেপিঠে যাওয়ার জন্যে, কাজে-কম্মে এই গাড়িই বহাল রয়েছে বাবু।

—একটু তাড়াতাড়ি যাবেন। অঞ্জনা বলেছিল।

'যে আজ্ঞে' বলে আমাদের নিয়ে ফল্‌সানগরের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছিল জিবু মণ্ডল। পথে একবার বলেছিল, আগেভাগে জানিয়ে এলে আপনাদের এত কষ্ট করতি হত না। দিনক্ষণ জানা থাকলি, আমি আগে থাকতি তেঁতুলতলায় গাড়ি লাগিয়ে রাখতাম গো।

ক্লান্তিতে অঞ্জনা ছইয়ের ভেতর পবিত্রর হাঁটুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিল। আমি বাইরে বসে রৌদ্রদগ্ধ গ্রাম দেখছিলাম! খড়, টালি অথবা টিন দিয়ে ছাওয়া বাড়ির পাশ দিয়ে, পেছন দিয়ে, সামনে দিয়ে পথ চলে গেছে। এদিকে, ওদিকে ছোট-বড় পুকুর। অপ্রতুল জল, তবু তারই মধ্যে গ্রাম্য বালকের দল জলচরা পাখির মতো খেলা করছে। মধ্যাহ্নের একান্তে স্নান সেরে নিচ্ছে সলজ্জ নারীরা। কুট্টি সোনাভাইকে কাঁখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দশ-এগারো বছরের বালিকা। রোগা, জিরজিরে। গায়ে জামা নেই। পরনে সস্তা, দড়িবাঁধা ইজের। দুগ্ধবতী গাভীদের মাঠ থেকে নিয়ে আসছে কোনও এক বৃদ্ধ মানুষ। বয়সের ভারে ন্যুব্জ। চোখের ওপরে হাতের আড়াল। গরুর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবছে, কারা যায়? অন্নদাচরণ-শ্যামাসুন্দরী ফ্রি প্রাইমারি স্কুল নামে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোল ঘেঁষে যেতে যেতে শুনতে পেয়েছি কচিকাঁচাদের তারস্বরে চিৎকার ঃ 'আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু।/

পেয়েছে খবর পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু।' 'স'-এর উচ্চারণ কানে এসে বেজেছিল। এসব ছাপিয়ে অখণ্ড সবুজ চোখ টেনে রেখেছিল আগাগোড়া। বসন্তের কিশলয় এতদিনে হৃষ্টপুষ্ট শ্যামলতর হয়ে গেছে। নানা আকৃতির গাছ আর ঝোপঝাড় পথে অথবা প্রান্তরে। একটা ফলন্ত আমগাছের প্রায় নীচ দিয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল গাড়ির ওপর দাঁড়ালেই আমের নাগাল পেয়ে যাব।

সারাটা পথ পবিত্র উসখুস করেছে। ওর ভাল লাগছিল না। অঞ্জনা কখনও-সখনও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি দু'-তিনবার ভেবেছিলাম, জিবু মণ্ডলকে সামন্তদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করব। ওঁরা কেমন লোক? মিলিন্দ যা বলেছে তা কি সত্যি? এমন মহানুভবতা দেখানো ওঁদের ব্যবসা নয় তো! জিবু মণ্ডল সামন্তদের কাছের লোক, ও সব কিছুই জানে। তবে অনেক কিছু চিন্তা করে ওকে আর জিজ্ঞেস করিনি। এসব প্রশ্ন ওকে আঘাত করতে পারত কিংবা আমাদের প্রকৃতি সম্পর্কে ও বিরূপ ধারণা করত। হয়তো ভাবত, কলকাতার লোকগুলো কী সন্দেহপ্রবণ! বড্ড নীচু মনের মানুষ। জিবুও কোনও কৌতূহল দেখায়নি আমাদেরকে নিয়ে।

খানিকটা দূর থেকে বীরেশবাবুদেব বাড়িটা ছিপ্‌টি তুলে দেখিয়ে জিবু মণ্ডল বলেছিল, আমরা এসে গেছি গো। ওই যে দেখা যায় সামন্তমশাইদের ভদ্রাসন। নিকটে গেলে বুঝতে পারবেন।

জিবুর মুখে খাঁটি সাধুভাষা শুনে কৌতুক বোধ করছিলাম। চিঠির জায়গায় পত্র, বাড়ির বদলে ভদ্রাসন, কাছে না বলে নিকটে। অঞ্জনা ধড়মড় করে উঠে বসে বলেছিল, আমি একটু চান করব ইন্দ্রদা। গরমে আর পারছি না। আপনি একটু ব্যবস্থা করে দেবেন?

আরও কাছে আসতে সামন্তদের বিখ্যাত আবাসের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একতলা, চৌকো ধরনের কোঠা বাড়ি। বাইরের দিকের দালানের ছাদ ধরে রাখা আছে বড় বড় গোল থামের ওপর। বাড়িটার বয়স একশো বছরের কাছাকাছি। প্যাটার্ন ও অবস্থা দেখে তাই মনে হয়েছে। পলেস্তারা খসা। উল্টোপাল্টা রঙের পোঁচ থামে দেওয়ালে। কখনও সাদা, কখনও এলা, আবার কোথাও ক্যাটকেটে মেটে-লালের ছোপ।

ওই দিকের টিউবওয়েলটাকে পিছনে রেখে গরুব গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছিল অদূরের ওই ঝিঙে খেতটার পাশে। একটি নিরেট মাটির অঙ্গনে। গাড়ি থামিয়েই জিবু মণ্ডল লাফিয়ে নেমে এসে বলেছিল, বাবু আমাকে বাক্সটা দিন। এই রাস্তাটা দিয়ে বরাবর হেঁটে চলে যান দালানের কাছে। সামন্তমশাই নিশ্চিত আপনাদের জন্যে না-খেয়ে-দেয়ে অপেক্ষা করতিছেন।

ভাল করে ঘাড় উঁচিয়ে দালানের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দেখেছিলাম। কেউ কোথাও নেই। চলতে চলতে কানে এসেছে রবীন্দ্রসংগীত : আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেন...। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই মৃদু হেসে জিবু মণ্ডল বলেছে, সামন্তমশায়ের ছোট নাতি ওই ঝিঙে খেতে ওষুধ ইস্‌প্রে করছেন। পাশে টেপরেকর্ডে গান চলতিছে। কলেজ পাস ছেলে। খুব গান-বাজনা ভালবাসে।

কীর্তন গাইতে পারেন গো!
—কোথায় তিনি? দেখতে পাচ্ছি না তো! জিজ্ঞেস করেছে অঞ্জনা।
—খেতের ভেতরে কোথাও আছেন আর কি! সে আপনারা দেখতে পাবেননি। জিবু মণ্ডল বলেছিল।
—মাচানের ওপরে সব ঝিঙে গাছ তোলা আছে। তাই না! একে তো ঝিঙে-বাড়ি বলে! আমি বিজ্ঞের মতো বলেছি।
—আরে, আপনি জানেন দেখছি গো। জিবু আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, কলকেতার মানুষ গাছ-গাছালির বেত্তান্ত জানে বুঝি!
পবিত্র হঠাৎ চোখ-মুখ খিঁচিয়ে বলেছে, হ্যাঁ জানে। এতে অবাক হবার কী আছে! আমি সাঁতার জানি। মাছ ধরতে জানি। গাছে চড়তে...
মুখ দিয়ে শব্দ করে আমি পবিত্রকে চুপ করিয়েছিলাম। পবিত্র যা জানে বলে গর্ব করছে, গাঁয়ের মানুষের কাছে সেগুলো কিছুই নয়। এগুলো ওদের আশৈশব জীবনচর্যা। এসব গলাবাজি করে বলে ওরা কখনও শ্লাঘা অনুভব করে না। সামান্য চুপসে গিয়ে জিবু বলেছে, মোদের জ্ঞান বড্ড সীমিত বাবু।
ইঁট দিয়ে তৈরি সরু রাস্তাটা একেবারে দালানে ওঠার চারধাপের সিঁড়িটার কাছে এসে মিলিয়ে গেছে। আমরা ওখানে দাঁড়াতেই একজন ফরসা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধুতির খুঁটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে দক্ষিণ কোণেব দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, নমস্কার, নমস্কার। বাবা এতক্ষণ আপনাদের জন্যে এখানে বসে অপেক্ষা করছিলেন। তা অনেক বেলা হয়ে যাওয়াতে ওকে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। দয়া করে কোনও দোষ নেবেন না।
লজ্জিত হয়ে বললাম, এ আপনি কী বলছেন! আমরাই তো দোষী! না বলে-কয়ে চলে এসেছি।
—খণ্ডবেড়িয়ার কৃতীসন্তান মিলিন্দর চিঠিটা আমার বাবা যথাসময়ে পেয়েছেন। কিন্তু আপনাদের আসার তারিখ জানানো ছিল না! তবে তাতে কিছুই অসুবিধে হয়নি। আপনাদের জন্যে সব রেডি। চলুন, আগে বিশ্রাম করে, স্নানাদি করে নিন। তারপর দুপুরের আহার গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করবেন! আমি সামন্তমশায়ের মেজছেলে অপরেশ। আমাকে এরা সবাই কচিবাবু বলে ডাকে। ইচ্ছে হলে আপনারাও তাই ডাকতে পারেন। কচি আমার ডাকনাম।
—কচিবাবুর মতো উদার-মনের মানুষ হয় না। জিবু মণ্ডল বলেছিল।
—আই চুপ্ কর্। আসুন এইখানে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
কোঠাবাড়িটার পেছনে শান-বাঁধানো এক মস্ত মালটিপারপাস উঠোন। উঠোনের ওপারে সারি দেওয়া কয়েকটা টিনের চালের ঘর। পাশাপাশি দুটো ঘর আমাদের জন্যে ইতিমধ্যেই গুছিয়ে রাখা হয়েছে। খাট-বিছানা, টেবিল-চেয়ার, ছোট আলনা, জলের কুঁজো। অপরেশবাবু হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, আপনারা দু'জন পুরুষ ওইদিকের কুয়োতলায় চলে যান। পায়খানার জায়গা আছে আলাদা। ওখানে কুয়ো থেকে জল তুলে স্নান করে নেবেন। আর মা, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। মেয়েদের

জন্যে বাথরুম আদি বাড়িতে। ওখানেই সব সেরে ফেলতে পারবেন।

অঞ্জনার পেটের দিকে একঝলক তাকিয়ে অপরেশবাবু বলেছেন, বাথরুমে ভয়ানক শ্যাওলা মা, দেখে-শুনে পা ফেলবেন। আলো-বাতাস ঢোকে না তো। জিবু, মাকে ভেতর-বাড়িতে নিয়ে যাও।

অপরেশবাবু নমস্কার জানিয়ে চলে গেছিলেন। কুয়োর ঠাণ্ডাজলে আমি আর পবিত্র আরামে চান করেছি। পবিত্র ভুলে গেছিল, বিপদ ও অন্ধকার ওর পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছে। একটি কিশোর এসে আমাদের খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেছিল। কোঠাবাড়িটার ভেতরেও একটা উঠোন আছে। চারদিকে ঘর। ঘরের লাগোয়া বারান্দা। উঠোনের মাঝখানে বেলেপাথরের তুলসী মঞ্চ। বাড়ির ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। একই সঙ্গে নৈঃশব্দ্যের বলয় দিয়ে ঘেরা। অপরেশবাবু আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছিলেন। মেঝেতে পিঁড়ি পেতে বসে খাওয়ার মজাই আলাদা। বড় বড় কাঁসার থালা। যদিও বাটি এবং গেলাস স্টিলের। একজন মাঝবয়সী বিধবা পরিবেশন করেছেন। ভাত, আমড়া দিয়ে তৈরি টক, মুসুর ডাল, আলুভাতে আর পটলের তরকারি। শেষে একবাটি করে খাঁটি গরুর দুধ। অঞ্জনা কিছুতেই দুধ খেতে চাইছিল না। অপরেশবাবু বলেছিলেন, খেয়ে দেখুন, ভাল লাগবে। এ তো আর মিল্ক পাউডার নয়। ঘরে-পাতা দই ছিল, শেষ হয়ে গেছে। কয়েক চুমুক দেওয়ার পর অঞ্জনাব চোখ-মুখের আকৃতি বদলে গেছিল। অপরেশবাবু খুশি হয়েছেন। খাওয়ার শেষে আমাদের হাতে মুখশুদ্ধি তুলে দেওয়ার পর বলেছিলেন, আমি আপনাদের সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা নাগাদ ডেকে নিয়ে যাব। বাবার সঙ্গে সেই সময় আপনারা কথা বলে নেবেন। এখন গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিন।

ঘরের দিকে আসতে আসতে পবিত্র গলা নামিয়ে বলেছিল, লক্ষ করেছেন এঁরা কিন্তু এখনও থাকার ব্যাপারে কিছুই বললেন না। আমি পবিত্রর কথায় সাড়া দিইনি। মুগ্ধ চোখে তখন ফল্‌সানগরের নিবিড় প্রকৃতি দেখছিলাম। মন বলছিল, যা হয় হবে। সামন্তরা যেটুকু আতিথ্য দেখিয়েছেন তারও তো মূল্য অনেক।

আমরা সেই তখন থেকে অকাতরে ঘুমোচ্ছিলাম। একটু আগে সেই কিশোরটি আমাদের জন্যে চা-বিস্কুট নিয়ে এসেছিল। ও না-ডাকলে আমাদের ঘুম ভাঙত না। এখন পাঁচটা বেজে বাইশ মিনিট। একটু পরেই অপরেশবাবু আসবেন। আমি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি। পাশের ঘরে পবিত্র আর অঞ্জনা খুটখাট্ করছে। সম্ভবত ওরাও যাওয়ার জন্যে এক পা এগিয়ে রেখেছে। এবার শুধু অপরেশবাবুর আসার পালা।

প্রায়ান্ধকার সরু সিঁড়ি দিয়ে আমরা ছাদে উঠে এলাম। যদিও প্রায় ছ'টা বাজে। তবে আঁধার নামতে এখনও দেরি আছে দেখে কোনও বাতি জ্বালানো হয়নি। আসার সময় দেখেছি আদি বাড়ির বারান্দায়, এক কোণে বসে একটি যুবতী মেয়ে, মাথায় ঘোমটা তোলা, একগাদা হ্যারিকেন, লণ্ঠন ইত্যাদির কাচ পরিষ্কার করছে। ছাদে কয়েকটা বেতের চেয়ার পাতা। আরামকেদারার মতো দেখতে একটি চেয়ারে পেছন ফিরে একজন বৃদ্ধ মানুষ বসে আছেন। আমরা ওঁর মাথার শ্বেতশুভ্র চুলগুলো দেখতে

পাচ্ছি। দিনান্তের পাখিদের তিনি শস্যদানা খেতে দিচ্ছেন। ছাদের নীচু আল্‌সেতে বসে বেশ কিছু শালিক, চড়াই আর নাম না-জানা পাখি কিচির-মিচির করতে করতে দিনশেষের ভোজে মেতে উঠেছে।

যতটা সম্ভব গলার স্বর চেপে অপরেশবাবু বললেন, আপনারা পাঁচ মিনিট দাঁড়ান। পাখিদের দানা দেওয়া শেষ হয়ে গেলে বাবাকে ডাকব।

আমরা কিছু বলার আগেই বীরেশ সামন্ত মুখ না ঘুরিয়েই বলে উঠলেন, কচি, ওঁদের আসতে দাও। বসতে বলো।

অপরেশবাবুর চোখের ইঙ্গিত পেয়ে আমরা সামন্তমশাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অঞ্জনা কী ভেবে মাথায় কাপড় তুলে ওঁকে ঢিপ করে প্রণাম করল। উনি ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, থাক, মা থাক। সুখী হও।

বিশাল সৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ালে যেমন আপনা থেকে মাথা নুয়ে আসে, তেমনি আমার আর পবিত্রর অবস্থা হল। আমরাও ওঁকে প্রণাম করলাম। মৃদু হেসে বীরেশবাবু হাত তুলে বললেন, শুভায়ু ভবতু। বসুন বসুন। তারপর আমাদের দু'জনের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে পবিত্রর ডান হাতটাকে খপ্‌ করে ধরে বললেন, তোমার নাম পবিত্র।

পবিত্র কেমন যেন বিভোল হয়ে গেল। ওর হয়ে আমি বললাম, হ্যাঁ, মিলিন্দ এর কথাই আপনাকে লিখেছে।

—ইন্দ্রবাবু, মিলিন্দভায়ার সঙ্গে আপনার চেনা-জানা হল কী করে? সামন্তমশাই এখনও মৃদু মৃদু হাসছেন।

সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তটা বললাম। উনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, পবিত্র আপনার কে হয়? আত্মীয়!

এসব প্রশ্নের একটাই উত্তর—না। কিন্তু আমি সেটা বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। ঢোক গিলে ওঁকে বললাম, আত্মীয়ই বলতে পারেন। এ বড় বিপদে পড়েছে সামন্তমশাই। মারাত্মক বিপদ। মেরে পাড়াছাড়া করানোর রাজনীতি...

—জানি, ওর কাছ থেকে সব শুনব। এ জিনিস নতুন নয়। রেন অফ টেরর ইংরেজ আমল থেকে চলছে। এসব কোনওদিন বন্ধ হবে বলে মনে হয় না। একটু থেমে সামন্তমশাই হঠাৎ অঞ্জনাকে বললেন, হ্যাঁ মা, তুমি নাকি দুধ খেতে চাচ্ছিলে না!

মাথা নীচু করে অঞ্জনা মিনমিনে গলায় বলল, হ্যাঁ।

—ছোটবেলায় আমার ছেলেমেয়েরা এক ফোঁটা দুধ খেতে পায়নি। কী করে খাবে, পেলে তো! তমলুক থেকে যে সব বিপ্লবীরা কাঁথির দিকে যাবে বলে রাতের অন্ধকারে হলদি নদী সাঁতরে আমাদের বাড়িতে আসত, তাদের তো আর দু'দণ্ড দাঁড়নোর অবসর ছিল না। তাদের প্রায় তক্ষুনি বেরোতে হবে। ভিজে জামাকাপড় ছাড়ার সময় পর্যন্ত থাকত না। সে কী অবর্ণনীয় কষ্ট। সারারাত ধরে উনুনে ভাতের হাঁড়ি বসানো থাকত। ভাত হচ্ছে তো হচ্ছেই। কতজন আসবে তার ঠিক নেই। ভাত, ডাল আর একটা সামান্য তরকারি। সেই সঙ্গে একটু দুধ। শুধু তো আর ইংরেজদের সঙ্গে নয়, প্রকৃতির সঙ্গেও বিপ্লবীদের লড়তে হত। একটু বলকারক দুধ ছাড়া আর কিছুই দিতে

পারতাম না। সামর্থ্যই ছিল না। অবশ্য এখনও নেই। 'দীনদশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না।' হাঃ হাঃ। এখন কী মনে হয় জানেন ইন্দ্রবাবু, সেদিন বাচ্চাদের মুখ থেকে দুধের বাটি কেড়ে নিয়ে ভুল করেছি, অন্যায় করেছি।

আমি বিনীত স্বরে বললাম, আমাকে আপনি বলবেন না। লজ্জা পাব। আপনার স্যাক্রিফাইসের কোনও তুলনা হয় না। কিন্তু কেন অন্যায়, ভুল—এসব বলছেন?

—কমিউনিস্টরা একসময় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বলত না—ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়! এখন মনে হচ্ছে, এদের ফাঁকা আওয়াজের সবটাই ফাঁকা ছিল না। এর মধ্যে কিছুটা সত্যি আছেই। কি হে ভায়া, তুমি কমিউনিস্ট নাকি!

পবিত্র আমার দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। আমি হেসে বললাম, না। আপনি বলুন।

—কী আর বলব! সবই তো তোমরা জান। আমি এখন ওপারের ডাকের অপেক্ষায় দিন গুনছি। আর কতদিন! তিরাশি বছর বয়স হয়ে গেল। তাম্রপত্র পেয়েছি, পেনশন ভোগ করছি—আবার কী! এবার থামা উচিত। হাঃ হাঃ!

শতকরা নব্বইজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এই হতাশায় ভুগছেন। আমরা সকলেই জানি, তাঁরা তাঁদের স্বপ্নসম্ভব দেশের সঙ্গে এই দেশকে মেলাতে পারছেন না। বীরেশবাবু সেই একই পথের পথিক। আমি আশ্চর্য হলাম না। তবে আমাকে অবাক করে দিয়ে সামন্তমশাই বললেন, আমাকে তা বলে পেসিমিস্ট ভেবো না। আমি কিন্তু এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। বিপ্লবীরা আজীবন বিপ্লবী। আনটিল হিজ ডেথ। তাকে অন্যায় আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হয়। এবং ওই দুটো জিনিসের হাত থেকে দেশের লোক এখনও মুক্তি পায়নি। তার উদাহরণ এই দুই স্বামী-স্ত্রী।

—আপনার কথাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি বললাম।

—স্বীকার-অস্বীকারের প্রশ্ন নয়। এটাই সত্যি। ট্রুথ। আসলে...সামন্তমশাই কী ভাবতে ভাবতে চুপ করে গেলেন।

হঠাৎ খেয়াল হল অপরেশবাবু কখন চলে গিয়েছেন। বৃদ্ধ তখন থেকে অনেক কথাই বলছেন, কিন্তু এখনও পবিত্রদের থাকার ব্যাপারটা কথা প্রসঙ্গে উঠে এল না। অথচ ওটাই সবচেয়ে জরুরি।

—আমার ভাই কুমারেশ উনিশ'শো তিরিশে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন করতে গিয়ে মারা গেছিল। সতেরো বছরের কিশোর পুলিশের নির্মম, নিষ্ঠুর ব্যাটনের আঘাত সহ্য করতে পারেনি। বৃদ্ধ চোখ বুজে আবার কথা শুরু করলেন, যেদিন বৈকালে কুমারেশের বন্ধু বিনোদানন্দ খবরটা দিতে এসেছিল, সেদিনও আকাশে অমন গোলপানা চাঁদের উদয় দেখেছিলাম। বীরেশবাবু হাত তুলে দেখালেন!

আমরা তিনজনই বিস্ময়ে চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম পুব দিগন্ত থেকে সত্যিই উঠে এসেছে চেনা চাঁদ। বিকেলের আলো এখনও অম্লান, তাই চাঁদের রঙ বেশ ফ্যাকাশে। তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

—ভায়ের মৃত্যুতে আমাদের পরিবার কিন্তু ভেঙে পড়েনি। বরং সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা

করেছিলাম, 'ফ্রিডম মুভমেন্টটাকে আরও এগিয়ে দেব। যতদূর সামর্থ্য। এখন দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না, একটা সময় কী অবর্ণনীয় দুঃসময় এই পরিবারটার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। ছেচল্লিশের শেষের দিকে পুলিশ জানতে পেরেছিল ফল্‌সানগরের এই ঘাঁটিটার কথা। তেঁতুলতলার পাশে যে-ঘাটটা আছে সেটার খবরও পেয়ে গেছিল। তখন খুব হয়রানি করত, কারণে-অকারণে। কোনও প্রমাণ পেত না বলে আরও আক্রোশ। বাবা-কাকাকে, আমাকে, বাড়ির বাগাল-মুনিষদের কতবার থানায় নিয়ে গেছে, বেধড়ক মেরেছে। জেল খাটিয়েছে। তবু একটা বর্ণও বের করতে পারেনি। বিশ্বাস করো, আমরা জীবনপণ করেছিলাম। কথার কথা নয়, একেবারে কাজে।

—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আপনাদের কাহিনী লেখা আছে। পবিত্র খুব গুরুত্ব দিয়ে বলল।

—লেখা আছে! আমাদের কথা! এই ফল্‌সানগরের সামন্তবাড়ির প্রসঙ্গ! তুমি পড়েছ? বীরেশবাবু সকৌতুকে ভুরু নাচিয়ে সোজা হয়ে বসলেন, তুমি বাজে কথা বলছ ভায়া। আমাদের নীরব, নিঃশব্দ ত্যাগের ইতিহাস ফ্রিডম মুভমেন্টের হিস্ট্রিতে স্থান পাবে কী করে! আমরা তো কাউকে বলতে যাইনি! বললে তো লিখবে! কেউ জানেই না।

—এসব কি আর জানানোর অপেক্ষায় থাকে। আমি বললাম, আত্মদানের সৌরভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এবং তা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

—না, ইন্দ্র না। তুমি ভুল বলছ। শুনতে ভাল লাগছে, কিন্তু তোমার কথাগুলো স্তোকবাক্য ছাড়া আর কিছু নয়। যাকগে ওসব বাদ দাও। কাজের কথায় আসি। এখানে আসার পর থেকে তোমাদের কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো!

প্রায় সমস্বরে আমরা বললাম, না, না। কী যে বলেন!

—মা লক্ষ্মী, তুমি আজ দুপুরে নিরুদ্বেগে ঘুমিয়েছ তো! সামন্তমশাই ঝুঁকে পড়ে অঞ্জনার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আবেগে, বিহ্বলতায় অঞ্জনার চোখে জল ভরে এল। দু'-তিনবার ঢোক গিলে মৃদুস্বরে ও বলল, হ্যাঁ অনেক দিন পরে। গত এক মাস ধরে যা চলছে!

—তোমার শরীরের পক্ষে এখন ঘুম খুব প্রয়োজন। এবার থেকে তুমি দ্বিপ্রহরে নির্বিঘ্নে ঘুমোবে মা। সামন্তমশাই ধীর গলায় কথাগুলো বলে চুপ করে গেলেন। অপলকে দূরের সবুজ খেতগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সামান্য গম্ভীর গলায় বললেন, ইন্দ্র, আগামীকাল পবিত্রকে সঙ্গে নিয়ে তুমি চলে যেয়ো।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ওঁর আদেশের কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি তো কালই চলে যাব, সেটাই ঠিক করা আছে। কিন্তু পবিত্র, কেন? মাথা চুলকে বললাম, তাই হবে। তবে পবিত্র...। আপনি তো জানেন...। মিলিন্দ সব লিখেছে।

—মিলিন্দ সামান্য ভুল করেছে। অবশ্য ওর দোষ নয়। ও হয়তো জানত না। ইন্দ্র, শোনো, গত দু'-তিন বছর ধরে আমরা আর রাজনৈতিক উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিই না। আগে দিয়েছি। কংগ্রেস, সি পি এম, জনতা পার্টি—কিছুই বাছবিচার করিনি। এগরা

আর রামদহের দুটি নকশাল ছেলে দীর্ঘদিন এখানে প্রায় লুকিয়েছিল। এখন ওসব বন্ধ করে দিয়েছি।

এমন একটি অকল্পনীয় দুঃসংবাদের জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোনও রকমে বললাম, সে কী! আপনাদের ঐতিহ্য।

—এমন ঐতিহ্যের কোনও মূল্য নেই। বীরেশ সামন্ত হেসে বললেন, পবিত্র তুমি আবার ব্যাটেল ফিল্ডে ফিরে যাও। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যারা পালিয়ে আসে তাদের আর ঠাঁই দেব না। আগে যা দিয়েছি, দিয়েছি।

—একটা চিঠি দিয়ে আপনার এইসব সিদ্ধান্তের কথা আগে জানিয়ে দিতে পারতেন। পবিত্র রেগে গিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, আমরা তা হলে আসতাম না, অন্য পথ দেখতাম।

—তুমি রাগ করছ কেন ভায়া! আমি যা বললাম, একটু ভেবে দেখ।

—আমাকে ওরা খুন করে ফেলবে, আপনি জানেন? এতে ভাবাভাবির কী আছে?

—ওরা ভয় দেখাচ্ছে। সামন্তমশাই মৃদু হেসে বললেন।

—আপনি কিচ্ছু জানেন না? খুনের রাজনীতি বোঝেন? গোঁয়ারতুমি দেখাতে গিয়ে ওদের হাতে খুন হয়ে যাব! বাঃ আপনি তো বেশ বুদ্ধি দিচ্ছেন! পবিত্র বিকৃত গলায় বলল। উঠে দাঁড়াল উত্তেজনায়।

—আপনি একটু পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখুন। আমি করুণ স্বরে বললাম, প্রবল শক্তিমানদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বেঘোরে ওর প্রাণটা যাবে। মারাত্মক ভুল করা হবে সামন্তমশাই! এখনকার পলিটিকস্ অন্যরকম। নীতিহীন, ব্রুট।

—এ তুমি কী বললে ইন্দ্র? আমার ভাই কি তবে ভুল করেছিল। বীরেশবাবু দু'চোখ কপালে তুলে বিস্ময়াহত স্বরে বললেন।

—ইন্দ্রদা, আপনার আহাম্মকির জন্যে এমন বেইজ্জত হতে হল। অন্য কোথাও এতদিনে ইজিলি ব্যবস্থা হয়ে যেত। অঞ্জনা, চলো। এই যে দাদু, কাল ভোরেই আমরা চলে যাব।

—তোমরা যাও। কিন্তু মা লক্ষ্মী থাকবে। ওকে আমরা মাথায় করে রেখে দেব। কেন জানো? আমি চাই ফল্‌সানগরের এই তীর্থভূমিতে ওর সন্তান ভূমিষ্ঠ হোক। ভাবী বীরের জন্ম হোক এখানে। সেই নবজাতক আবার নতুনভাবে যুদ্ধ শুরু করবে। গান্ধীজির স্বপ্নের দেশ, নেতাজির স্বপ্নের ভারত গড়ে তুলবে। ও থাক, ও থাক। সামন্তমশাই আবার অঞ্জনার মাথায় হাত ছোঁয়ালেন। ওঁর দুটি ঠোঁট কাঁপছে।

অঞ্জনা শব্দ করে কেঁদে উঠল। পবিত্র কিছুতেই মাথা তুলে তাকাতে পারছে না। আমি দেখলাম, বিকেলের সেই চাঁদের রঙ আর ম্লান নয়। ভারি উজ্জ্বল। চরাচরে সন্ধ্যার আয়োজন সম্পূর্ণ।

বাঁচার রাস্তা

পলশুণ্ডার বৈতুল মণ্ডল সশব্দে হাই তুলে বলল, এবার আপনাকে উঠ্তি হবে। এর পরের ইস্টিশন দেবগ্রাম।

চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল নিশিকান্ত। একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। সেই মাঝরাত থেকে ঠায় একভাবে বসে আছে। জানলার ধারের সিঙ্গল সিটে বসতে গিয়ে এই বিপত্তি। একটু হাত-পা ছড়ানোর পর্যন্ত উপায় নেই। ওপাশের সিটে বৈতুল মণ্ডল বসে আছে জবরদখল কলোনির পাণ্ডার মতো। নিশিকান্তর মাথার ওপরের বাঙ্কটা আর একটা লোকের দখলে। ট্রেন ছাড়ার একটু পরে লোকটা সেই যে লম্বা দিয়েছে, এখনও ঘুম ভাঙেনি। কোথায় নামবে কে জানে! ঘুমন্ত লোকটার ধুতির কোঁচা বাঙ্কের ওপর থেকে খসে পড়ে ঝুলছে। একেবারে নিশিকান্তর মুখের সামনে। একটু শুতে না-পারার কষ্টটা প্রায় ঘণ্টা তিনেক বসে থাকার পর টের পেয়েছে নিশিকান্ত। বৈতুল মণ্ডল বসে বসে ঘুমিয়ে নিয়েছে। ঘুমোতে ঘুমোতে লোকটা স্বপ্নও দেখছিল। 'মারবো শালাকে এক থাপ্পড়' বলে চেঁচিয়ে উঠেছে একবার। এইভাবে রাত-বিরেতে ট্রেনে চলাফেরা করে এদের অভ্যেস হয়ে গেছে। যেভাবে হোক ঘুমিয়ে নিতে এদের অসুবিধে হয় না। নিশিকান্ত সেই অর্থে দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি।

সিটের তলা থেকে ছেঁড়া-ফাটা তাপ্পিমারা কিটস ব্যাগটা বের করে নিশিকান্ত আড় ভাঙল। বাইরে ভোরের আলো। ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে কমে আসছে। বাঙ্কে মাথা ঠুকে যাওয়ার ভয়ে একটু তেরছাভাবে উঠতে গিয়ে ঝুলন্ত কোঁচাটা নিশিকান্তর সারা মুখ বুলিয়ে গেল। আর কিছু নয়, ধুতিটা বড্ড নোংরা আর দুর্গন্ধে ভরা। নিশিকান্তর মুখ বিকৃতিতে কুঁচকে যেতেই বৈতুল মণ্ডল হেসে বলল, ঘেন্নাই করুন আর রাগই করুন, এরেই বলে, ভক্তের কোঁচা ভগবানে দোলায়! কেমন ঘুমুচ্ছে দেখেছেন!

এই লোকটা বেশ দিলখোলা। এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। ধর্মে মুসলমান। পলাশীর ওদিকে কোথায় যেন পলশুণ্ডা বলে একটা গ্রাম আছে, সেখানে থাকে। গুড় আর ডিজেল পাম্প ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করে। সিগারেট ধরানোর জন্য লাইটার চাইতে গিয়ে বৈতুলের সঙ্গে নিশিকান্তর আলাপ। আলাপ মানে নিশিকান্তই ঠেলায় পড়ে জিজ্ঞেস করেছিল, দেবগ্রাম পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

প্রশ্ন শুনে বৈতুল মণ্ডল বেশ অবাক হয়ে বলেছিল, দেবগ্রাম! সে তো এখন অনেক দূর! এখনও কেষ্টনগর এলো না, তায় দেবগ্রাম। তা, আপনার এই নাইনে প্রথম আসা হচ্ছে বোধহয়!

বোকার মতো একটু থ হয়ে নিশিকান্ত বলেছে, হ্যাঁ, এই মানে...বহু বছর আগে

একবার...তখন আমার বয়স সাত-আট বছর...না, তাও হয়নি, আরও ছোট। কিছু মনে নেই আর কি!

—ও, তাই বলুন। ন্যাংটো পোঁদে এয়েছিলেন। বৈতুল মণ্ডল খিক-খিক করে হেসে বলেছে, এখন চেপে বসুন দিকি। আমি দেবগ্রাম এলে ডেকে দেব'খন।

—আপনি কোথায় নামবেন? নিশিকান্ত ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করেছিল।

—আজ্ঞে পলাশী। ভয় নেই, আপনার পরে নামব। সস্তা সিগারেটে সুখটান দিয়ে বৈতুল মণ্ডল বলেছে, আমার ঘর অবশ্য পলশুণ্ডায়। পলাশীতে নেমে আরও এগারো মাইল ভিতরে। তা বাবু, আপনি পলাশীর নাম শুনেছেন তো!

নিশিকান্তর আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। যা জানার-তা জানা হয়ে গেছে। লোকটা দয়া করে দেবগ্রাম স্টেশনে নামিয়ে দিলেই এ যাত্রা নিশ্চিন্ত। ততক্ষণে কামরার প্রায় অর্ধেকের বেশি লোক ঘুমিয়ে পড়েছিল। যে যেমনভাবে পেরেছে। বৈতুল মণ্ডলও ঘুমোচ্ছিল। ওকে জেগে উঠে লাইটার জ্বাল্‌তে দেখে নিশিকান্তর সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেটা চিড়বিড়িয়ে উঠেছে। বুক পকেট থেকে সিগারেটের চোপসানো প্যাকেটটা বের করে নিশিকান্ত বলেছিল, একটু আগুনটা দেবেন দাদা? বৈতুল মণ্ডল কোনও কথা বলেনি। মাথা নেড়ে লাইটারটা কেবল এগিয়ে দিয়েছিল। তারপর নিজের দায়ে নিশিকান্ত দেবগ্রামের সুলুক-সন্ধান করেছে। লোকটা এত বকবক করতে ভালবাসে জানলে নিশিকান্ত গায়ে পড়ে আলাপ করত না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখে হাসি টেনে ও বলেছিল, পলাশীর নাম শুনবো না। শুনেছি, শুনেছি।

—হাঃ হাঃ, কে না শুনেছে! রাজায়-রাজায় অত বড় যুদ্ধ হয়েছিল। সেসব জায়গা-বাগান এখনও আছে বাবু। তা একদিন দেবগ্রাম থেকে চলে আসুন না! রেলগাড়িতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। পলশুণ্ডায় আমার বাড়িতে একটু না হয় পদধূলি দেবেন। খাওয়া-থাকার অসুবিধে হবে না। বৈতুল মণ্ডলের বাড়ি বললেই যে কেউ দেখিয়ে দেবে। আল্লার দয়ায় বাবু, একটু গুছিয়ে নিয়েছি। গুড়ের সিজিনে গুড়ের বিজনেস করি আর সংবৎসর ডিজেলের পাম্প মিসিন চাষে ভাড়া খাটাই।

এত সব নিশিকান্ত জানতে চায়নি। লোকটা নিজে থেকেই বলেছে। কোনও যেন রাখঢাক নেই, অদ্ভুত সারল্যে ঘর-সংসারের কথা শুনিয়েছে। বৈতুল মণ্ডলকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে। মোটা পয়সা হাতে আছে। দাড়ি-গোঁফহীন মুখটা পোড়খাওয়া ফড়েদের মতো। নস্যি রঙের সুতির পাঞ্জাবি আর ময়ূরকণ্ঠী নীলে চোবানো সাদা পায়জামা পরা লোকটার বয়স আন্দাজ করা শক্ত। বৈতুল মণ্ডলের দিলখোলা স্বভাবের গন্ধ পেয়ে সেই মুহূর্তে নিশিকান্তর মাথার ভিতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে-থাকা পোকাটা নড়ে উঠেছিল। আজকাল সরল সোজা লোকের বড় অভাব। অথচ নিশিকান্ত এই জাতীয় লোকই হন্যে হয়ে খোঁজে। দু'বেলা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য এই মুহূর্তে দিলখোলা কিংবা একটু বোকাসোকা টাইপের মানুষ নিশিকান্তর বড়ো প্রয়োজন। যে-সহজে মিথ্যে কথা বিশ্বাস করবে, ধাপ্পাবাজি ধরতে পারবে না, জগ মেরে টাকা খিঁচে নেওয়ার সময় সন্দেহ করবে না। ইদানিং নিশিকান্তর দিনযাপন শুরু হয় ধাপ্পাবাজির ফাঁক-ফোঁকর খুঁজতে খুঁজতে।

এ ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না। কলেজ স্ট্রিটের একটা পুরনো কাপড়ের দোকানে শাড়ি-ধুতির গাঁটরি নামানো-ওঠানোর কাজটা চলে যাওয়ার পর থেকে নিশিকান্ত অনেক রকম চেষ্টা করেছে। ফুটপাথে প্লাস্টিকের অতি কমদামি জিনিস সাজিয়ে হকারি, বইপাড়ায় খদ্দেরের হাত থেকে বুক লিস্ট ছিনিয়ে নিয়ে বই খুঁজে আনা, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন অফিসের সামনে দালালি করা, এমন কী সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রি পর্যন্ত। কিন্তু এর কোনওটাতেই নিশিকান্ত সুবিধে করতে পারেনি। এখন সব জায়গায় প্রতিপক্ষ, প্রতিযোগিতা কিংবা অনিবার্য কারণে পিছু হটতে বাধ্য হওয়া।

নিশিকান্ত একা মানুষ। কাউকে প্রতিপালন করতে হয় না। ক্যানাল ইস্ট রোডের একটা বস্তিতে এক চিলতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। কাপড়ের দোকানের সাড়ে তিনশো টাকার মাইনেতে টেনে-টুনে চলে যাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করার কোনও মানসিকতা নিশিকান্তর নেই। কখনও ছিল না। কিছু কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা ওর মনের মধ্যে মাঝেসাঝে ঘুরপাক খায়। কিন্তু সেগুলো কবে চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠবে নিশিকান্ত জানে না। আদৌ হবে কিনা কখনও ভাবেনি। হঠাৎ একদিন কাপড়ের দোকানের মালিক ছিঁচকে চোর, বেজন্মা, হারামি বলে তাড়িয়ে দিল। টাঙ্গাইল শাড়ির গাঁটরি থেকে দুটো শাড়ি হাওয়া। গুন্‌তির সময় ধরা পড়েছিল। মালিকের দৃঢ় ধারণা, নিশিকান্তই দু' দুটো শাড়ি চুরি করেছে। অতএব, ভাগো, কেটে পড়ো। বাবুর হাতে-পায়ে ধরেও ছাড় হয়নি। সব কাকুতি-মিনুতি ব্যর্থ হয়ে গেছে। একথা নিশিকান্ত অস্বীকার করবে না যে, একটা শাড়ি ও সরিয়ে ফেলেছিল। বস্তির হরিকিশোরের ঘর থেকে ইলেকট্রিকের লাইন টানতে আর ফ্যান ভাড়া নিতে গিয়ে শ'খানেক টাকা ধার করতে হয়েছিল। টাঙ্গাইল শাড়িটা সরাতে হয়েছে ওই টাকা শোধ করার জন্য। কিন্তু এখনও নিশিকান্তর কাছে রহস্য---দ্বিতীয় শাড়িটা কে চুরি করল? গণেশবাবু, দুখিরাম, নৃপেনদা—কোন্ কর্মচারী? নিশ্চয় এদের মধ্যেই কেউ। এদিক থেকে দেখতে গেলে, নিশিকান্ত একা চোর নয়। অথচ শাস্তি হল ওর একার, কোনও মানে হয়! মাস মাইনের নিশ্চিত টাকাটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর থেকে আর মাথা তুলতে পারেনি নিশিকান্ত।

আজকাল চেনাপরিচিত সবাই জেনে গেছে নিশিকান্ত ধাপ্পাবাজ। নানা অজুহাতে, মিথ্যে গল্প বলে, অভিনয় করে টাকা ধার নেয়। পাঁচ, দশ, বিশ, তিরিশ। সকলকেই নিশিকান্ত টাকা শোধ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। বলাবাহুল্য, আজ পর্যন্ত কেউ টাকা ফেরত পায়নি। ফলে সবাই সতর্ক হয়ে গেছে। সেদিন তো বাবুরাম রাস্তায় ধরে সবার সামনে বেইজ্জত করে ছেড়ে দিল। কেবল মারতে বাকি রেখেছিল। কিন্তু নিশিকান্তর কিচ্ছু করার নেই। সব হজম করতে হচ্ছে মুখ বুজে। যাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছে, তাদের দেখলে এখন লুকিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। এই যে রাত-বিরেতের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চেপে নিশিকান্ত দেবগ্রামের দিকে ছুটে চলেছে, এও তো এক ধরনের পালানো, চোরের মতো। বেলেঘাটা, শিয়ালদা, কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের সবাই ওকে চিনে ফেলেছে। এইভাবে পালাতে বাধ্য হয়েছে নিশিকান্ত। নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে ও অন্যভাবে বাঁচতে চায়। যদি

তা নাও পারে, তা হলে অগত্যা ধাপ্পাবাজির পুরনো টেকনিকটাই এখানে ব্যবহার করবে। তারপর দেবগ্রামের সবাই যেদিন ওর পরিচয় জেনে যাবে সেদিন আবার অন্য কোনও জায়গায় সরে পড়বে নিশিকান্ত। এইভাবে যতদিন চালানো যায়, চালিয়ে যেতে হবে। পেছনে ফেরার পথ আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে।

কাল রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ দেবগ্রাম জায়গাটার কথা মাথায় এসেছিল। দেবগ্রামে বিদ্যাপিসি থাকে। নিশিকান্তর মৃত বাবার তিন নম্বর বোন। অর্থাৎ সেজো। বেলেঘাটার খালপুলের ওপরে নিশিকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খুব ছোটবেলার ধূসর স্মৃতি হাতড়ে খুঁজেছে দেবগ্রাম, বিদ্যাপিসি, টিনের বাড়ি, দুটো কালোরঙের ছাগল, সবুজ পানায় ছাওয়া পুকুরের জল। সেই ছেলেবেলায় বাবা একবার নিয়ে গেছিল। সঙ্গে মা। কিন্তু ওই একবারই। আর কখনও দেবগ্রামে আসা হয়নি। সেই প্রথম ও শেষবার কেন, কোন উপলক্ষে বাবা-মা নিশিকান্তকে নিয়ে এখানে এসেছিল, আজ আর মনে নেই! বিদ্যাপিসিকেও ওদের কলকাতার ভাড়াবাড়িতে কখনও আসতে দেখেনি নিশিকান্ত। তবে বাবার মুখে অনেক সময় বিদ্যাধরী নামটা নিশিকান্ত শুনেছে। বাবার অন্য তিন বোন—বড়, মেজো ও ছোটর বিয়ে হয়েছিল বাংলার বাইরে। তাদের কাউকেই নিশিকান্ত দেখেনি। বাবা অদ্ভুত ধরনের লোক ছিল। নিজের বোনেদের সঙ্গে পর্যন্ত সম্পর্ক রাখেনি। কেন রাখেনি, নিশিকান্ত জানে না। অথচ রাখলে এমনভাবে অপরের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে, চোর অপবাদ নিয়ে বেঁচে থাকতে হত না। দেবগ্রামের বিদ্যাপিসির বাড়িতে একবার যাওয়ার স্মৃতিসূত্র, সেই মুহূর্তে নিশিকান্তর কাছে মহার্ঘ বলে বোধ হয়েছে। একই সঙ্গে মনে হয়েছে, সারা পৃথিবীর মধ্যে ওই একটি মাত্র জায়গা আছে, যেখানে গেলে নিশিকান্ত একটু আশ্রয় পাবে। রক্তের সম্পর্কের কথা ভেবে বিদ্যাপিসি অন্তত দুর দুর করে তাড়িয়ে দেবে না। নিশিকান্ত তখনই দেবগ্রাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও বিদ্যাপিসি এখনও বেঁচে আছে কিনা, দেবগ্রামে গিয়ে কীভাবে পিসির বাড়ি খুঁজে বের করবে, বুড়ি আদৌ পাত্তা দেবে কিনা—এইসব সংশয়ও নিশিকান্তকে তাড়া করেছিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরপরই।

এসব অজানা আশঙ্কা নিয়ে কিছু ভাবার মানসিকতা আর ছিল না। জলে ডুবে যাওয়ার আগে দেবগ্রামকে খড়কুটোর মতো ধরতে চেয়েছে নিশিকান্ত। বাড়ি ফিরে গিয়ে জামা-প্যান্ট, লুঙ্গি, মাজন, চিরুনি আর মা কালীর একটা ছোট বাঁধানো ছবি হতকুৎসিত কিটস ব্যাগটায় পুরে নিশিকান্ত শিয়ালদা স্টেশনে চলে এসেছে। তারপর এই রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জার। জানলার ধারের সিঙ্গল ঘাট। নিদ্রাহীন রাত। বৈতুল মণ্ডল। এই লোকটার কাছ থেকে কিছু টাকা খিঁচে নেওয়ার কথা দু'-একবার ভেবেও পিছিয়ে এসেছে নিশিকান্ত। লোকটা হয়তো কিছু না-ভেবে দিয়েও দিত। কিন্তু নিশিকান্তর ভেতরে একটা খিঁচ থেকে যেত। বৈতুল মণ্ডলের সরলতা অন্যদের চেয়ে আলাদা। মানুষটা ওকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে অবলীলায়। অথচ নিশিকান্তর চেহারা-চাহনিতে কোথাও আপ্যায়ন পাওয়ার যোগ্যতা নেই। রোগা, চিম্‌সে, চোয়াড়ে মার্কা দেখতে হয়ে গেছে নিশিকান্ত। তোবড়ানো গাল, মুখে অকর্তিত দাড়ি, জামা-প্যান্টে মালিন্য, ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি—সব মিলিয়ে সংসারের বাইরে যেন ছিটকে

গেছে। বৈতুল মণ্ডলের সরলতা নিয়ে ছিনমিনি খেলতে গিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিশিকান্ত। যেমন উইদাউট টিকিটে আসবে ভেবেও শেষ মুহূর্তে শিয়ালদা-দেবগ্রামের টিকিট কেটেছে। ধরা পড়ে গেলে জেলে যেতে হবে—এই ভয়ের চেয়েও একটা স্বাভাবিক জীবনের ক্ষণিক স্বপ্নে নিশিকান্ত গত রাত থেকে বিভোর হয়ে আছে। অন্তত কিছুটা সময়ে অন্যদের এবং নিজেকে ঠকাতে চায়নি নিশিকান্ত।

ভোরের আলোয় সোনারঙ ধরেছে। জানলার বাইরে সবুজ মাঠ, খেত, টলটলে জলের পুকুর। কাছে অথবা দূরে ঘুমন্ত গ্রাম। সিটে এলিয়ে বসে নিশিকান্ত শান্ত, নিস্পন্দ ভোরের দৃশ্য দেখছিল। গাড়ির গতি আরও কমে আসছে। বুকের মধ্যে একটা উত্তেজনা অনুভব করল নিশিকান্ত। আর কয়েক মিনিট পরেই দেবগ্রাম। বিদ্যাধরী পিসি। প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছর আগেকার একটা অযত্নলালিত স্মৃতির খাতার পাতা খুলে ধরা। কিংবা এর কোনওটাই নয়। দেবগ্রাম শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারে। তখন আবার নিশিকান্ত একা। কোনও আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই। চেনা-পরিচিত লোকেরা সব শত্রু। নিশিকান্তকে পুনবায় ফিরে যেতে হবে সেই অন্ধকার জগতে, শঙ্কিত জীবনে।

—তা, দেবগ্রামে কি কুটুম্বের বাড়িতে বাবুর বেড়াতে আসা হচ্ছে? বৈতুল মণ্ডল আবার হাই তুলে জানতে চাইল।

একটু ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল নিশিকান্ত, হ্যাঁ। এর বেশি কিছু বৈতুল মণ্ডল জিজ্ঞেস করলে, যেমন কার বাড়ি যাবেন, কোন্ পাড়ায়—কিছুই বলতে পারবে না। পিসেমশায়ের নামটা পর্যন্ত জানে না ও। মা বেঁচে থাকলে জেনে আসা যেত। অসহায় নিশিকান্ত যে মাথায় তাল ঠুকে বেরিয়ে পড়েছে, এটা কি বৈতুল মণ্ডল ধরতে পারছে না। আত্মীয়-কুটুমের বাড়িতে এইভাবে কেউ বেড়াতে আসে? লোকটা আচ্ছা সিদেসাধা তো!

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ঘট-ঘটাং শব্দ তুলেই ট্রেন থামল। বৈতুল মণ্ডল তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিই।

কামরার দরজার সামনে এসে নিশিকান্ত থ। মাঠের মাঝখানে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনও প্লাটফর্ম নেই। নিশিকান্ত আমতা আমতা করে বলল, এখনও স্টেশন আসেনি বোধহয়। প্লাটফর্ম...

—আরে না না। এটাই দেবগ্রাম ইস্টিশন। এখানে ওসব পেলাটফরমের বালাই নেই। আপনি ছেলেবেলায় যখন এয়েছিলেন, তখনও এমন ছিল। দেশ একটুও বদলায়নি। ...এই হাতলটা ধরুন।...এবার সিঁড়ি দিয়ে নাইনের ওপর নেমে পড়ুন।...ওই যে দূরে ইস্টিশন মাস্টারের ঘর দেখা যাচ্ছে। ওদিক পানে চলে যান।...আবার দেখা হবে বাবু...। পারলে একবার আসবেন কিন্তু!

নিকানো উঠোনের যেদিকে বাড়ির ছায়া পড়েছে, সেখানে বসে কুলোর ঝপর ঝপর শব্দ তুলে ধান ঝাড়ছে এক বুড়ি। ধবধবে সাদা থান। গায়ে সেমিজ। মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলো ঝুঁটির মতো চুড়ো করে তালুর ওপরে রাখা। ফরসা গায়ের রঙ। সকালের উজ্জ্বল আলোর আভা বুড়ির গায়ে গিয়ে যেন মিশে গেছে। ডালপালা ছড়ানো ঝাঁকড়া আমগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে নিশিকান্ত দু'চোখ ভরে দেখল। এই বুড়ি

নিশ্চয়ই বিদ্যাপিসি। গাছতলা থেকে বাড়ির উঠোনের দূরত্ব প্রায় হাত পঞ্চাশেক। নিশিকান্ত যে চুপিচুপি এসে দাঁড়িয়েছে, বুড়ি তা টের পায়নি।

অদ্ভুত আনন্দে বুকের ভেতরে একটা চিনচিনে ব্যথা ছড়িয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে এই প্রথম এক আত্মীয়র বাড়িতে নিশিকান্ত থাকতে আসছে। নিজের থেকে। ছেলেবেলায় এর-ওর বাড়ি গেছে। কিন্তু সেসব আসা-যাওয়ার স্মৃতি ছেলেবেলায় পুতুলের মতো বহুদিন আগে হারিয়ে ফেলেছে নিশিকান্ত। তবে এর মধ্যে কেন যে বিদ্যাপিসির কথা হঠাৎ মনে পড়েছে ও বলতে পারবে না। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে ধান ঝাড়ছে ওই যে বুড়ি, ও আমার আপনজন, আমার বাবার নিজের বোন—এগুলো ভাবতে ভারি ভাল লাগছে। আর তখনই চিনচিনে ব্যথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের চারপাশে।

পা টিপে টিপে নিশিকান্ত এগিয়ে এলো। গাছতলা থেকে একটা সরু পায়ে চলার পথ বিদ্যাপিসিদের উঠোনে গিয়ে মিশেছে। এই পথটুকু পেরোলেই নিশিকান্তর দেবগ্রাম-যাত্রা শেষ হবে। আর কোনও কষ্ট থাকবে না। অথচ এই ঝাঁকড়া আমগাছটা পর্যন্ত এসে পৌঁছতে নিশিকান্তর কালঘাম ছুটে গেছে। কোনও কিছু জানা না-থাকলে যা হয়। অতবড় ট্রেন থেকে মাত্র ছ-সাতজন প্যাসেঞ্জার দেবগ্রামে নেমেছিল। রেললাইন পেরিয়ে, লাল ইটের তৈরি ইংরেজ আমলের স্টেশন-বাড়িটার কাছে আসতে আসতে দু'জন যাত্রীকে নিশিকান্ত জিজ্ঞেস করেছিল, দাদা, বিদ্যাধরী দেবীর বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? একজন সঙ্গে সঙ্গে জানে না বলে চলে গেছে। অন্যজন স্কুলমাস্টার-গোছের একটু দাঁড়িয়ে বলেছিল, বিদ্যাধরী দেবী! নাঃ, এই নামে এখানে কেউ থাকে বলে শুনিনি তো! এর স্বামী-ছেলেমেয়ের নামটাম কী? বলতে পারবেন!

নিশিকান্ত অসহায়ের মতো বলেছে, জানি না দাদা। উনি আমার পিসি হন। বহুদিন যোগাযোগ ছিল না। তাই কিছুই বলতে...

—সে কি, মেয়েলোকটি আপনার পিসি, অথচ কিছুই জানেন না। আশ্চর্য! লোকটি হতবাক হয়ে গেছে। কাঁধের ঝোলা-ব্যাগটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে সরিয়ে এনে ভুরু কুঁচকে বলেছে, কলকাতা থেকে আসা হচ্ছে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানকার কিছুই চিনি না তো! নিশিকান্ত হাসতে চেষ্টা করেছে।

—আপনি একটা কাজ করুন, ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তায় কিছুটা গেলেই বেপারিতলা পড়বে। ওখেনে দেখবেন সবজি-আনাজের পাইকার চাষিরা মাল বিক্রি করছে। ওরা হয়তো বলতে পারবে।

ভয়ে ভয়ে বেপারিতলায় এসে নিশিকান্ত একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। পথ দিয়ে আসতে আসতে গ্রামটাকে যতটা জনহীন বলে মনে হচ্ছিল ততটা নয়। রাস্তার পাশে একটা নীচু জমিতে বেশ কিছু লোক ঝিঙে, কাঁকরোল আর পেঁপের ঝাঁকা নামিয়ে বিক্রিবাটা করতে বসে গেছে। তবে বাজার এখনও জমেনি। খদ্দেরের সংখ্যা কম। সবাই এসে জোটেনি এখনও। এক ব্যাপারির কাছ থেকে আর এক ব্যাপারি, তারপর আর একজন—নিশিকান্ত ঘুরে ঘুরে বিদ্যাপিসির বাড়ি কোথায় জানতে চেয়েছে সবার কাছে। কেউ বলতে পারেনি। নিজেদের মধ্যে সামান্য আলোচনা করে, মুখ

চাওয়া-চাওয়ি করে ব্যবসার কাজে মনে দিয়েছে। নিশিকান্ত হতাশ হয়ে পড়েছিল। এই এতগুলো লোক, যাদের সঙ্গে দেবগ্রামের মাটির সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়, তারা যখন পারল না, তখন আর আশা নেই। ও যদি একটুখানি আভাস পেত কোথায় বিদ্যাপিসি থাকে, তাহলে সারা গ্রাম চষে ঠিক বের করে ফেলত। কষ্ট হলেও, নিশিকান্তর কাছে প্রাণের দায় এখন অনেক বড়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিশিকান্ত বেপারিতলার মাঠ ছেড়ে রাস্তায় উঠে এসেছিল। এবার দক্ষিণে যাবে না উত্তরে যাবে ঠিক করে নিচ্ছিল নিজের মনে। এমন সময় পিছন থেকে এক চাষি হেঁকেছে, ও কত্তা, শুনে যান, শুনে যান। কী যেন নাম বললেন?

রাস্তা থেকে প্রায় লাফিয়ে জমিটায় নেমে নিশিকান্ত উত্তেজিত হয়ে বলেছিল বিদ্যাধরী দেবী বিদ্যাধরী দেবী।

সেই চাষি একগাল হেসে বলেছে, বিদ্যেধরী-টরী জানি না। তবে হঠাৎ মনে পড়ল মাচণ্ডীতলার পশ্চিমে দুই বুড়ি থাকে। তাদের একজনের নাম বিদ্যে।

—তুই কী করে জানলি? ওর পাশের ব্যাপারি চাষিটা গলা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

—আরে, একদিন দুপুরে ওই বুড়িদের বাড়ির পাশ দিয়ে ঘরকে যাচ্ছিলুম। তা, দেখি একটা বুড়ি গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাকে যেন গাল পাড়ছে। আর মাঝে মাঝে বলছে, ও বিদ্যে, বিদ্যে, এদিকে এসো গো বউমা, দ্যাখো না, কোন্ ড্যাকরা আমগাছে ঢিল ছুঁড়ছে। এসো, এসো...। সেই যে বিদ্যে নামটা শুনেছিলুম, এখন হঠাৎ মনে পড়ল। একবার গিয়ে দেখতে পারেন, ওরাই আপনার মাসি-পিসি কি না।

প্রায় হাতজোড় করে করুণ মুখে নিশিকান্ত বলেছে, নিশ্চয়ই যাবো দাদা। মাচণ্ডীতলাটা কোথায় একটু বলে দিন।

একেবারে অন্ধকার থেকে একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে নিশিকান্ত আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠেছে। চাষি মানুষটাকে মনে হয়েছে সাক্ষাৎ দেবদূত। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে পথের হদিস নিয়ে নিশিকান্ত মাচণ্ডীতলার দিকে পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু বিপত্তি বাধিয়েছে গ্রামের মাটির পথ। সব একরকম দেখতে। সব ক'টা পথই চলে গেছে খেতের পাশ দিয়ে, পুকুরের পাড় ঘেঁষে, গৃহস্থের উঠোনের মধ্যে দিয়ে। মাটি আর ধুলোয় ভরা মেঠো পথগুলো কোথাও একটু চওড়া, কোথাও সরু। নিশিকান্ত বারচারেক পথ হারিয়ে ফেলেছে। সবচেয়ে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে পথের বাঁকগুলো। একে-তাকে জিজ্ঞেস করতে করতে একসময় নিশিকান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নিজের ওপর বিরক্তি এসে গেছিল অন্ধের মতো। একই জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে। শেষকালে এক বৃদ্ধ গ্রামবাসী ফাঁকা মাঠে পায়খানা সেরে সামনের একটা ডোবায় জলশৌচ করতে যাওয়ার পথে বলেছিল, শোনো বাবু, ওই যে বাঁশঝাড়টা দেখতে পাচ্ছো, ওটা ছাড়িয়ে আরও খানিকটা গেলি মাচণ্ডীর থান দেখতি পাবে। মায়ের থানে দশটা পয়সা দিয়ে পেন্নাম করবে। তারপর বাঁদিকে ঘুরে এট্টুখানি যেয়ে দেখতে পাবে একটা পুরান আমগাছ। বেশ ঝাঁকড়ো, ফলন্ত। সেই আমগাছের সোজাসুজি তাকালে ওই দুই বুড়ির বাড়ি। সোজা চলে যাও দিকি। আহা, রোদে ঘুরে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। তুমি কোত্থেকে এসেছ গা! আগে তো কখনও

ইধারে দেখিনি! বুড়িরা তোমার কে হয়?

বুড়োর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিশিকান্ত ম্লান হেসেছে। বুড়ো উদাস চোখে তাকিয়ে বলেছিল, ওই বুড়িদের দুইজনের শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্ক। একজনের নাম বিদ্যে, অন্যটার নাম চিন্তে। তবে দুইজনেই বেধবা। মুড়ি বাতাসা বিক্রি করে পেট চালায়। দুটোই বড় দুঃখী মেয়েছেলে।

সেই মুহূর্তে নিশিকান্ত নিশ্চিত হয়ে গেছিল, ওই দুই বুড়ির একজন ওর বিদ্যাপিসি। ব্যাপারি চাষিটি বাজে কথা বলেনি। বুড়োও বলছে, ওদের একজনের নাম বিদ্যে। নিশিকান্ত আর দাঁড়ায়নি। দ্রুত পা চালিয়ে এসেছে। আর পথ ভুল হয়নি। দূর থেকে পুরনো আমগাছটা দেখতে পেয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে নিশিকান্ত মাচণ্ডীকে মনে মনে প্রণাম জানিয়েছে।

খানিকটা এগিয়ে এসে নিশিকান্ত আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বুড়ি একমনে কাজ করছে। নিশিকান্তর অস্তিত্ব টের পায়নি। অনেকগুলো হাঁস একসঙ্গে প্যাঁক প্যাঁক করে কোথা থেকে যেন ডাকছে। হাঁসগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। নিশিকান্ত চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, কোনও দৃশ্যই চেনা লাগছে না। কিছুই আর স্মৃতিতে ধরা নেই। তারপর আরও দু'পা এগিয়ে এসে ও ডাকল, ও বিদ্যাপিসি, বিদ্যাপিসি!

বহুদিন আগে হারিয়ে-যাওয়া কোনও শব্দ, কোনও গন্ধ, কোনও বিবর্ণ ছবি হঠাৎ ফিরে এসে মানুষকে যেভাবে চমকে দেয়, বুকের মধ্যে ক্ষণিকের ঝড় তোলে, ঠিক তেমনভাবে 'বিদ্যাপিসি' শব্দটা বুড়িকে বাজপড়ার মতো চমকে দিল, কাঁপিয়ে দিল দুরন্ত ঝড়ের ঝাপটায়। ধানসুদ্ধ কুলোটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল। বুড়ি তীরবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত গলায় নিশিকান্তকে বলল, কে, কে আপনি?

—পিসিমা, আমি নিশি, নিশিকান্ত। আমাকে চিনতে পারছেন না।

—নিশিকান্ত! বুড়ি দ্রুত হাতে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে অবাক স্বরে বলল।

—হ্যাঁ, নিশিকান্ত। আমি আপনার ভাইপো। আপনার দাদা শশিকান্ত সরকারের ছেলে। ছোটবেলায় এখানে একবার এসেছিলাম। মনে পড়ছে?

থমথমে কালো মেঘ কেটে গিয়ে যেভাবে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে, তেমনভাবে বিদ্যাপিসির সারা দেহ থেকে আনন্দের বিভা ছড়িয়ে পড়ল এক লহমায়। পাগলের মতো দৌড়ে এসে পিসি বলল, নিশি তু-ই! তোকে যে সেই অ্যাত্তটুকুন দেখেছিলুম! কত বছর আগে। ওরে, তোর মুখটা যে একেবারে দাদার মতন! আয় বাবা, কাছে আয়! কতদিন পরে তোকে দেখলাম!

এই বহু আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটার জন্য নিশিকান্ত এত দূর ছুটে এসেছে। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে পা রেখেছে দেবগ্রামের মাটিতে। নিশিকান্ত বিহ্বল হয়ে গেল। পিসিকে প্রণাম করে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, পিসি অনেক বছর পরে...।

—কেমন আছিস বাপ! এতদিন পরে এই দুখিনী পিসির কথা মনে পড়ল! বনবাসে পড়ে আছি। কেউ আমার খোঁজ নেয় না।

বিদ্যাপিসির চোখ ছলছল করছে। নিশিকান্ত সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এই তো আমি এসেছি। কতদিন থেকে ভাবছি, আপনার এখানে আসব। কাজেকর্মে থাকি তো, আসতেই আর পারি না। আমার আপিসে আবার বড্ড কম ছুটি। শেষকালে অনেক

ঝুট-ঝামেলা করে চলে এলুম।

—বেশ করেছিস, বেশ করেছিস। আয় বাবা, দাওয়ায় এসে বোস। বিদ্যাধরী তাড়াতাড়ি একটা মাদুর বিছিয়ে দিল।

শুরুতেই মিথ্যে বলতে হল। নিশিকান্তর খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই। নিজের দুরবস্থার কথা বললে বিদ্যাপিসির এই আবেগ এক্ষুনি উবে যেতে পারে। কেননা পিসির নিজের অবস্থাও বেশ নড়বড়ে। দাওয়ায় বসে নিশিকান্ত দেখল, ঠিক উল্টো দিকে উঠোনের ওপারে খড়ে ছাওয়া একটা মাটির ছোট বাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এ বাড়িটার জং-ধরা টিনের চালে বড় বড় ফুটো। একটা লাউগাছ বেমক্কা চালে উঠে সংসার পেতেছে।

—হ্যাঁ রে নিশি, বউদি কেমন আছে! অসমাপ্ত কাজটা দ্রুত শেষ করতে করতে বিদ্যাপিসি জিজ্ঞেস করল।

নিশিকান্ত প্রথমে ধরতে পারেনি। বউদি! বউদি কে? ধাঁধার জট ছাড়াতে গিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারল, বিদ্যাপিসির বউদি মানে ওর মা। নিশিকান্ত গলা পরিষ্কার করে করুণ মুখে বলল, মা তো মারা গেছে।

—মারা গেছে, কবে! সে কী রে! বিদ্যাপিসির কাজের হাতদুটো আবার থেমে গেল, আমাকে তোরা কেউ খবর পর্যন্ত দিলি না। হায়, হায়, দাদা মারা যাওয়ার সময় বড়দির সোয়ামি এসে জানিয়ে গেছিলেন। তা, তখন আমার নিজের সোয়ামির এখন-তখন অবস্থা। আমি তোর বাপের ছেরাদ্দতেও যেতে পারিনি। এখেনেই দাদার নামে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়েছিলুম। বউদির মরার খবরটা জানতেই পারলুম না! তুই কী ছেলে রে!

মাথা নীচু করে নিশিকান্ত অপরাধীর মতো বসে রইল। মায়ের মৃত্যুর খবর কাউকে যে দিতে হবে, একথা তখন মাথায়ই আসেনি। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বাবা যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি করে গিয়েছিল, সেখানে আপনজন বলতে কেউ আছে—এটা ভাবার কোনও সূত্র ছিল না নিশিকান্তর সামনে। বস্তির ওই ছোট্ট ঘর থেকে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি এসে মাকে যখন নিয়ে গেল, সেদিন নিশিকান্ত একটা কথাই ঘুরেফিরে ভেবেছে—আমার আর কোনও বাঁধন নেই।

—যাক্ গে, যা ভাল বুঝেছিস, করেছিস। বউদির আত্মা স্বর্গে গিয়ে শান্তি পাক।...একটু বোস বাবা, হাতের কাজটা সেরে নিয়ে তোকে চা-মুড়ি দোবো।...ও হরি, তুই তো এখনও হাত-মুখে জল দিসনি। দাঁড়া, দাঁড়া তোকে আগে জল তুলে দি।

উঠোনের পশ্চিম কোণে একটা বাতাবি লেবুর গাছ। তার পাশেই শান বাঁধানো কুয়ো। বিদ্যাপিসি জল তুলতে এগিয়ে গেল।

—হ্যাঁ বউমা, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো! অ্যাঁ!

একটা তীক্ষ্ণ, খ্যানখেনে গলার আওয়াজে চমকে মুখ তুলে নিশিকান্ত দেখল, পোড়ো বাড়িটার পেছন থেকে দু'নম্বর বুড়িটা এগিয়ে আসছে। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ফুলের সাজি। বুড়ির কোমর পড়ে গেছে। সোজা হতে পারে না। খুব সম্ভবত চোখে

ভাল দেখে না।

কুয়োর মধ্যে দড়িসুদ্ধু বালতিটা ঝপাং করে ফেলে দিয়ে বিদ্যাপিসি চেঁচিয়ে বলল, বাবা নিশি, উনি আমার শাশুড়ি-মা। প্রণাম করো।...আমার ভাইপো এসেছে মা। অনেকদিন পরে। ওর নাম নিশিকান্ত।

মাটির দিকে ঝুঁকে আসা দেহটা অদ্ভুত কায়দায় খানিকটা সোজা করে বুড়ি অবাক গলায় বলল, ভাইপো! সে কে বউমা! চার কুড়ি বয়স হল, তোমার মুখে কখনও ভাইপো-বোনপো—এসব তো শুনিনি। কোথাকার কে এসে বলল, আমি তোমার ভাইপো আর তুমি নেচে উঠলে! সেই যে বলে না, একে তো নাচুনে বুড়ি, তায় পড়েছে ঢাকের বাড়ি। জানলে না, শুনলে না, অমনি খাতির যত্ন করতে শুরু করলে!

প্রণাম করবে বলে নিশিকান্ত উঠে পড়েছিল। কিন্তু আর এগোতে সাহস করল না। বিদ্যাপিসি দারুণ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। শাশুড়ি-মা যে এইভাবে অভ্যর্থনা জানাবে, স্বপ্নেও ভাবেনি। বিদ্যাপিসি মুখে হাসি টেনে বলল, কোথাকার কে কেন বলছেন মা! আমার দাদার ছেলেকে আমি চিনব না! ওই তো নিশি দাঁড়িয়ে আছে। জলজ্যান্ত ছেলেটা...

বুড়ি চোখের ওপর হাত রেখে আলো আড়াল করে নিশিকান্তকে দেখাব চেষ্টা করল। কি বুঝল বুড়িই জানে। চাপা স্বরে গজগজ করতে করতে বুড়ি টিনের বাড়ির মাঝের ঘরটায় উঠে এলো।

—কিছু মনে করিস না বাবা। মানুষটা অমন হয়ে গেছে। বিদ্যাপিসির কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ল অপার স্নেহ।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে নিশিকান্তর মনে হল, এ এক অন্য জগতে সে চলে এসেছে। চারদিকে গোধূলির আলো। উঠোনে সাত-আটটা ধূসর রঙের পাখি তারস্বরে চেঁচিয়ে শুকোতে দেওয়া ধান খাচ্ছে। একটা মিষ্টি গন্ধে ভরে আছে চরাচর। বিদ্যাপিসির শাশুড়ি-মা কুয়োতলায় বসে মাথায় ক্রমাগত চিরুনি দিচ্ছে। শনের মতো সাদা দু'গাছি চুল কিছুতেই যেন বাগ মানছে না। বুড়িটা একটু খিটকেলে। সকালের সেই সুবচন ছাড়া পরে আর কিছু যদিও বলেনি, কিন্তু নিশির প্রতি বুড়ির উপেক্ষা থেকেই গেছে। নিশিকান্ত অবশ্য বুড়ির ব্যবহার নিয়ে আদৌ আর ভাবছে না। বিদ্যাপিসির স্নেহ-মমতার পাশে এই উপেক্ষা কোন্ ছার।

এমন অতল, গভীর ঘুম অনেকদিন ঘুমোয়নি নিশিকান্ত। শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। বিদ্যাপিসি দুপুরবেলায় কত যত্ন করে খেতে দিল। ঢেঁকি ছাঁটা চালের সুস্বাদু ভাত, কলমি শাকের ঝোল, কাঁচা মুগের ঘন ডাল আর গুলে মাছের ঝাল-ঝাল বাটি-চচ্চড়ি। নিশিকান্ত অনেকটা ভাত খেয়েছে। দুপুরের এই ঘুমের মতো খাওয়াটাও ওর জীবনে একটা অনাস্বাদিত ঘটনা। প্রত্যেক দিন পাইস হোটেলে খেয়ে খেয়ে, এমন অন্ন-মহোৎসব যে হতে পারে, তা প্রায় ভুলেই গেছিল নিশিকান্ত। এর নামই কি স্বর্গসুখ!

খাওয়া-দাওয়ার পর বিদ্যাপিসি এই ঘরটা নিশিকান্তর থাকার জন্য গুছিয়ে দিয়েছে।

ঘরটায় যত উট্‌কো মাল সব ঢুকে ছিল। ঝাঁটার কাঠি, তালপাতা, জ্বালনের কাঠ, আলুর ঝুড়ি, গাদাখানেক নারকেলের মালা, ছেঁড়াখোঁড়া লেপ-তোশক-কাঁথা, তালের আঁঠি—আরও কত কি। নিজের হাতে সব ঝাড়পোঁছ করে, মালপত্তর সরিয়ে দিয়ে নিশিকান্তর শোয়া-বসার জায়গাটুকু করে দিয়েছে বিদ্যাপিসি। একমাত্র ভাইপোকে নিজের থেকেই বলেছে, তোর বড্ড কষ্ট হবে রে। তোরা কলকাতার বাবুমানুষ। কিন্তু কি করবো বল্। এর বেশি আমার আর সামর্থ্য নেই। নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাচ্ছিস। আপন মনে করে একটু মানিয়ে নিস্ বাবা।

লজ্জায় জিভ কেটে নিশিকান্ত তৎক্ষণাৎ বলেছে, কি বলছো গে পিসি, এ তো একেবারে স্বর্গ। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। তুমি ফাল্‌তু ভাবছো!

সকালে প্রথম এসে বিদ্যাধরীকে 'আপনি' সম্বোধন করেছিল নিশিকান্ত। কুয়োর ঠাণ্ডা জলে স্নানটান করে খেতে বসে আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে ও নিজের অজান্তেই 'তুমি'তে নেমে এসেছে। বিদ্যাপিসি অবশ্য এসব দিক্‌বদল খেয়ালই করেনি। সামান্য আয়োজন, অতি সামান্য উপকরণ সাজিয়ে চেষ্টা করেছে ভাইপোকে যত্নআত্তির স্বাদ দিতে।

ঘরের হাটখোলা দরজা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল নিশিকান্ত। পাখিগুলো খুব চেঁচাচ্ছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। বাসায় ফিরে যাওয়ার আগে ওরা তাই পেট পুরে ধান খেয়ে নিচ্ছে। বিছানা ও আলস্য ছেড়ে নিশিকান্ত ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। লুঙ্গিটা শক্ত করে বেঁধে নিয়ে উঠোনে নামতেই বিদ্যাপিসির গলা ভেসে এলো, কি, ঘুম ভাল হয়েছে তো!

ওপাশের রান্নাঘরে বসে বিদ্যাপিসি চায়ের আয়োজন করছে। নিশিকান্ত কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে বলল, হ্যাঁ পিসি, তোফা ঘুমিয়েছি। তোমার তুলনা নেই।

—বাঃ। যাও, মুখ ধুয়ে এসো। এক্ষুনি চা করে দেবো। বিদ্যাপিসির মুখে মায়ের মতো অন্তরতম, অকৃত্রিম হাসি খেলে গেল।

রান্নাঘরের কাছটায় একবাটি মুড়ি আর এক গেলাস চা নিয়ে বসে নিশিকান্ত জিজ্ঞেস করল, তোমার শাশুড়ি-মা চা খাবে না?

—উনি এসব চা-টা কখনই খান না। একাহারী মানুষ। দুপুরে একবার মাত্র অন্নসেবা। ব্যস। তারপর রাত্রে শোয়ার আগে একগেলাস জল, সঙ্গে একটা নাড়ু বা মুড়ির মোয়া। অথবা ছোট একখণ্ড গুড়।...ক'দিন থাকো, সব দেখেশুনে নিতে পারবে। বিদ্যাপিসি হাসতে হাসতে বলল।

—আচ্ছা পিসি, একটু আগে যে পাখিগুলো চেঁচামেচি করে ধান খাচ্ছিল, সেগুলোর নাম কী? চড়াই পাখির চেয়ে বড়...ছাই ছাই রঙের...

—ও হরি, ওগুলো *তো ছাতারে। কোথাও কোথাও ওদের আবার সহেলি বলে ডাকে। ওরা প্রত্যেক দিন বিকেলে আমার এই উঠোনটায় নেমে খেলা করে যায়।

সহেলি শব্দটা কানে যেতেই নিশিকান্তর শরীর শক্ত হয়ে গেল। হাতটা কেঁপে গিয়ে কিছু মুড়ি ছড়িয়ে গেল মাটিতে। সহেলি তো শুধু পাখির নাম নয়, একটা সাক্ষাৎ শয়তানেরও নাম। অন্তত নিশিকান্তর কাছে। বাবা নামক নির্বান্ধব লোকটা যে-বছর

মারা গেল, সেই বছর ক্লাস এলেভেনে উঠেছিল নিশিকান্ত। আর এক বছর পরেই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটা দিতে পারত। বাবার মৃত্যু সব তালগোল পাকিয়ে দিল। তালতলা হাইস্কুলের রেজিস্টার খাতায় এখনও ড্রপ-আউট নিশিকান্তর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে। যদিও লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার ব্যক্তিগত কষ্ট আর পাঁচটা কষ্টের মধ্যে মিশিয়ে নিতে ওর অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ওর ছ'-সাত মাস পরে আরও এক বড় বিপর্যয় নেমে এসেছিল মা ও ছেলের ঘাড়ের ওপর। বাড়িওয়ালা হঠাৎ ঘর ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দিয়েছে। বাবা নাকি গত দেড় বছর ভাড়া দেয়নি। শোকগ্রস্তা মা মৃদু প্রতিবাদ করেছিল। কোনও ফল হয়নি। কেন না, বাবার কাগজপত্রে ভাড়া দেওয়ার কিছু পুরনো রসিদ দেখিয়ে মা কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। বকেয়া মাসগুলোর কোনও রসিদ ওতে ছিল না। বাড়িওয়ালা আর দেরি করতে চায়নি। তালতলার তখনকার মস্তান সহেলি ও তার সাকরেদদের সাহায্য নিয়ে নিশিকান্তদের ঘর ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছিল। সেই সহেলি। সতেরো বছরের একটি ছেলের কাতর অনুনয়-বিনয় দু'পায়ে মাড়িয়ে যে বলেছিল, আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। এক মাসের মধ্যে ঘর খালি করে দেবে। না হলে মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো। মাজাকি পেয়েছো। ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নেই আবার কান্না হচ্ছে। যাও শালা, মায়ের ভোগে!

এমন একটা রহস্যময় বিপর্যয় রোধ করার মতো কোনও পথ সেই সময় নিশিকান্ত দেখতে পায়নি। মা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে পরামর্শ দিয়েছিল, এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা পারব না। চল্, অন্য কোথাও চলে যাই। তুই একটা ঘরটর দেখ বাবা। ঘর দেখা, ভাড়া নেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে নিশিকান্তর তখন কোনও ধারণাই ছিল না। রাস্তায় নেমে নিশিকান্ত টের পেয়েছিল—চতুর্দিকে অথৈ জল। চারটে দেওয়াল আর মাথার ওপর একটুকরো টিন-টালি বা খোলার চালের দাম এত! ওর মাথা ঘুরে গেছিল। শেষ পর্যন্ত ক্যানাল ইস্ট রোডের বস্তিবাড়িটার খবর কে দিয়েছিল, আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে একদিন সকালে দুটো ঠেলায় মালপত্র চাপিয়ে বস্তির ঘরে মা ও ছেলে এসে উঠেছিল। ছোট ঘরটায় ওদের খাট আর কাঠের আলমারি ঢোকানো যায়নি। জলের দরে ওই দুটো আসবাব বিক্রি করে দিতে হয়েছে। ঘরটায় ঢুকে ক্ষোভে দুঃখে মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। নিশিকান্তও কেঁদেছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। শুধু মনে হয়েছিল, সহেলির অত্যাচারের চেয়ে এ অনেক ভাল।

সেই সহেলি। সহেলিনাথ বিশ্বাস। এখনও বেঁচে আছে। আজকাল নাকি ভদ্র গেরস্থ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। বহু বেদনা, বহু রাগ, বহু অভিমান ঝরে পড়ে গেছে নিশিকান্তর জীবন থেকে। বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে অনেক কিছু। কেবল সহেলির অত্যাচারের কথা নিশিকান্ত ভুলতে পারে না। এখনও ওর মাঝে মাঝে মনে হয়, সহেলিকে খুন করে আসি। লোকটা সামান্য ক'টা টাকার জন্য দুটো অসহায় মানুষকে পথে বসিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। বস্তির জীবন থেকে আর বেরোতে পারল না নিশিকান্ত। নাকি উঠতে পারল কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গায়! বরং ক্রমাগত নামতে নামতে আজ ধাপ্পাবাজির পথ ধরতে হয়েছে। এর জন্য সহেলি দায়ী। ওকে কখনও ক্ষমা করবে

না নিশিকান্ত। চোয়াল শক্ত করে নিশিকান্ত আনমনে উচ্চারণ করল, সহেলি!
—হ্যাঁ বাবা, ছাতারেদের ভাল নাম সহেলি। ওরা গলায়-গলায় সখীর মতো দল বেঁধে থাকে। একটুখানি আদা থেঁতো করে নিশিকান্তর গেলাসে ফেলে দিয়ে বিদ্যাপিসি বলল, সেই যে ছড়া শুনিসনি, সহেলি বা ছাতারে যে নামেই ডাকো/জুড়ে বসে ধান খাবে, ভয় পাবে নাকো।
নিশিকান্ত হেসে ফেললো। বিকেলের আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। চোখের সামনে, এত স্পষ্ট করে দিনবদলের লগ্নটা যে দেখা যায়, সে সম্পর্কে নিশিকান্তর কোনও ধারণাই ছিল না। একটা ভালো লাগার অনুভূতি, একটা অকারণ পুলক যেন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। চায়ের গেলাসে আয়েসী চুমুক দিয়ে নিশিকান্ত বলল, ছেলেবেলায় সেই যে এসেছিলাম, তার কথা কিছু মনে নেই।...আচ্ছা পিসি, তোমার ছেলমেয়েরা কোথায়?
প্রশ্নটা শুনে বিদ্যাপিসির সারা মুখে যেন মেঘ ঘনিয়ে এলো। নিশিকান্ত ঠিক বুঝতে পারল না কী হয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিদ্যাপিসি ঠোঁট উল্টে বলল, ছেলেমেয়ে আর হল কই।...তোর পিসেমশাই তো সারাজীবন অসুখে ভুগে ভুগেই শেষ হয়ে গেলেন। কার দোষে যে একটা-আধটাও হল না জানি না বাপু।...তা, আমার না হয় কিছু নেই, কিন্তু তোর তো আছে। কিরে নিশি, তোর বউ-ছেলেমেয়ের গল্প কর, একটু শুনি। বিয়েতে না হয় ডাকিসনি! তাতে কী হয়েছে!
গলা ফাটিয়ে হাসতে গিয়েও নিশিকান্ত পারল না। বিদ্যাপিসি যে-ছবিটা আঁকতে চাইছে, সেটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। খুব স্বাভাবিক, সাধারণ ছবি। সহজ রেখায়, সরল রঙে আঁকা। অথচ নিশিকান্ত যে স্বপ্নেও বিয়ের কথা, ঘরসংসারের কথা ভাবতে পারেনি, তা বিদ্যাপিসি বিশ্বাসই করবে না। বেঁচে থাকার জন্য নিশিকান্তকে এযাবৎ যা যা করতে হয়েছে বা এখনও হচ্ছে, সেখানে বিয়ে নামক কোনও আকাঙ্ক্ষার প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক জন্তুর জীবন নিয়ে নিশিকান্তরা বেঁচে আছে। সেই জীবনে, শুভবিবাহের রজনীগন্ধার সুগন্ধ কল্পনার অতীত, স্বপ্নের চেয়েও অবাস্তব। নিশিকান্ত টের পেল, ওর ঠোঁট কাঁপছে। যে-ঘরের চাবি চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে, সেই ঘরে আজ বিদ্যাপিসি না-জেনে ঢুকতে চাইছে। ওর দোষ নেই। কিন্তু নিশিকান্তর বুকের ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বড় কঠিন স্বরে নিশিকান্ত বলল, সে সব পরে বলব।
—পরে কেন রে?...তুই কি বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এখানে চলে এসেছিস! তোর রাগ-রাগ মুখ দেখে তো ভাল ঠেকছে না!
—আঃ, তুমি মিছিমিছি এসব ভাবছো পিসি। নিশিকান্ত বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকাল। তারপর কথার মোড়টা একেবারে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বলল, পিসেমশাই কবে চলে গেলেন? ওঁর কী হয়েছিল?
বিদ্যাপিসি আবার গম্ভীর হয়ে গেল। নিশিকান্ত এটাই চেয়েছে। নিজের জীবন সম্পর্কে একগাদা মিথ্যে কথা বলার চেয়ে, বিদ্যাপিসির ভাবনাগুলোকে এধার-ওধার ঘুরিয়ে দেওয়া অনেক স্বস্তির।
—তোর পিসের কথা আর জিগেস করিস না বাবা! হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে

বিদ্যাপিসি ডুকরে কেঁদে উঠল, মানুষটা আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করল। সে কী কষ্ট! চোখে দেখা যায় না।
কথার বাঁক এমনভাবে ঘুরে যাবে নিশিকান্ত ভাবতে পারেনি। খুব অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে কুয়োতলার দিকে ও তাকাল। বুড়ির হাতে চিরুনি থেমে গেছে। বুড়ি উৎকর্ণ হয়ে শুনছে বিদ্যাপিসির কান্নার শব্দ। নিশিকান্ত তাড়াতাড়ি বলল, ও পিসি আমি তোমাকে কাঁদাতে চাইনি। বিশ্বাস করো।
সাদা আঁচলে চোখের জল মুছে বিদ্যাধরী বলল, জানি, বাবা জানি। আমি কাঁদছি আমার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে। ভগবানের কাছে পূর্বজন্মে অনেক দোষ করেছিলুম। তাই ও জন্মে তিনি এত শাস্তি দিলেন।...জানিস নিশি, তোব পিসেমশাইকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছি। যথাসাধ্য। কোথাও কোনও ত্রুটি করিনি। কিন্তু পারলাম না। মানুষটা নিজের হাতে নিজেকে শেষ করে দিলে। রোগের কাছে শেষমেশ হাব মানল তোর পিসে। অথচ মানুষটা বাঁচতে চেয়েছিল।
—কী অসুখ করেছিল? ভয়ে ভয়ে প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল নিশিকান্ত।
—পেটে ঘা হয়েছিল। অসহ্য শূলবেদনা। চোখে দেখা যেত না। এখানকার প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার ছিল তোর পিসে। বড় নরম প্রকৃতির লোক। শরীরে তেজ বলতে কিছু ছিল না। অমন মানুষ কখনও ওই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে! মাঝে মাঝে ওষুধপত্তর খেয়ে ভাল থাকত। কিন্তু তা আর ক'দিনের জন্য! আমি বেশ বুঝতে পারতাম, ও রোগের সঙ্গে আব যুঝতে পারছে না। ভাল থাকলেও বলত, বিদো, এবার তোমরা মুক্তি দাও। ডাক্তার-কোবরেজ বন্ধ করো দিকি। প্রাণটাকে এইভাবে আটকে রেখে, কষ্ট ভোগ করে কী লাভ!
জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদ্যাপিসি থেমে গেল। উদাস দৃষ্টিতে দূরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার কথা শুরু করল বিদ্যাপিসি, ভাল খাবাপের টানা-পোড়েনে যখন দিন কাটছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি, তোর পিসেমশাই ওই আমগাছটার একটা ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। চিৎকার করে দৌড়ে গেছিলাম। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।
বিদ্যাপিসি ঝাঁকড়া-মাথা প্রাচীন আমগাছটাব দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে বুঝতে পেরেও নিশিকান্ত জিজ্ঞেস করল, কোন্ গাছটা?
—ওই যে ওইটা। ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গাছটার দিকে তাকালে তোর পিসের কথা মনে পড়ে যায়। জোছনা রাতে ওটাকে দেখলেই বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ...আমি গাছটাকে কেটে ফেলতে চেয়েছিলাম। যার সঙ্গে অমন দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাকে রেখে কী লাভ? তা, আমার শাশুড়ির-মা তখন কাটতে দিলেন না।
—কেন?
—ওঁর অদ্ভুত যুক্তি। উনি বলতেন, ওই গাছটা আমার বাদলের শেষ আশ্রয়। ওর কোলে শুয়ে ছেলেটা আমার শেষ নিশ্বেস ত্যাগ করেছে। ওটাকে আমি কাটতে দেব না বউমা। প্রথম প্রথম আমার খুব রাগ হতো। তুই বল্, গাছটা শত্রু কি না! তোর পিসে যখন গলায় দড়ি দিতে এলো, তখন ওটা একবারের জন্যও বাধা দিল না গো!

নিশিকান্ত খুব অবাক হয়ে বলল, গাছ তো মানুষ নয় পিসি, ও কী করে বাধা দেবে!

—ঠিক বলেছিস। বিদ্যাধরী দীর্ঘশ্বাস লুকোতে পারল না, তা, এখন সব মানিয়ে গেছে। গাছটাকে দেখে আর রাগ হয় না।...আবার এও ঠিক, ওই আমগাছ কাটার অধিকারও আমার নেই। এই বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা সব শাশুড়ি-মার নামে লেখা আছে। ওঁর ছেলে বেঁচে থাকার সময়েও এই ব্যবস্থা ছিল। তাই শাশুড়ি-মায়ের অমতে কিছু করার জো নেই। উনি মরে গেলে বিষয়-সম্পত্তি কে পাবে জানি না। আমার বাপু এসবের দরকার নেই। কোন্‌দিন শুনবি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তীর্থে চলে গেছি।

ঘাড় ঘুরিয়ে কুয়োতলার দিকে তাকাল নিশিকান্ত। এই স্বর্গের চাবিকাঠি ওই বুড়ির আঁচলে বাঁধা আছে! ভাবা যায়!

—নিশি, তোর আপিসের ছুটি আর কতদিন বাকি আছে!

চোখ বুজে পরম তৃপ্তিতে নিশিকান্ত পুঁইডাঁটা চিবোচ্ছিল। আজ আবার পুঁইশাকে কুঁচো চিংড়ি পড়েছে। শুনশান দুপুরে, মাটির দাওয়ায় আসন পেতে বসে কাঁসার থালায় শাক-ভাত খাওয়ার আনন্দে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসবেই। বিদ্যাপিসির গলার স্বরে নিশিকান্ত চমকে গেল। বেশ গম্ভীর। চোখ চেয়ে দেখল, পিসির ফরসা মুখটা থমথম করছে। হাসি-হাসি ভাবটা একদম নেই। ঘাড়টা সামান্য বাঁকিয়ে বিদ্যাপিসি তাকিয়ে আছে ওঁর দিকে। নিশিকান্ত ভয় পেয়ে গেল। পরশু দিন থেকেই ওর মনে হচ্ছিল, কোথাও একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। বিদ্যাপিসি ঠিক আগের মতো আর খাতির-যত্ন করছে না। অন্তরের উচ্ছ্বাস ঝপ করে কমে গেছে। কেমন যেন কাঠ-কাঠ ব্যবহার। পিসি তোমার কী হয়েছে?—একথা জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি নিশিকান্তর। বিদ্যাপিসি ও তার শাশুড়ি-মার জীবনে আর নতুন কিছু হওয়ার মতো ঘটনা অবশিষ্ট নেই। দু'জনেই এখন মৃত্যুব দিন গুনছে। ওদের জীবনে এই মুহূর্তে নিশিকান্ত স্বয়ং একটা ঘটনা। বাইরে থেকে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ছাতারে পাখির মতো। দুই বুড়ির এখন কিছু হওয়া মানে তা নিশিকান্তকে ঘিরে। একটা প্রতিকূল হাওয়ার অস্তিত্ব টের পেয়েও নিশিকান্ত সতর্ক হতে পারেনি। কিংবা ইচ্ছে করেই হয়নি। কেন না, সতর্ক হওয়া মানেই দেবগ্রাম ছেড়ে অন্য কোনও কূলে নৌকো লাগাতে হবে। তাই উল্টোপাল্টা হাওয়া শুরু হয়েছে বুঝতে পেরেও নিশিকান্ত পাত্তা দেয়নি। আজ কিন্তু বিদ্যাপিসি সরাসরি জানতে চাইছে, আর কতদিন থাকবি? প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করেছে, এই যা!

মুখ থেকে চিবোনো, থ্যাঁতলানো হড়হড়ে পুঁইডাঁটাটা ধীবেসুস্থে বের করে এনে নিশিকান্ত ইচ্ছে করেই বোকা সাজল, কেন পিসি?

—কেন আবার, আজ নিয়ে এগারো দিন হয়ে গেল। তাই জিজ্ঞেস করছিলুম, তোর ছুটি কি ফুরোয়নি! স্থির চোখে কথাগুলো বলল বিদ্যাধরী। তারপর নিশিকান্তর পাতে দু'মুঠো ভাত দিয়ে সামনে থেকে উঠে গেল।

আজ নিয়ে এগারো দিন! নিশিকান্তর সত্যিই দিনের হিসেব খেয়াল নেই। প্রতিদিনই মনে হয়, আজই যেন দেবগ্রামে এসেছে। সাবা গ্রাম জুড়ে সবসময়ই একটা নতুন গন্ধ

ভেসে বেড়াচ্ছে। সবুজ-শ্যামল গাছপালা, নানা মাপের জলাশয়, জমি-জিরেত আর মানুষজন দেখতে দেখতে এক-একটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পায়ে হেঁটে গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত ঘুরে এসেছে নিশিকান্ত। পথঘাট চেনা হয়ে গেছে অনেকখানি। চার-পাঁচজন লোকের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। অবশ্য নিশিকান্ত এখনই খুব একটা মিশতে চাইছে না কারুর সঙ্গে। দেবগ্রামের মাটিতে যদি শেকড় চালাতেই হয় তাহলে বীজের মতো শক্ত আবরণের আড়ালে নিজেকে আপাতত লুকিয়ে রাখাই ভাল—এতদূর ভেবেছে নিশিকান্ত। কিন্তু বিদ্যাপিসি এই খানিক আগে যেভাবে প্রশ্ন করল এবং ঠরঠর করে উঠে গেল তাতে এক অশনিসঙ্কেত ছায়া ফেলে যাচ্ছে। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল নিশিকান্তর। মুখে আর গ্রাস তুলতে ইচ্ছে করছে না।

এ কথা ঠিক যে, নিশিকান্ত বসে বসে খাচ্ছে। নিজের থেকে কিছু একটা ও করবে, তেমন কোনও সুযোগ বা পথ এখনও দেখতে পায়নি। আবার বিদ্যাপিসি তার সংসারের কাজেও নিশিকান্তকে হাত লাগাতে দেয় না! ও একদিন বলেছিল, পিসি, কী কাজ করতে হবে বলো, করে দেবো। শুনে বিদ্যাপিসি চোখ বড় বড় করে বলেছে, তুই কি পাগল হয়েছিস। এখানে বেড়াতে এসেছিস। শরীর জুড়োতে এসেছিস—কাজ করবি কি রে! একেবারে বসে খেতে চায় না নিশিকান্ত। খারাপ লাগে। তার চেয়েও বড় কথা, এখানে ও তো বেড়াতে আসেনি। বাঁচতে এসেছে। আর এই বেঁচে থাকার জন্যই কাজ করতে চায় নিশিকান্ত। খুব ভোর থেকে উঠে বিদ্যাপিসি এবং ওই বুড়ি সংসারের কাজে নেমে পড়ে। আর তো কেউ করে দেওয়ার নেই! তাই দু'জনে দু'জনের সাধ্যমতো কাজ ভাগ করে নিয়েছে। সকাল সকাল স্নান সেরে নিয়ে বিদ্যাপিসি ধান ঝাড়ে, রোদে নুন এবং খাবার সোডা মাখানো মুড়ির চাল শুকোতে দেয়। একটু বেলার দিকে একরাশ মুড়ি ভেজে তোলে। তারপর রান্নার জোগাড় করে। বিদ্যাপিসির শাশুড়ি-মা ত্রিভঙ্গ দেহ নিয়ে এটা-সেটা করতে করতে নড়েচড়ে বেড়ায়। এক-একদিন দুপুরে একলা বসে বসে তালপাতার চাটাইয়ের ওপর বুড়ি গুঁড়ের বাতাসা বোনে। অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়। গরম গরম পাতলা গুড় ছোট্ট একটা ফুটো মালসায় নিয়ে টপাটপ চাটাইয়ের ওপর সারি সারি ফেলতে থাকে। একটু ঠাণ্ডা হলেই টোপ্‌লা-টোপ্‌লা বাতাসাগুলোর শরীর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখতে খুব মজা লাগে নিশিকান্তর।

একদিন বুড়ির কাছে বাতাসা তৈরির প্রক্রিয়াটা শিখতে চেয়েছিল নিশিকান্ত। বুড়ি পাত্তাই দিল না। নিশিকান্ত বেশ বুঝতে পারে, বুড়ি ওকে মোটেই পছন্দ করছে না। সেই প্রথম দিন থেকে। তবু বেশ কয়েকবার, ও বুড়ির সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চেষ্টা করেছে। পারেনি। বুড়ির এখনও সন্দেহ, বিদ্যাধরীর ভাইপো বলে আদৌ কেউ নেই! নিশিকান্ত বাতাসা তৈরি করা শিখতে চায় শুনে বুড়ি বিদ্রূপের সুরে বলেছিল, থাক বাছা, অত শিখে কাজ নেই। সেই যে বলে না, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে জামাই রাঁধতে শিখেছে/মাগ এবার বসে খাবে, বলে দিয়েছে। তোমার হয়েছে সেই দশা! প্রথম দিন থেকেই বুড়িটা কাঁটার মতো ওর গলার কাছটায় বিঁধে আছে। একে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কব্জা করার কোনও উপায় এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি নিশিকান্ত।

বিদ্যাপিসি বুড়ির ঠিক বিপরীত। বেশ সরল-সোজা। সংসারের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে আর দুঃখ পেতে পেতে পিসির মনটা একেবারে শক্ত কাঠ হয়ে যায়নি। একমাত্র দাদার একমাত্র ছেলেকে নিজের বলেই গ্রহণ করেছে। নিশিকান্তর খুব ইচ্ছে করে বিদ্যাপিসিকে কিছু একটা কিনে উপহার দিতে। অন্তত একটা থান কাপড়। কিন্তু এই সামান্য জিনিসটুকু কেনার মতো সামর্থ্যও নিশিকান্তর নেই। সেদিন এ-পকেট, সে-পকেট থেকে টাকা-পয়সা জড়ো করে নিশিকান্ত গুনে দেখেছে, মাত্র সতেরো টাকা চল্লিশ পয়সা পড়ে আছে। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার ভাড়া পর্যন্ত নেই। বিদ্যাপিসিকে কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, এরই মধ্যে দু'বার পিসির কাছ থেকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিয়েছে নিশিকান্ত। এত ভেবেও স্বভাব ছাড়তে পারেনি। প্রথমবার চুল-দাড়ি কাটার জন্য তিন টাকা। দ্বিতীয়বার এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য চার টাকা। দু'বারই নিশিকান্ত নিপুণ অভিনয় করে বলেছে, আমার কাছে সব একশো টাকার নোট গো পিসি! এইটুকু জিনিস কেনার জন্য কে ভাঙিয়ে দেবে বলো! তুমি এখন দাও, আমি পরে দিয়ে দেবো'খন।

বিদ্যাপিসি ওই সাত টাকা ফেরত পাওয়ার আশা করেনি। বরং মাথা নেড়ে ফিরে নেওয়ায় অসম্মতি জানিয়েছে। তবে নিশিকান্ত স্পষ্ট দেখেছে, সব একশো টাকার নোট শুনে বিদ্যাপিসির চোখের ভাষা সেই মুহূর্তে বদলে গেছিল।

করঞ্জার অম্বল আঙুলে সাপ্‌টে তুলে নিয়ে মুখে চালান করে দিল নিশিকান্ত। বেশ টক্‌টক, মিষ্টিমিষ্টি। শেষ পাতে চাটনির কোনও তুলনা নেই। তবু আজ খাওয়াটা মোটেই জমল না। বিদ্যাপিসিও কি শেষ পর্যন্ত ওই বুড়িটার মতো ওকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে! কুয়োতলায় মুখ ধুতে ধুতে নিশিকান্ত ভাবল, তাই যদি হয়, তা হলে সমূহ বিপদ আমার সামনে ওৎ পেতে বসে আছে। দেবগ্রামের মাটিতে যে-শস্য হয়, তার স্বাদ বড়ো মিষ্টি। এই স্বাদ ছেড়ে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যেভাবেই হোক, বিদ্যাপিসির মায়া-মমতার সুযোগ নিতে হবে। পিসির হৃদয়ে একটু জায়গা করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মুখ ধুয়ে নিশিকান্ত পিসিদের ঘরে এলো মুখশুদ্ধি নিতে। এই ঘরটায় জিনিসপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। একটা তক্তপোশ, গুটিয়ে রাখা বিছানা, খাটের তলায় বাসনপত্র, অনেকগুলো পুরনো কৌটো-শিশিবোতল, চালের খুঁটির সঙ্গে টাঙানো একটা বাঁশের আলনা, তাতে দুই বুড়ির জামাকাপড় ঝুলছে। ঘরের পুব কোণে একটা ঢাউস কাঠের সিন্দুক। তালামারা। ওতে কোন্ সম্পত্তি লুকনো আছে কে জানে! এই ঘরে ঢুকলেই সিন্দুকটার দিকে চোখ চলে যায়। তালাবন্ধ রহস্যের ডালা খুলতে ইচ্ছে করে নিশিকান্তর। তক্তপোশ আর দেওয়ালের মাঝখানে যে-সরু গলির মতো জায়গাটা, সেখানে বিদ্যাপিসিদের ঠাকুর-থান। দেওয়ালে যত রাজ্যের দেব-দেবীর ছবি। একটা জলচৌকিতে বহু পেতলের, পাথরের মূর্তি। দেব-দেবীর ছবির মধ্যে একটি ছবি মানুষের। স্বর্গত পিসেমশায়ের। প্রথম দিনই নিশিকান্ত দেখেছিল ছবিটা। আজ আবার দেখল। বিবর্ণ, লালচে হয়ে গেছে। অস্পষ্ট হলেও পিসেমশায়ের মুখ দেখে মনেই হয় না যে, এই লোকটা নিজেকে নিজে খুন করেছেন। একেবারে গো-বেচারা। বিদ্যেপিসি বলেছিল, মানুষটা নাকি বাঁচতে চেয়েছিল। ছবি দেখে অন্তত

সেটাই মনে হয়। পিসে যেন বড়ো করুণ চোখে বাঁচার আশায় তাকিয়ে আছেন। কিন্তু বাঁচতে চাইলেই কি আর বাঁচা যায়! এতই সোজা! আপনমনে কথাটা বলে হাসল নিশিকান্ত। তারপর একটুকরো আমলকি হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। এখন আর সুখের দিবানিদ্রা আসবে না। পিসির কথায় মনটা খিঁচড়ে গেছে। এবার একটা খারাপ ইঙ্গিত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে নিশিকান্তকে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে নিশিকান্ত বিড়বিড় করে বলল, দুর ছাই ভাল্লাগে না! তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে, আমগাছতলা পেরিয়ে রাস্তায় চলে এলো।

•

রাত আটটাতেই দেবগ্রামে প্রায় মাঝরাত নেমে আসে। দূরের কোনও একটা বাড়ি থেকে তখনও স্থানীয় সংবাদের টুকরো টুকরো শব্দ শোনা যায়। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বিদ্যাপিসি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পিসির শাশুড়ি-মা ওর আগেই নেতিয়ে পড়ে। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আটটার মধ্যে রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ। বিদ্যাপিসি বাসনপত্র মেজে-ঘষে তুলে রাখছে। দুপুরের পর থেকে পিসির সঙ্গে আর একটাও কথা হয়নি। পিসিকে অসম্ভব গম্ভীর লাগছে। নিশিকান্ত স্বভাববশত একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের চৌকাঠে বসল। বিদ্যাপিসি ঘরে ঢুকে গেলেই ও শুয়ে পড়বে।

রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বিদ্যাধরী সোজা নিশিকান্তর সামনে এসে দাঁড়াল। হাতের তালুতে সিগারেট লুকিয়ে ফেলে নিশিকান্ত উঠতে যাচ্ছিল। বিদ্যাধরী হাত তুলে বলল, বোস্, উঠতে হবে না। তোকে একটা কথা বলতে এলাম।...তুই যে আমার ঠাঁয়ে ক'দিনের জন্য এসেছিস, এতে আমার কোনও আপত্তি নেই। যদিও তোর ভাবগতিক দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না। সে যাক্‌গে, যার যার সত্যি-মিথ্যে তার তার কাছে। আমার কিছু বলার নেই। তবে আমার শাশুড়ি-মা তোকে এখানে থাকতে দিতে নারাজ। তুই বাড়ি না-থাকলে, উনি আমাকে শুধু খোঁচান। ভাল-মন্দ বলে দু'কথা শুনিয়ে দেন। আমার বাপু এসব একদম ভাল লাগে না।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বিদ্যাধরী একটু চুপ করল। নিশিকান্ত ঘর থেকে ছিটকে আসা লণ্ঠনের ম্লান আলো বিদ্যাপিসির মুখের ওপরে এসে পড়েছে। বেদনায় কুঁচকে আছে পিসির মমতাসিক্ত সুন্দর মুখটা। জ্বলন্ত সিগারেটের তাপ হাতের তালুতে এসে লাগছে—টের পেল নিশিকান্ত। বিদ্যাপিসি বেশ করুণ চোখে তাকিয়ে আবার বলল, দ্যাখ্, আমি বলি কি, কাল সকালের ট্রেনেই বাড়ি ফিরে যা। আবার না-হয় মাস তিনেক বাদে আসবি। হয়তো ভাবছিস তোকে তাড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কি করব বল, আমি নিরুপায়। তুই কাল চলেই যা নিশি। সারাজীবন অশান্তিতে জ্বলে-পুড়ে গেলাম। এই শেষ বয়সে ওসব আর সহ্য হয় না? একটু শান্তিতে থাকতে চাই রে!

জ্বর আসার আগে যেমন কাঁপুনি লাগে, তেমন একটা অনুভূতি নিশিকান্তকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রাস্তার কুকুর যেমন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে, তেমনই আচমকা নিশিকান্ত রেগে গেল। চাপা গর্জনে বলল, ঠিক আছে, পিসি ঠিক আছে। আমার আপিসের ছুটির আর দু'দিন বাকি ছিল। তা, তুমি যখন চাইছ, তখন কাল সকালেই চলে যাব। এত ইনিয়ে-বিনিয়ে ন্যাকামি করার কি

দরকার আছে। সোজা বললেই হয়, চলে যা! আমি কি তোমাদের অন্নে জন্মের শোধ ভাগ বসাতে এসেছি। যত্তো সব বাজে কথা। যাও, ঠিক আছে। আর বলতে হবে না।

বিদ্যাধরী কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চলে গেল।

কিছুতেই ঘুম আসেনি। অন্ধকারে চোখ মেলে শুয়েছিল নিশিকান্ত। বারবার মনে হচ্ছিল, দেবগ্রাম ঠিক কলকাতার মতোই নিষ্ঠুর। ওর অসহায় অবস্থার দিকে ফিরেও তাকাল না। আর কিছুদিন থাকতে পেলে নিশিকান্ত কাজকর্মের একটা উপায় এখানে করে নিতে পারত। সে সময়-সুযোগটুকুও দেবগ্রাম ওকে দিল না। নিশিকান্ত একটু আগে স্থির করে নিয়েছে কী করবে। এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। আগামীকালের সূর্যোদয় দেখতে চাওয়ার নিজস্ব বায়নাকে নিশিকান্ত আর প্রশ্রয় দেবে না। অনেক হয়েছে। আর নয়। পিসেমশাই ঠিক রাস্তাটা বেছে নিয়েছিলেন। বাঁচার রাস্তা। আজ না হোক কাল, নিশিকান্তকে অন্যেরা মেরে ফেলবে। পিটিয়ে, খুঁচিয়ে, গণ-ধোলাই দিয়ে। জোচ্চোর, ঠকবাজ, চোরদের যেমন করে লোকে শেষ করে দেয়। এসব হওয়ার আগেই বরং...।

উঠোনে নামার আগে নিশিকান্ত বিদ্যেপিসিদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় খিল তুলে ওরা দু'জন ঘুমোচ্ছে। বন্ধ কপাটে আলতো করে হাত রেখে নিশিকান্ত বলল, পিসি, এইভাবে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমার কী লাভ হল বল তো! আমার সঙ্গে তোমার রক্তের সম্পর্ক। তবু তুমি আমার কষ্টটা ধরতে পারলে না! পিসি, আমাকে তুমি মরার রাস্তা দেখিয়ে দিলে! পিসি...পিসি...

রাতচরা একটা পাখি শব্দ করে উড়ে গেল উঠোনের ওপর দিয়ে। নিশিকান্ত আর দাঁড়াল না। সোজা কুয়োতলায় এসে, জলতোলার শক্ত দড়িটা হাতে গুছিয়ে নিল। অন্ধকার খুব ঘন নয়। আকাশে একফালি চাঁদ লেগে আছে। তার ফিকে আলো এসে পড়েছে দেবগ্রামের বুকে।

নিঃশব্দে আমগাছটার নীচে এসে দাঁড়াল নিশিকান্ত। লাফিয়ে নীচের ডালটা ধরতে গিয়ে নিশিকান্ত অবাক। আমগাছের সমস্ত ডালপালা দূর আকাশের দিকে উঠে গেছে। মানুষ যেভাবে হাত তুলে নিষেধের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। নিশিকান্ত ভয় পেয়ে গেল। তবু আর একবার চেষ্টা করবে। দড়িটা ওপর দিকে ছুঁড়তে গিয়ে চমকে উঠল নিশিকান্ত। একটু দূরে, মেঠো পথটার ঠিক মাঝখানে পিসেমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর গলায় দগদগে দড়ির ফাঁসের দাগ, কিন্তু মুখে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। নিশিকান্ত স্পষ্ট শুনল, পিসেমশাই বলছেন, নিশি, তুই তো মরেই আছিস, তাহলে আর দ্বিতীয়বার মরবি কেন? বরং বাঁচার রাস্তা খোঁজ। যেভাবেই হোক, বেঁচে থাক্। বাঁচতে বড়ো সুখ রে!

নিশিকান্তর আর কিছু মনে নেই। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে জ্ঞান ফিরতে নিশিকান্ত দেখল ভোর হচ্ছে। চারপাশে কুসুম-কুসুম আলো। দু'-একটা পাখি শিস দিচ্ছে। আমগাছের পাতা হাওয়ায় কাঁপছে ঝিরঝির শব্দে। শিশির-ভেজা ঘাস-মাটির গন্ধ বুক ভরে টেনে নিয়ে নিশিকান্ত অস্ফুট স্বরে বলল, ও বিদ্যাপিসি, তুমি কি এখনও ঘুমিয়ে আছো!

বিশ্বনাথ দত্তের ছবি

হঠাৎই কূটবুদ্ধিটা নীরজের মাথায় ঝিলিক মেরে গেছিল। এ ছাড়া ওর সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। আসলে ভদ্রলোক এমন একজন মানুষের রেফারেন্স নিয়ে এসেছিলেন যে, নীরজ ওঁকে গোড়াতেই চুপসে দিতে পারেনি। অন্যদের ও কড়া হাতে বিরত করে। নিরাশ করতেও পিছপা হয় না। একটা ম্যাগাজিনকে তার স্বধর্মে থিতু রেখে সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে এমন নির্মম হতেই হয়।

অনেকেই নিজের সীমানাটাকে বুঝতে চায় না। হয়তো জানেও না ভালভাবে। বিশেষত, এই ভদ্রলোকের মতো রিটায়ার্ড বৃদ্ধরা। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এঁরা আর কোনও কিছু করতে না পেরে সাহিত্য রচনায় নেমে পড়েন। রীতিমতো আদা-জল খেয়ে। দিস্তে দিস্তে কাগজ কিংবা খাতা ভরিয়ে ফেলেন উপন্যাস, গল্প অথবা সত্যকাহিনী অবলম্বনে কোনও রোমহর্ষক ঘটনা লিখে। সেগুলোর নিরানব্বই ভাগ ছাপার অযোগ্য, পড়া যায় না। অথচ এই সব পরিণত বয়স্ক মানুষ দারুণ অভিমানী। নিজের অপাঠ্য সৃষ্টি সম্পর্কে ভয়ংকর সেনসেটিভ। তার চেয়েও অসহ্য, আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এঁদের কোনও ধারণাই নেই, খোঁজও রাখেন না। 'যতিচিহ্ন' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নীরজকে প্রায়ই এ সব বৃদ্ধদের মুখোমুখি হতে হয়। এক একসময় খুব খারাপ লাগে, বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই।

পদ্মনাথবাবু ওঁদেরই মতো একজন। কোথাও তেমন পার্থক্য নেই। তবে পদ্মনাথ ওর কাছে এসে অরুণেন্দুদাব রেফারেন্স দিতেই নীরজ সতর্ক হয়ে গেছিল। অরুণেন্দুদাকে ও শ্রদ্ধা করে, ভয়ও পায়। জীবনে মোটামুটি একটা দাঁড়ানোর জায়গা যাঁরা নীরজকে করে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অরুদা এক নম্বর। নীরজ ওঁর কাছে ঋণী। পৃথিবীতে কোনও মানুষই বা আনৃণ্য? ঋণের কথা চিরদিন মনে থাকে। চেষ্টা করলেও ভোলা যায় না। আর যায় না বলেই, অরুদার পাঠানো মানুষটিকে নীরজ রুটিনমাফিক বিদায় করতে পারেনি।

একটা ফুলস্কেপ এক্সারসাইজ খাতায় পদ্মনাথ প্রায় তেরো রকমের সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করে নিয়ে এসেছিলেন। গল্প, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রম্যরচনা, হাসির নাটক, কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। দু'পাতা, চারপাতা অথবা তিন পাতার। নীরজের সব ক'টা মনেও নেই। তবে খাতার শেষ রচনাটি ছিল, কলকাতার প্রতিটি গৃহস্থের বাড়িতে গঙ্গা জলের পাইপ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচিত্র গবেষণা। চিত্র মানে হাতে আঁকা কিছু দুর্বল ড্রয়িং। অদূর ভবিষ্যতে শহরের জনসংখ্যা

বিস্ফোরণের ভয়াবহতা, টালার ট্যাঙ্কের জল সরবরাহ মাথাপিছু কোথায় এসে দাঁড়াবে, তখন গঙ্গার জলের ভূমিকা কী হবে ইত্যাদি নিয়ে পাতা ছয়েকের মতামত। একান্তই ওঁর নিজস্ব। লেখাটার ওপর খামচে খামচে চোখ বোলাচ্ছিল নীরজ। পদ্মনাথ তখন খুব বিনয়ের সঙ্গে বলছিলেন, আমার আরও কয়েকটা খাতা আছে। আপনি দেখতে চাইলেই নিয়ে আসব। বহু দিন পরে লিখছি, লিখতে লিখতে কখন যে পাতা ভরে উঠেছে বুঝতেই পারছি না!

তর্জনিটাকে তিরের ফলার মতো সোজা করে সেই মুহূর্তে নীরজ বলেছিল, গবেষণা-ধর্মী লেখাতেও আপনার উৎসাহ আছে দেখছি! তার মানে, এই বয়সেও রিসার্চওয়ার্কের যে-কষ্ট, তা স্বীকার করতে আপনি প্রস্তুত!

—নিশ্চয়ই। পদ্মনাথ চোখেমুখে তারুণ্যের চমক জাগানোর চেষ্টা করে বলেছিলেন আমার শরীর কিন্তু দারুণ ফিট। এখনও লিফ্‌ট ছাড়াই আমাদের বাড়ির পাঁচতলা-একতলা ওঠানামা করি। আর রিসার্চ ব্যাপারটা তো আমার রক্তের মধ্যেই আছে। আমার বাবা মোগল চিত্রকলার ওপর গবেষণা করে প্রবাসীতে আর্টিকেল লিখতেন!

ঠিক তখনই কূটবুদ্ধিটা ওর মাথায় খেলে গেছিল—তা হলে আপনাকে একটা সাজেশান দিতে পারি, নীরজ হেসে বলেছিল, এই সব গল্প-কবিতাটবিতা লিখে, মানে ক্রিয়েটিভ রাইটিংসের চর্চা করে কিছুটা হয়তো এগোতে পারবেন, কিন্তু আপনার মন ভরবে না।

—তা হলে... লেখালেখি ছেড়ে দেব বলছেন? পদ্মনাথ ঝিমমারা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—না, না, সেটা চালিয়ে যান। নীরজ চোখ নাচিয়ে বলেছিল, পাশাপাশি এই গবেষণাধর্মী লেখার কাজটায় জোর দিন। জীবনের বহু জিনিস এখনও আমাদের দৃষ্টির বাইরে অপেক্ষা করে আছে। রিসার্চ করে তাদের খুঁজে বের করতে হবে।

—কিন্তু ভাই, সাহিত্যের কাগজ রিসার্চওয়ার্ক ছাপবে কেন? আপনিই ছাপতে চাইবেন না। পদ্মনাথ হতাশ গলায় বলেছিলেন।

—কে বলল ছাপব না! গলায় কৃত্রিম জোর এনেছিল নীরজ, তেমন গবেষণা হলে আমার ম্যাগাজিনই তো ঋদ্ধ হবে।

'ঋদ্ধ' শব্দটা পদ্মনাথ জীবনে সেদিন প্রথম শুনেছিলেন হয়তো। কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, আপনি বলছেন!

—ইয়েস! ইঁদুর যেন থাবার মধ্যে চলে এসেছে, এমনভাবে ধূর্ত বিড়ালের মতো শরীর বাঁকিয়ে নীরজ বলেছিল, এই যেমন ধরুন, স্বামী বিবেকানন্দের বাবা বিশ্বনাথ দত্তের কোনও ছবি আজ পর্যন্ত কোনও বইয়ে ছাপা হয়নি। হয়নি পাওয়া যায়নি বলে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, তাঁর মতো একজন শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত মানুষের কি কোনও ছবি ছিল না—ক্যামেরায় তোলা কিংবা হাতে আঁকা? নিশ্চয়ই ছিল, থাকতেই হবে। কিন্তু সে ছবি কোথায়? বিশ্বনাথ দত্তের কোনও পোর্ট্রেট কিংবা গ্রুপ ছবি কি সত্যিই নেই?

হাঁ করে পদ্মনাথ নীরজের কথা শুনছিলেন। নীরজ একটু থামতেই বলেছিলেন, বিশ্বনাথ দত্তের ছবি... বিবেকানন্দের বাবা... দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি মনে হয় দেখেছি। হ্যাঁ... হ্যাঁ...
শব্দ করে হেসে নীরজ বলেছিল, না, পদ্মনাথবাবু, আপনি কেন, কেউই দেখেনি। ব্যাপারটা কেউ খেয়ালই করে না। আমি বলছি। আচ্ছা, আপনি আমার পত্রিকার জন্য এই গবেষণাটাতেই হাত দিন না! যত রকম সোর্স আছে, সব জায়গায় বিশ্বনাথ দত্তের ছবি খুঁজতে থাকুন। তার আগে অবশ্য আপনাকে বিবেকানন্দের জীবনীগুলো ভাল করে পড়ে নিতে হবে। খুঁজতে খুঁজতে যদি সত্যিই ওঁর কোনও ছবি পেয়ে যান, তা হলে আপনি অমর হয়ে যাবেন পদ্মনাথবাবু। আপনার সেই গবেষণা যখন 'যতিচিহ্ন'-এ প্রকাশিত হবে তখন এর সম্মান আর সার্কুলেশন যে কোথায় পৌঁছবে আমি কল্পনাই করতে পারছি না।
পদ্মনাথের প্রৌঢ় চোখে সেই মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠেছিল। এ কাজটা আদৌ ওঁর দ্বারা সম্ভব কিনা, কতদূর উনি এগোবেন, কীভাবে এগোবেন—এ সব কিছুই না-ভেবে ভদ্রলোক বলেছিলেন, ঠিক আছে। আমি কাল থেকেই কাজে নেমে পড়ব। ছবি খুঁজে বের করবই।
—আপনি দু'মাস পরে, না, না ছ'মাস পরে এসে জানাবেন কতটা কী করতে পারলেন কেমন!
—অত দিন লাগবে না ভাই। পদ্মনাথ গভীর প্রত্যয়ে বলেছিলেন।
নীরজ ফিকে হেসেছিল। ওর মুখে সেই হাসিটা এখনও লেগে আছে। দেড় মাস হয়ে গেছে। পদ্মনাথ আর 'যতিচিহ্ন'-এর দিকে আসেননি।

দুই

রাস্তার ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছটায় ফুল আসতে শুরু করেছে। কয়েক দিন পরে এগুলোকে আর ফুল বলে মনে হবে না। দূর থেকে দেখাবে যেন আকাশছোঁয়া আগুন। রবীন্দ্রনাথের গানের লাইনও চকিতে মনের মধ্যে ভেসে উঠবে। গত বছরও এই সময় নির্জন দুপুরে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে পদ্মনাথ গাছটাকে প্রায়ই দেখতেন। একঠেরে লম্বা গাছ। ওঁদের বাড়ির চারতলার প্রায় সমান সমান। তবে গাছটার বয়স বেশি নয়।
এ বছর কৃষ্ণচূড়ার ওই ফুলের সমারোহ পদ্মনাথকে একদমই টানছে না। মানুষটা ভেতরে ভেতরে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে হতাশ। একটা একটা করে দিন চলে যাচ্ছে। অথচ পদ্মনাথ এতটুকু এগোতে পারেননি এই সাড়ে তিন মাসে। গত জানুয়ারিতে উনি নীরজের কাছে প্রথম গেছিলেন। মাঝখানে আর একবার। তখনও ওঁর উৎসাহ আর উদ্দীপনায় কোনও খামতি ছিল না। ভেবেছিলেন, ঠিক ঠিক জায়গায় জাল ফেলতে পারলে ছবিটা হাতের মুঠোয় চলে আসবে। এই কাজে ওঁকে অপ্রত্যাশিত সাহায্য করছে দেবীপ্রসাদ। ওঁর কলেজের বন্ধু। কত দিন যোগাযোগ ছিল না দেবীপ্রসাদের সঙ্গে। পদ্মনাথ যখন সেল ট্যাক্সে চাকরি নিয়ে কলকাতাতেই থেকে

গেলেন, তখন দেবীপ্রসাদ ইন্ডিয়ান অয়েলে। প্রথম পোস্টিং ডিগবয়।

তেষট্টি-চৌষট্টি সালে কেনা নিজের বিবেকানন্দ রচনাবলির সেট এবং পাড়ার লাইব্রেরি থেকে আনা বিবেকানন্দ-সংক্রান্ত অন্যান্য বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেবীপ্রসাদের কথা মনে পড়েছিল। শুধু এইটুকু মনে ছিল, দেবীরা থাকত সালকিয়া বাঁধাঘাটের কাছে। বেলুড় মঠের সঙ্গে ওদের বাড়ির যোগাযোগ ছিল নানা সূত্রে। মঠ-মিশনের ভাবধারায় দেবীর ছোটবেলা কেটেছে। ও পুষ্ট হয়েছে সেই জল-হাওয়ায়। নরেন দত্তর বাবার সম্পর্কে দেবী নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে।

পদ্মনাথ সালকেয় এসেছিলেন। একে তাকে জিজ্ঞেস করে খুঁজেও বের করেছেন দেবীপ্রসাদের বাড়ি। আত্মীয়-স্বজন কেউ কেউ থাকলেও দেবী এখন আর এখানে থাকে না। গল্ফ গ্রিন-এ ফ্ল্যাট কিনেছে। ঠিকানাটা জোগাড় করে পদ্মনাথ কয়েক দিন পরে গ্রে স্ট্রিট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে গল্ফ গ্রিনে চলে এসেছিলেন। বিরাট অঙ্কের ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে গিয়ে এতটুকু বুক কাঁপেনি। আসলে তখন সেই আবিষ্কারের নেশাটা ওঁকে বুঁদ করে রেখেছিল।

অথচ এখন, উৎসবের শেষ রাতে স্তিমিত প্রদীপের মতো লাগছে নিজেকে। কোনও দিকের অন্ধকারেই পদ্মনাথ এতটুকু আলো ফেলতে পারেনি। যদিও প্রথম দিনের মতোই দেবীপ্রসাদ ওঁকে এখনও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

আজ পর্যন্ত বিশ্বনাথ দত্তর ছবি কোথাও, কোনও বইয়ে ছাপা হয়নি শুনে দেবীও অবাক হয়েছিল ওঁরই মতো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজস্ব সংগ্রহে যে সব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য আছে, তা মেলে নিয়ে বসেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁজেছে বিশ্বনাথ দত্তের ছবি। না-পাওয়ার ঘটনাটাই দেবীকে বেশি উদ্দীপ্ত করেছিল। দেবী নিজে থেকেই কথা দিয়েছিল, একটা-না-একটা সূত্র বের করবেই।

পদ্মনাথও বসে থাকেননি। পাড়ার ছোট লাইব্রেরি থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার—প্রায় সব জায়গায় গেছেন। পুরনো খবরের কাগজ, স্টেট আর্কাইভ, পুরনো ছবির অ্যালবাম, বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড, কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহ—পদ্মনাথ চরকির মতো ঘুরেছেন। সর্বত্র ওঁর প্রবেশ খুব সহজে হয়নি। ওঁর গবেষণার বিষয় শুনে অনেকেই নিরুৎসাহিত করেছে। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছেন, বেলুড় মঠের দ্বারস্থ হতে। কিন্তু পদ্মনাথ তখনও ভেঙে পড়েননি। মাথায় একটা গোঁ চেপে গেছিল। সব ধরনের লেখালেখি বন্ধ করে এই একটা কাজ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করতে চেয়েছিলেন। নীরজ যে-অদৃশ্য চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বেড়াতে ভাল লাগছিল। কেন কে জানে, তখন কেবলই মনে হয়েছে, অতীতের বিবর্ণ কোনও পৃষ্ঠা থেকে নরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতার অবয়ব বেরিয়ে আসবে, আসবেই। তিনি তো কাল্পনিক কেউ নন। তখনকার দিনের নামকরা অ্যাটর্নি, সংস্কৃতিবান, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিজাত পুরুষ। অমন বিশ্বজয়ী পুত্রের পিতা। তাঁর অন্য দুই ছেলে মহেন্দ্রনাথ এবং ভূপেন্দ্রনাথও স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতী। এমন যে-মানুষ, তিনি কি চিত্রশূন্য, নিরালম্ব হতে পারেন কখনও।

দেবীপ্রসাদ একটা কেন, অনেকগুলো সূত্রের কথা ফোনে ফোনে জানিয়েছে। পদ্মনাথ

দেরি না করে ছুটে গেছেন। খুব আশাব্যঞ্জক কিছু হয়েছে তা নয়। তবে সোর্সগুলো অপরীক্ষিত থাকেনি। দিন পনেরো আগে দেবী ওঁকে বাড়িতে আসতে বলেছিল। পদ্মনাথ গেছিলেন। দেবীপ্রসাদ তেমনই গভীর আশায় বলেছেন, শোন্, চন্দ্, তুই আর আমি একদিন হাইকোর্টে যাই। তার আগে অবশ্য আঁটঘাট বেঁধে নিতে হবে। হাইকোর্টের দেওয়ালে, বার লাইব্রেরিতে আঠারোশো চুরাশির আগে অ্যাটর্নিদের যেসব গ্রুপ ছবি টাঙানো আছে সেগুলো আমরা দেখব। গ্রুপ ছবিগুলোর তলায় নিশ্চয়ই নাম থাকবে। বি এন ডাট কিংবা ভি এন ডাট।

—কী করে বুঝবি ইনিই বিবেকানন্দের বাবা? পদ্মনাথ কোথায় যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলেন।

—তারও একটা সূত্র ভেবে রেখেছি! ধর, যদি দেখি সেই গ্রুপ ফটোতে এইচ এন টাগোর নামে কেউ আছেন, তা হলে আমরা নিশ্চিত হয়ে যাব ওই বি এন বা ভি এন স্বামীজির বাবা।

সামান্য বিরক্ত হয়ে পদ্মনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, এইচ এন টাগোর কে? রবীন্দ্রনাথের কেউ...

—ইয়েস! বিশ্বকবির সেজদা। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উনিও অ্যাটর্নি ছিলেন এবং বিশ্বনাথ দত্তের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব ছিল বেশ গভীর। সম্ভবত হেমেন্দনাথ সিমলার দত্তবাড়িতে একাধিকবার গেছেন। এ সব তথ্য পেয়ে গেলাম হেমেন্দনাথের নাতি সুভো ঠাকুরের একটা লেখায়। আশ্চর্যের কথা, এই দুই বন্ধুরই মৃত্যু আঠারোশো চুরাশিতে। শোন্, হাইকোর্টের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়। তাঁকে ধরে আমরা অন্তত ছবিগুলো কিংবা ওই সময়ের কিছু কাগজপত্র হয়তো দেখতে পারব। অসুবিধে হবে না। তুই যেতে রাজি? আমার মন বলছে, এখানেই...

অরাজি হওয়ার কথা ছিল না। পদ্মনাথও ভেবেছিলেন, হাইকোর্ট ছিল বিশ্বনাথ দত্তর কর্মক্ষেত্র। ওখানে নিশ্চয়ই উনি ওঁর জীবনের কোনও চিহ্ন ফেলে রেখে এসেছেন। যে-অ্যাটর্নি ফার্মের সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন, তা আজ আর নেই। কিন্তু হাইকোর্ট আছে। একশো সোয়াশো বছরের পুরনো কাগজ-পত্র আছে, হাইকোর্টের সগর্ব অস্তিত্ব আছে। অতএব যত বর্ণহীনই হোক, কিছু একটা পাওয়া যাবে।

দেবীপ্রসাদ সেই ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু হাইকোর্ট থেকেও শূন্য হাতে ফিরে এসেছেন পদ্মনাথ। সুউচ্চ দেওয়ালে, নাগালের বাইরে টাঙানো ছবিগুলো ধূলিধূসরিত। অনেকগুলোরই নীচে ক্যাপশান নেই। যেগুলোর আছে, সেগুলোও পড়া যাচ্ছে না। টর্চের জোরালো আলোতেও নয়। ছবিগুলো নীচে নামিয়ে আনাও দুঃসাধ্য। এবং সে অনেক জটিল প্রক্রিয়া।

হাইকোর্টের উৎসগুলোকে পদ্মনাথ এই দৌড়ের শেষ স্পর্শবিন্দু বলে মনে মনে দাগিয়ে রেখেছিলেন। অথচ...। দৌড় এবং এগিয়ে যাওয়া—এর কোনওটাই পদ্মনাথ শেষ করতে পারছেন না। পথের ধারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। যদিও ওঁর চারপাশের জীবন কোথাও থেমে নেই। কৃষ্ণচূড়া গাছটা এই বসন্তে তেমনই ফুল ফোটাচ্ছে।

তিন

নীরজ ওর কিউবিকলে ঢুকতেই সিনিয়র সাব এডিটর রুদ্রদা এসে বলল, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

—কোথায়? নাম বলেছে? নীরজের ভুরু কুঁচকে গেল।

—না, মানে জিজ্ঞেস করিনি। তবে ভদ্রলোক আগেও নাকি তোমার কাছে এসেছিলেন। তুমি নাকি কী একটা কাজ দিয়েছ...। উনি একটু টয়লেটে গেছেন।

—অ। নীরজ মুচকি হাসল। তার মানে পদ্মনাথবাবু। ভদ্রলোক এই ক'দিনে নিশ্চিত টের পেয়ে গেছেন আত্মপ্রকাশের জগৎটা কত কঠিন। ছাইপাঁশ লিখলাম আর ছাপানোর জন্য সম্পাদকের টেবিলে এনে ফেলে দিলাম—ব্যাপারটা সহজ নয়। সৃজন অথবা আবিষ্কার—যে কোনও পথেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম অনিবার্য। এরপরে পদ্মনাথবাবুর লেখালেখির শখ আর থাকবে বলে মনে হয় না। ওঁকে নিবৃত্ত করতেই নীরজ এমন একটা অসম্ভব কাজের মুখে পদ্মনাথকে ঠেলে দিয়েছিল। সম্ভবত পৃথিবীর কোথাও আর বিশ্বনাথ দত্তের প্রতিকৃতির অস্তিত্ব নেই। চিরদিনের মতো ধ্বংস হয়ে গেছে সংরক্ষণের অভাবে, সময়ের নির্মম উপেক্ষায়। আমৃত্যু চেষ্টা করলেও পদ্মনাথবাবু নরেন্দ্র-মহেন্দ্র-ভূপেন্দ্রর বাবার ছবি উদ্ধার করতে পারবেন না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আজ ওঁর ব্যর্থতার কথা জানাতে এসেছেন। নীরজের কাছে এটা পরিষ্কার। কেননা এই কাজের এটাই নিষ্ঠুর ফলশ্রুতি। কী আর করা যাবে! নীরজ তো পদ্মনাথকে এইভাবেই ধাক্কা মারতে চেয়েছিল।

—আজ খুব গরম পড়েছে, তাই না রুদ্রদা? ফ্যানের স্পিডটা শেষ বিন্দুতে নিয়ে গিয়ে নীরজ বলল। ওর ঠোঁটের কোণে এখনও হাসিটা ঝুলে আছে।

—ভীষণ। রুদ্রদা বলল। কিন্তু বুঝতে পারল না নীরজ কেন সারা মুখে হাসির আভাস ছড়িয়ে রেখেছে।

—ঠিক আছে। তুমি এসো। ভদ্রলোক আসুন, কথা বলব।

রুদ্রদা চলে যাওয়ার দু'মিনিট পরেই পদ্মনাথবাবু ওর ঘরের সুইংডোর ঠেলে মুখ বাড়ালেন। ওঁকে ভেতরে আসার আহ্বান জানানোব পরিবর্তে নীরজের এই মুহূর্তে মনে হল, ভদ্রলোককে এখনও জিজ্ঞাসাই করা হয়নি—অরুণেন্দুদাকে উনি চিনলেন কোন্ সূত্রে? আজ জেনে নিতে হবে।

পদ্মনাথ ভাঙা গলায় বললেন, আসব...

—আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনাকে আবার পারমিশান নিতে হবে নাকি! নীরজ মাত্রাতিরিক্ত আন্তরিক।

ভদ্রলোকের মুখটা এই গরমে বেশি রকম ঝলসে গেছে। সেই সঙ্গে বেশ বিধ্বস্ত। ওঁর ধুতি-পাঞ্জাবিতে একটু যেন মালিন্য লেগে আছে।

হাত তুলে ওকে অযথা নমস্কার করে পদ্মনাথ বললেন, নীরজবাবু, আমি পারলাম না।

—সে কী! পারলেন না মানে? কৃত্রিমতার দুর্ভেদ্য মুখোশটা মুখে ভাল করে এঁটে

নিয়ে নীরজ বলল, আপনি এরই মধ্যে হাল ছেড়ে দিলেন? আশ্চর্য! না, না এটা আমি ভাবতে পারছি না, পদ্মনাথবাবু।

—ভাই, বিশ্বনাথ দত্তের ছবি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এমন নিদারুণ কাণ্ডও ঘটে গেছে। হ্যাঁ, ভাই, আমিও ভাবতে পারিনি। অথচ এমন একজন নামী মানুষ, গুণী মানুষ...

—আপনি সমস্ত সম্ভাব্য জায়গায় খুঁজেছেন? নীরজ সোজা হয়ে বসে পদ্মনাথকে বাজিয়ে নিতে চাইল।

—হ্যাঁ, নীরজবাবু। অলমোস্ট এভরি সোর্সেস। কিন্তু কোথাও পেলাম না। আপনি তো জানেন, বিবেকানন্দ তো বটেই, ওঁর দুই ভাইও ছিলেন চিরকুমার। কেউই উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। তাই আমি বিশ্বনাথ দত্তের বড় মেয়ে স্বর্ণময়ী দেবীর বংশধরদের কাছেও গেছিলাম। তাঁরাও কোনও আলো দেখাতে পারেননি। বিশ্বাস করুন...

ওঁকে হাত তুলে থামিয়ে নীরজ বলল, আর কোথায় কোথায় খুঁজেছেন?

—বলছি। করুণ গলায় পদ্মনাথ বললেন, তার আগে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন!

সামান্য পরেই জল এল। পদ্মনাথ খেলেন। তারপর প্রায় প্রাণহীন গলায় গেঁথে তুললেন ব্যর্থতার এক-একটা ইট। নীরজ লক্ষ করছিল ভদ্রলোকের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কষ্টটা যত না শারীরিক তার চেয়ে বেশি হৃদয়ের। আসলে না-বুঝে, না-ভেবে একটা ভ্রান্ত আশার পেছনে এইভাবে দৌড়লে যে কোনও মানুষকেই মুখ থুবড়ে পড়তে হয়। নীরজ তো জানতই এমনটা ঘটবে।

পদ্মনাথ একটু থামতেই নীরজ জোরে হতাশ্বাসের শব্দ করে বলল, তার মানে কি আমি ধরে নেব, আপনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বিশ্বনাথ দত্তের ছবির কোনও অস্তিত্বই আর নেই! একটু আগেই আপনি এমনই বললেন।

মাথা নীচু করে পদ্মনাথ এবার মৃদু স্বরে বললেন, একথা আমি কীভাবে জোর দিয়ে বলব ভাই! থাকতেও পারে। অবিশ্বাস্য কোনও অন্তরালে! কিন্তু আমরা কেউ সেখানে পৌঁছতে পারছি না হয়তো!

—তাহলে আপনি এমনভাবে ভেঙে পড়ছেন কেন? নীরজ একটু থামল, তারপর চোখ সরু করে হেসে বলল, কাজটা কিন্তু চালিয়ে যান! চালিয়ে যান!

স্তব্ধ হয়ে পদ্মনাথ বসে আছেন। ওঁর হাতে আজ আর সেই ফুলস্কেপ সাইজের খাতাটা নেই।

ডট পেনের পেছনটা টেবিলে দু'চার বার ঠুকঠুক করে নীরজ গলার স্বর পাল্টে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনি অরুণেন্দুদাকে কী করে চিনলেন?

নিষ্প্রভ চোখ দুটোকে তুলে পদ্মনাথ বললেন, ওর এক শ্যালক আমার কাছে কিছুদিন অঙ্ক-ইংরেজি পড়েছিল। একসময় প্রাইভেট টিউশনিও করতাম।

নীরজ কোনও মন্তব্য করল না। দেখাই যাচ্ছে অরুদার সঙ্গে ওর পরিচয়ের সূত্রটা খুব জোরালো কিছু নয়। শালা-সম্বন্ধীর যোগাযোগগুলো খুব ক্লিশে এবং পাতলা। ও

নিয়ে ভাবার কিছু নেই। নীরজ আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল, জানেন, আমি কিন্তু খুব আশা করেছিলাম, আপনি পারবেন। আজ পর্যন্ত যে-কাজটা কেউ করেনি, সেটা আপনার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করেছিল। আর একটু চেষ্টা করুন না পদ্মনাথবাবু! বিশ্বনাথ দত্তের মতো মানুষ কেবল বইয়ের পাতায় কতগুলো অক্ষরের আকৃতিতে বেঁচে থাকবেন! আমরা তাঁর কোনও ছবি কখনও দেখতে পাব না!

পদ্মনাথ জোরে শ্বাস ফেললেন।

—এ হতে পারে না। এটা আপনার বাজে ধারণা। শুনুন, পদ্মনাথবাবু, আপনাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম, এই কাজটা করতে পারলে আপনি অমর হয়ে যাবেন। বিশ্বনাথ দত্তের ছবির ইনভেন্টর হিসেবে আপনার নাম জগৎ বিখ্যাত হয়ে যাবে। বুঝেছেন!

নীরজকে হতচকিত করে সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে উঠলেন পদ্মনাথ, আমি অমরত্ব চাই না, নীরজবাবু, চাই না। জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় দুটো প্রাণের কথা, মনের কথা লিখেছি। সেটুকু কোথাও ছেপে বেরোলেই যথেষ্ট। আর কিছু চাই না, ভাই!

নীরজ বিব্রত। খানিকটা বিমূঢ়। অস্বস্তি কাটাতে মুখে হাত রাখতেই ওর আঙুলের ডগায় উঠে এল মুখোশেব রঙ।

বেণীবাবুর মৃত্যুসংবাদ

পাল-ডাক্তার থুথু ফেলতে গিয়েও সামলে নিলেন। প্রায় সারা ঘর জুড়ে বেণীবাবুর লাশ পড়ে আছে। খাটে ওঠারও সময় পায়নি লোকটা। মনে হয়, মেঝেতে পড়া মাত্রই খতম। ঠাণ্ডা, শক্ত, কাঠ হয়ে-যাওয়া দেহটাকে এরা কেউ নড়াতে পারেনি। থুথু ফেললেই লোকটার গায়ে গিয়ে পড়বে। অথচ একটা চাপা গা-বমি বমি গন্ধ ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। পাল-ডাক্তার বিরক্ত হয়ে থুথুটা গিলে ফেলে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, আর দেখার কিছু নেই। ফিনিশ্‌ড। বাট হোয়েন—দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন! তা, দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে গতকাল রাত্রে পড়েছে আর মরেছে। ...আচ্ছা তোমরা তো ওর বেশ বন্ধু-বান্ধব হে! একটা লোক কাল থেকে বেঘোরে মরে পড়ে আছে, আর আজকের এই সন্ধেবেলায় তোমরা সেটা টের পেলে! আশ্চর্য!

ওদের মধ্যে জীবনধন নামের মানুষটা পাল-ডাক্তারের চেয়েও বয়সে বড়। বয়স ষাটও হতে পারে, সত্তরও হতে পারে। জীবনযুদ্ধে লড়াই করতে করতে লোকটা ঘাঘু হয়ে গেছে। শোকতাপহীন। মরা মাছের মতো ঘোলাটে চোখ। এরই মধ্যে এক পাঁইট চড়িয়ে এসেছে। ডাক্তারের বিস্ময় দেখে জিভ কেটে জীবনধন বলল, ডাক্তারবাবু মানুষ জন্মানোর পর কেমন ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদে। সক্কলকে জানিয়ে দেয়—আমি মায়ের পেট থেকে দয়া করে বেরোলুম। পাড়া-পড়শি তখন জানতে পারে এক ব্যাটা মানুষের বাচ্চা জন্মাল। কিন্তু মরার সময় দেখুন, কান্না নেই, আওয়াজ নেই। একটু চিৎকার চেঁচামেচি করলে তবু জানা যায় মানুষটা মরছে। আমরা স্যার সাত ধান্দায় ঘুরছি। জানান না দিলে কী করে টের পাব বলুন! তারপর এই ধরুন না...

জীবনধন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওর কোমরের কাছটায় খাম্‌চে ধরে ওকে থামিয়ে দিল বিষ্ণুচরণ। অল্প অল্প নেশায় জীবনধন খুব কথা বলতে ভালবাসে। আজেবাজে বকে যেতে থাকে এক নাগাড়ে। আচমকা বাধা পেয়ে জীবনধন বলল, কিছু বলছিস বিষ্টু?

—না, তুমি একটু চুপ করবে ধন্‌দা। বিষ্ণুচরণ পাল-ডাক্তারের দিকে চেয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল। ডাক্তার যদি কোনও ছুতোয় একটু বেঁকে বসে তাহলে বেণীবাবুর আর শ্মশান-যাত্রায় যাওয়া হবে না। কাটা-ছেঁড়ার টেবিলে গিয়ে শুতে হবে চিৎপাত হয়ে। তারপর শালা বেওয়ারিশ লাশের গাদায় ঢুকে স্বর্গের সিঁড়ি খোঁজো!

কড়া চোখে জীবনধনের দিকে তাকিয়ে পাল-ডাক্তার বললেন, ডেথ সার্টিফিকেট আমি দিয়ে দিচ্ছি। তবে শ্মশানের ডাক্তার যদি আটকে দেয়, তখন কিন্তু আমি আর

তোমাদের চিনব না। বলে দেবো, তোমরা আমার সই জাল করেছ। লেটার হেড চুরি করেছ। বুঝলে...

বিষ্ণুচরণ ভাল ছেলের মতো মাথা নাড়ল। মণ্টু আর হিলু পাল-ডাক্তারের পিছনে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যোমকেশ ওপাশের সিঁড়িতে বসে ভাগ করছে সৎকারের বিভিন্ন খরচাখরচ। এই টাকার সিংহভাগটাই এসেছে বেণীবাবুর সেই কালো মানিব্যাগটা থেকে। ব্যাগটা কেরোসিন কাঠের সেলফের ওপরে রাখা ছিল। পাল-ডাক্তার আসার আগেই ওটা ওরা সরিয়ে নিয়েছে।

—এই লোকটির কী যেন নাম? পাল-ডাক্তার জানতে চাইলেন।

—আজ্ঞে বেণীমাধব। বেণীমাধব মল্লিক। বিষ্ণুচরণ হাত জোড় করে বলল।

—না ডাক্তারবাবু, ওর নাম বেণীমাধব দাস। আমি জানি। ওরা বেণীবাবুকে ক'দিন চেনে? সেদিনের ছোঁড়া সব! আমি ওর পুরনো সাকরেদ।

—আঃ, কী হচ্ছে ধনদা, তুমি ঘর থেকে যাও তো। বিষ্ণুচরণ বেশ রেগে গিয়ে বলল।

পাল-ডাক্তার নাক-মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে বিকৃত মুখে বললেন, আশ্চর্য, লোকটার নামগোত্র তোমরা ঠিক করে জানো না!...আমার চেম্বারে দু'-তিনবার এ চিকিৎসার জন্যে গেছল। আমারও ছাই টাইটেলটা মনে নেই। যাই হোক, আমি ওই মল্লিকই লিখে দিচ্ছি। কই, আমার ব্যাগটা কার কাছে?

হিলু নিজের পকেট থেকে তিন টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে পাল-ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ওর হাতে প্রথম থেকেই ধরা আছে ব্যাগটা। বেজায় ভারী। ভেতরে মনে হয় যত রাজ্যের ওষুধ-পত্তর পোরা আছে। হিলু অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল—ডাক্তারের যাওয়ার ভাড়াটা কে দেবে? এবার বেণীবাবুর নিজেরই দেওয়া উচিত। ওর জন্যেই তো এসব ডাক্তার-ফাক্তারের হুজ্জোতি। এইভাবে বেমক্কা মরার কোনও মানে হয়! পাল-ডাক্তার ব্যাগের খোঁজ করছেন দেখে হিলু তাড়াতাড়ি ব্যাগটা এগিয়ে দিতে গিয়ে দরজায় ঠোক্কর খেল। দরজার ওপরের চৌকাঠে। বেশ লেগেছে। হিলু মনে মনে বলল, শালা, পালের বাচ্চা।

ঘরের মধ্যে একটা বড়সড় গুয়ে-মাছি ঢুকে পড়েছে। বিষ্ণুচরণ দেখল, মাছিটা বেণীবাবুর হাঁ-এর পরে বসার জন্য এপাশ-ওপাশ উড়ছে। সন্ধেবেলায় মাছি বেরোনোর কথা নয়। কিন্তু ও ব্যাটা কোত্থেকে যেন খবর পেয়েছে বেণীবাবু আর বেঁচে নেই। এখন একেবারে একটা আস্ত মড়া। মাছিটা নির্ঘাত মড়ার রস খেতে এসেছে। বিষ্ণুচরণ কার কাছে যেন শুনেছিল, মরা মানুষের শরীরে রস জমা হয়। সেই রস বাড়তে বাড়তে দেহটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কদাকার করে তোলে। তারপর শরীর পচে যায়। দুর্গন্ধ ওঠে। পচা মড়ার গন্ধে সুস্থ মানুষের অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। পাল-ডাক্তার হয়তো ঠিকই বলছেন, বেণীবাবু গতকাল রাতে পটল তুলেছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল। অতএব রস জমতে শুরু করেছে। মাছিটা রসের গন্ধে বন্‌বন্ করে ঘুরছে। হুস্ হুস্ করে তাড়িয়ে দেওয়ারও উপায় নেই। ডাক্তারবাবু মেঝেতে উবু হয়ে বসে ডেথ সার্টিফিকেট লিখছে। এখন কোনওরকম ডিস্টার্ব করা

চলবে না। বেণীবাবুকে চিতায় তোলার আগে পর্যন্ত পাল-ডাক্তারকে তোয়াজ করতে হবে।

—লোকটা খেয়েই মরল। এই যে দেখ না, কাল রাত্রে বাবু দুধ খেয়েছেন। বাটির তলায় এখনও দুধের সর লেপটে আছে। সঙ্গে মাংসও চলেছে দেখছি। ওই খুরিটায় করে মাংস এনেছিল। বডির তলায় হয়তো হাড়-গোড়গুলো পড়ে আছে। তার মানে রুটি, মাংস আর দুধ। সঙ্গে নিশ্চয়ই বোতল-টোতল ছিল। ব্যস্, চারে মিলে বলহরি হরি বোল!

—চোখ বড় বড় করে জীবনধন পাল-ডাক্তারকে দেখল। লোকটা ডাক্তার না পুলিশ! বেটার চোখ দেখ! কোথায় কী পড়ে আছে ঠিক দেখেছে। আমার তো বাপু এসব কিছুই নজরে পড়েনি। আমি তো এসে থেকে কেবল একটা মালই দেখতে পাচ্ছি—বেণীবাবুর লাশ। মোটা, কালো, হুমদো এক মিন্‌সে মরে পড়ে আছে। লুঙ্গির একটা দিক থাইয়ের ওপর সরে গেছে। আর একটু সরলেই তলার জিনিসপত্তর সব বেরিয়ে পড়ত। বেণীবাবুকে ছাড়া এই মুহূর্তে ঘরের আর কী দেখার আছে! জীবনধন ভেবে পেল না। কেবল মুখ সরু করে চুক্ চুক্ শব্দ করল।

একটু অবাক হয়ে গেল বিষ্ণুচরণ। পাল-ডাক্তারের কথায় নয়, অন্য একটা ব্যাপারে। ঘরের মেঝেতে সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, এমন কী বেণীবাবু স্বয়ং, অথচ পাঁইটের খালি বোতলগুলো কোথায়? বিষ্ণুচরণ কাল নিজে দেখেছে, শচীনন্দনের দোকান থেকে দুটো পাঁইট কিনে বেণীবাবু ওর বাংলা শার্টের দু'পকেটে রাখছে। কালো মানি ব্যাগটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বেণীবাবু ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির গলিতে ঢুকে গেছিল। বিষ্ণুচরণ ইচ্ছে করেই ওর সামনে আসেনি। দূর থেকে দেখছিল। ওকে দেখতে পেলেই বেণীবাবু টাকার কথা বলত নিশ্চিত। বেণীবাবুর থেকে এক হপ্তা আগে দুশো টাকা ধার নিয়ে এখনও শোধ দিতে পারেনি বিষ্ণুচরণ। লোকটা দিনের বেলায় দেখা হলে কখনও টাকার কথা বলত না। কিন্তু এই সন্ধের পরে বেণীবাবু অন্য মানুষ। তখন ওর যত রাগ, যত হারামিপনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। কাউকে ছেড়ে কথা বলত না। অবশ্য পাশাপাশি খোলা হাতে মালও খাওয়াত লোকটা। একদম কিপ্‌টেমি করত না। এই একটা মস্ত গুণ ছিল বেণীবাবুর। কাল রাতে ওর সঙ্গে কে কে প্রসাদ পেয়েছিল বিষ্ণুচরণ এখনও সেটা বের করতে পারেনি। জীবনধন, মণ্টু, হিলু, ব্যোমকেশ সবাই অস্বীকার করেছে। সবাই নাকি কাল রাতে নিজের পয়সায় টেনেছে। ঠিক আছে, তা না হয় হল। কিন্তু বেণীবাবু নিজে তো খেয়েছেন। তা সেই বোতলগুলো কোথায় গেল? বিষ্ণুচরণ বেশ ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে। একটু নীচু হয়ে তক্তপোশের তলায় উঁকি দিয়ে দেখল বিষ্ণুচরণ। বোতলের চিহ্নমাত্র নেই! ওখানে পড়ে আছে মরচে-পড়া টিনের সুটকেস, ভাঙা হ্যারিকেন, ছেঁড়া হাওয়াই চপ্পল, নোংরা মশারি, কেরোসিন তেলের ক্যান আর বহু বছরের ধুলো। জীবনধনের দিকে একটু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বিষ্ণুচরণ বলল, মুখ দিয়ে শব্দ করছ কেন? অ্যাঁ!

মুখের ওপর আঙুলের চাবি এঁটে জীবনধন বলল, চুপ চুপ, গোল করিস না।

ডাক্তাবাবুর ভুল হয়ে যাবে।
—হ্যাঁ হে, এর আত্মীয়স্বজন কোথায় থাকে? তাদের খবর দেওয়া হয়েছে? পাল-ডাক্তার হঠাৎ লেখা থামিয়ে জানতে চাইলেন, বেণীমাধবের মুখাগ্নি করবে কে? ওর আত্মীয়দের খবর দিয়েছ?
কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। ওরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। এতক্ষণ বেণীবাবুর আত্মীয়কুটুম্বের কথা কারোর মনেই আসেনি। ওরা যে বেণীবাবুর কেউ নয়, কিংবা বেণীবাবুও যে ওদের কেউ হয় না—এটা বেমালুম ভুলে গেছে! মানুষটা ওদের সঙ্গে মিশত, কথা বলত, মাল খেত, খাওয়াত, টাকা ধার দিত বলে তো আর আত্মীয় হয়ে যায়নি। এসব একদমই খেয়াল নেই। হিলুর কাছ থেকে খবরটা পাওয়ার পর থেকেই ওদের সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। টেরিটি বাজারের মহেন্দ্র সিং হিলুকে আজ দুপুরে বলেছিল, তুই বেণীবাবুকে বলে দিবি, কাল যেন উনি কামাই না করেন। আমার স্টক মেলানোর কাজ বাকি আছে। হাতে আর সময় নেই। উনি যেন অবশ্য করে আসেন। হিলু সেই খবরটা দিতে এসে জেনেছিল বেণীবাবু মরে পড়ে আছে। এই বাড়ির এগারোটা ঘরের নটাই চট-বস্তার গুদাম। বাকি দুটো ঘরের একটায় থাকে বুড়ো রামযতন—গুদাম মালিকের নোকর, আর অন্যটায় বেণীবাবু। কবে, কীভাবে এই বাড়িতে এসে বেণীবাবু আস্তানা গেড়েছিল বিষ্ণুচরণরা জানে না। ধনদাও বেণীবাবুকে গোড়া থেকে এখানেই দেখে আসছে। গঙ্গার দিকের এই গলিটায় ফ্যামিলি নিয়ে বাস করে খুব কম লোক। তার ওপর এই বাড়িটা তো আরও জনহীন।
—বেণীবাবুর বাড়ি স্যার ধবধবিতে। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে। অনেক দূর। মণ্টু পেছন থেকে ফ্যাসফেসে গলায় বলল।
—তা বললে হবে! দূর তো কী হয়েছে? আত্মীয়দের খবর দেবে না। এক্ষুনি কেউ চলে যাও। ওর স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে আছে তো! লোকটা কোথায় চাকরি করত! পাল-ডাক্তার লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলেন।
—হ্যাঁ স্যার, বেণীবাবুর বউ আছে। দুই ছেলে। খুব শিক্ষিত। একজন তো জাহাজে চাকরি করে। অন্যজন বি-এ পড়ছে। বেণীবাবু নিজে কর্পোরেশনে চাকরি করত। মেয়ে ছিল একটি, বেণীবাবু বিয়ে দিয়ে খালাস হয়ে গেছিল। এবারও মণ্টু উত্তর দিল।
—বেশ, বেশ, খুব খলিফা লোক ছিল দেখছি। তা এইভাবে মরণ ডেকে আনলো কেন? যাক্ গে, এই নাও সার্টিফিকেট। এবার তোমাদের ম্যাও তোমরা সামলাও। আমি চলি।
পাল-ডাক্তারকে চলে যেতে দেখে সিঁড়ি থেকে তড়াক করে উঠে এসে ব্যোমকেশ মাথা চুলকে বলল, ডাক্তারবাবু, আপনার টাকাটা আগামীকাল দিয়ে আসব। বুঝতেই পারছেন...আমরা যে কটা টাকা জোগাড় করতে পেরেছি, তাতে করে বেণীবাবুর সৎকারটাই ভাল মতো হবে না। আধপোড়া অবস্থায় হয়তো গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে। তাই বলছিলাম...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। সে পরে দেখা যাবে। আগে আমাকে যেতে দাও দেখি। ওঃ, এখানে দমবন্ধ হয়ে আসছে। অ্যাই ছোঁড়া, আর একটা রিকশা ডেকে দে তো! পাল-ডাক্তার লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন। ওঁর পেছনে হিলু।

ওরা একটু আলো-আঁধারি জায়গা খুঁজে নিয়ে বেণীবাবুর খাট নামিয়েছে। নিমতলা আর আগের মতো নেই। চাপ চাপ অন্ধকার, অসংখ্য ঝুপড়ি, চোলাইয়ের আড্ডা, খারাপ মেয়েছেলের হাতছানি আর বাতাসের হা-হা নিষেধ কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। এখন চতুর্দিকে ফক্‌ফক্ করছে আলো। লুকিয়ে-চুরিয়ে একটু শ্মশান-বৈরাগ্য পালায় কেউ মাতবে—তার জো নেই। মা শ্মশানকালীকে এখন আলোয় পেয়েছে। চিতার আগুনে যেন পোষাচ্ছিল না, তাই বিলিতি আলোয় মা সারা শ্মশান চত্বর সাজিয়ে নিয়েছে।

নিমতলায় পা দিয়েই জীবনধন প্রথমে অবাক হয়ে গেছিল। বেশ কয়েক বছর পবে শ্মশানে আসতে হল। এর মধ্যে কোনও দরকার পড়েনি। বাগবাজার খালপাড়ে জীবধনদের যে-বসতি, সেখানকার কেউ কেউ গত কয়েক বছরে মারা গেছে। সবাই চেনাশোনা লোক। তবু জীবনধন আসেনি। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে যারা হেরে যায়, তাদের সঙ্গে জীবনধনের কোনও বনিবনা নেই। তাদের জন্য শ্মশানে যেতে রাজি নয় মানুষটা। তবে বেণীবাবুর মৃত্যু অন্য ব্যাপার। এই লোকটা জ্যান্ত থাকতে যেমন কাছে টানত, মবার পবও তেমন টানছে। একটু দোনামনা করেও চলে এসেছে জীবনধন। খানিক রাস্তায় বেণীবাবুর খাটে কাঁধও লাগিয়েছে। অবাক ভাবটা এতক্ষণে কেটে গেছে। এবার বিরক্তি লাগছে জীবনধনের। এরচেয়ে কাশী মিত্তিরের ঘাটে গেলেই হতো। যে মরে গেছে তার জন্যে এত আলো-ফালোর কি দরকার বাপু! জীবনধন উসখুস করে বলল, হ্যাঁ রে, বিষ্টু, বোতলগুলো কি ভাঙবি না ঠিক করেছিস! রাত তো অনেক হল!

বেণীবাবুর খাট ছুঁয়ে বিষ্ণুচরণ বসে আছে। জীবনধনের কথায় তেমন উৎসাহ দেখাল না। হাই তুলে বলল, মণ্টুকে আসতে দাও। তারপরে...

—যাঃ বাবা, দুপাগুর চড়ানোর সঙ্গে মণ্টুর আসার সম্পর্ক কোথায়? ওর জন্যে একটা পাঁইট রেখে দিলেই তো হল! দে ভাই, দে। আর পারছি না।. জীবনধন কঁকিয়ে উঠল।

ব্যোমকেশ আর হিলু বেণীবাবুর পায়েব দিকটায় বসে আছে। একজন বাবু হয়ে, অন্যজন হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। কেউ কোনও কথা বলছে না।

—ও সিংজী, তোমার ঘড়িতে ক'টা বাজে? বিষ্ণুচরণ চেঁচিয়ে জানতে চাইল।

দূরের একটা ল্যাম্পপোস্টের হ্যালোজেন বাল্‌ব ঠিকমতো জ্বলতে পারছে না। থেকে থেকে দপ্ দপ্ করছে। মহেন্দ্র সিং ওখানে দাঁড়িয়ে একমনে বাল্‌বটার কাণ্ড দেখছিল। বেণীবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকে মহেন্দ্র সিং দারুণ চুপসে গেছে। দর্জিপাড়ায় ওর বাড়িতে গিয়ে হিলু খবরটা দিয়ে এসেছিল। মহেন্দ্র সিং তখন বাড়ি ছিল না। তবু খবরটা পেয়েছে। পেয়েই ছুটে এসেছে। বেণীবাবু প্রতিবছর এই

সময়টায় মহেন্দ্র সিং-এর কারবারের খাতায় হাত লাগাত। কিসের কারবার বিষ্ণুচরণরা জানে না। তবে বেণীবাবু বলত, স্টক মেলানোর কাজ। মাথা ঠাণ্ডা করে করতে হয়। একটু গোলমাল হয়ে গেলে সারা বছর হিসেব মিলবে না।
হিলু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, সিংজি কিসের কারবার করে গো বেণীবাবু?
—ওই একটা জিনিসের। তা তোর জেনে কী লাভ! বেণীবাবু হেসে বলেছিল।
সেই থেকে মহেন্দ্র সিংকে ঘিরে একটা রহস্যের জাল ছড়িয়ে আছে। আজ সিংজি যেরকম দমে গেছে, তাতে মনে হচ্ছে, বেণীবাবু ওকে ডুবিয়েছে। কিংবা লোকটা কোনও অজানা আশঙ্কায় ভীত। মহেন্দ্র সিংহ আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। বেণীবাবুর খাটের কাছে এসে ঘড়ি দেখে বলল, দশটা পাঁচ।
—আই বাপ্, এত রাত হয়ে গেছে। মণ্টু শালা এখনও আসছে না কেন? ধবধবিতে হারিয়ে গেল নাকি। শালা, আচ্ছা ঝোলানো দেখছি। ক্লান্তি আর বিরক্তি জড়নো গলায় ব্যোমকেশ বলল।
—বিষ্টুটা বড় হারামি তো! এখনও গ্যাঁট মেরে বসে আছিস। দে, দে, বোতলগুলো দে। জীবনধন আর ধৈর্য রাখতে পারল না। খিঁচিয়ে উঠল।
অন্য সময় হলে বিষ্ণুচরণ বুড়োটাকে টেনে মারত এক লাথি। মাল খাওয়ার জন্যে একেবারে ভিখিরির মতো করছে। প্রতিদিন খেয়েও ভিখিরিপনা গেল না। তবে আজ বিষ্ণুচরণ একদম খচে যাবে না। এখনও অনেক কাজ বাকি। বেণীবাবু চলে যাওয়ায় যে কত বড় ক্ষতি হল, বলার নয়। এটা কি ধন্দা বুঝতে পারছে না। ওদের সকলের এই হতদরিদ্র, কুৎসিত, দিন আনি দিন খাই জীবনে বেণীবাবু অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল। সেই জায়গাটা চিরদিনের মতো ফাঁকা হয়ে গেল। বিষ্ণুচরণরা মরে গেলেও আর একটা বেণীবাবু জোটাতে পারবে না। ওদেব কেউ পছন্দ করে না। দেখলেই সবাই সতর্ক হয়ে যায়। কেবল বেণীবাবু ওর মনের সুতোয় ওদের গেঁথে নিয়েছিলেন। ওর কালো মানিব্যাগটা, বিষ্ণুচরণদের কখনও ফিরিয়ে দেয়নি। যতটা সম্ভব বেণীবাবু ওদের দিয়েছেন। পাল-ডাক্তাব ওর আত্মীয়দের ডেকে আনার কথা বলছিলেন। বিষ্ণুচরণ মাঝে মাঝেই ভাবছে, কারা আত্মীয়—ধবধবির লোকগুলো, না আমরা! বেণীবাবু কাদের আত্মীয় বলে মনে করত! ব্যোমকেশ, হিলু এসব নিয়ে একবারও ভাবছে না কেন? মাল খাওয়ার মজা আগামীকালই তো আবার ফিরে আসবে। কিন্তু বেণীবাবু! বিষ্ণুচরণের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। দড়ির চৌপাইয়ের তলা থেকে চটের থলেটা বের করে জীবনধনের হাতে দিয়ে বিষ্ণুচরণ বলল, আমি খাবো না। তোমরা খাও।
কাচের গ্লাস, খুরি আর বোতলের ঠুংঠাং আওয়াজ তুলে জীবনধন খুশি-খুশি মুখে বলল, তা কি হয়! বেণীবাবুর অবর্তমানে তুই হলি গে আমাদের গার্জেন। কাজে-কম্মেও তুই মান্যবর লোক। আমি মুটেমজুরি করে খাই, হিলু শালা কোলাপসিবেল গেট পরিষ্কার করে পরিবার চালায়, ব্যোমকেশ ফুটপাতে হাত-সাফাইয়ের জিনিস বেচে, বড়বাজারের গদিতে ফাইফরমাস খাটে মণ্টু আর তুই পোস্তার ভেলিগুড়ের বাজারে দালালির কাজ করিস। তুই হলি দালাল। সবার সেরা। তুই যদি পাঁইটে

অরুচি দেখাস, তাহলে আমরা কোথায় যাব বাপ!

মহেন্দ্র সিং ওর সাদা ফিনফিনে ধুতির জাত খুইয়ে শ্মশানের মাটিতে বসে পড়েছে। লোকটা মনে হয় ডাম্বেল ভাঁজে। শক্ত গর্দান, উঁচু ঢিপির মতো বুকের ছাতি। বিষ্ণুচরণ আড় চোখে দেখল সিংজি ওর সিল্কের পাঞ্জাবির আস্তিন এমন সরু করে গুটিয়েছে যে হাতের মাস্‌ল ফেটে বেরুচ্ছে। লোকটা এত নিখুঁত বাংলা কথা বলে যে বিহারী বলে ধরতে পারা শক্ত। মহেন্দ্র সিং হঠাৎ চোয়াল শক্ত করে জীবনধনের দিকে আঙুল তুলে বলল, এই লোকটা সেই তখন থেকে ভ্যাটভ্যাট করছে! একদম চুপচাপ খাও। আবার কথা বললে মেরে উঠিয়ে দেব।

ওরা যে-অর্থে বেণীবাবুর সাগরেদ-সাথী, সেই অর্থে মহেন্দ্র সিং নয়। সিংজির ঠেক আলাদা, জগৎ আলাদা। কেবল কাজের সূত্রে বেণীবাবুর সঙ্গে ওর পরিচয়। জীবনধনকে কড়কে দেওয়ার কোনও অধিকার সিংজির নেই। তবে আজকের কথা স্বতন্ত্র। এখন শোকের সময়। এখানে যারা মড়া পোড়াতে এসেছে তারা কেউই আনন্দ করছে না। একটা যুবতী বউ তো সেই কখন থেকে এক নাগাড়ে মরা স্বামীর জন্য বুক ফাটিয়ে কাঁদছে। যেসব ভদ্রলোকেরা এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা কী সাংঘাতিক উদাস, গম্ভীর। মড়া পোড়ানোর গন্ধে আর গাঢ় ধোঁয়ায় এখানকার বাতাস ভারী হয়ে গেছে। ধন্‌দা সত্যিই বাড়াবাড়ি করছিল। হিলু বাকি ধূপগুলো জ্বালিয়ে বেণীবাবুর পায়ের কাছটায় গুঁজে দিতে দিতে দেখল ধন্‌দা গুম্ মেরে গেছে। যাতে শব্দ না হয় এমনভাবে গেলাসে মাল ঢালার চেষ্টা করছে ধন্‌দা।

সবাই চুপচাপ। নির্জলা কান্ট্রি স্পিরিট গলা বুক জ্বালিয়ে নেমে যাচ্ছে পেটের ভেতরে। কষ্ট হচ্ছে। তবু কেউ একটাও শব্দ করছে না। বিষ্ণুচরণ এবং সিংজিও শেষপর্যন্ত গেলাস নিয়েছে। মাত্র সতেরো টাকার ফুলে সাজগোজ করে শুয়ে আছে বেণীবাবু। খুব সামান্য ফুল। চারটে তোড়া, দুটো মালা আর কিছু ঝুরো রজনীগন্ধা। ব্যোমকেশের মনে হল, আর একটু বেশি ফুল কিনলেই হতো। জ্যান্ত বেণীবাবুর টাকায় মরা বেণীবাবু সাজবে—হিসেবটা তো এইরকম। তাহলে আর বেশি করে ফুল কিনলে দোষটা কি হত! লোকটার দরাজ হৃদয় ছিল। সেই তুলনায় ফুলের মালা বড় কমই পেয়েছে বেণীবাবু। ওর বাড়ির লোকেরা এসে হয়তো ছিঃ ছিঃ করবে। আবার না-ও করতে পারে। তারা এলেই বুঝবে, এর বেশি সামর্থ্য এদের নেই। এদের বাগানে সবচেয়ে বেশি ফুল কোনওদিন ফোটে না। এখনও পর্যন্ত সবই হল, কিন্তু মণ্টুর তো দেখা নেই! সারা রাত এইভাবে কি বসে থাকতে হবে? এই সব ভাবতে ভাবতে ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলে ব্যোমকেশ নিজেদের অস্তিত্বটা একবার ঝালিয়ে নিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল জীবনধন। মালের গেলাস উল্টে দিয়ে বেণীবাবুর বুকের ওপর প্রায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমরা অনাথ হয়ে গেলাম। হায় হায়, ওগো বেণীবাবু তুমি আমাদের বাবা ছিলে। আমরা বড় দুঃখী গো। আমাদের ফেলে কেন চলে গেলে? আমরা তোমার চরণে কি অপরাধ করেছিলাম। বলো, ও বেণীবাবু, একবারটি বলো।

বুড়ো মানুষটার কান্না-জড়ানো প্রলাপের অনেকটাই বোঝা যাচ্ছে না, তবু এই মুহূর্তে

ওদের সকলের বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে বেদনায় ভারী হয়ে উঠল। জীবনধন যা বলছে, তা ওদেরও মনের কথা। ওর এই কান্না, ওদেরও কান্না।

খানিকক্ষণ কেঁদে জীবনধন চুপ করতেই হিলু বলল, কতবার মিথ্যে কথা বলে বেণীবাবুর কাছ থেকে দু টাকা পাঁচ টাকা খিঁচে নিয়েছি—মানুষটা একবারও সন্দেহ করেনি। বলত, নে, নে। আমার অত টাকার দরকার নেই। বড় ছেলে জল-জাহাজে চাকরি করে। বাড়িতে টাকার অভাব নেই। বরং আমাকে পাঠায়।

—আমিও নিয়েছি রে হিলু। বিষ্ণুচরণ উদাস গলায় দূরে তাকিয়ে বলল, একবার বেণীবাবু আমাকে ওর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করার জন্য ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছিল। সেই টাকা থেকে কুড়িটা টাকা সরিয়ে ফেলেছিলাম। বেণীবাবু ধরতে পেরেও আমাকে কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল, চেয়ে নিলেই পারতিস বিষ্ণু। তোদের চুরির স্বভাবটা এবার ছাড়।...বেণীবাবু আমাদের খুব ভালবাসত না রে! সেদিন ওর কাছ থেকে দু'শো টাকা ধার করেছিলাম, আর শোধ দেওয়া হল না।

বিশ্রী শব্দে নাক ঝেড়ে জীবনধন বলল, বিষ্টু আমি কোনোদিন ব্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকিনি রে। আমাকে একবার ব্যাঙ্ক দেখাবি বাবা! বল্ না, দেখাবি!

জীবনধনের বেমক্কা কথার কেউ জবাব দিল না। প্রত্যেকের ভেতরে এখন উঁকি দিয়ে যাচ্ছে বেণীবাবুর স্মৃতি।

—আমি কতবার বেণীবাবুকে বেবুশ্যে মেয়েছেলে ধরাতে চেষ্টা করেছি। পারিনি। লোকটা বলত, এ দোষে আমাকে পাপী করে তুলতে পারবে না সিংজি। বাড়িতে আমার সতীসাধ্বী পত্নী আছে। বেণীবাবু আমাকে প্রতিবছর হাজার হাজার টাকা ট্যাক্সের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, অথচ কিছুই নেয়নি। কয়েকশো টাকা আর একটা বিলাইতি মদের বোতল। ব্যস্. ওতেই খুশি। কেমন যেন সাধু মানুষ ছিল বেণীবাবু। সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অদ্ভুত নরম গলায় বলল মহেন্দ্র সিং।

—ঠিক বলেছ সিংজি। লোকটা সত্যিই সাধু ছিল। খাঁটি সাধু। বটগাছ, অশ্বত্থ গাছ—এসব ভালবাসত। আমাদের গোয়াবাগান বস্তিতে গত বছরে খুব গাছ লাগানোর ধুম উঠেছিল। তা আমার মুখে সে খবর শুনে বেণীবাবু কোত্থেকে যেন একটা বটগাছ আর দুটো অশ্বত্থের চারা জোগাড় করে এনে আমাকে দিয়েছিল। বলেছিল, এগুলো লাগিয়ে দে। বড় হলে খুব ছায়া পাবি। গাছের তলায় তোর দোকানও করতে পারবি। গাছের মতো আশ্রয় আর নেই রে ব্যোমকেশ। জানো সিংজি, সেই তিনটি গাছের একটা এখনও বেঁচে আছে।

'বেঁচে আছে' কথাটা ধক্ করে ওদের বুকে গিয়ে ধাক্কা মারল। ওরা সবাই এই মুহূর্তে যেন নতুন করে আবিষ্কার করল—সবাই বেঁচে আছে, কেবল বেণীবাবু নেই।

লাস্ট ট্রেন কখন এসে ধবধবিতে পৌঁছবে অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন মাস্টারও বলতে পারলেন না। গাড়ি লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে আধঘণ্টা দেরিতে ছেড়েছে—এই পর্যন্ত খবর আছে। এবার ধবধবিতে কখন আসবে কেউ জানে না।

শেষ ট্রেন যারা শিয়ালদায় যাবে তাদের সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায়। মণ্টু এতক্ষণ

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল। খিদের জ্বালায় পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর না-পেরে মণ্টু বেঞ্চিতে এলিয়ে বসে পড়ল। এমন দুর্ভোগ, এমন সব অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা হবে জানলে কোন্ শালা ধবধবিতে আসত। ওঃ বেণীবাবুর শ্রীচরণে শত কোটি প্রণাম। এখন কোনওরকমে কলকাতায় পৌঁছতে পারলে হয়।

মণ্টু প্রথমে আসতে চায়নি। ধবধবিতে কোথায় বেণীবাবুর বাড়ি কেউ জানে না। এই সব গ্রাম-গঞ্জি জায়গায় রাস্তার নাম, বাড়ির ঠিকানার চল নেই। রাতের অন্ধকারে লোককে জিজ্ঞেস করে বেণীবাবুর বাড়ি কীভাবে খুঁজে বের করবে। মণ্টুর এইসব যুক্তি অন্যরা মানতে চায়নি। বিশেষত বিষ্ণুচরণ। প্রায় চোখ রাঙিয়ে ধমকচমক দিয়ে মণ্টুকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে। হিলুটা আরও পাজি। ও বিষ্ণুচরণের কথায় সায় দিয়ে বলেছিল, আমাদের মধ্যে কেবল মণ্টুর সঙ্গেই বেণীবাবু সুখ-দুঃখের গল্প করত। মণ্টু ওর হাঁড়ির খবর জানে। আমরা তো সব এক একটা ঢপবাজ। একমাত্র মণ্টু বেণীবাবুর তত্ত্বতল্লাশ করত। ওরই যাওয়া উচিত। কিরে মণ্টু, আমি ভুল বলছি।

হিলু ঠিকও বলেনি, আবার ভুলও বলেনি। বেণীবাবু নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই প্রায় বলত না। কম কথার মানুষ ছিল। রাতের দিকে যখন ওর নেশাটা বেশ চড়ে যেত, তখন বাড়িঘরের গল্প বলত। সেই সময় ওর ঘরে জীবনধন, বিষ্ণুচরণ, হিলুরা কেউ থাকত না। ততক্ষণে সবাই কেটে পড়ত। মণ্টুর বাড়ি ফেরার তাড়া থাকত না। আহিরীটোলার ফুটপাথে, শীলদের গাড়িবারান্দার নীচে যার শোয়ার বন্দোবস্ত, তার তাড়াহুড়োর দরকার কি! মণ্টু অনেক রাত পর্যন্ত থেকে যেত। কখনও যন্ত্রণায়, কখনও আনন্দে মুখ খুলত বেণীবাবু। সেও অবশ্য খুব সামান্য। এক একদিন বেণীবাবু বলত, অ্যাই শুয়োর, তুই বিয়ে করেছিস?

—না বেণীবাবু। মণ্টু নিজের গ্লাসটাকে হাতে নিয়ে একটু তফাতে বসে উত্তর দিত।

—এখনও করিসনি! তোর চেহারা তো ভেঙে গেছে, খেঁকুরে হয়ে গেছিস।...ঠিক আছে, আমি তোর বিয়ে দেবো। টুকটুকে ফরসা বউ। তুই যা বলবি শুনবে। বড় বাধ্য মেয়ে হবে তোর বউ।...তোকে আমি ধবধবিতে জমি কিনে বাড়ি করে দেবো। আমার মতো সংসার-হারা হয়ে তোকে থাকতে দেবো না।

—আজ্ঞে।

—আবার আজ্ঞে। মুখে ভদ্রলোকের ভাষা! মারবো শালাকে চড়।...হ্যাঁ রে যার এক ছেলে জাহাজে চাকরি করে আর এক ছেলে বি.এ. পড়ছে তার আবার কষ্ট কিসের? তাই না বল! সে তো সুখী মানুষ।

মণ্টু ভয়ে ভয়ে সায় দিয়েছে, ঠিক বলেছেন, সে খুব সুখী। ছেলেরা মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

—আচ্ছা, সতী মেয়ে পছন্দ করিস, না অসতী?

কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে মণ্টু চুপ করে থাকত। উত্তরের জন্য হাঁ করে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় বেণীবাবুর মাথাটা ঝুঁকে পড়ত মেঝের দিকে। আর কথা

বলার শক্তি থাকত না।

যেদিন শচীনন্দনের দোকানে সবাই মিলে বসা হত সেদিনও এইভাবে শেষ হতো সন্ধের মজলিশ। ওই দিনগুলোতে মণ্টুর একটা বাড়তি কাজ ছিল, প্রায় বেহুঁশ বেণীবাবুকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে চটের গুদামে পৌঁছে দেওয়া।

এই সব টুকরো টুকরো কথার স্কেচ জুড়ে ওরা বেণীবাবুর ঘরদোর সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ছবি তৈরি করে নিয়েছে। এর বেশি কিছু নয়। বেণীমাধব মল্লিক, সাকিন ধবধবি, কর্পোরেশনে চাকরি করে, বাড়িতে স্ত্রী ও দুই ছেলে আছে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—কেবল এইটুকু পরিচয় সংগ্রহ করে বেণীবাবুর বাড়িতে ওর মৃত্যুর খবর পৌঁছে দিতে আসার ইচ্ছা ছিল না মণ্টুর। জোর করে বিষ্ণুচরণরা পাঠাল বটে, কিন্তু কী লাভ হল। যেসব অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে মণ্টু ফিরে যাচ্ছে তা কি ওরা বিশ্বাস করবে! মণ্টু রাগে-দুঃখে শব্দ করে থুথু ফেলল।

প্রায় মরণ-দৌড় দৌড়ে ধবধবিতে আসার ট্রেনটা ধরেছিল মণ্টু। নানা টালবাহানায় এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। কোন্ গাড়িটা ধবধবি যাবে বুঝতে না পেরে মণ্টু এক চেকার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিল। 'ওই যে চলে যাচ্ছে। শিগ্‌গির যান।' —ভদ্রলোক হাত তুলে চলন্ত ট্রেন দেখিয়েছিলেন। আর কিছু ভাবার সময় ছিল না। মণ্টু ছুটতে ছুটতে এসে গাড়িতে উঠেছে। উইদাউট টিকিটে। সারাটা পথ ভয়-ভয় করছিল। ধরা পড়লেই হাজতবাস। তখন বেণীবাবুর মৃত্যুসংবাদ জেলের কয়েদিদের দিতে হত।

পথে কোনও অঘটন ঘটেনি। কিন্তু বিপত্তি বাধল ধবধবিতে নেমেই ডেলি প্যাসেঞ্জারদের পেছু পেছু ধবধবির প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই চড়বড় করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কোথায়ই বা মেঘ ছিল, কেনই বা অমন ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এলো মণ্টু বুঝে উঠতে পারেনি। এই যে, লালকাঁকর বেছানো প্ল্যাটফর্মের এখান-ওখান, এখনও ভিজে। শান-বাঁধানো বেঞ্চিগুলোর জল অবশ্য হাওয়ায় শুকিয়ে গেছে। সেই বৃষ্টির পর থেকে উল্টোপাল্টা হাওয়াও দিচ্ছে বটে। স্টেশনের এপাশ-ওপাশের অন্ধকার থেকে ছুটে আসছে সোঁ সোঁ হাওয়া। সেইসঙ্গে গাছগাছালির মর্মর শব্দ।

বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে সবার সঙ্গে মণ্টুও ছুটে এসেছিল প্ল্যাটফর্মের শেডের তলায়। নানা মানুষ, নানা কথাবার্তা, ঝালমুড়িওয়ালার চিৎকার, ঠাণ্ডা পানির বোতল খোলার ফটাস শব্দ, ঝাঁকা বাখা নিয়ে সবজি ব্যবসায়ীদের ঝগড়া আর কোনও এক অবুঝ শিশুর কান্নায় ভবেছিল পুরো শেডের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত।

এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মণ্টু বুদ্ধি করে এক মাঝবয়সী লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরা লোককে জিজ্ঞেস করেছে, দাদা, এখানে বেণীমাধব মল্লিকের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন?

লোকটা বেশ সন্দেহের চোখে মণ্টুকে দেখে জবাব দিয়েছিল, বলতে পারব না। ...তা, আপনার কোত্থেকে আসা হচ্ছে!

—কলকাতা থেকে। মণ্টু নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়ে বলেছিল। ওর তেঠ্যাঙা চেহারা, শুকনো মুখ আর ফ্যাসফেসে গলা সবাইকে ধন্দে ফেলে দেয়। কেউ ওকে

সোজা চোখে দেখে না। ওই লোকটাও তার ব্যতিক্রম নয়।
—আপনি বৃষ্টি থামলে স্টেশনের পশ্চিম দিকে চলে যাবেন। ওখানকার দোকানদাররা বলে দিতে পারবে। আমি থাকি পুব দিকে গ্রামের ভেতরে। আমাদের সেদিকে ওই নামে কেউ থাকে না। ধবধবিতে এর আগে কখনও আসা হয়নি বোধহয়। লোকটা একটা টিনের কৌটো থেকে বিড়ি বের করে কানের সামনে নাড়তে নাড়তে বলছে।
—আজ্ঞে না।...এই প্রথম এলাম। বেণীবাবুর বাড়িতে একটা জরুরি খবর দিতে হবে কি না—তাই...। মণ্টু মুখে হাসি টেনে রেখেছিল।
লোকটা মণ্টুর কথায় আর কোনও উৎসাহ দেখায়নি। ঝিরঝিরে জলের ছাঁট থেকে বিড়িটাকে আড়াল করে মনের সুখে টেনেছে। তারপর একসময় কী ভেবে স্থান বদল করে সরে গেছে মণ্টুর পাশ থেকে।
মিনিট কুড়ি পরে বৃষ্টি থামলে মণ্টু সোজা চলে এসেছে স্টেশন রোডে। পরপর তিনটে দোকান বেণীবাবুর বাড়ির সন্ধান দিতে পারেনি। বেশ হতাশ হয়ে মণ্টু রাস্তার অপর পারের একটা মিষ্টির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে। শো-কেসের লোকটা ঠিক বুঝতে না পেরে মণ্টুকে বলেছিল, ভেতরে মালিক বসে আছে, ওকে জিজ্ঞেস করো।
ক্যাশবাক্সের সামনে একটা গেঁয়োমতন বুড়ো লোক বসেছিল। মণ্টুর একদম পছন্দ হয়নি, তবু প্রাণের তাগিদে লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা আপনি বলতে পারবেন, এখানে বেণীমাধব মল্লিকের বাড়ি কোথায়?
প্রশ্নটা শুনে বুড়ো লোকটা প্রায় মিনিট দুই চুপ করে বসেছিল। ওর চোখের পাতা পড়ছিল না। যেন বেণীমাধবের বাড়ি বলে পৃথিবীতে কিছু নেই—মণ্টুর প্রশ্নটাই একটা ভ্রম। মণ্টুর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।
—বেণীমাধব তো এখানে থাকে না। বৃদ্ধ ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বরে বলেছিল।
—তা জানি। বুড়ো বেণীবাবুকে চেনে বলে বুঝতে পেরেছিল মণ্টু।
—সে কলকেতার চিৎপুরে থাকে। যতদূর জানে—সেখেনে গেলে তাকে পাবে।
—জানি দাদু।
—তো জানোই যদি, তাহলে ধবধবিতে খোঁজ করতে এসেছো কেন?
—আজ্ঞে না...মানে...বেণীবাবুর খোঁজ করতে আসিনি। বেণীবাবুর বউ-ছেলেদের একটা খবর দিতে এসেছি।
—বেণীমাধবের বউ-ছেলে! বুড়ো যেন আকাশ থেকে পড়ল, সে আবার বিয়ে করল কবে! তুমি কোন্ বেণীমাধবকে চাইছ বলত!
—আজ্ঞে, ওই তো যে চিৎপুরে থাকত, কর্পোরেশনে চাকরি করত, এই ধবধবিতে তার বাড়ি...
—ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না, বলতে হবে না। তুমি ওই কাছারিপাড়ার বেণীমাধবের কথাই বলছ—বুঝতে পেরেছি। তাকে আমি খুব চিনি। কিন্তু তার তো এখেনে কোনও বউ-ছেলেমেয়ে নেই। সে ব্যাটা তো বিয়েই করেনি। এমন কী তার বাড়ি নেই। বৃদ্ধ খিকখিক করে হেসে উঠেছিল।

—তার মানে? মণ্টুর সারা শরীর অজানা শিহরণে কেঁপে উঠেছে, আপনি ঠিক বলছেন?...কিন্তু বেণীবাবু যে বলেছিল...

—বেণীমাধব মিথ্যে কথা বলেছে। এখেনে থাকার মধ্যে ওর ডাক-মা আছে। তাও আধমরা হয়ে দিন গুনছে। চোখ দেখতে পায় না।

—ডাক-মা! মণ্টু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি।

—হ্যাঁ ডাক-মা। ডাক-মা কাকে বলে জানো না? বেণী যাকে ছোটবেলা থেকে মা বলে ডেকে এসেছে, সে-ই হল ওর ডাক-মা।...হেঁ হেঁ, বুঝতে পারলে না তো! তবে শোন, বেণীমাধবের তো জন্মের ঠিক নেই। এই অ্যাত্তটুকু থাকতে বেণীকে বহড়ুর এক সংধারী গাজন-সন্ন্যাসী ইস্টিশনে কুড়িয়ে পায়। তার কাছ থেকে তিন বছরের বেণীমাধবকে নিয়ে আসে যতন মল্লিক। তারপর যতনের বউই তো ওকে পেলেছে। সে মাগীকেই বেণী মা বলে জানত, ডাকত। তা, বেণী বড় হয়ে যখন এই সব বেত্তান্ত শুনল তখন এই ঠাঁই ছেড়ে কলকেতায় চলে গেল। আর এলো না। বিয়ে থা করল না। নিজের ওপর তার রাগ। বড় অভিমান আর বুকে জ্বালা নিয়ে সে এখনও দূরে দূরে পড়ে আছে।...আমরা বুড়োরা এসব ঘটনা জানি। এবার বল তো বাপু, বেণীমাধবের খোঁজে কেন এসেছো?

মণ্টুর মুখের ভেতরটা সেই মুহূর্তে তেতো হয়ে গেছিল। বুড়ো একটা কথাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। মণ্টুকে তবু বলতে হয়েছিল, বেণীবাবু মারা গেছে। আমি ওর বাড়িতে খবরটা দিতে এসেছি।

—মারা গেছে! সে কী! কবে? আহা গো! বুড়ো মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে শোক জানিয়েছে।

তারপর মণ্টুকে বলতে হয়েছে কিছু অনিবার্য অথচ একান্ত মামুলি কথা। অদ্ভুত ঔৎসুক্যে নিষ্ঠুর বুড়োটা এটা-সেটা জিজ্ঞেস করছিল। মণ্টুর ভাল লাগছিল না। ও বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছে, বেণীবাবুর দেহ নিমতলায় পড়ে আছে। ও না ফেরা পর্যন্ত দাহ হবে না। অন্যেরা সব অপেক্ষা করে বসে আছে। কথার ফাঁকে একসময় কী মনে করে বৃদ্ধ বলেছিল, তা বাপু তুমি যখন ধবধবিতে এসে পড়েছ, তখন বেণীমাধবের ডাক-মাকে ওর মরার খবরটা না-হয় দিয়েই যাও, দাঁড়াও, তোমাকে একটা লোক দিয়ে দিচ্ছি। সে ওই বুড়ির কাছে তোমায় নিয়ে যাবে। অ্যাই দুলাল, পানবাজার থেকে একবার জামান আলিকে ডেকে নিয়ে আয় তো।

শো-কেসের লোকটা দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে মিনিট কয়েক পরেই জামান আলিকে নিয়ে ফিরেছিল। বৃদ্ধের কাছ থেকে সব শুনে ছোটখাটো চেহারার প্রৌঢ় জামান আলি মণ্টুকে বলেছিল, চলুন আমার সঙ্গে।

টর্চের আলো জ্বেলে মোরাম বাঁধানো পথে চলতে চলতে জামান আলি শুনিয়েছিল আরও করুণ এক কাহিনী। বেণীবাবুর ডাক-মাকে তার নিজের গর্ভের ছেলেরা কেউ দেখে না। এখানকার এক চাষির বাড়িতে বুড়িকে মাস-কাবারি দিয়ে ফেলে রেখেছে। তারা জমিজিরেত, বাড়ি-পুকুর বেচে দিয়ে বছর তিন আগে জয়নগরে চলে গেছে। সেখানে ব্যবসা ফেঁদেছে, বড় বাড়িঘর তৈরি করে সুখে আছে। বুড়ির বড় কষ্ট। কেউ

দেখার নেই। আজকাল আবার চোখে দেখতে পায় না। তবু বেণীবাবু মাঝে মধ্যে একবার এসে ডাক-মাকে দেখে যেত। খোঁজ-খবর করত। চাষির বউয়ের হাতে কিছু টাকাও গুঁজে দিয়ে যেত মায়ের জন্যে। এখন বুড়ি যতদিন বাঁচবে বড় দুর্ভোগ নিয়ে বাঁচবে।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা পেরিয়ে একটা টালি-ছাওয়া বাড়ির সামনে এসে জামান বলেছিল, এদের ওই পোলট্রি ঘরের পাশে একটা ঘুপচিতে বুড়ি থাকে। আপনি দেখে-শুনে পা ফেলে আসুন। বাড়ির লোকেরা জানতে পারলে আপনার আবার দেরি করিয়ে দেবে। চুপি চুপি খবরটা দিয়ে সরে পড়তে হবে কিন্তু...।

শতচ্ছিন্ন তোশকের ওপরে, আলুথালু কাপড়-চোপড়ে শুয়েছিল বেণীবাবুর ডাক-মা। টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় ঘরের ভেতরটা কতটা নরক তা বোঝা যাচ্ছিল না। কেবল দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগছিল। জামান আলি যতটা সম্ভব চাপা গলায় ডেকেছে, ও বুড়ি-মা, বুড়ি-মা, জেগে আছো?...তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এয়েছে।

—অ্যাঁ, অ্যাঁ, কে এসেছে, কে এসেছে।...হ্যাঁ বাবা, বেণী এলি, বেণী এলি...। বুড়ি ধড়মড় করে উঠে বসেছিল।

জামান ফিসফিস করে মণ্টুকে বলেছে, ইদানিং বুড়ির এই এক দোষ, যে-ই আসুক না কেন, ও ভাবে বেণীমাধব এসেছে...। যা হোক, আপনি তাড়াতাড়ি যা বলার বলে নিন...। বেশিক্ষণ থাকা চলবে না।

সেই মুহূর্তে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল নিদারুণ আবর্তে। মণ্টু একটাও কথা বলতে পারেনি। কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মণ্টু বলেছিল, না থাক, চলুন। আমার কিছু বলার নেই।

হতভম্ব জামান আর কথা বাড়ায়নি। দ্রুত পায়ে ওকে পথ দেখিয়ে স্টেশন রোডে পৌঁছে দিয়েছে। রাত আরও বেড়েছে। শেষ ট্রেন বাদ দিয়ে আর সব ক'টা ট্রেন চলে গেছে কলকাতায়।

একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। হঠাৎ ইঞ্জিনের তীব্র হুইস্‌লের শব্দে মণ্টু লাফিয়ে উঠল। গাড়ি আসছে কি? ভাল করে বোঝার আগেই নিমেষে ওর চোখের সামনে দিয়ে একটা ইঞ্জিন চলে গেল। চারদিক কাঁপিয়ে। মণ্টু দেখল, ইঞ্জিনটার পেছনে কোনও বগি নেই।

ভোরের আকাশ

সুপ্রকাশ প্রথমবার ভেবেছিলেন ভুল শুনছেন। অন্য কোনও শব্দ। দ্বিতীয়বার ভুল হল না। টিভি-তে সন্ধের খবর হচ্ছে। উঠে গিয়ে টিভির ভয়েসটা কমিয়ে দিতেই স্পষ্ট হল—কেউ কাঁদছে। ডুকরে ডুকরে। দরজার কাছে এগিয়ে এসে সুপ্রকাশের মনে হল, একতলা থেকে ভেসে আসছে কান্নার বিচ্ছিন্ন প্রবাহ। দেববাণী একটু আগে উঠে চলে গেছে। খবর শুরু হলেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তখন অন্য কাজ করে। ওঁর দুই মেয়ে আজ এ ঘরে আসেইনি। ওপাশের ঘরে ওরা কথা বলছিল। বাথরুমে যেতে গিয়ে সুপ্রকাশ দেখেছিলেন। সায়ন্তনী খাটের কোণায় বসে কি যেন বোঝাচ্ছিল। চিরন্তনী মেঝেতে পা মুড়ে বসে একমনে শুনছিল ওর দিদির কথা। সুপ্রকাশ এক ঝলক দেখেছিলেন। দৃশ্যটা তবু মনে আছে।

—শুনছো, একবার এদিকে এসো তো! সুপ্রকাশ স্ত্রীকে ডাকলেন। অশ্রুপাতের সময় মানুষের গলার স্বর একেবারে বদলে যায়। চেনা যায় না। তবু সুপ্রকাশের মনে হল, এই শব্দ তাঁর একেবারে অপরিচিত নয়। কোনও কিশোরী মেয়ে কাঁদছে। এবং তাকে তিনি চেনেন।

দেববাণী সাড়া দিল না। অথচ এক্ষুনি নীচে গিয়ে দেখা উচিত, কে কাঁদছে। খুব বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করে সুপ্রকাশ মেয়েদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজা খোলা। ভেতরে ফ্যান ঘুরছে। মৃদু স্বরে বাজছে ক্যাসেট রেকর্ডার। অথচ দুই মেয়ের একজনও ঘরে নেই। একটু বিস্মিত হয়ে আবার স্ত্রীকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলেন সুপ্রকাশ। দেববাণী বাথরুমে ঢুকেছে। জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না-করে সুপ্রকাশ নীচে নেমে এলেন।

—চিরু! তুই! কাঁদছিস কেন? এখানে দাঁড়িয়ে...। সুপ্রকাশ প্রচণ্ড অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

মিটার বক্সের সামনে দাঁড়িয়ে চিরন্তনী কাঁদছে। এইখানটায় কোনও লাইট নেই। ওদিকের দেওয়ালে লাগানো ল্যাম্প-শেড থেকে যেটুকু আলোর আভাস এখানে এসে পৌঁছেছে, তাতে চিরুকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দু'হাতে মুখ ঢেকে মেয়েটা চোখের জল ফেলছে। সুপ্রকাশ মেয়ের চিবুক স্পর্শ করার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। চিরুর পিঠে হাত রেখে আবার জানতে চাইলেন, কী হয়েছে! আমাকে বল্! তোর দিদি কোথায়?

ভেতরের আবেগ যেন পাথরে চাপা ছিল। সুপ্রকাশের সস্নেহ জিজ্ঞাসার ছোঁয়ায় প্রবল বেগে বেরিয়ে এলো। চিরুর কান্না এবার অনেকটা যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের আর্তনাদের

মতো শোনাচ্ছে। সুপ্রকাশ ভয় পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে বিমূঢ়। কী করা উচিত, কী করবেন ঠিক করতে পারলেন না। নিজের অসহায় অবস্থাটা লুকনোর জন্য গম্ভীর গলায় বিরক্তি মিশিয়ে বললেন, সেই থেকে কচি খুকির মতো কেঁদে যাচ্ছিস। আমি যে তোকে জিজ্ঞেস করছি কী হয়েছে—বলছিস না কেন? এই ফ্যামিলির কেউ কি মারা গেছে? তোর বাবা-মা-দিদি বা অন্য কোনও আত্মীয়!

সুপ্রকাশের নিজের কাছেই কথাগুলো রূঢ় শোনালো। এতটা বিশ্রীভাবে না বললেও হত। মেয়েটা হয়তো এমন কোনও কষ্টে চোখের জল ফেলছে, যা বলা যায় না। তার ওপর, এইরকম ভাষায় কিছু বলা উচিত হয়নি। সুপ্রকাশ মেয়ের দিকে সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—বাবা, দিদি চলে গেল। চিরু নিজেকে সংযত করতে পারেনি, এখনও, তবু বলল।

প্রথমে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন সুপ্রকাশ, তারপর বিস্ময়ের শেষ কিনারায় দাঁড়িয়ে বললেন, সানু চলে গেল। কী পাগলের মতো বকছিস! চলে গেল! তার মানে? না, না। এ হতে পারে না। তুই এদিকে আয়। আমাকে খুলে বল্। সানু...

চিরুকে আলোর সামনে নিয়ে এসে সুপ্রকাশ কেঁপে উঠলেন। মেয়েটা হঠাৎ কান্না থামিয়ে দিয়েছে। ওর দু'চোখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন। বেদনার তীব্রতায় ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গিয়েছে। 'দিদি চলে গেল'—এই কথার একটাই অর্থ হয়। সুপ্রকাশ তা ভাল করেই জানেন। তবু বিশ্বাস করতে পারছেন না। এত তাড়াতাড়ি, এত আকস্মিকভাবে এটা ঘটবে, সুপ্রকাশ কল্পনাও করতে পারেনি। ভেবেছিলেন, এই পর্ব থেকে সানু বেরিয়ে আসতে পারবে। মানুষের জীবনে খণ্ড খণ্ড সময়গুলো এক একসময় এক একটি চেতনার জন্ম দেয়। কখনও ঘরের মায়া তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, কখনও বাইরের আদিগন্ত পৃথিবী হাতছানি দিয়ে ডাকে। যখন ঘরের বন্ধন অসহ্য মনে হয়, তখন বাইরের অবারিত ঔদার্যের মধ্যে মানুষ মুক্তির বাতাস গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু এইসব চেতনার কোনওটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সময় একটা বহুবর্ণ বলের মতো কেবলই গড়িয়ে চলেছে। এমন কী, আত্মহত্যার কথা ভেবেও মানুষ যে পিছিয়ে আসে, তা ওই চলমান সময়ের নিয়ত স্থানবদলের জন্য।

বিধ্বস্ত, ক্লান্ত গলায় চিরু থেমে থেমে বলল আমি জানতাম না, দিদি আগে থেকেই ওর ছোট্ট ব্যাগটা গুছিয়ে রেখেছিল। আমাকে কিছুই বুঝতে দেয়নি। ...কথা বলছিল, হাসছিল। হঠাৎ বলল, চিরু আমি চললাম। বিশ্বাস করো, আমি ভাবতেই পারিনি। আমি কিছু বলা আগেই দিদি বলল চল্, সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিবি। তারপর...

চিরু থেমে গেল। সুপ্রকাশ জানেন, এরপর আর একটি কথাই বলার আছে—দিদি চলে গেল। কোথায়?—এই প্রশ্নের উত্তরও ওঁর জানা। ওই গঙ্গামাতা না যমুনামাতা, তাঁর আশ্রমে। সানুর মতো একটি শিক্ষিত, বিবেকী মেয়ে কীভাবে এগুলো ভাবে—সুপ্রকাশ কিছুতেই বুঝতে পারেন না। সংসারের প্রতি ওর এই অকারণ বিতৃষ্ণার কারণ এখনও খুঁজে পাননি। সানু ওর জীবনযাপনের ধারাটাকে কোন্ পথে নিয়ে যেতে চায় সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে গিয়ে। দেববাণী

একদিন ছলছল চোখে বলেছিল, তুমি এসব কী করবে! সানু তো আজ আমায় সোজা জানিয়ে দিল, ও সংসার করবে না। সুপ্রকাশ সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তা হলে কী করবে? সারাজীবন ওই মন্তেস্‌সরি স্কুলের দিদিমণিগিরি করে কাটিয়ে দেবে। দেববাণী মুখ নীচু করে বলেছিল, ও গঙ্গামায়ের আশ্রমে যোগ দেবে ঠিক করেছে। সন্ন্যাসিনী হবে। সেদিন তীব্র ব্যঙ্গে পুরো ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সুপ্রকাশ। সানুকে ডেকে বকাবকি করেছেন, বুঝিয়েছেন। কোনও ফল হয়নি। বরং সেই সময় থেকে সুপ্রকাশের মনে হয়েছে, সানু অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এবং নিজের আকাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপগুলোকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করছে।

গঙ্গামাতার আশ্রমে, সেই হৃদয়পুর না কোথায়, সানুকে প্রথম নিয়ে গিয়েছিল বাসন্তী—ওর স্কুলজীবনের এক বন্ধু। বাসন্তী বহু বছর পরে কোত্থেকে যেন আবির্ভূত হয়েছিল। আজ যে-আগুন জ্বলে উঠেছে, তার একেবারে গোড়ায় ওই মেয়েটা। গত দেড় বছরে সানুর সঙ্গে বাসন্তীর বন্ধুতা—এক আসনে শোয়া, বসা, খাওয়া দৃষ্টিকটুর পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। কতদিন রাত্রে ওই বাসন্তী মেয়েটা বাড়ি ফেরেনি। সুপ্রকাশের আবাসেই থেকে গেছে। মাস দুয়েক আগে সুপ্রকাশ শুনেছিলেন, বাসন্তী নাকি গঙ্গামাতার আশ্রমে জয়েন করেছে।

সময়ের স্রোত এইভাবেই এঁকেবেঁকে চলছিল। কিন্তু তা আজ যে এমন করে সোজা মোহানার দিকে ছুটে যাবে—সুপ্রকাশ কখনও চিন্তা করেননি। বাসন্তীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সানু তো আর অবুঝ ছোট মেয়েটি নয়! সব কিছুর দায় সানুর। সুপ্রকাশ রাগে অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন। রুক্ষ গলায় ছোট মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, চোরের মতো পালিয়েছে, বুঝলি! এতটুকু সৎ সাহস নেই আমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার! ...তোকে কিছু বলে যায়নি?

চোখ সরিয়ে চিরু মাথা নাড়ল। তারপর বলল, দিদি শুধু বলে গেল, আমার আর কোনও পিছুটান রইল না। আমি এখন স্বাধীন, মুক্ত। আমাকে নিয়ে বাবার আর চিন্তা থাকলো না।

—শুধু এইটুকু! স্বার্থপরটা আর কিছু বলল না! আমি...আমরা কেউ নই! সুপ্রকাশের কণ্ঠস্বর এই মুহূর্তে বড়ো করুণ শোনাল।

দুই

সানুর ছেলেবেলার ছবিটা বারবার মনে পড়ছে। পুত্রসন্তান হল না বলে দেববাণীর একটু অতৃপ্তি ছিল। সুপ্রকাশও ভেবেছিলেন প্রথমবারে একটি ছেলে হবে। দেববাণী সেই সময় নিজের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করত সানুকে সাজ-পোশাকে ছেলে সাজিয়ে রেখে। প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত সানু ছেলে সেজে থেকেছে। মাথায় ছোট ছোট চুল। হাফ প্যান্ট, বাহারি টি-শার্ট, পায়ে বুট জুতো। শ্বশুরমশাই মৃদু আপত্তি করতেন। বলতেন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারবে না বউমা। ওকে ওর মতো বেড়ে উঠতে দাও।

দ্বিতীয়বার যখন চিরু হল, তখন থেকেই দেববাণী হাল ছেড়ে দিয়েছে। ছেলে

সাজানোর খেলা বন্ধ করে শ্বশুরের কথাই ঠিক বলে মেনে নিয়েছিল। প্রকৃতির খেয়ালের কাছে মানুষ একেবারেই শিশু। সুপ্রকাশ অবশ্য প্রথম থেকেই দুই মেয়েকে নিয়ে তৃপ্ত, খুশি। ওঁর কখনও মনে হয়নি, ছেলে ছাড়া জীবনের যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী হতে পারবেন না। কিন্তু আজ! সানুর চলে যাওয়ার খবরটা জানার পর থেকে সুপ্রকাশ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছেন। মানুষটা দুই মেয়েকে ওদের নিজেদের মতো করে বড় হতে দিয়েছেন। কড়া শাসন বা প্রাচীন সংস্কার কোনওটাই ওদের ওপরে চাপিয়ে দেননি।

আজ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। ছকে বাঁধা নকশা আর প্রাত্যহিকের আলপনা মেনে। সুপ্রকাশ বড় মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। একটি ভাল ছেলের খোঁজ করছিলেন এর-ওর কাছ থেকে। দেববাণী দুই মেয়েকে পরমাসুন্দরী করে জন্ম দিতে পারেনি। সানু-চিরু—দু'জনেরই গায়ের রঙ চাপা। চেহারা আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো সাধারণ। কেবল ওদের মুখশ্রীতে অদৃশ্য আকর্ষণের ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। সেজেগুজে ওরা যখন কোথাও বেড়াতে যায়—তখন খারাপ লাগে না। বরং অনেকেরই চোখ সরে আসে ওদের দিকে। দেববাণী বহুবার লক্ষ করেছে। মন্তেস্সরি স্কুলে চাকরি করতে এম-এ পাসের দরকার হয় না, তবু বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা করা হবে—এই ভেবে সানু গড়পারের স্কুলে চাকরিটা নিয়েছিল। সুপ্রকাশ আপত্তি করেননি। স্ত্রীকে বলেছিলেন, যতদিন না বিয়ে হচ্ছে করুক না! সময়ও কাটবে, দুটো পয়সাও পাবে।

ঠিক সেই সময়ে বা তার একটু পরে বাসন্তী এসেছিল। ওকে প্রথম দিন দেখে দেববাণী চিনতে পারেনি। ফ্রক-পরা এইটুকুন সেই কোন্ ছোটবেলার একটি মেয়েকে স্কুল-কম্পাউন্ডের মধ্যে সানুর সঙ্গে খেলতে দেখেছে। কিংবা মারামারি করতে অথবা টিফিন বাক্স বদল করে খেতে দেখেছে দেববাণী। বাসন্তী একগাল হেসে দেববাণীর অপ্রস্তুত অবস্থাটা কাটিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'মাসিমা, আমি বাসন্তী।' ওর নামটা ভেতরে গিয়ে ধাক্কা মারতেই বিস্মৃতির দরজা খুলে গিয়েছিল। দেববাণী খুশি হয়েছে। পুরনো বন্ধুত্ব আবার নতুন করে শুরু করার মজাই আলাদা। সেদিন বাসন্তীকে খুব ভাল লেগেছিল। ওর অপরিমিত আন্তরিকতা, সহমর্মিতা আর সুবচন সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে দিনের পর দিন। সেইসব দিনগুলোতে দেববাণী ভাবতে পারেনি, কোন্ ধ্বংসের বীজ, বাসন্তী সকলের অগোচরে সায়ন্তনীর মনের মধ্যে পুঁতে দিয়েছে। নিয়ত একটু একটু করে সেই বীজের শরীরে জল ঢেলেছে।

হৃদয়পুরের আশ্রমে একসময় দুই বন্ধু যাতায়াত শুরু করল। দেববাণীর মনে আছে, প্রথম প্রথম ওরা বলে যেত। পরে আর বলার প্রয়োজন বোধ করত না। ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে এক-একদিন খুব রাত হত। সুপ্রকাশ অফিস থেকে ফিরে চিন্তা করতেন, যত রাত বাড়ত তত রেগে উঠতেন। তখনও এগুলো বাইরের সমস্যা ছিল। ভেতরে ভেতরে ধ্বংসের গাছটা কতদূর শিকড় চালিয়ে দিয়েছে, তখনও কেউ ধরতে পারেনি। শুধু মা হিসেবে দেববাণী সানুর পরিবর্তনটা বুঝতে পারছিল। জীবনের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের কাছ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছিল সানু। একই সঙ্গে

সংসারের অতিপরিচিত উত্থান-পতন কিংবা সুখ-দুঃখের মুহূর্তগুলো সানু উপেক্ষা করেছে। এর আগে সানুকে কখনোই ধর্মপ্রাণা বলে মনে হয়নি। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা পারিবারিক পুজোআর্চা, ধূপ-ধুনো, সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনির সঙ্গে যতটুকু জড়িয়ে থাকে, ঠিক ততটুকুই, তার বেশি কিছু নয়। কোনও গভীর উপলব্ধির জগতে পৌঁছে গেলে মানুষ যেমন স্থিরদৃষ্টি ও সংযতবাক্ হয়ে যায়, তেমনি হয়ে আসছিল সানুর অস্তিত্ব। উনি কিংবা চিরু মেয়েটার এই পরিবর্তনকে কেমন চোখে দেখেছে—দেববাণী জানে না। আদৌ লক্ষ্য করেছিল কি! তবে সবাই স্তম্ভিত, বিস্মিত হয়েছিল, যেদিন সানু ওর বৈরাগ্য ও ত্যাগের সংকল্প নির্দ্বিধায় জানিয়েছে, বিবাহের স্বাভাবিক বন্ধনের প্রস্তাব আর ঘর-সংসারের চেনা ছবিটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, সেদিন স্পষ্টভাবে সবাই জেনে গিয়েছে।

দেববাণী জানলার সামনে চেয়ারটাকে টেনে আনল। এখান দিয়ে গলির অনেকটা দেখা যায়। কিছুক্ষণ আগে উনি কার সঙ্গে যেন দেখা করার জন্য চিরুকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দেববাণীর হঠাৎ মনে হল, সানুর এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে শ্বশুরমশাই সামান্য কিছু জানলেও জানতে পারেন। ইদানিং দাদুর কাছে সানু খুব ঘন ঘন যাচ্ছিল। কলকাতা থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে যে-মানুষটি একাকী সাধকের মতো জীবনযাপন করছেন, একমাত্র ছেলেকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যিনি বাণপ্রস্থ বেছে নিয়েছেন, তিনি হয়তো একটু আলোর সন্ধান দিতে পারবেন। অন্য কারোর কাছে নয়, সেই মানুষটির কাছে সুপ্রকাশ গেলে পারতেন।

সানুটা একবার দেখা পর্যন্ত করল না! বলে গেল না---মা, আমি যাচ্ছি। দেববাণী জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দেববাণী চিরুকে জিজ্ঞেস করেছিল, সানু খুব কাঁদছিল—তাই না রে?

মায়ের কথায় একটু চমকে উঠে চিরু বলেছিল, কই না তো! দিদি কাঁদছিল কে বলল!

—তাহলে! ও কি চুপচাপ চলে গেল? নীরবে!

—তা কেন মা! দিদি যাওয়ার সময় তোমার কথা বলছিল। চিরু, তুই মাকে দেখিস। মা যেন একদম কাঁদে না! মাকে কষ্ট দিবি না কিন্তু!

কষ্ট দেওয়ার আর কি বাকি থাকল! দেববাণী আলো-আঁধারের আভায় ঢাকা কালো রাস্তার দিকে তাকিয়ে চোখের জল মুছল। কিছুতেই শক্ত হতে পারছে না দেববাণী। জীবনের সবরকম স্বাদ-আহ্লাদ ত্যাগ করে একটি যুবতী মেয়ে চোখের সামনে সন্ন্যাসিনী হয়ে ঘুরবে—এই নিষ্ঠুর ছবিটা কিছুতেই দেখতে পারবে না। দেববাণীর মনে হল, মায়ের ভূমিকায় আমি ব্যর্থ। একটা ছোট্ট নীড় আর দুটি ডানা সম্বল করে যে কোনও পক্ষিমাতা যা পারে আমি তাও পারিনি। ব্যর্থ, ব্যর্থ। সানু আজ নিরুদ্দেশের রাস্তায় হারিয়ে গেল।

তিন

যাতে শব্দ না-হয় এমনভাবে সন্তর্পণে গ্রিলের ছোট দরজা খুলে সুপ্রকাশ চিরুকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন। সরু রাস্তাটা এখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা বাগানের দিকে, অন্যটা চলে গিয়েছে ওই ছোট্ট বাড়িটার সামনে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, বাড়িতে কেউ নেই। হাটখোলা দরজা-জানলা দিয়ে দুরন্ত হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে বালক কৃষ্ণের মতো। সকালের নরম রোদ আরও মায়াময় করে তুলেছে বাগানটাকে। ওপাশের সোনাঝুরি গাছের পাতার আড়াল থেকে শিস দিচ্ছে কোন্ এক অচিন পাখি।

বাগানের পথ ধরে প্রায় মাঝামাঝি এসে সুপ্রকাশ দাঁড়ালেন। এখানেও মানুষটি নেই। ওঁর কাজের লোকটিকেও দেখা যাচ্ছে না। সুপ্রকাশ গলা পরিষ্কার করে জোরে ডাকলেন, বাবা!

পাঁচিল-ঘেরা এক বিঘে দু'কাঠা জমির বুকের ওপর দিয়ে শব্দটা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। চিরন্তনী তাকিয়ে ছিল পিছনের সূর্যমুখী ফুলের প্লটটার দিকে। কাল সারা রাত কেউ ঘুমোয়নি। দিদির চলে যাওয়ার ব্যাপারটা মৃত্যুশোকের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। ভোরে আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ওকে নিয়ে দাদুর কাছে ছুটে এসেছে। অনেকদিন পরে চিরন্তনী দাদুর এই সবুজ দেশে এলো। নানা কারণে আসা হয় না। যদিও মাঝে মধ্যে মনে হয়, দাদুর কাছে যাই। প্রকৃতির কোলে পরম খুশিতে শিশুর মতো বেঁচে আছেন যিনি, তাঁকে প্রণাম করে আসি। আজ বাধ্য হয়ে দাদুর কাছে আসতে হয়েছে। গত কয়েক মাসে দিদির সঙ্গে ওঁর যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, তা যদি অন্য কোনও আলোর সন্ধান দেয়—এই আশায়। কিন্তু দাদু কোথায়? সূর্যমুখীর খেত থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল চিরন্তনী। হঠাৎ দেখল, ওই হলুদ ফুলের ঢেউয়ের ভেতর থেকে দাদু বেরিয়ে আসছেন। বৃদ্ধ রাজার মতো। ঋজু, শান্ত, সমাহিত। সাদা ধবধবে ফতুয়া। হাঁটুর ওপরে ধুতি। হাতে খুরপি।

—বাবা, ওই যে দাদু! চিরন্তনী মৃদু উচ্ছ্বাসে বলল।

বৃদ্ধ ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন। মুখে কোনও বিস্ময় নেই, জিজ্ঞাসা নেই। সুপ্রকাশের সামনে এসে হাত তুলে স্নেহ ঝরিয়ে বললেন, আমি জানি।...তোমার কথা শুনবো। তার আগে তোমরা মুখে কিছু দাও। একটু শান্ত হয়ে বসো। সকালবেলা শোকের সময় নয়।...দিদিভাই, ওই গোয়ালে রতন আছে, ওকে গিয়ে তোদের জন্যে জলখাবার বের করে দিতে বল। আমি হাতের কাজটুকু সেরে আসছি।

তেমনই ধীর পায়ে মানুষটি চলে গেলেন সূর্যমুখীর উদ্ধত বনে।

জলখাবার বলতে দাদুর বাগানের পাকা পেঁপে, সন্দেশ আর দুধ। বাবা কিছুই খেতে চাইছিল না। রতন জোর করে একটুখানি খাইয়েছে। বারান্দায় বসে চিরন্তনী সবুজ দ্বীপটাকে অপলকে দেখে নিচ্ছে। যদিও নিদ্রাহীন চোখ রোদের ঝিকিমিকি সহ্য করতে পারছে না। জ্বালা করছে। বাবা সেই থেকে স্তব্ধ হয়ে আছে। দাদুর নিরুদ্বিগ্ন মুখ বাবার অসহ্য লাগছে কি? চিরন্তনী কাঁঠালচাঁপার গন্ধ পেল। বাতাস এখানে ফুলের

সুগন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, রোদ এখানে সোনা ফলায়। এ এক আশ্চর্য পৃথিবী!
দাদু বারান্দায় উঠে এলেন। পা ধুয়ে এসেছেন। চিরন্তনী দেখল, মেঝেতে পায়ের জল-ছাপ পড়েছে। গড়ানে বেতের চেয়ারে দাদু হেলান দিয়ে বসে বাবাকে বললেন, তুমি বউমাকে নিয়ে এলে পারতে। ওর কষ্ট তোমার চেয়ে অনেক বেশি। ও যে মা! এখানে এলে ওর বেদনার উপশম হত।
সুপ্রকাশ উত্তর দিলেন না। কঠিন মুখে বাবাকে একঝলক দেখে চোখ সরিয়ে নিলেন। বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, তুমি অবুঝের মতো রাগ করছ—যেমন করতে তোমার ছেলেবেলায়। তোমার ভেতরে ক্রোধ আর ব্যথা গুলিয়ে গিয়েছে, তুমি বিচার করার শক্তি হারিয়েছ।
—আপনি চিরকাল এইরকম হেঁয়ালিতে কথা বলে এসেছেন। আজও বলছেন। বলুন। তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি শুধু জানতে এসেছি, সানু যা হতে চাইছে, করতে চাইছে, তা কি আপনি সমর্থন করেন? নাকি আপনার প্রশ্রয়ে...
—সমর্থন, প্রশ্রয়—এই কথাগুলোর আর কোনও মূল্য নেই আমার এই বিরাশি বছরের জীবনে! কাকে আমি সমর্থন করতে যাবো! প্রশ্রয়ই বা দেবো কাকে? জীবনের প্রবাহ নিজের মনে হু হু করে ছুটে যাচ্ছে। এসবের ধারও সে ধারে না। ...আর সানু যা চাইছে তাকে অন্যায় বলবে কী করে!
—আমি যদি আপনার চোখের সামনে দিয়ে ওইরকম সন্ন্যাসী হবো বলে বেরিয়ে যেতাম, আপনি সহ্য করতে পারতেন! বলুন, পারতেন কি?
বৃদ্ধ সকৌতুকে শব্দ করে হেসে উঠলেন। চিরুর মনে হল, দাদুকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে সুন্দর, পবিত্র, নিষ্পাপ শিশুর মতো দেখতে লাগছে।
—সন্ন্যাসী তো আমিই হয়ে গিয়েছি তোমার আগে। বৃদ্ধ ওঁর দু'চোখে আনন্দের দীপ্তি জ্বালিয়ে রেখে বললেন, তোমাদের সংসার থেকে চলে এসে, এই একা যেভাবে আমি প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, সব আসক্তিকে বিসর্জন দিয়ে, তা কি সন্ন্যাসীর চেয়ে কোনও অংশে কম!
—উঃ, আপনি সেই হেঁয়ালি...। কথা ঘোরাবেন না। আপনাকে বলতেই হবে। আজকাল মেয়েটা আপনার কাছে বেশি আসত। আপনি সব জেনেও ওকে সংসার ত্যাগের মতো উদ্ভট চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করলেন না। কেন বলতে পারেন?
—সংসার ত্যাগ কথাটা বলো না। তোমার মেয়ে সংসারের বাইরে হিমালয়ে বা মানস সরোবরে তপস্যা করতে যায়নি। সানু এখানেই আছে। আমাদের আশপাশে। ও কেবল একটা ছোট গণ্ডিকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেছে। খুব সাহস না-থাকলে এ জিনিস করা সম্ভব নয়। আমার কথা কি জানো, ওকে ওব পথে চলতে দাও। সব তার একসুরে বাজবে বা বাজাতে হবে—এটা ভাবা খুব অন্যায়। তা হতে পারে না। ওকে সুখে থাকতে দাও।
—নিশ্চয়ই দেবো, একশো বার। ওই সব আশ্রম-টাশ্রমে সুখের অভাব নেই। ঈশ্বর-দর্শন ওখানে আরও তাড়াতাড়ি হয়। সেবা করার ভড়ং দেখিয়ে ওই সব জায়গায় নিজের সেবা পাওয়া যায়। আরও শুনবেন, সানু একটা

সেলফ-ডিভোটেড, এসকেপিস্ট!
—ছিঃ, ছিঃ, এ তুমি কী বললে! নিজের মেয়ের সম্পর্কে তুমি এইভাবে বলতে পারলে! না, না, দ্বিতীয়বার তুমি এসব বলো না। ছিঃ, ছিঃ!
প্রবল ধিক্কারের সামনে থেকে মাথা নীচু করে সুপ্রকাশ উঠে পড়লেন। যাকে জন্ম দিয়েছেন, বড় করে তুলেছেন, যাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেছেন—তার দেওয়া আঘাত কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। বোধ-বুদ্ধি-অনুভূতি ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। সুপ্রকাশ সোনাঝুরি গাছটার তলায় এসে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।
—শুনছিস দিদিভাই, আমার ছেলে কাঁদছে। আহা, কাঁদুক, ওর মনের গ্লানি ধুয়ে যাক। ও শান্তি পাবে। বৃদ্ধ মানুষটি পরম মমতায় বললেন।
—কিন্তু আমার কী হবে দাদু? আমি তো একা হয়ে গেলাম? চিরন্তনী আর চোখের জল ধরে রাখতে পারল না।
—দুর পাগলী, একা ভাবলেই একা। জগতে কত মানুষ আছে যারা সবার মাঝখানে থেকেও একা। আবার কত একলা মানুষ সকলের মধ্যে বেঁচে আছে।
—দাদু, বাবা-মা আমার কাছে জানতে চেয়েছে দিদি যাওয়ার সময় কী বলে গেছে। আমি ওদের মিথ্যে কথা বলেছি। ওরা যাতে কষ্ট না-পায় সেজন্য বানিয়ে বানিয়ে সব বলেছি। অথচ দিদি একটা কথাও বলেনি ওদের সম্পর্কে। ওর প্রিয় নীলরঙের ব্যাগটা কাঁধে ফেলে নীচে নেমে এসেছে। একেবারে হঠাৎ। এই দিদি তুই কোথায় যাচ্ছিস—শুধু এটুকুই তখন জিজ্ঞেস করতে পেরেছিলাম। দিদি উত্তর দেয়নি। সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এসে আমাকে অদ্ভুত চোখে কয়েক সেকেন্ড দেখেছিল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলেছে, আমি চলে যাচ্ছি, গঙ্গামাতার আশ্রমে। বাবা-মাকে আমার প্রণাম দিস। তুই আমার আদর নে চিরু। কথা শেষ করে দিদি একমুহূর্ত দাঁড়ায়নি। সোজা এগিয়ে গেছে। একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। দিদিকে ফিরে আসতে বলো দাদু। তুমিই পারবে...
সেই আশ্চর্য সুন্দর হাসিতে নিজেকে ভরিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, না আর হয় না, দিদিভাই। জীবনের গেরুয়া রঙটাকে অস্বীকার করব কীভাবে! তাকে মেনে নিতেই হবে—শান্তচিত্তে, নম্র শ্রদ্ধায়। ...তবে কি জানিস, মানুষ পারে না। তার ক্ষোভ, অভিমান থেকেই যায়। সেই যে গানে আছে—সবুজ দেশের রাজা একটু থামলেন, তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় সুর ছড়িয়ে দিলেন বাতাসে : যদি প্রেম দিলে না প্রাণে, কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে...।

মাটির তিলক

সুবলসখা চোখ নাচিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তাহলে কিছু কাজ হচ্ছে! পাড়ার ছেলেরা নিজের থেকে নেমেছে বলছেন!

বিতান স্মিত হাসির আভাস ঠোঁটে ঝুলিয়েই রেখেছিল। সুবলসখাকে আরও একবার খুশি করার জন্য বলল, হ্যাঁ সুবলবাবু, উদ্‌যোগ ওরাই প্রথমে নিয়েছে। তারপর আমি। আইডিয়াটা এখনও অবশ্য মোস্ট প্রিলিমিনারি স্টেজে আছে। এবার আপনার হেল্প পেলেই কাজটা করে ফেলা যায়।

—আরে হেল্প কী বলছেন! এ তো আমার ডিউটি। আপনি তো জানেনই, ইচ্ছে থাকলেও সবসময় সব কিছু করা হয়ে ওঠে না। তার ওপর পার্টির কাজ, বিধানসভা, মিটিং, হেনাতেনা—একেবারে জেরবার অবস্থা। অনেকের ধারণা, এম. এল. এ.-দের মতো সুখী আর কেউ নেই। একবার গদিতে বসতে পারলেই হল! বিতানবাবু, আপনি তো সমাজসেবা করেন, আপনি বলুন...

এই শুরু হল! সুবলসখার সাতকাহন। নিজের ঢাক পেটাতে পেটাতে ভদ্রলোক উত্তরবঙ্গে গিয়ে পৌঁছে যাবেন। আলিপুরদুয়ার না শিলিগুড়ি—কোথায় যেন ওঁর জন্মস্থান, সেখানে উপস্থিত হবেন। বিতান তাড়াতাড়ি চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়ার ভঙ্গিতে বলল, আজ তাহলে আসি। আপনার আর সময় নষ্ট করব না।

যেন এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন এমনভাবে ঘড়ি দেখে এম. এল. এ. বললেন, ওঃ...হ্যাঁ, আমাকে আবার আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। দিল্লি থেকে আমাদের এক নেতা আসছেন। আমার ওপরে আবার প্রোটোকলের ভার পড়েছে। ঠিক আছে তাহলে। একটা সুসংবাদ শুনিয়ে গেলেন। এইভাবেই একুট একটু করে হবে। কী বলেন! নমস্কার, নমস্কার...

গতকাল রাতেই ফোন করে সুবলসখার কাছ থেকে বিতান অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিয়ে রেখেছিল। এম. এল. এ. কথা রেখেছেন। এই সময়টায় আর কাউকে দর্শন দেওয়ার ব্যবস্থা রাখেননি! বিতান সবই খুলে বলেছে। সারা কলকাতা জুড়েই ফুটপাথের ওপর এক চিলতে জায়গা ঘিরে বাগান করার প্রবণতাটা গত দু'-তিন বছরে বেশ বেড়ে উঠেছে। অবশ্য হকাররা যে-হারে এবং যে-দ্রুততায় পায়ে-চলার-পথ দখল করে নিচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাগান তৈরি হচ্ছে না। বিতানদের এলাকায় একই সমস্যা। তুব পাড়ার বেকার ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন বিতানের কাছে প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছিল। বাগান বলতে সিমেন্ট বা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা এক টুকরো জায়গা। সেখানে নানা রকমের গাছ। হাতের সামনে যে-গাছ পাওয়া যাবে। ফুল,

ফল, ক্যাকটাস—কোনও বাছাবাছি নেই। সব মিলিয়ে একটুখানি সবুজ দ্বীপ। প্রথম প্রথম খুব উৎসাহে এর পেছনে সবাই লেগে থাকবে। তারপর কোনওরকমে একজন বা দু'জন। বিতান খেয়াল করেছে—এই সব শখের বাগানের ক্ষণজীবী গাছগুলো সবার অলক্ষ্যে মারা যায়। আর যারা এই শহরের বুক ফাটিয়ে কংক্রিটের ভেতর থেকে জীবনের রস শুষে নিয়ে আসে, ছিনিয়ে আনে, কেবল তারা বেঁচে থাকে। সেই গাছগুলো রেলিঙের বাইরে ডালপালা মেলে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। মানুষ যে এখনও পাথুরে শহরের কালো দেহের পাশে একটুখানি শ্যামলছায়া কামনা করে—এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের। কলকাতার প্রতিটা ফুটপাথ যেখানে রুজি-রোজগারের হক-রাইটে প্রতিনিয়ত দুর্লভ ও দুর্মূল্য হয়ে উঠছে সেখানে একটু বাগান তৈরি করার স্বপ্ন বা প্রয়াস খুব বেখাপ্পা মনে হয়। তবু পৃথিবীর যা কিছু আশ্চর্য ঘটনা তা মানুষই ঘটায়: এবং তা এই মৃত্তিকার বুকেই ঘটে।

ওরা সাতজন এসেছিল। নন্দু, রাজা, পান্তী, সমীর, বুকু, দেবরাজ এবং মনা। এই অঞ্চলের সবচেয়ে নামকরা ক্লাবের সেক্রেটারি হিসেবে বিতান ওদের প্রত্যেককে চেনে। এরা কেউই বিতানের ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত নয়। এদের কেউই এখনও চাকরি পায়নি। দিনের বেশির ভাগ সময় এরা আড্ডা দিয়ে, রকবাজি করে কাটিয়ে দেয়। একই সঙ্গে হয়তো ভুলতে চেষ্টা করে কর্মহীন জীবনের গ্লানি। নন্দুদের একটাই পরিচয়—পাড়ার ছেলে। এদের সকলেই চেনে। তবে মেলামেশা করে না। যার যতটুকু স্বার্থ, সেটা পরিমাপ করে নিয়ে পাড়ার লোকেরা এদের সঙ্গে মেশে। কথা বলে। সরস্বতী ও কালীপুজোর সময় এদের দৌরাত্ম্য নিয়ে অনেকে আড়ালে-আবডালে বলে ঃ 'এরা কি মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি!' ব্যস্‌, ওই পর্যন্ত। শান্তিপ্রিয় মধ্যবিত্তরা এর বেশি এগোতে ভরসা পায় না। বিতান জানে, এই ছেলেগুলোই আর কয়েক বছর পরে জীবিকার ধান্দায় এধার-ওধার ছিট্‌কে পড়বে। এদের বয়স হয়ে যাবে। তখন এই সব শূন্যস্থান পূর্ণ করতে আসবে এখন যারা কিশোর। এ গলি ও-গলির অন্তরালে যারা একটু একটু করে বেড়ে উঠছে।

কেন যে হঠাৎ নন্দুরা ফুটপাথের ওখানটায় বাগান করতে চাইছে—সেটা বিতানের কাছে এখনও স্পষ্ট নয় যদিও। ওদের মধ্যে রাজা নামের বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেটাকে বিতান জিজ্ঞেস করেছিল, হঠাৎ বাগান করবে কেন?

সকলের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে রাজা উত্তর দিয়েছে, না,...মানে, এমনি অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম।

বেশ অবাক হয়ে বিতান বলেছিল, তাই না কি! আমার তো মনে হচ্ছে, তোমরা কলকাতার এই লেটেস্ট হুজুগে মেতে উঠেছ। এসব এন্‌থু থিতিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে না কিন্তু।

দুরন্ত ছেলেগুলো বিতানের মুখের দিকে খুব অসহায়ভাবে তাকিয়েছিল। ওদের মনের গহনে লুকনো বিষণ্ণতা আর চাপা থাকেনি। সমীর নামের গাঁট্টাগোট্টা ছেলেটা হাসতে চেষ্টা করেছে। অযথা হাত নেড়ে বিতানকে বলেছিল, না, না, হুজুক কেন হবে! আমরা কিছু একটা করব...। তাই আপনার কাছে এসেছি। আপনি...

খুব জোরালো কোনও যুক্তি নয়, তবু বিতানের মনে হয়েছিল এদের এই সংকল্পটা সত্যি। উদ্দেশ্য হয়তো কিছু আছে। কিন্তু সেটাকে ছাপিয়ে, সেই মুহূর্তে ওদের, কিছু একটা করার দৃঢ়তা ইস্পাতের মতো ঝলসে উঠেছিল। ওদের আর নিরুৎসাহিত করেনি বিতান। শুধু কতকগুলো বাস্তব সুবিধে-অসুবিধের আলো-অন্ধকারের দিকে ছেলেগুলোর ভাবনাকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে। কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বিতান মুখ খুলেছিল, ফুটপাথ নয় তোমাদের হাতের মুঠোয় আছে, কিন্তু ওই জায়গাটায় একটা রেলিঙ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বাখারি দিয়ে ঘিরে তো আর রাস্তার বাগান করা যাবে না। ইট বালি সিমেন্ট চাই কিংবা লোহার গ্রিল। এরপরে মাটি আছে এবং গাছগাছালি। এসবের জোগাড় কী করে হবে! টাকা-পয়সা...

সেইজন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি বিতানদা। নন্দু প্রত্যেকটা 'স'-কে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলেছে, সব ব্যবস্থা আপনি করে দেবেন। আমরা বাগানটার জন্যে জান লড়িয়ে দেব। সত্যি বলছি!

—আমরা কিছু চাঁদা দেব নিশ্চয়ই। তবে বেকারদের অবস্থা তো আপনি জানেন! রাজা প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল।

একটু দ্বিধা ও সংশয়ের আভাস রেখে বিতান বলেছে, তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, তোমরা কিছু একটা করবে। কিন্তু কীভাবে করবে সে-সম্পর্কে কিছুই ভাবা নেই। এখন বিতান চ্যাটার্জিকে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বাঃ! এতে আমার কী লাভ! নাম তো হবে তোমাদের!...মাঝখান থেকে আমি ক্লাবের কাছে খারাপ হয়ে যাব। ওরা ভাববে বিতানদা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে। তোমরা এখানকার কাউন্সিলারের কাছে গেলে পারতে। উনি কর্পোরেশন থেকে সব ব্যবস্থা করে দিতেন।

কেউ কিছু বলার আগেই বুকু—এদের মধ্যে সবচেয়ে খেঁকুরে ও মিচ্কে ছেলেটি ধুপ করে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়েছিল। তারপর একেবারে হিন্দি ফিল্মের সৎ অথচ অত্যাচারিত নায়কের কায়দায় বলেছে, মাইরি গুরু. মায়ের দিব্যি বলছি, আপনাকে আমরা অন্য চোখে দেখি। ক্লাবের থ্রু দিয়ে আপনি পাড়ার জন্যে কত কী করেন। আমরা আপনার পাশে থাকি না, তবু আপনি আমাদের পাত্তা দেন। অন্যরা তো আমাদের কেয়ার...। ওসব কাউন্সিলার-ফাউন্সিলার বুঝি না আপনি যা করবেন, তাই হবে।

বুকুকে প্রায় জন্মাতে দেখেছে বিতান। ওর বাবা মনোহার দাস একটা মুমূর্ষু লেটার প্রেসের কম্পোজিটর। মনোহরবাবু এখনও স্বপ্ন দেখছেন দারিদ্র্যকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা দাঁড়াতে পারবেন, যেমন ভাবতেন কুড়ি-একুশ বছর আগে। সেই সময় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সামান্য কয়েকটা ফর্মা এক অখ্যাত ছাপাখানার ঘুপচি ঘরে ছাপাতে এসে মনোহর দাসের সঙ্গে কলেজ-পড়ুয়া বিতানের চেনাজানা হয়েছিল। ওঁর পাশের পাড়ায় বিতান থাকে—এই কথা জানার পর দারিদ্র্যের চাবুকে পাংশু ও কৃশ হয়ে যাওয়া দাসবাবু একদিন সন্ধেবেলায় চল্লিশ পাওয়ারের ফ্যাকাশে হলুদ আলোর নীচে বসে বলেছিলেন, 'আশা, বুঝলে না ভাই আশা। সুদিন আসবেই। একভাবে কি আর তিনশ পঁয়ষট্টি দিন যায়! না, না—এটুকু স্বপ্ন যদি না দেখি, তাহলে তো বাঁচাই

বৃথা।' কোন্ প্রসঙ্গে এসব কথা মনোহর দাস বলেছিলেন এখন আর মনে নেই। তবে একটা দৃশ্য মনে আছে। ঠিক ওই সময়েই বা তার একটু পরে, একদিন বিকেলে মেডিকেল কলেজের গেট থেকে পাণ্ডুর বর্ণ এক ভদ্রমহিলা ও একটি সদ্যোজাত শিশুকে রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে দাসবাবু বেরিয়ে আসছিলেন। মনোহরের চোখে-মুখে খুব সামান্য তৃপ্তির আভাস লগ্ন হয়ে ছিল। ওঁর স্ত্রীকে সেদিন আদৌ সুখী বলে মনে হয়নি। ক্লান্তি বিতৃষ্ণায় ভদ্রমহিলা নুয়ে পড়েছিলেন। সেদিনের সেই দুধের বাচ্চাটাই আজকের বুকু। আরও পরে বিতান এটা জেনেছিল। মনোহর দাস এখনও দিন আনি দিন খাই—এই কঠিন এবং অনতিক্রম্য বন্দোবস্ত থেকে বেরোতে পারেননি। অন্যদিকে, আধপেটা খেয়েও মানুষ হওয়া যায়—এই চমৎকার নীতিবাক্যকে প্রমাণ করার কোনও দায় অনুভব করেনি বুকু। ও যা হবার, তাই হয়েছে। কেবল দাসবাবুর স্বপ্ন এখনও স্বপ্ন।

অন্য ছেলেগুলো বুকুর ওই নাটুকেপনায় হেসে ফেলেছে। বিতান কপট গাম্ভীর্যে নন্দুকে লক্ষ করে বলেছিল, শোনো নন্দু, তোমাদের এই বাগান করার সাধ কেন—এটা আমার কাছে পরিষ্কার হল না। তবে তোমরা পাড়ার ছেলে। তোমাদের কথায় আমি বিশ্বাস করছি। তোমাদের আন্তরিকতা আছে বলে ধরে নিচ্ছি। তবে ওই টাকা-পয়সার ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা ভাবো। ইন দি মিন টাইম, আমি এম. এল. এ.-র সঙ্গে কথা বলব বিষয়টা নিয়ে। কাউন্সিলারকেও বলতে হবে। এটা ফুটপাথ বলে কথা। পিপলস রিপ্রেজেনটেটিভরা আপত্তি করতে পারেন। তার চেয়েও বড় ফ্যাক্টর, পথচারীরা অবজেকশন দিতে পারে।

ওদের মধ্যে যার নাম দেবরাজ, সেই লম্বা মতন সুবেশী ছেলেটি একটু কায়দা করে উচ্চারণ করেছিল, হোয়াই অবজেকশন?

—ভুলে যাচ্ছ কেন? রাস্তাটা পাবলিকের। তাদের সুবিধে-অসুবিধেটা সব কিছুর উর্ধ্বে। তোমরা ফুটপাথে এনক্রোচ করে বাগান করবে আর লোক্যাল পিপল সব মেনে নেবে, এটা ভেব না যেন! বিতান আবার ওদের বাজিয়ে নিয়েছে।

ছেলেগুলো চলে যাওয়ার আগে আত্মসমর্পণের সুরে সবাই বলেছিল, একটু দেখবেন বিতানদা। সত্যিই যদি কিছু হয় আপনার জন্যেই হবে। আপনাকে কথা দিচ্ছি, বাগানটাকে এই এলাকার প্রেস্টিজ ইস্যু করে দেব।...

সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত কী মনে করে বিতানকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন সুবলসখা। তরতর করে নেমে আসছিল বিতান। সুবলসখা ওপর থেকে ডাকলেন, শুনুন বিতানবাবু, এক মিনিট...। টাকার জন্য ভাববেন না। হাজার দুয়েক টাকার মামলা। ও আমি লোহাপট্টি থেকে তুলে দেব। আপনি টোটাল স্কিমটা কাল পরশুর মধ্যে করে আনুন।...খুব জাঁকজমক করে বাগানটার উদ্বোধন করে দেব।...চাই কি একটা মার্বেলের ট্যাবলেটও বসানো যেতে পারে। তাতে লেখা থাকবে ঃ বিধানসভার সদস্য মাননীয় শ্রীসুবলসখা গুহ কর্তৃক এই পথ-উদ্যান...সরি, সরি, আপনার দেরি করিয়ে দিচ্ছি। তাহলে আসুন...নমস্কার...ও হ্যাঁ আপনি মোহিতকেও ম্যাটারটা জানিয়ে রাখবেন।

মোহিত মানে মোহিত রায়। বিতানদের ওয়ার্ডের পৌরপিতা। বিতান হাত নেড়ে

এম. এল. এ.-কে আশ্বস্ত করে রাস্তায় নেমে এল। মোহিতের সঙ্গে বিতানের সম্পর্কটা খুব একটা সুবিধের নয়। বিতানের জনপ্রিয়তা মোহিত ঠিক সহ্য করতে পারে না। বিতান কতবার ভেবেছে, মোহিতকে গিয়ে বলবে, নির্বাচনে জেতা এক জিনিস আর মানুষের সুখদুঃখের সাথী হওয়া অন্য জিনিস।
ইচ্ছা না থাকলেও মোহিতকে বলতে হবে। ওকে উপেক্ষা করলে যে কোনও ছুতোয় ও বাধা দিতে পারে। বিতান হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করে নিল কখন পৌরপিতার সঙ্গে দেখা করবে।

দরজা না খুলে বিতান রুক্ষস্বরে বলল, কে?
রাত প্রায় দশটা। এই সময় বেল বাজিয়ে বিতানকে কে যেন ডাকতে এসেছে! ওর একটু রাগ হয়ে গেল। যথেষ্ট রাত হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে ক্লাব, পাড়া, পল্লীমঙ্গল করে বিতান বাড়ি ফিরেছে। ওর নিজস্ব সময় বা প্রাইভেসি বলতে এই রাত দশটার পর থেকে যতক্ষণ না শুতে যায়। এখন কাউকে অ্যাটেন্ড করার ইচ্ছেটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। খুব জরুরি বিষয় বা বিপদগ্রস্ত কেউ এলে আলাদা কথা। তেমন কোনও ব্যাপার হলে বিতান ক্লাবে বসেই খবর পেত। তাহলে কে বেল বাজাল!
—আমি, বিতানদা। ওধার থেকে বেশ ভীরু কণ্ঠে উত্তর এল।
গলাটা চেনা-চেনা লাগছে। শব্দ করে ছিটকিনি খুলেই বিতান দেখল বুকু দাঁড়িয়ে আছে। অপরাধীর মতো মুখ করে। আবার হাসতে চেষ্টা করছে।
—তুমি! কী ব্যাপার? বিতান বেশ অবাক হয়ে গেল। ছেলেটা তো অদ্ভুত। এই ঘণ্টা দুয়েক আগে নন্দুদের সঙ্গে বিতান কথা বলেছে। ওদের মধ্যে বুকুও ছিল। ওরা কবে মিস্ত্রি লাগাবে, গাছ কিনবে, হাতে হাত লাগিয়ে বাগানটার জন্যে খাটবে—এইসব বিতান আলোচনা করেছে। এমন কী ওরা যেখানটায় বাগানটা করবে ঠিক করেছিল, সেখান থেকে কয়েক হাত দূরে করা হবে—এটাও মোটামুটি স্থির হয়ে গিয়েছে। এবার শুধু এম. এল. এ.-র কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে পথ-উদ্যানটি করে ফেলা। এই উদ্‌যোগ ও সৃষ্টির মাঝখানে আর এমন কোনও কথা নেই যা এই মুহূর্তে বলার জন্য বিতানের বাড়িতে কাউকে ছুটে আসতে হবে। বুকুর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওর এই আসাটা একেবারে উদ্দেশ্যহীন। হয়তো বিতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়ে ছেলেটা সাহস করে ভাব জমাতে এসেছে। সময়-অসময় নেই। আচ্ছা পাগল তো। বিতান রাগ-রাগ মুখ করে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার!'
—আপনার সঙ্গে...কয়েকটা ইমপর্ট্যান্ট কথা আছে। একটু যদি শোনেন।
—ইমপর্ট্যান্ট! বিতান আশ্চর্য হয়ে গেল, তখন বললে না তো!
—না, আসলে আপনাকেই শুধু বলব বলে...। অন্যরা পরে জানলেও চলবে। বুকু হাসতে চেষ্টা করল।
বিতান ভুরু কুঁচকে এক মিনিট ভাবল। ছেলেটা কী এমন বলতে এসেছে, জানাতে এসেছে যা ওর বন্ধুবান্ধব নন্দু, পান্তী, সমীর, রাজাদেরও বলা যায় না। বিতান একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, এসো, এসো, ভেতরে এসো।

সদর দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে সামান্য এগিয়েই বসার ঘর। বুকুকে সোফায় বসতে ইঙ্গিত করেই বিতান জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বাগানটা নিয়ে কোনও কথা কি?

বসার ঘরটার সৌন্দর্য মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিল বুকু। এরই মধ্যে ছেলেটা বিষয়ান্তরে চলে গিয়েছে। বিতানের প্রশ্নে চমকে উঠে বলল, অ্যাঁ, ও হ্যাঁ, না, না বাগান নিয়ে নয়। একটু দাঁড়ান বলছি। বিতানদা, ওগুলো কি বাঁকুড়ার ঘোড়া!

ওগুলো যে বাঁকুড়ার ঘোড়া এবং পিছনে শো-কেসের ঠিক কোন্‌খানে রাখা আছে বিতান তা জানে। তবু বুকুর আচমকা প্রশ্নে ঘাড় ফিরিয়ে ও বাঁকুড়ার ঘোড়াগুলো দেখল। পোড়ামাটির বিশ্বনন্দিত লোকশিল্প। বিতানদের বসার ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। মহা মূল্যবান, চোখ-ধাঁধানো জিনিস দিয়ে নয়। খুব সামান্য অথচ দৃষ্টিনন্দন শিল্পকৃতি ঘরের এখানে-ওখানে বসিয়ে রাখা আছে। মুখ ফিরিয়ে ভারি আশ্চর্য হয়ে বিতান বলল, হ্যাঁ! বাঁকুড়ার ঘোড়া! আগে নিশ্চয়ই কোথাও দেখেছ!

—এ রকম জ্যান্ত দেখিনি। ছবিতে দেখেছি। এগুলো নাকি আরও বড় সাইজের কিনতে পাওয়া যায়। দেবরাজের কাছে শুনেছিলাম, ও কোন্ একটা প্রাইভেট অফিসে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখেছিল। মাটি থেকে এই অ্যাত্ত বড়। বুকু কথা থামিয়ে হাত তুলে মেপে দেখাল।

—এরা জ্যান্ত ঘোড়া! চাপা রাগের মধ্যেও হেসে ফেলল বিতান।

—ওই হল। বুকু আরও সহজ সুরে বলল।

বুকুর শুকনো, নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকিয়ে বিতান চুপ করে বসে আছে। ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার ঘরের নরম সৌন্দর্যে বুকু ডুবে গিয়েছে। ওর রুগ্‌ণ রোগাটে বাবা হয়তো এতক্ষণে ছাপাখানা থেকে বাড়ি চলে এসেছেন। ভদ্রলোক এবার বসবেন রাতের খাবার নিয়ে। গোনাগুন্‌তি রুটি, মাপা তরকারি ডাল। সেই সঙ্গে হয়তো একটুখানি সস্তা আখের গুড়। বাড়িতে কেউ নিশ্চয়ই বুকুর খোঁজ করছে না। ওর এখনও বাড়ি-ঢোকার টাইম হয়নি। মনোহর দাসের কাছে বুকুর ঘরে ফেরা, না-ফেরা দুটোই সমান। বিতানের হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল। ওর মনে হল, বুকুদের জীবনযাপনের সঙ্গে সময়ের কোনও সম্পর্ক নেই। সকাল দশটা কিংবা রাত এগারোটা এদের কাছে সমান। এরা অসহ্য, অফুরন্ত সময়ের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে।

—জানেন তো, এরই মধ্যে একটা গণ্ডগোল বেধে গিয়েছে। আপনি কিছু শুনেছেন! নীরবতা ভেঙে বুকু বলল।

—গণ্ডগোল, কই না তো! কিছু শুনিনি। বিতান অবাক হয়ে গেল।

—ও। তার মানে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।...গণ্ডগোল মানে, শুনলাম বিপুলদারা নাকি আমাদের ওইখানটায় বাগান করতে দেবে না। বাধা দেবে।

—তুমি কোত্থেকে এসব শুনলে?

—গোপন সোর্স। সেটা বলব না। তবে খবরটা হয়তো সত্যি। আপনি বিপুলদাদের চেনেন তো! ওই যে শীল লেনের মুখটায় বসে ওরা গ্যাঁজায়। ওরা নাকি প্ল্যান করেছে, ফুটপাথের ওখানে দুটো রোলের গাড়ি দাঁড় করাবে। আর আমাদের বাগান করতে দেবে না।

—সে কী! তোমাদের কাছে আগে কোনও খবর ছিল না?

—না বিতানদা। আমি কিছুক্ষণ আগে জানতে পারলাম। এখন কী হবে বলুন তো! ওরা যদি ঝামেলা করে!

ঠোঁট কামড়ে বিতান একটু চিন্তা করল। শূন্য দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, একজনকে না একজনকে জায়গাটা ছেড়ে দিতেই হবে। ব্যবসা আর বাগান একসঙ্গে তো হবে না। দেখ, কী করবে?

—কোন্‌টা হওয়া উচিত?

বুকুর প্রশ্নে বিতানের আনমনা ভাবটা কেটে গেল। এ এক সাংঘাতিক জিজ্ঞাসা। কোন্‌টা হবে! একদল স্বপ্ন দেখছে একটুকরো সবুজ দ্বীপের, অন্যদল চাইছে রুজি-রোজগারের অবলম্বন। অথচ জায়গা একটা। যদি সত্যিই বিপুলরা ওখানে রোলের গাড়ি লাগাতে চায় কিংবা চেষ্টা করে তাহলে পথ-উদ্যানের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হবে। জনপ্রতিনিধিরা এককথায় বিপুলদের সাপোর্ট করবেন। তার ওপর শীল লেনের এই ছেলেগুলোকে এলাকার লোকেরা ভয় পায়। এদের বোমাবাজ বলে কুখ্যাতি আছে। কয়েকটা ঘটনায় স্থানীয় মানুষ দেখেছে, বিপুলরা খুব সামান্য ছুতোয় ত্রাস সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। গত দুর্গাপুজোয় এমনই একটা ঘটনার কথা এখনও কেউ ভোলেনি। শীল লেনের ছেলেরা জোর করে আর একটা সার্বজনীন পুজো নামিয়েছিল রাস্তায়। চাঁদা তোলা নিয়ে কম হুজ্জোতি হয়নি। অকারণে বোমা পড়েছে। যথেচ্ছ। হয়রানির একশেষ। গত বছর থেকে বিপুলরা আরও বেশি লাইমলাইটের সামনে চলে এসেছে। ওরা যদি মনে করে থাকে, ফুটপাথে গাড়ি লাগাবে, লাগাবেই, পুলিশও কিছু করতে পারবে না। বরং বেকারদের রোলের হকারিই লোকের সভানুভূতি টানবে, বাগান নয়। তবু এটাই শেষ কথা নয়। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, সব কিছুকে উপেক্ষা করে একটি গাছ যখন সবুজ পাতার ধ্বজা তুলে বলে 'আমি প্রাণ', তখন সেই সত্যটিকে অস্বীকার করা যায় না। করা সম্ভবও নয়। গাছের সঙ্গে মানুষের আবহমান কালের মিতালি। যদিও এই বন্ধুত্ব এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে কত লোক আজ প্রাণের সঙ্গে প্রাণের হারানো ভালবাসার সেতুটি পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করছে। নন্দু, মনা, রাজা, বুকু, পাঙ্খীরা অন্তত এই মুহূর্তে সেইসব মানুষদেরই একজন। রাস্তায় বাগান করে এরা কী ফায়দা ওঠাবে বিতানের জানা নেই। কিন্তু ওদের এই কিছু একটা করার আকুতিটা যে নির্ভেজাল, আন্তরিক, সে-সম্পর্কে বিতান নিঃসংশয়। বুকুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিতান জানতে চাইল, ওদের পেছনে কি মোহিত আছে? কিছু শুনেছ!

সেন্টার টেবিল থেকে সুদৃশ্য অ্যাসট্রেটা হাতে তুলে নিয়ে বুকু বলল, থাকতে পারে। জানেন তো বিপুলদাদের দলে নিতাই বলে একটা হাড়হারামি ছেলে আছে। ও শালা তো মোহিতবাবুর আত্মীয়। বিতানদা, আমরা কিন্তু বাগান করবই। আপনি আমাদের সাপোর্ট করবেন না?

—আচ্ছা, তুমি যদি আমার জায়গায় হতে, তাহলে কী করতে বুকু? বিতান ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করল।

—আমি...আপনার জায়গায়! যাঃ কী বলছেন! আমি...। বুকু শব্দ করে হাসল।

—না, না। বলো বলো তুমি কী ডিসিশন নিতে? গম্ভীর গলায় বিতান বলল।

বেশ ঘাবড়ে গিয়ে বুকু করুণ স্বরে বলল, ওখানটায় বাগানই হওয়া উচিত।

বেশ। কিন্তু তোমরা বিপুলদের সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারবে? পাবলিক তো ওদের হয়ে কথা বলবে। তোমাদের বাগান করার ছেলেখেলা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। আর আমি একা তোমাদের পেছনে থেকে কতটা কী করতে পারব সন্দেহ আছে। বিতান কথা বলার সময় হতাশাটাকে চেপে রাখতে পারল না।

—তাহলে বাগানটা হবে না বিতানদা! গুরু, আমরা যে মুখ দেখাতে পারব না। বেশ কয়েকজন আমাদের গাছ-ফাছ কেনার টাকাও দিয়েছে। দিয়েছে মানে আমরা চেয়ে নিয়েছি। এবার তারা তো চামড়া খুলে নেবে। অজানা অদৃশ্য যন্ত্রণায় বুকুর রোগাটে-ভোগাটে দেহটা কুঁকড়ে ভেঙেচুরে গেল।

—শোনো, আমাকে একটু ভাবতে দাও। আমি সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। তারপর দেখছি কী করা যায়। বিতান হাত তুলে বুকুকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল।

—এই বর্ষায় বাগানটা তৈরি করে ফেলতে না পারলে আর কোনওদিন হবে না। দেখবেন এই আমি আপনাকে বলে দিলাম।

—এবারে না হোক সামনের বর্ষায় হবে।

—না, না, এবারই করতে হবে। নট ছাড়ান ছোড়ন। আমাদের পাড়ার মুখে ওরা কেন রোলের দোকান দেবে? শীল লেনের মুখটায় দিক। ওদের যত মাজাকি আমাদের জায়গাটায়। বুকু রেগে গিয়ে হাত-পা নেড়ে বলল। ঠোঁট সরু করে কী যেন ভেবে নিয়ে আবার মুখ খুলল, বিতানদা, বুকে হাত দিয়ে মায়ের দিব্যি কেটে বলুন তো, আপনি বাগান হোক—এটা চাইছেন না!

গাম্ভীর্যের মুখোশ খসিয়ে ফেলে বিতান এবার হো হো করে হেসে উঠল।

—আপনি হাসছেন! গুরু, আমার কান্না পাচ্ছে। জানেন, গত পরশু আমি বামনগাছি গেছিলাম। ওখানে এক ভদ্রলোকের নার্সারি আছে। নিজের চোখে দেখে এসেছি। ভদ্রলোক কম পয়সায় আমাকে ভাল ভাল গাছ দেবে—কথা দিয়েছে। বিশ্বাস করুন। ভদ্রলোক আমার বাবার চেনা।

বুকুর মুখে 'বাবা' শব্দটা শুনেই বিতান বলল, মনোহরবাবু কেমন আছেন?

একেবারে অতি সাধারণ জিজ্ঞাসা। কিন্তু বুকু ভারি আশ্চর্য হয়ে, চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার আভা ফুটিয়ে বলল, আপনি আমার বাবাকে চেনেন?

বুকের ভেতরে বিতান আবার ব্যথা অনুভব করল। এরা পেছনে হটতে হটতে কোথায় চলে গিয়েছে! কোন্ গহন অন্ধকারে! সেখানে কেউ যদি একটুখানি আলো ফেলে, এদের কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। বিতান নরম স্বরে বলল, কেন চিনব না! তোমাকে যতটা চিনি, তার চেয়েও ভাল করে চিনি। উনি তো...

বিতান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ওর ভাইঝি মুকুলিকা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বুকুকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, কাকু, কটা বাজে খেয়াল আছে! কাকিমা রাগ করছে। তাড়াতাড়ি চলে এসো। খাবার রেডি।

মুকুলিকা বিতানের মেজদার মেয়ে। ওর বাবার বদলির চাকরি। ওরা এখন কৃষ্ণনগরে থাকে। মুকুলিকা হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই ফাঁকে কাকা-জেঠাদের কাছে বেড়াতে এসেছে। অদ্ভুত শ্রীময়ী, শ্যামবর্ণা এই ভাইঝিটি বিতানের খুব প্রিয়। বিতান হাত তুলে বলল, এক্ষুনি যাচ্ছি।

মুকুলিকা মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে মুখ ফিরিয়েই বিতান দেখল, বুকু মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রায় হাঁ-করে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক যেখানটায় মুকুলিকা দাঁড়িয়েছিল।

ট্যাক্সিতে উঠেই বিতান ঘড়ি দেখল। এখান থেকে হাসপাতালে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে বলা মুশকিল।

অফিস ছুটি হওয়ার মিনিট পঁয়তাল্লিশ আগে বিতান খবরটা জেনেছে। ওর ক্লাবের ট্রেজারার অরুণ ঘোষ ফোন করেছিলেন। ঘোষ কোথা থেকে খবরটা প্রথম শুনেছেল তা আর জানা হয়নি। রিসিভারে বিতানের গলা পেয়েই অরুণ ভয়ার্ত গলায় বলেছেন, বিতানবাবু, আপনি এখনও হয়তো জানেন না, আমি এই মাত্র খবর পেলাম, শীল লেনের ছেলেগুলো রাস্তার বাগানটাকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। দুপুরবেলার লোনলিনেসের সুযোগ নিয়ে ওরা সব শেষ করে দিয়েছে। নন্দু, রাজা, মনা—আর কে কে যেন ছুটে এসেছিল। কিন্তু ওই পর্যন্ত। বাগানটাকে বাঁচাতে পারেনি। ওরা বোমা মেরে জায়গাটাকে মুক্তাঞ্চল করে রেখেছিল। নন্দুরা কাছে এগোতে পারেনি। একমাত্র ওদের মধ্যে বুকু নামের ছেলেটা রড নিয়ে তেড়ে গেছিল। তবে বেশি দূর যেতে পারেনি। ওর পায়ের সামনে বোমা পড়েছে। ছেলেটা সিভিয়ারলি ইনজিওর্ড। পায়ের পাতাফাতা নাকি উড়ে গেছে।

—কে-খে। বুকু! কী বলছেন আপনি! ছেলেটা কোথায় আছে এখন? বিতান থর থর করে কেঁপে উঠেছিল।

—শুনলাম আর জি করে আছে।...আপনাকে আগে থেকে সব জানিয়ে রাখলাম। পাড়ায় ফিরলেই তো আপনাকে নিয়ে পুলিশ আর লোকাল পিপল্ টানাহেঁচড়া শুরু করবে।...ঠিক আছে! রাখছি।

বিতান অনেকক্ষণ কোনও কিছু ভাবতে পারেনি। অফিস রুম থেকে বেরিয়ে এসে করিডোরের এক কোণায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আজ সকালেও বুকুকে ও দেখেছে—বাগানটার ভিতর উবু হয়ে বসে মাটি আলগা করছিল। সেই সময় মুকুলিকাকে নিয়ে ট্যাক্সি ধরতে যাচ্ছিল বিতান। এস্‌প্ল্যানেডে আসবে বলে। ভাইঝিটা আজই কৃষ্ণনগর চলে গেল। মুকুলিকাকে বহরমপুরের এক্সপ্রেস বাসে তুলে দিয়ে বিতান ফিরে এসেছে, তখনও বুকু বাগানে কাজ করছিল। কতগুলো বাখারির গা ছুরি দিয়ে চেঁছে মসৃণ করে রাখছিল। বিতানকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, গুরু, আজ নিয়ে আটদিন হল। আমি কিন্তু লেগে আছি।

মাত্র সাতদিনের মধ্যে কী এমন হয়েছে যে বিপুলরা এমন আচমকা, এমন পশুর মতো ধ্বংসলীলায় মেতে উঠল। এটা ঠিক, বিপুলরা কিছুতেই মানতে চাইছিল না।

ব্যাপারটা নিয়ে একটু একটু করে জল ঘোলা হচ্ছিল। মোহিত রায়ের প্রচ্ছন্ন উসকানিতে শীল লেনের ছেলেগুলো একগুঁয়েমিতে উৎসাহ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত সুবলসখা কোনওরকমে আপসে রফা করেছেন। বাজারের কাছে হাবুলদার চায়ের দোকানের পাশে একটুখানি জায়গা বিপুলরা পেয়েছে। ওখানে মাত্র একটা রোলের গাড়ি দাঁড় করানো যাবে। জায়গাটা বাজার সমিতির দখলে। ওঁরা দয়া করে এম. এল. এ.-কে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। সুবলসখা মিষ্টি মিষ্টি করে বিপুল, নিতাই, মদনদের বুঝিয়েছেন, 'তোমাদের দোকান, বাজারের অনেক কাছে হল। এখানের চেয়ে ওইখানে আরও জমিয়ে বসতে পারবে। তোমরা নিজেদের মধ্যে মিছিমিছি ঝগড়া করছ। ফুটপাথ পাবলিকের। আজ আছে, কাল নেই। এই দেখ না, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে মেট্রো রেলের কাজ হচ্ছে। সেখানে ফুটপাথ বলতে তার কিছু আছে! নেই, নেই! সব পাতালের গর্ভে ঢুকে গিয়েছে! এখানে আছে, তাই তোমরা লড়ে যাচ্ছ, যদি না থাকত!' ওরা সুবলসখার সঙ্গে তর্ক করেছে। মানতে চায়নি। শেষমেশ সম্মতি দিলেও ওদের ভেতরে প্রতিহিংসার যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল, তা আজ দুর্নিবার হয়ে উঠে সব কিছু ছারখার করে দিয়েছে।

লাস্ট মিটিং-এ বিপুলরা বুঝে গিয়েছিল, এম.এল.এ. সবুজ বাগানের দিকেই ঝুঁকে আছেন। এবং এর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে বিতান চ্যাটার্জি। ছেলেগুলোর মুখ দেখে সেদিন মনে হয়েছিল, ওরা দাঁতে আর নখে বিষ লুকিয়ে রাখল। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিতান একবার ভেবেছিল সরে আসবে। সুবলসখা সেটা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, 'আপনি ঘাবড়াবেন না। জানি, আপনার বা আপনার ক্লাবের কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তবু পুরোটা আপনাকেই করতে হবে। ইউ উইল বি দ্য চিফ আর্কিটেক্ট। শুধু মনে রাখবেন, আপনার পেছনে পলিটিক্যাল লিডারের সমর্থন আছে।'

সামনে লম্বা জ্যাম। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেল। ছুটন্ত কলকাতাকে দেখে বোঝার উপায় নেই, আজ সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কতগুলো দুর্ঘটনা, কতগুলো মৃত্যু, কতগুলো রাহাজানি, ডাকাতি ও ধ্বংস কলকাতার বুকের ওপর ছুটে গেছে। রাত্রিবেলায় পাড়ায় ফিরে বিতান কিছুতেই আটদিন আগের ঘটনার সঙ্গে আজকেরটাকে মেলাতে পারবে না। সেদিন সাড়ম্বরে পথ-উদ্যানের উদ্বোধন করেছিলেন সুবলসখা গুহ। নন্দুরা তিনদিনের মধ্যে সব কমপ্লিট করে ফেলেছে। পাতাল রেলের মাটি আর টবে তৈরি মাঝারি সাইজের গাছ পেতে অসুবিধে হয়নি। বুকু বামনগাছির সেই নার্সারি থেকে নানা পাতাবাহারি গাছ নিয়ে এসেছে সগর্বে। জাফরি দিয়ে ঘেরা জায়গাটাকে চেনাই যাচ্ছিল না। পাড়ার কে একজন একটা গোলাপ চারা আর দুটো পেয়ারা গাছ দিয়েছিলেন। স্থানীয় মানুষরা ভিড় করে এসেছিল। একটু দেরি হলেও হাজির হয়েছিল মোহিত রায়। তবে শীল লেনের ছেলেগুলোকে বিতান দেখতে পায়নি। নিজের হাতে একটা হাসুহানার চারা লাগিয়ে সুবলসখা আনন্দে হাততালি দিয়েছিলেন। টাকায় কুলোয়নি বলে মাইকের ব্যবস্থা করা যায়নি। বিনা মাইকেই এম.এল.এ. ফাটিয়ে দিয়েছেন। পথ-উদ্যানের উপকারিতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক কথা

বলার পর সুবলসখা নন্দুদের প্রশংসায় ভাসিয়ে দিতে ভোলেননি। ফেরার পথে ভদ্রলোক বিতানের কানে কানে বলেছেন, ছেলেগুলো মনে হচ্ছে টাকাটা মিস ইউজ করেনি। তাই না!...আচ্ছা, যে-মেয়েটি ছবি তুলছিল, সে কি আপনার ভাইঝি! কে যেন বলল। হাঃ হাঃ আমার ছবি তুলেছে তো! দেখবেন মশাই!

—এ পি সি রোডে জ্যাম আছে বাবু, আমি দীনেন্দ্র স্ট্রিট দিয়ে গাড়ি বের করে নিচ্ছি। প্রৌঢ় ড্রাইভার ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন।

—যেখান দিয়ে খুশি চলুন। আমাকে মোটামুটি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। বিতান আনমনে বলল।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল। বিতান আর ভাবতে পারছে না। বুকু কি মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা লড়ছে? এই ছেলেটা প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একই রকম উৎসাহে মগ্ন ছিল। এক একসময় বিতানের বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। বুকু কারোর বিরক্তিকে পাত্তা দেয়নি। এই ক'টা দিন রাস্তার বাগানটাকে ও পরম মমতায় আগলে রেখেছিল। শীল লেনের ছেলেগুলোর কাছে গাছের আর মানুষের প্রাণ—দুটোরই কোনও দাম নেই। একটাকে শেষ করতে এসে আরেকটাকে শেষ করে দিয়ে গিয়েছে বোধ হয়। যতক্ষণ না বিতান হাসপাতালে পৌঁছবে ততক্ষণ বুকুর জীবন-মৃত্যুর ছকটাকে হাতে নিয়ে বসে থাকতে হবে।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই বিতান দেখতে পেল এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সিঁড়িতে মাথা নীচু করে দেবরাজ বসে আছে। হাতে নোংরা রুমাল। বিতান দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ডাকল, দেবরাজ, বুকু কেমন আছে।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ছেলেটা। তারপর নিষ্ফল আক্রোশে রুমালটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখের জল আটকাতে আটকাতে তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে বলল দেবরাজ, বিতানদা, বুকু মারা গেছে। ওদের হাতে বুকু খুন হয়ে গেল। বিতানদা...

দৌড়ে ভেতরে ঢুকে এল বিতান। হাসপাতালের উৎকট গন্ধ, বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ভেসে-আসা রোগীদের আর্তনাদ, নার্স আর জুনিয়র ডাক্তারদের ছোটাছুটি, ইতস্তত রাখা ট্রলি, স্ট্রেচার আর উৎকণ্ঠিত মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে আছে বুকুর বন্ধুরা। পান্তীকে সামনে দেখতে পেয়ে বিতান উদ্‌ভ্রান্তের মতো জিজ্ঞেস করল, বুকু কোথায়? বুকু...

পান্তী বাঁদিকের একটা ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। তিন-চারজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বিতান চমকে গেল। পরপর তিনটে ডেডবডি শোয়ানো আছে। সাদা কাপড়ে ঢাকা। এর মধ্যে কোন্‌টা বুকু, চেনার উপায় নেই। এরা তিনজন এখন লাশ। এদের নাম নেই, ঠিকানা নেই, কোনও পরিচয় নেই।

মাথা নীচু করে বিতান বেরিয়ে এল। একটু দূরে নন্দুরা দাঁড়িয়ে আছে। বিতানের কাছে আসতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। প্রত্যেকের মুখে মৃত্যুর আতঙ্ক ছোবল মেরে

গিয়েছে। নীলচে হয়ে আছে ওদের মুখ। সাহস করে রাজা দু-পা এগিয়ে আসতেই বিতান ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় ভেঙে পড়ল, কী দরকার ছিল এই বাগান করার? তোমরা কেন নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়লে বলতে পারো! কী দরকার...
কেউ কোনও উত্তর দিল না। সবাই নীরব। বিমূঢ়। সমীর বহু কষ্টে সরু গলায় বলল, বিশ্বাস করুন, আমরা গোড়াতেই বুকুকে বারণ করেছিলাম—বিপুলদাদের পেছনে লাগিস না। ওরা যা করতে চায় করুক। বুকু শুনল না। ওরা ওর জান নিয়ে নিল।
বিতান ভীষণ অবাক হয়ে গেল। ওর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু বিতান জানতে চাইল, গোড়াতেই মানে! কী বলতে চাইছ তুমি!
সমীরকে থামিয়ে দিয়ে নন্দু বলল, শীল লেনের ছেলেরা ওখানে রোলের গাড়ি লাগাবে—এ খবর আমরা জানতাম। ওদেরকে আমাদের পাড়ার কাছে বসতে দেব না, ব্যবসা করতে দেব না—এসব হালকাভাবে ভাবতে ভাবতেই বুকুর মাথায় বাগান তৈরির প্ল্যানটা আসে। বিপুলদাদের বাধা দেওয়ার সাধ্য নেই, একথা জেনেও বুকু ওর প্ল্যানটাকে নিয়ে ভীষণই সিরিয়াসলি চিন্তা শুরু করল। আমাদের তাতিয়ে তুলল আস্তে আস্তে। তারপর...
চকিতে বিতানের মাথার ভেতরে সেই রাত্রির দৃশ্যটা বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল। রাত দশটা। বসার ঘর। বিতানের মুখোমুখি বুকু। ছেলেটা বলেছিল, গোপন সোর্স থেকে কিছুক্ষণ আগে জানতে পেরেছে বিপুলদারা ওইখানটায় রোলের গাড়ি দাঁড় করাবে। বাগান করতে দেবে না। বাধা দেবে। বুকু সেদিন মিথ্যে কথা বলেছিল, অভিনয় করেছিল। বিতান নিদারুণ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বলল, কেবল অন্য একটা দলকে টাইট দেওয়ার জন্যে তোমরা এই বাগান করার গটআপ গেমটা খেললে! ছি! ছি! তোমরা মিথ্যেবাদী, শয়তান!
বিতানের রুদ্রমূর্তি দেখে বুকুর বন্ধুরা ভয়ে পিছিয়ে গেল। একটু দূর থেকে হাত জোড় করে রাজা বলল, না বিতানদা, না। বুকুর দিব্যি কেটে বলছি, ও আমাদের ওর বাগান করার ভাবনাটার সঙ্গে পুরোপুরি ইনভলভড্ করে ফেলেছিল। অপনেন্ট পার্টিকে টাইট দেওয়ার চেয়েও আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল ওই বাগানটা। বুকু আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল। সবুজ রঙের স্বপ্ন। বিশ্বাস করুন, বাগানটাকে নিয়ে আমরা আর একভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম। বিতানদা...
রাজা কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই ডুকরে কেঁদে উঠল।

বুকু ও পথ-উদ্যানের কাহিনী এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। একটি শখের বাগান ধ্বংস ও একটি অতি সাধারণ ছেলের মৃত্যুর পর সব কিছুর ইতি হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। পোস্টমর্টেম, পুলিশি এনকোয়ারি, উল্টোপাল্টা ধরপাকড়, খবরের কাগজের এক কোণে ছিটেফোঁটা সংবাদ, মনোহর দাসের দুঃস্থ পরিবারের ধ্বংসস্তূপে 'তপন (বুকু) দাস—আমরা তোমায় ভুলিনি, ভুলছি না' ইত্যাদি লেখাঙ্কিত শহিদ

বেদী নির্মাণ প্রভৃতি পর্বগুলোও একের পর এক ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, পুরো ঘটনাটার ওপর বিস্মৃতির ধুলোও জমতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। ঠিক এই সময় আজকের এই পড়ন্ত বিকেলে বিতান ওর অফিসের ঠিকানায় একটা রেজিস্ট্রি চিঠি পেল। কৃষ্ণনগর থেকে মুকুলিকা পাঠিয়েছে। মোটা কাগজের খামটার এক কোণে লেখা ঃ ফোটোস ডু নট ফোল্ড।

খামটা ছিঁড়ে মুকুলিকার চিঠি আর ছবিগুলো বের করে এনেই বিতানের মনে হল, পৃথিবীর কৌতুক বড় অদ্ভুত। তা বুঝতে পারার ক্ষমতা কারোর নেই। মানুষের স্মৃতি থেকে অতি দ্রুত যে ঘটনা ও যে মানুষটি মুছে যেতে বসেছে, বসুধা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। আশ্চর্যভাবে বুকু বেঁচে আছে এক টুকরো রঙিন ছবিতে। পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেটার অস্তিত্ব একেবারে মুছে যায়নি। বিতান স্তব্ধ হয়ে গেল। ছবির মধ্যে একটা পাতাবাহার গাছ হাতে নিয়ে বুকু দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে। ছবিটা দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না, এই ছেলেটা মাসখানেক আগে মারা গিয়েছে। বিতান নিজেই ভাবতে পারছে না।

কয়েকটা ফিল্ম বাকি ছিল বলে কলকাতায় ছবিগুলো প্রিন্ট করাতে পারেনি মুকুলিকা। কৃষ্ণনগরে ফিরে গিয়ে কাজটা শেষ করে কাকাকে ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে। মুকুলিকা যে সেদিনের অনুষ্ঠানের ছবি তুলেছিল, এই ঘটনাটাই বিতান ভুলে গিয়েছিল। বুকুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে-ঘূর্ণি কয়েকদিন ধরে চলেছে, তাতে সব কিছু ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। পুলিশ বিতানকে নিয়েই টানাহেঁচড়া করেছে বেশি। অরুণ ঘোষ ঠিকই বলেছিলেন। যেন সমস্ত দায় বিতানের। সুবলসখা হাত-পা ঝেড়ে ফেলেছেন। উনি কেবল মর্মাহত, ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ। ওঁর এই ব্যথা এবং ক্ষোভ কিসের জন্য এবং কার জন্য—বিতান এখনও বুঝতে পারেনি। ওর ক্লাবের সদস্যরা ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে—এইসব উট্‌কো ঝামেলায় বিতান নিজেকে আর জড়াবে না। সব মিলিয়ে ক'দিন ধরে বিতান ভেতরে ভেতরে গুম হয়ে আছে। আজ মুকুলিকার পাঠানো ছবিগুলো অন্য পৃথিবীর দরজা খুলে দিল।

ছবিগুলো একটা একটা করে নিবিড় মমতায় দেখে গুছিয়ে রাখল বিতান। তারপর ছবির সঙ্গে পাঠানো মুকুলিকার চিঠিটা মেলে ধরল চোখের সামনে ঃ

প্রিয় ছোট্‌কাকু,

তুমি কেমন আছ? ভেবেছিলাম এখানে ফিরেই তোমার একটা চিঠি পাব। এখনও পেলাম না। তুমি আজকাল ক্লাব ক্লাব করে সব ভুলে যাচ্ছ। আমার কিন্তু খুব রাগ হয়ে যাচ্ছে। আগেই বলে রাখি আমার চিঠি পাওয়া মাত্রই উত্তর দেবে।

তোমাদের সেই স্ট্রিট-গার্ডেন ওপেনিং-এর যে-ছবিগুলো তুলেছিলাম, সেগুলো পাঠালাম। অনেক দেরি হয়ে গেল। সব ক'টা ভাল হয়নি। তবে এম. এল. এ. মশাই গাছ লাগাচ্ছেন আর তুমি পাশে দাঁড়িয়ে আছ এবং বুকু নামের সেই দুষ্টু ছেলেটার ছবি—এই দুটো ভাল হয়েছে। পাতে দেওয়ার মতো। কম দামি ক্যামেরায় এর চেয়ে ভাল হওয়া মুশকিল। কাকু, আমি এইচ. এস.-এ ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলে একটা নিকন ক্যামেরা কিনে দেবে তো! তোমার চেলাদের ছবিগুলো দেখিও। ওরা নিন্দে

করলে কান মুলে দেবে কিন্তু। বিশেষ করে বুকুকে। ছেলেটা ভীষণ টকেটিভ। তবে প্রচণ্ড পরিশ্রমী। সেদিন অনুষ্ঠানের শেষে হঠাৎ আমাকে বলল, 'আপনাকে দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি আপনার মনটা সুন্দর কিনা তা প্রমাণ হবে যদি আলাদা করে আমার একটা ছবি তুলে দেন।' এমন পাজি! ওর ছবিটা অবশ্য খারাপ হয়নি।

বাবা-মা ভাল আছে। জেঠু ও জেঠিমাকে আমার প্রণাম দিও। বুম্‌দা, ঋতুদি ও টিটোকে আমার ভালবাসা জানাবে। তুমি ও কাকিমা আমার প্রণাম নেবে। ইতি—মুকুলিকা।

পুনশ্চঃ বুকুকে বলে দিও, যে-গাছটা হাতে নিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম ডাইফেনবেচিয়া ককেটাস। এর আরও অনেক প্রজাতি আছে। বইতে পড়লাম, এই গাছগুলো সহজে মরে না। অনেকদিন বাঁচে। বুকু গাছটার নাম জিজ্ঞেস করেছিল। সেদিন বলতে পারিনি। ওকে জানিয়ে দিও।— মু ◻

মেহগনি

অশ্বত্থতলার কাছাকাছি এসে বিনোদ বলল, আর একটু এগোলেই ডানহাতি রাস্তা। সেখেনে ঢুকে হাত কুড়ি যেতে হবে। ব্যাস, তারপরই আমরা একেবারে গিয়ে দাঁড়াব কিশোরী পালের বাড়ির দাওয়ায়। পালমশায়ের বাড়ির ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে গাছটা।

নিতাই হঠাৎ থমকে গেল। বাঁ-পাশের নিচু জমিটার সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, এইখেনে একটা কাঠবাদাম গাছ ছিল। বেশ মনে আছে। সরেস গাছ। সত্তর-আশি বছরের তো হবেই। বুঝলে বিনোদ ভায়া, আমি কিন্তু এসব জায়গায় আগে দু'-তিনবার এসেছি। আমার মনে আছে।

—তাহলে তো এ তোমার চেনা জায়গা। তুমি আর সতু এলেই হতো! কাজ হাসিল করে চলে যেতে পারতে। আমি এলুম ফালতু। বিনোদ হেসে বলল।

—তা কেন বাপু! জায়গা চিনলেই কি মানুষ চেনা যায়। আমি কি কিশোরী পালকে চিনি?

বিনোদ এই একটা ব্যাপার কিছুতেই ভেবে পায় না। নিতাই-এর মতো ধুরন্ধর করাত কলের মালিক কিশোরী পালের নাম শোনেনি! যারা গঙ্গার এপারে-ওপারে গাছ কেনা-বেচা করে, কাঠগোলার মালিক, তাদের কাছে কিশোরী পাল অচেনা থাকার কথা নয়। বিশেষত, পালমশাই যেখানে এমন একটি মহাবৃক্ষের মালিক।

অবশ্য বিনোদও এর আগে মানুষটিকে চিনত না। বলাগড়ের এক নম্বর রাজমিস্ত্রি আবেদ আলি পাইক পালমশাই-এর সন্ধান দিয়েছিল। নতুন স্কুলবাড়ির ভিতের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর জানলা-দরজা বানাবার কাজে হাত দিতেই হবে—বলেছিল আবেদ আলি। কেননা দেওয়াল ওঠানো ও ছাদ ঢালাই-এর সঙ্গে সঙ্গে জানলা-দরজার ফ্রেম বসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এতবড় কাজের জন্য পর্যাপ্ত কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে? এই অঞ্চলে এত রসদ কারও নেই। দ্বিতীয়ত, কলকাতা থেকে আনাতে গেলে চতুর্গুণ খরচ। গভর্নিং বডির তৃতীয় মিটিং-এ ঠিক হল, কাঠের জোগাড় এখান থেকেই করতে হবে। তৈরি কাঠ না পাওয়া গেলে, একটা ভাল জাতের গাছ কেনা হোক। তার থেকে কাঠ বের করে নেওয়া হবে। মিটিং-এ সাব্যস্ত হয়েছিল, এই কাজের ভার নেবে বিনোদ। আশপাশের অঞ্চল ঢুঁড়ে গাছ খুঁজে দেখা, দরদস্তুর করে কেনা, চেরাই করা, জলে রোদে ফেলে রেখে সিজনড্ করা—এসব কাজে তরুণ সদস্যের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। প্রথমে আপত্তি করেও বিনোদ নিমরাজি হয়েছে। মানুষের বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব জায়গায় গাছের সংখ্যা এমনিতেই কমে

গেছে। তার ওপর ভাল গাছ পাওয়া আরও দুষ্কর। এদিকে স্কুলের নতুন পাকা বাড়িটাকে এ অঞ্চলের অন্যতম প্রেস্টিজ ইস্যু করে তুলতে হবে। সেখানে যা-তা কাঠের জানলা-দরজা লাগালে চলবে না। সরকার যা টাকা স্যাংসন করেছে, তাতে ভাল জিনিস করার বাধা নেই। সরকারি টাকা চুরি না করলে সুন্দরভাবে সব কিছু করা যায়। টাকায় আটকাবে না, আসল সমস্যা একটা উঁচুদরের মহাবৃক্ষ।

কাজের ভার পাওয়ার পর থেকে বিনোদ বসে থাকেনি। একে-তাকে সুলুক-সন্ধান দেওয়ার জন্য বলেছে। কিছুদিন আগে বাঁশবেড়িয়ার নীলাম্বর খবর দিয়েছিল, আঁটপুরে দুটো সেগুন গাছ আছে। শরিকী ঝামেলায় গাছ দুটোর প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এই ফাঁকে ওগুলোকে হাতিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বলাগড় থেকে আঁটপুর কম দূর নয়। একই জেলার দুটো জায়গা—অথচ যোজনব্যাপী দূরত্ব। তবু সময় নষ্ট না করে বিনোদ দৌড়ে ছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কোর্টের মামলা। নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত গাছে হাত দেওয়া বারণ। অবশ্য গাছ দুটোও বিনোদের তেমন পছন্দ হয়নি। খুব একটা পুরুষ্টু নয়। বয়স কম। তবে সেগুন গাছ বলে কথা। এর গরিমাই আলাদা। আম, বাদাম, শিরীষ, জারুল প্রভৃতি গাছের খোঁজ দিয়েছে অনেকে। কিন্তু বিনোদের মন ভরছিল না। একটা দামি রাজকীয় গাছের প্রত্যাশায় দিন গুনছিল বিনোদ। কিছুটা যে-হতাশও হয়ে পড়ছিল—সে-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। একদিন তো গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট অঞ্চল-প্রধান কালিদাসবাবু বলেই ফেললেন, দেখো বিনোদ, গাছ খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে অরণ্যে রোদন না-হয়ে দাঁড়ায়। হাতে সময় বেশি নেই। যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলো।

ভাল গাছ পাওয়া যাবে না-র দ্বন্দ্বে বিনোদ যখন বেশ বিব্রত ঠিক সেই সময়ে আবেদ আলি কিশোরী পালের খোঁজ দিল। আবেদ মিস্ত্রি একটু অহংকারী লোক। কলকাতার বাগমারির বিহারী মুসলমান মিস্ত্রিদের কাছে কাজ শিখেছে বলেও একটু ডাঁট নিয়ে চলাফেরা করে। তবে লোক ভাল। বিনোদকে নিজের থেকেই বলেছিল, জিরাটের কিশোরী পালকে চেনেন! আগেকার দিনের লোক বাবু। বড় টেঁটিয়া আর মেজাজি। তাঁর বাড়ির হাতায় একটা মেহগনি গাছ আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। বুড়োকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন—গাছটা বেচবে কিনা। মেহগনির ওপর সবার লোভ। এ তল্লাটে ওই জিনিস আর দ্বিতীয় নেই। ইয়া তাগড়াই। শ'দেড়েক বছরের পুরনো তো হবেই। জানেন, আমি একবার ওকে গাছটা বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিনু। তা. বুড়ো তো এই মারে সেই মারে। এটা অবশ্য বছর পাঁচেক আগের কথা।...এখন মানুষটার রক্তের জোর আরও কমে গিয়েছে। আর গাছ আঁকড়ে থাকার বয়স নেই।

—বুড়োর ছেলেরা তো আছে। তারা এবার বাধা দেবে। বিনোদ অন্য সমস্যার দিকে আঙুল তুলে দেখাতে চেয়েছিল।

আবেদ আলি পাইক মুখে চুক চুক শব্দ করে বলেছে, বুড়ো একা মানুষ বাবু। ওঁর ছেলে-টেলেরা সব কলকেতায় থাকে। এখানে উনি একাই যক্ষের ধন পাহারা দিচ্ছেন। তা একবার গিয়ে কথা বলে দেখতে পারেন। দিলো দিলো, না-দিলো না-দিলো। কথা বলতে লোকসান নেই।

তখনই বিনোদ ঠিক করে নিয়েছিল, আগে একদিন গিয়ে বুড়োর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে আসতে হবে। প্রথমেই গাছ কিনতে আসার কথা ভাঙবে না। কাউকে না-জানিয়ে একদিন সকালে বিনোদ জিরাটে এসে নেমেছিল। স্টেশনের রিকশা-ওয়ালাদের জিজ্ঞেস করতেই ওরা বলে দিয়েছিল কিশোরী পালের বাড়িটা ঠিক কোথায়। বিনোদের অসুবিধে হয়নি।

বুড়ো সেদিন গামছা পরে উবু হয়ে বসে করাত-বঁটিতে খড় কাটছিল। ফণিমনসার বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ি। ইঁটের দেওয়াল, অর্ধেক খড়ের ছাউনি, অর্ধেক টালি। বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে সেই বিশাল গাছটা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে সোজা। বিনোদের লোভী চোখ দুটো চিক্ চিক্ করে উঠেছে।

কিশোরী পাল তখনও বুঝতে পারেনি, বেড়ার বাইরে বিনোদের উপস্থিতি। বিনোদ ইচ্ছে করেই বলেছিল, ও দাদু শুনছেন, আমি কিশোরী পালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি আছেন?

বৃদ্ধ স্থির চোখ দুটো তুলে বিনোদকে দেখেছিল। খড় কাটা বন্ধ রেখে বলেছিল সুরে, হ্যাঁ আছেন। আমিই কিশোরী পাল। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—ওহো। আপনি! নমস্কার। আজ্ঞে আমি বলাগড় থেকে আসছি। বিনোদ জোড় হাতে নমস্কার করে বলেছিল।

—অ। আসুন, ভেতরে আসুন। গামছার কসি শক্ত করে বেঁধে কিশোরী পাল ধীরে ধীরে উঠে এসেছিলেন। দাওয়ায় পাতা খেজুর পাতার চাটাইটাকে ঠিকঠাক করে দিয়ে বলেছিলেন, এখেনে বসুন। আমি হাতের কাজটা সেরে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলব। গরুগুলোকে এখনও জাবনা দেওয়া হয়নি।

যেন একজন সর্বজ্ঞ প্রবীণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে, জিরাট-বলাগড় অঞ্চলের অতীত ইতিহাসের খোঁজ নিতে এসেছে—এমন একটা ভাব করে কিশোরী পালের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল বিনোদ। বৃদ্ধ একটু অবাক হয়েই বলেছিল, তা, হ্যাঁ ভাই, আমার কথা আপনাকে কে বলল। আমি তো কারোর সঙ্গে বড় একটা মেলামেশি করি না।

—তাতে কী হয়েছে! ধরে নিন আমি আপনাকে খুঁজে বের করেছি, বিনোদ আন্তরিক সুরে বলেছিল।

কিশোরী পাল বিনোদের কথায় খুব একটা বিগলিত হয়নি। একটু সন্দেহ হয়তো থেকেই গেছিল। তবে মানুষটা অনেক পুরনো গল্পের পাতা মেলে ধরেছে। দাওয়ায় বসে গাছটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। কেবল ওর ডালপালা আর পাতার মর্মরধ্বনি ভেসে আসছিল।

বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে সেদিন একটা ব্যাপার বিনোদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তা হল, এই জমি-জমা-সম্পত্তির প্রতি ওর মমত্ব অনেক ক্ষয়ে গেছে। এসব ত্যাগ করে একদিন চোখ বুজতে হবে—এমন একটি ভাবনা পেয়ে বসেছে মানুষটাকে। গাছ কেনার কথাটা তবু সেদিন পাড়তে পারেনি বিনোদ। আজ বিনোদ জিরাটে এসেছে নিতাই আর সতুকে সঙ্গে নিয়ে। বিনোদ বুড়োকে প্রস্তাবটা দেবে। খুব ইনিয়ে-

বিনিয়ে। আবেদন-নিবেদনের ভঙ্গিতে। ও যখন কথাবার্তা বলবে তখন নিতাই আর সতু গাছটার মাপজোক করে নেবে। কী ভাবে এখান থেকে মেহগনিটাকে কেটে নিয়ে যাবে তার হিসেব করবে। কিশোরী পাল অবশ্য এসব টেরও পাবে না। ওরা কাজ সারবে নিশ্চুপে।

—বড় দামি কথা বললে তো!—জায়গা চিনলেই কি মানুষ চেনা যায়! বিনোদ হেসে নিতাইকে একটু তোল্লাই দিল।

—এরকম কথা আমার এস্‌টকে আরও আছে ভায়া। তোমায় একদিন শোনাব। আমার কাছ থেকে শুনে শুনে সতুও কত শিখে গেছে। তাই না রে সতু।

নিতাই-এর কথায় তাল মিলিয়ে সতু মাথা নাড়ল। এই ছেলেটা নিতাইবাবুর করাত-কলে হেলপারের চাকরি করে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ডানহাতি রাস্তায় ঢুকে এলো। বিনোদ চাপা উচ্ছ্বাসে আকাশের দিকে দেখিয়ে বলল, ওই যে কিশোরী পালের মেহগনি। ব্যাটা সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে। ওই যে, দেখো, দেখো।...তোমরা যেন কোনও গোল বাধিও না। কাজটা ভালয় ভালয় উদ্ধার হলে হয়। চলো...

কালিদাসবাবু বিনোদের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বললেন, কিছু মনে কোরো না ভাই, আজকের দিনে এসব কথা আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল না। কথায় কথায় এসে গেল। আসলে কি জানো, সেই যে কথায় আছে না—ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে—আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। কাজের লোকদের নিয়ে এই এক মুশকিল।

—না, না কালীদা, আমি কিছু মনে করিনি। একই চিন্তা, একই ভাবনা আমাকেও তো তাড়া করছে। বিনোদ শব্দ করে হেসে বলল, আমি এখনও হাল ছাড়িনি। মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত পেয়ে যাব।...আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, আজকে আসার জন্য কিশোরী পালকেও নেমন্তন্ন করে এসেছিলাম। দেখি আসে কিনা।

—তাই নাকি! বুড়োটাকে একবার দেখতে পারলে হতো!

—একটু বসে যান না! হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে।

—না ভাই, আমাকে একটু পরেই ব্যান্ডেলের দিকে যেতে হবে। কাজ আছে। অঞ্চল-প্রধানের বসে থাকার উপায় নেই। শুধু চরকির মতো ঘুরে বেড়াও।...ঠিক আছে, তুমি অন্যদের আদর-যত্ন করো।...খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি। দই-ইলিশের পদটা খুব জমে গেছে। এখন পেটে সইলে হয়! হাঃ হাঃ। পরে দেখা হবে। চলি।

কালিদাসবাবুকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল বিনোদ। আজ বিনোদের একমাত্র পুত্র-সন্তানের মুখে-ভাত। অন্নপ্রাশনের এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ও কিছু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ওর ব্লক অফিসের কলিগদের আর চেনা-জানা কয়েকজনকে বলেছে। সব মিলিয়ে শ'খানেক লোক। ওর পুত্রের শুভকামনা করে সবাই দু'মুঠো মাছ-ভাত খেয়ে যাবে—এইটুকুই বিনোদের আশা। আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠানটিকে যথাসম্ভব আন্তরিক করে তোলার চেষ্টা করেছে। একটু আগে দ্বিতীয় ব্যাচ খেয়ে উঠল। এই

ব্যাচেই কালিদাসবাবু নিমন্ত্রণ রক্ষা করে গেলেন। অনাড়ম্বর হলেও আনন্দে হইচই কম হচ্ছে না। সারা বাড়িটা উৎসবের চেহারা পেয়েছে। সবচেয়ে খুশি বিনোদের স্ত্রী। নাদুস-নুদুস ছ'মাসের শিশুটি এর-ওর-তার কোলে ঘুরছে। বিনোদের ঘরের কোণ ভরে উঠেছে পুতুল আর নানান উপহারে। ওর ছোট ভাই সকাল থেকে মাইক বাজাতে ব্যস্ত।

বারান্দা থেকে বিনোদ দেখতে পেল নিতাই আসছে। হাতে রঙিন কাগজে মোড়া স্টেনলেশ স্টিলের থালা। অন্নপ্রাশনের উপহার। বিনোদ খুশি হয়ে নেমে এসে বলল, তুমি এত দেরি করলে? সকাল সকাল এসে কোথায় একটু কাজে হাত লাগাবে, তা নয়...

নিতাই-এর মুখ বেশ গম্ভীর। ও শুকনো হেসে বলল, তোমার এখেনে কাজের লোকের অভাব নেই বাপু! তুমি মিছিমিছি...। কথা থামিয়ে নিতাই এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিশোরী পাল এসেছে? শালার বুড়ো...

—তুমি দেখছি এখনো রেগে আছো! এত অল্পে রাগ করলে চলে! বিনোদ হালকা সুরে বলল।

মুখ দিয়ে প্রবল ক্রোধে হুঁঃ করে শব্দ করল নিতাই। উপহারের থালাটার ওপরেই ঘুষি মেরে বলল, শালাকে দেখে নেবো।

সেদিনের ঘটনাটা নিতাই সত্যিই ভুলতে পারছে না। কিশোরী পাল তেড়ে অপমান করেছিলেন। বিনোদ এবং সতুকেও ছাড়েনি। কিন্তু সবচেয়ে গায়ে লেগেছে নিতাই-এর। ছেলের অন্নপ্রাশনে কিশোরী পালকে বিনোদ নেমন্তন্ন করেছে জেনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। বলেছিল, এরপরেও তুমি ওই লোকটার ছায়া মাড়াতে চাও! তোমার মানসম্মান নেই গা! বিনোদ ওকে শান্ত করার জন্য বলছে, লোকটার চেয়ে কিন্তু গাছটা বড়। কিশোরী পাল আর ক'দিন বাঁচবে, কিন্তু ওই মেহগনি গাছটা! ওটার কোনও বিকল্প নেই। ওটা আমার চাই। নিতাই আরও রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, ভায়া, তুমি আর গাছের দোহাই দিও না। আমার করাত-কলে বহু দামি গাছ ফালাফালা হয়েছে; এমন কী বার্মা টিক পর্যন্ত। সাবা বাংলা দেশে ওই বুড়োটারই কি একমাত্র মেহগনি আছে! তুমি আমাকে মাসখানেক সময় দাও, তোমাকে মেহগনির খবর এনে দেবো। মাস এখনও পেরোয়নি। নিতাই রাজবৃক্ষের খবর পেয়েছে কিনা বিনোদ জানে না। তবে ওর রাগ এখনও পড়েনি।

তিন মক্কেল সেদিন কিশোরী পালের বাড়িতে পৌঁছে মিনিট দশেক ভাল মানুষের পালায় অভিনয় করেছিল। পূর্বপরিচিত বিনোদকে দেখে বুড়ো কিছু ধরতে পারেনি। বরং ওদেরকে ন্যাতানো বিস্কুট আর মিইয়ে-যাওয়া সস্তা চানাচুব দিয়ে আপ্যায়িত করেছিল। বুড়োটার কতাবার্তা, ভাবভঙ্গি খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল নিতাই। এটা-সেটা ভনিতার পর বিনোদ বোমাটি ফাটিয়েছিল বেশ সশব্দে এবং আচমকা, কর্তামশাই, আমরা এসেছি আপনার ওই মেহগনিটি কিনতে। যদি অনুমতি করেন, তাহলে দর-দাম করে সব কিছু পাকা করে ফেলতে পারি। গাছটি আমাদের খুব দরকার আর কি!

বাজ পড়ার শব্দে মানুষ যেভাবে চমকে ওঠে, তেমনভাবে শিউরে উঠেছিল কিশোরী পাল। অদৃশ্য ত্রাসে কাঁপতে কাঁপতে পেছনে সরে গিয়েছিল। যেন অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় কিছু শুনেছে। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, তার মানে? তোমরা সব এইজন্য এসেছ!

বিনোদ জানত বুড়ো সহ্য করতে পারবে না। এক মুহূর্তে পাগল হয়ে যাবে। তবু প্রস্তাবটা না-রেখে উপায় ছিল না। লাথি-ঝাঁটার বিনিময়েও গাছটা চাই। যেন দাদুর সঙ্গে নাতি কথা বলছে, এমন সুরে বিনোদ বলেছিল, হ্যাঁ, কর্তামশাই। বলাগড় হাইস্কুলের পাকাবাড়ি উঠছে। মেহগনি কাঠের মজবুত দরজা-জানলা বসাতে হবে। আপনার গাছ ছাড়া ভিন্ন পথ নেই। আপনি সাহায্য করবেন না?

—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে। নইলে তোমায় গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতুম।...এ গাছ আমি বিক্রি করব না। মরে গেলেও না। তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ—যুক্তি দিয়ে বলতে পারবে কেন বিক্রি করব? একে নিয়ে আমার তো কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, এ আমার পিছনে কাঠিও দিচ্ছে না। তাহলে! তুমি তোমার ছেলেকে বিক্রি করতে পারবে। বৃদ্ধ মানুষটা এক নিঃশ্বাসে বলেছিল।

নিতাই হঠাৎ বিনোদের পাশে দাঁড়িয়ে ফোড়ন কেটেছে, ওরে আমার ছেলে রে! ওনার মানুষ-ছেলের দেখা নেই; গাছ হয়েছেন ছেলে! যত সব বুড়ো বয়সের ভীমরতি।

বৃদ্ধের রোদে-পোড়া-তামাটে মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। কিশোরী পাল এক ঝট্‌কায় এগিয়ে এসে নিতাই-এর বুকের কাছটায় খামচে ধরে বলেছিল, তুই কে, কে তুই! গাছের মর্ম তুই কী বুঝিস!

—ছাড়ুন ছাড়ুন। বুড়ো হাড়ে ভেল্‌কি দেখাতে এসেছে। গাছের মর্ম আমি বুঝি না! আমরা চোদ্দ পুরুষ ধরে করাতকল চালাচ্ছি—আমি জানি না।

—ও, তাই বল, তুই হলি গিয়ে গাছ-মারার জাত। মরা গাছের সদ্‌গতি করিস। শালা ডোম, চাঁড়াল কোথাকার! বেরো, বেরো।...এই চ্যাংড়াটাকে নিয়ে তুমি বেরিয়ে যাও। এক্ষুনি।

কিশোরী পাল নিতাই-এর সঙ্গে সতুকেও প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। সতু বেচারা চুপচাপ বসেছিল। সে ক্ষেপে গিয়ে বলেছে, আপনার চিতায় ওই মেহগনি জ্বলবে। ওদের দুজনকে চোখের ইঙ্গিতে শান্ত হতে বলে পুনরায় বিনোদ বৃদ্ধকে শুধিয়েছে, আপনি তাহলে সাহায্য করবেন না?

—না। না। লাখ টাকা দিলেও এ গাছ আমি বেচবো না। তোমরা যা পারো করে নেবে।

—ঠিক আছে, আমরা চলে যাচ্ছি। তবে একটু ভেবে দেখবেন। এই গাছ তো আর চিরদিন আপনি আগলে রাখতে পারবেন না। একদিন না একদিন এর গোড়ায় কুড়ুলের কোপ পড়বেই। একটা সৎ কাজে গাছটাকে দিলে পারতেন। আমরা উপযুক্ত মূল্য দিতাম।

অজানা ব্যথায় বুক চেপে বৃদ্ধ মাটিতে বসে পড়েছিল। কঁকিয়ে উঠেছিল এই বলে,

তোমরা বরং আমাকে খুন করে গাছটাকে উপড়ে নিয়ে যাও।
—হ্যাঁ, তাই যাবো। বিনোদ, চলো, চলো। তুমি আচ্ছা লোকের কাছে নিয়ে এসেছ ভাই। একেবারে জ্যান্ত শয়তান। শালাকে আমিও দেখে নেবো। নিতাই সেদিন চলে আসতে আসতে বলেছিল।
আজও সেই একই কথা বললে নিতাই। বিনোদ হাসল। বলল, বেলা হয়েছে। এই ব্যাচে খেয়ে নাও। ওসব দেখাদেখি পরে হবে।
—কিশোরী পাল আগে আসুক, তারপর বসব। দেখি, পালমশাই তোমার পলিটিক্সের ফাঁদে পা রাখে কিনা! তুমি ভেবেছ নেমন্তন্ন করে ওকে ভজাবে। সে গুড়ে বালি—এই বলে রাখলুম। মিষ্টি কথায় গাছ ও দেবে না। ছিনিয়ে নিতে হবে। তুমি দেখে নিও।
—আহা, লোকটা বড়ো একা। লোকজনের সঙ্গে না মিশে মিশে অমন একগুঁয়ে, অবুঝ হয়ে গেছে। তাই ছেলের ভাতে ডাকলুম, যদি আসে আনন্দ পাবে। বিনোদের গলা দিয়ে অল্প বেদনা ঝরে পড়ল।
কড়া চোখে বিনোদের দিকে তাকিয়ে ঢুকে গেল ভেতর-বাড়িতে।
কিশোরী পাল শেষ পর্যন্ত এলো না। নিতাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিনোদকে বিদ্ধ করেছে। চলে যাওয়ার আগে বলে গিয়েছে, গাছ চিনেছো, পাল চেনোনি। সারাদিনের অনুষ্ঠানের শেষে সবাই এখন ক্লান্ত। অবসন্ন। আত্মীয়স্বজনরা এখানে ওখানে নেতিয়ে পড়ে আছে। বিনোদের বারবার মনে হচ্ছে, সবই হল, কিন্তু কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে গেল। উঠোনে দাঁড়িয়ে বিনোদ সিগারেট ধরাল।
সন্ধ্যা নামতে আর বেশি দেরি নেই। আলো নিভে আসছে। এমন সময় সদরের সামনে একজন বেঁটে কালো মতন লোক এসে দাঁড়াল। বিনোদকে দেখে বলল, আমি পালমশয়ের কাছ থেকে আসছি। আমার নাম শশধর। পালমশয় বিনোদবাবুর খোকনের জন্য এটা পাঠিয়ে দেছেন।
বিনোদ এগিয়ে আসতেই একটা মুখবন্ধ চটের থলে ওর হাতে তুলে দিয়ে শশধর আবার বলল, তাঁকে এটা দিয়ে দেবেন। আমি বসতে পারব না। চোখে কম দেখি। আলো থাকতে থাকতে চলে যাই। পেন্নাম বাবু।
লোকটা চলে যেতেই থলের মুখটা খুলে ফেলল বিনোদ। ওর হাতে উঠে এল একটি মেহগনি গাছের ছোট্ট চারা। চারাটির গায় এক টুকরো কাগজ সুতো দিয়ে বাঁধা। ঝুলছে। তাতে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে লেখা : 'এ তোমার খোকনের বয়সী। একসঙ্গে দুটোকে বড় করে তোলো।'

শুকসনাতনতলার পাত্র

এমনভাবে কাউকে বিপাকে ফেলার লোক নন হিতুদা। ওঁর সময়জ্ঞান অসাধারণ। কথা দিয়ে কথা রাখাই হিতুদার জীবনের ব্রত। সেই মানুষটা এখনও কেন এসে পৌঁছচ্ছেন না! শিবাজী ক্রমশ অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের সবচেয়ে বড় ঘড়িটার নীচেই ও দাঁড়িয়ে আছে হিতুদার জন্য। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার ঘড়ি দেখল শিবাজী। তিনটে-চল্লিশ।

তার মানে সাড়ে তিনটে এবং তিনটে-পঁয়ত্রিশ মিনিটের ট্রেন দুটো চলে গেল। এর পরের গাড়িগুলোও যদি শিবাজী ধরতে না-পারে, তা হলে সেই সন্ধে নেমে যাবে। দিনের আলো নিভে যাওয়ার আগেই সে পৌঁছতে চেয়েছিল। হিতুদাও তেমনই পরামর্শ দিয়েছিলেন, দ্যাখ, বিকেল-বিকেল যাওয়াই ভাল। ঠিকানা দেখে বাড়ি খুঁজে বের করার ব্যাপার যেখানে আছে, সেখানে রাত করে গিয়ে লাভ কী? তার ওপর, এসব জানবি শুভকাজের প্রিলিমিনারি স্টেজ। সূর্যের আলো থাকতে থাকতে সেরে নেওয়াই ভাল। তুই কী বলিস!

শিবাজী মাথা হেলিয়ে হিতুদার সব কথা মেনে নিয়েছিল। উনি বাজে কথা বলার লোক—এটা কেউ বলবে না। অথচ সেই হিতুদাই শিবাজীকে আকণ্ঠ টেনশনে ভোগাচ্ছেন, দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এক বিশ্রী, অনিশ্চিত দোলাচলে। হিতুদার সঙ্গে গত বছর ব্যাঙ্কের হয়ে কম্পিউটার ট্রেনিং নিতে গিয়ে শিবাজীর আলাপ হয়েছিল। ওর চেয়ে বয়সে অন্তত পনেরো বছরের বড়। এখন পিকনিক গার্ডেন ব্রাঞ্চে আছেন। এক একজন মানুষকে হঠাৎ ভাল লেগে যায়। কেন লাগে, গুছিয়ে বলা যায় না। কোনও একটি বা দুটি গুণ কিংবা তার হৃদয়-স্পর্শ-করা ব্যবহার বুকের মধ্যে চকিতে আলোড়ন তোলে। মানুষটিকে তৎক্ষণাৎ আপন মনে হয়, মনে হয় কাছের। হিতুদার সঙ্গে শিবাজীর অন্তরঙ্গতার পিছনে এমনই কোনও একটা আবেগ হয়তো কাজ করে থাকবে। হিতুদার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা এখন পারিবারিক পর্যায়ে চলে গেছে। প্রায় আর কোনও আড়াল নেই। শিবাজী ওর জীবনের সমস্যাগুলোকে হিতুদার সামনে মেলে ধরে, হালকা হতে চায়। ওকে ভালবেসে ওর প্রবলেম নিয়ে কেউ একজন ভাবছে, সমাধান করার চেষ্টা করছে—এটা মনে হলেই শিবাজী স্বস্তির পরশ অনুভব করে দেহে মনে। এখন অনেক কিছুই ও হিতুদাকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারে না। এই যে আজ অলির জন্যে পাত্র দেখতে চলেছে, সেখানেও অন্য সবার চেয়ে হিতুদাকেই বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে শিবাজীর। অথচ তিনিই এখনও এলেন না।

অস্থির পায়ে দু'-তিনবাব পায়চারি করে শিবাজী ঠিক করে নিল, ও একাই যাবে। এই অবস্থায় বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। ফিরে গেলে বাবার উদ্বেগ

আরও বেড়ে যাবে, আরও গাঢ় হবে মায়ের দীর্ঘশ্বাস। আর সবচেয়ে কষ্ট পাবে অলি। ও মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু ওর বেদনাহত মুখে ফুটে উঠবে এই আকুতি—দাদা, আমি আর পারছি না রে। যা হোক একটা ব্যবস্থা কর। যেমনই হোক। এইভাবে হন্যে হয়ে কেন তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস! আমাকে এত ভালবাসিস কেন বল তো! এত ভালবাসিস বলেই তোর এত যন্ত্রণা।
অলি। বয়স ছাব্বিশ। বি. এ. অনুত্তীর্ণা। অতি সাধারণ দেখতে। রোগাটে গড়ন। তবে গায়ের রঙ ফরসা। ভাল নাম দীপাবলি। শিবাজীর একমাত্র বোন। গত দেড় বছর ধরে অলির বিয়ের চেষ্টা চলছে। এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসু কিছুই হয়নি। ছুটির দিনগুলোতে শিবাজীর কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অলির ছবি নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতা পাত্রপক্ষের বাড়ি বাড়ি ঘোরা। বিনয় আর কুণ্ঠায় কুঁকড়ে গিয়ে, শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে একটি সাধারণ মেয়ের সম্পর্কে মৃদু গুণগান করা। তারপর ক্ষীণ প্রত্যাশা অথবা গভীর হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসা। হয়তো শিবাজীর বিনীত ব্যবহারে প্ররোচিত হয়ে, কয়েকটি পাত্রপক্ষ অলিকে দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই আর দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করেননি। শিবাজী এক-একসময় রেগে গিয়ে ভাবে—অলিকে কী দেখে পাত্রপক্ষ পছন্দ করবেন? কী আছে অলির? একমাত্র উদারতাই অলিকে নতুন জীবনের ছাড়পত্র দিতে পারে। কিন্তু পাত্রপক্ষরা উদার হতে যাবে কোন কারণে! একটা কারণ তো থাকা চাই! শিবাজী আর ভাবতে পারে না। মাথা গরম হয়ে যায়। ও নিজের জৈব ইচ্ছেগুলোর টুঁটি টিপে ধরে। অলির বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত শিবাজী বিয়ে করবে না। করা উচিতও নয়। যদিও আগামী মার্চে ওর বয়স হবে তেত্রিশ। তবু শিবাজী মনে করে, ওর আগে বিয়ে হওয়া মানে অলিকে আরও অপমান করা। বেচারি এমনিতেই অদৃশ্য লাঞ্ছনায় মরমে মরে আছে।
হিতুদা আলাপের প্রায় গোড়া থেকেই অলির ব্যাপারটা জানেন। দাদা হিসেবে শিবাজীর জীবনে এটা যে একটা সংকট, তা আর হিতুদাকে বুঝিয়ে বলতে হয়নি। বিষয়টা জানার পর উনি বলেছিলেন, দুর বোকা, এতে ভেঙে পড়বি না। তোর বোনের বিয়ে একদিন না একদিন হবেই। চেষ্টা-চরিত্র করলে কেউ পড়ে থাকে না। তবে হ্যাঁ, হয়তো একটু দেরি হবে। ঠিক আছে, এবার থেকে তোর সঙ্গে আমিও যাব। শিবাজী ম্লান হেসে বলেছে, তা হলে তো খুব ভাল হয় হিতুদা। আপনি থাকলে একটু ভরসা পাব। পাত্রপক্ষ হয়তো গুরুত্বও দেবে। আমাকে একা দেখে অনেকেই এলেবেলে ভাবে।
শুকসনাতনতলার এই পাত্রপক্ষ, যাদের কাছে আজ শিবাজী ও হিতুদার যাওয়ার কথা, তাঁরা কাগজে নিজেদের বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে লিখেছিলেন, 'সুশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীই একমাত্র কাম্য। অসবর্ণও চলিবে। পাত্র (স. চ.) দাবিহীন। ছবিসহ যোগাযোগ করুন।' হিতুদাই প্রথমে উইক ডেজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলেন। তারপর শিবাজীর পার্ক সার্কাস ব্রাঞ্চে ফোন করে ওকে বলেছিলেন, শোনো, এই অ্যাডগুলো প্রথমেই অ্যাটেন্ড করা দরকার। বক্স নম্বর ধরে চিঠি চালাচালি নয়, একেবারে ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচের সুযোগ। তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের ভিড় বাড়ার আগেই যেতে হবে। পাত্রপক্ষ ক্লান্ত ও বিরক্ত

হওয়ার আগেই। বুঝেছ! হিতুদা কথা শেষ করেই হেসে ফেলেছিলেন। শিবাজীও হেসেছিল। কিন্তু ওর হাসিতে কোনও প্রাণ ছিল না। বরং নিজের বাবার মুখটা ওর চোখের সামনে আবছা ভেসে উঠেছিল।

প্রথম দিকে বাবাই এইসব যোগাযোগের কাজটা শুরু করেছিল। শিবাজী ব্যাপারটায় তখনও এতটা গুরুত্ব দেয়নি। আসলে ওর কোনও ধারণাই ছিল না। ছিটেফোঁটা শ্রী নিয়ে জন্মানো একটি মেয়ের বিয়ে হওয়া যে কত কঠিন, কত জটিল এক প্রক্রিয়া, তা আজ আর শিবাজীর কাছে অজানা নেই। অলির ছবি নিয়ে এর-তার দ্বারে-দুয়ারে হাঁটাহাঁটি করতে করতেই দেড়টা বছর চলে গেল। ভাবা যায়। আগে আগে রবিবারের পাতা জোড়া বিজ্ঞাপনগুলো দেখে বাবা টিক মারত লাল স্কেচ পেন দিয়ে। তারপর চিঠি লেখালেখি। পাত্রপক্ষের উত্তর এলে বাবা মেয়ের ছবি নিয়ে হাজির হত তাঁদের বাড়ি। শিবাজী দেখত, পাত্রপক্ষ ডাকযোগেই অলির ছবি পাঠাতে বলত। কিন্তু বাবা নিজেই যেত। বাবার যুক্তি ছিল, সাধারণ ডাকে পাঠালে অলির ছবিটা তো নাও ওঁদের হাতে পৌঁছতে পারে। অন্য দিকে রেজেস্ট্রি করতে একগাদা খরচ। আবার পাত্রপক্ষ অলির ছবিটা যদি ফেরত না পাঠায়! যদি অকারণে রেখে দেয় কিংবা অবজ্ঞাভরে ফেলে দেয়! তার চেয়ে নিজে গিয়ে একবার দেখিয়ে নেওয়াই ভাল! রিটায়ারমেন্টের পর বাবার শরীরটা আরও নড়বড়ে হয়ে গেছে। ভিড় বাসে-ট্রামে ওঠার ধকল বাবা আর সহ্য করতে পারে না। তবু বাবা যেত। এইভাবেই চলছিল। যদিও কোনওখান থেকে অলির জন্যে কোনও সুখবর বাবা নিয়ে আসতে পারেনি।

একদিন অনেক রাত্রে, বাড়ির সকলকে নিদারুণ উদ্বেগের মাঝখানে রেখে, বিড়লাপুরের এক পাত্রের বাড়ি থেকে ফিরে এসে বাবা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। শিবাজী হতচকিত হয়ে গেছে। অলি বিমূঢ়। মা কান্না-ধরা গলায় বারংবার বাবাকে জিজ্ঞেস করছিল, ওগো, এমন করছ কেন? কী হয়েছে, বলবে তো! বলো না, আমাকে বলো!

কান্না থামিয়ে বাবা অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল। তারপর অলি ওর সামনে থেকে সরে যেতেই শিবাজীকে বলেছিল, বাবলু, আমি আর পারছি না রে! মেয়েটা এত পোড়াকপালি যদি জানতাম...। আমার পক্ষে আর এত অপমান সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। এবার তুই একটু সময় করে যোগাযোগগুলো করবি, বাবলু?

কথা বলতে বলতে পকেট থেকে অলির ফোটো-রাখা ঘামে-ভেজা খামটা বের করে শিবাজীর হাতে দিয়ে বলেছিল, দ্যাখ, যদি কিছু করতে পারিস।

অলির রঙিন ছবিটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে শিবাজী জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি অপমানের কথা বলছ, কিন্তু কীসের অপমান? কে তোমাকে অপমান করল!

একটু গলা চড়িয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বাবা বলেছিল, বাবলু, সব তো তোদের বলি না। এক-একটা জায়গায় এক-একরকম অভিজ্ঞতা। বলতে পারিস, কোনওটাই খুব মধুর নয়। আজ পর্যন্ত যতগুলো বাড়িতে গেছি, কেউই অলির ছবি দেখে সন্তুষ্ট হয়নি। পাত্রপক্ষের চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি, আশা নেই। ওঁদের পছন্দ হয়নি। আর আজ

যাঁদের বাড়ি গেছিলাম, তাঁরা মস্ত বড়লোক। বাড়ির কর্তা আগে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। এম. এল. এ. হওয়ার জন্যে ভোটেও নাকি দাঁড়িয়েছিলেন। পাঁচ ছেলে। সবাই ব্যবসা করে। পাত্র সবার ছোট। তা ছেলের বাবা অলির ছবিটা একঝলক দেখে, নাক কুঁচকে বললেন, আমরা তো বিজ্ঞপনে লিখেই দিয়েছিলাম, পরমাসুন্দরী ছাড়া যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। আপনি কেন এভাবে সময় নষ্ট করতে এসেছেন? এই মেয়েকে আমি পুত্রবধূ করব! আপনি এটা ভাবলেন কী করে? আমি আর আপনার সঙ্গে একটা বাক্যও ব্যয় করব না। আসুন। নমস্কার।

—বড়লোক দেখেও কেন তুমি সেই বাড়িতে ঢুকতে গেলে? সদর দরজা থেকে চলে এলেই পারতে! মা ককিয়ে উঠে বলেছিল।

—চুপ করো! কোথায় বড়লোক! কীসের বড়লোক। গরিব, গরিব! একেবারে পুওর। ওদের হৃদয় বলে কিছু আছে? যার হৃদয় নেই, তাকে বড়লোক বলছ কী করে? ছিঃ, ছিঃ। হ্যাঁ রে, বাবলু, অলিকে দেখতে কি খুব খারাপ! কুৎসিত! বিয়ে হওয়ার অযোগ্য! তুই বল।

অলির ছবিটা তখনও ওর আঙুলে ধরা ছিল। বাবার তীব্র আকুতিতে শিবাজীর বুকের ভেতরটা কেঁপে গেছে। ও আর একবার বোনের ছবিটায় চোখ বুলিয়েছিল সমস্ত চেতনা দিয়ে। সেই মুহূর্তে ওর মনে হয়েছিল, বোনটিকে সাধারণ দেখতে ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন একটা অদৃশ্য সৌন্দর্য লগ্ন হয়ে আছে। অন্তত এই ছবিতে। কিন্তু সেটা ঠিক কোথায় শিবাজী বলতে পারবে না। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের রেইনবো স্টুডিওর মালিক অধীরদা খুব যত্ন করে অলির ছবিটা তুলে দিয়েছিলেন। ছবিটার মধ্যে কোথাও স্টিফনেস নেই। ভীষণ ন্যাচারাল। অলির চোখ দুটো অদ্ভুদ অতলান্ত, ওকে সামনাসামনি দেখলে কিন্তু মনে হয় না। ভিজে ভিজে খামের মধ্যে ছবিটা ঢুকিয়ে রেখে শিবাজী বলেছিল, বাবা, তুমি অযথা উত্তেজিত হয়ো না। ঠিক আছে, তুমি কদিন বিশ্রাম নাও। আমি দেখছি। দেখি, কতদূর এগনো যায়।

শিবাজী অস্বীকার করবে না যে, প্রথমে ও একটু হালকাভাবে ব্যাপারটা নিয়েছিল। কিন্তু তিন-চারটে পার্টিকে ফেস করার পরই ওর ধারণা বদলাতে শুরু করে। শিবাজী অতি দ্রুত বুঝতে পেরেছিল, বাবার যন্ত্রণার তীব্রতা। এইভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার পেছনে কত বড় আঘাত পেতে হয়েছে বাবাকে। ইদানিং অলির কথা ভেবে ভেবে বাবার শরীর আরও খারাপ হয়ে গেছে।

অভিজ্ঞতা শিবাজীরও কম হল না। কেউ ওকে সামনাসামনি অপমান করেনি ঠিকই, কিন্তু কুয়াশার মতো একটা সূক্ষ্ম অপমানের মধ্যে দিয়ে নিয়ত পথ চলতে হচ্ছে। একজন পাত্র তো অলির সম্পর্কে কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে শিবাজীকে বলেছিল, পার্ক স্ট্রিট বা এস্‌প্ল্যানেডের কোনও রেস্টুরেন্টে বসে আপনার বোনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। সাম প্রাইভেট টক। যেখানে সেখানে বলা যাবে না। সো, আই ওয়ান্ট এ সলিটারি প্লেস। উড ইউ প্লিস অ্যারেঞ্জ ইট!

আর একটি ছেলের বাবা শিবাজীকে গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, দেখুন ভাই, লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না। আজকাল যে কোনও ম্যাট্রিমনিয়াল ইভেন্ট অনেক টানাপোড়েনের পর পাকা হয়। অনেকটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বিজনেসের মতো! তা যেটা

বলছিলাম, আপনার বোনকে আমাদের তরফ থেকে কমপক্ষে পাঁচবার দেখতে যাওয়া হবে। তার মানে আমি, আমার স্ত্রী বা ছেলেই পাঁচবার যাব তা নয়। ছেলের মামারা, মাসি, কাকা, পিসি, বন্ধু-বান্ধব সব মিলিয়ে ওই পাঁচ-ছ'বার হবে আর কি! তারপর সবার মতামত নিয়ে মেয়ে পছন্দের ব্যাপারটা ফাইনাল হবে। এবং এরপরে দেওয়া-থোওয়ার কথা। আপনি কী করতে চান চিঠি দিয়ে জানাবেন ভাই। অযথা দেরি করবেন না। তাতে আপনাদেরই ক্ষতি।

লাভ-ক্ষতি নিয়ে শিবাজী আজকাল আর তেমন ভাবে না। অলির জন্যে পাত্র দেখার কাজটাকে ও রুটিন-ওয়ার্কের মতো করে নিয়েছে। নানা ঔৎসুক্য নিয়ে এবং দয়া করে যারা অলিকে দেখতে আসে, তাঁদের সামনে বোনটি এখন আর আড়ষ্ট হয়ে থাকে না। ওর কাছেও বিষয়টা ক্রমশ যেন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

পর্ব-পর্বান্তরের এই সব করুণ কাহিনী হিতুদার অজানা নয়। শিবাজী ওঁকে সবই বলেছে। তবু হিতুদা এখনও কেন আসছেন না! আর সাত মিনিট বাকি আছে পরবর্তী গাড়িটা ছাড়তে। শিবাজী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। ও একাই যাবে। হিতুদার জন্যে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। হয়তো জরুরি কোনও কাজে অথবা কোনও বিপদে ফেঁসে গেছেন মানুষটা। গতকালের আগে শিবাজী জানতে পারবে না। এখান থেকে ব্যান্ডেল অথবা বর্ধমান লোকালে চন্দননগর। চন্দননগরে নেমে রিকশা করে শুকসনাতনতলা। তারপর বাড়ি খোঁজাখুঁজি। প্ল্যাটফর্মের দিকে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে শিবাজীর মনে হল, এই হেমন্তের অপরাহ্ণে আর একটা নিষ্ফল যাত্রায় সে একা চলেছে। হিতুদার মতো মানুষও ওকে সঙ্গ দিলেন না।

বারবার ভিতু চোখে দরজার দিকে শিবাজীকে তাকাতে দেখে ব্রজগোপালবাবু শুকনো হেসে বললেন, আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন। ওরা এদিকে কেউ আসবে না। আসতেও পারবে না। আপনি আরাম করে বসুন। আরে, চা-টা খান! জুড়িয়ে গেল যে!

শিবাজী তবু আশ্বস্ত হতে পারল না। কুকুরগুলো এখনও থেকে থেকেই নানা আওয়াজ করে চেঁচাচ্ছে। ঘেউ ঘেউ শব্দগুলো অদ্ভুত সব ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে বুকের ভেতর পর্যন্ত। প্রায় কুড়ি পঁচিশটা কুকুর। সব ক'টাই নেড়ি। হয়তো মিশ্রজাতের দু'-একটা থাকলেও থাকতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে তেতলায় এলে ডান-হাতি আর বাঁ-হাতি দুটো ঘর। ডান দিকের ঘরের পিছন ও পাশে ছাতের যে-অংশটুকু, সেখানেই ওই অতগুলো নেড়ি স্রেফ ছেড়ে রাখা আছে। বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন বয়সের। দরজায় বেল টেপার পর থেকেই ওদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল শিবাজী। কিন্তু তখনও কিছুই ধারণা করতে পারেনি। ব্রজগোপালবাবু সন্তর্পণে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করেছেন, কী চাই?

ভদ্রলোকের জিজ্ঞেস করার ধরন, ওঁর অদ্ভুত মুখের ভাব এবং অনেকগুলো কুকুরের চিৎকারে শিবাজীর তখন থেকেই কেমন যেন ভয় ভয় ধরে গেছে। থতমত খেয়ে, দ্বিধাগ্রস্ত গলায় শিবাজী ওর আসার উদ্দেশ্য বলেছিল। ব্রজগোপালবাবু কয়েক মুহূর্ত একটু ভেবে বলেছেন, অ, আসুন। উপরে আসুন।

সিমেন্টের চটাওঠা, অপরিষ্কার, খাড়াই সিঁড়ি দিয়ে ব্রজগোপালবাবু একটু হেলতে-

দুলতে উঠছিলেন। তিন-চারবার হাঁটুর কাছটায় খামচে-খামচে ধরেছিলেন, শিবাজী দেখেছে। ওঁর পেছন পেছন নিঃশব্দে উঠতে উঠতে কুকুরগুলোর বীভৎস কনসার্ট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। দুটো ঘরের সামনের প্যাসেজটায় পা রেখেই শিবাজী আতঙ্কে চমকে গেছে। ও আর এক পা-ও এগোতে পারছিল না। ব্রজগোপালবাবু ঘরে ঢুকে গেছিলেন অভ্যাসবশে। হঠাৎ ওঁর খেয়াল হয়েছে, শিবাজী ঢোকেনি। বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, চলে আসুন, চলে আসুন। ওরা কিচ্ছু বলবে না। একটু চেঁচায় নতুন লোকজন দেখলে। রাস্তার কুকুর তো! ব্যাটাদের স্বভাব গেল না! আহাঃ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

পা টিপে টিপে শিবাজী ঘরের দরজার কাছে এসেছিল। যদিও ছাদের গায়ে প্যাসেজটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা মাঝারি মাপের গ্রিলের দরজা তালা দিয়ে বন্ধ করা আছে, তবুও শিবাজীর সাহস হচ্ছিল না ওইটুকু রাস্তা পেরিয়ে আসতে। মনে হচ্ছিল, ক্ষিপ্ত কুকুরগুলো যে কোনও মুহূর্তে লাফিয়ে এসে ওকে ক্রমান্বয়ে কামড়াতে শুরু করবে। ওকে একটা রক্তাক্ত মাংসের তাল বানিয়ে ফেলবে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। এতগুলো নেড়ি কুকুর তেতলায় এল কী করে! কেনই বা এদের এই ছাদে বন্দি করে রাখা আছে! রাস্তাতেও এতগুলো একসঙ্গে দেখা যায় না!

দমবন্ধ করে ঘরে ঢুকেই শিবাজী সন্ত্রস্ত গলায় জানতে চেয়েছিল, কুকুরগুলো কি আপনাদের পোষা?

ব্রজগোপালবাবু অকারণে হেসে উঠেছিলেন। নোংরা একটা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা, গায়ে আধময়লা, সেলাই খোলা ফতুয়া, চোখে হাইপাওয়ারের সেকেলে চশমা, একটু ঢ্যাঙা টাইপের ব্রজগোপালবাবু বলেছিলেন, তা পোষাও বলতে পারেন, নাও বলতে পারেন। রাস্তা থেকে সব তুলে এনেছি। বুঝলেন, একেবারে পাতি নেড়ি। একেবারে হাভাতে। যতক্ষণ ভাত, ততক্ষণ কাত। আপনার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবে। খাওয়া বন্ধ করে দিন, দেখবেন আবার আঁস্তাকুড়েয় পালিয়ে গেছে। এগুলো হচ্ছে সব আধা-বেইমান জাতের কুকুর।

এত সব শিবাজী জানতে চায়নি। মুখে লালা ভরে এলে যেমনভাবে লোক কথা বলে তেমনভাবে ব্রজগোপালবাবু বলছিলেন, তবে এদের আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না ভাই। বড্ড উপকারী। আমার চতুর্দিকে যা শত্রু। এরাই আমাকে নানাভাবে প্রোটেকশন দেয়। দে আর মাই বডিগার্ড। মাই রিজার্ভ ফোর্স। আমার পেছনে লাগতে কেউ সাহস পায় না।...আপনি একটু বসুন। আমি দোতলায় খবর দিয়ে আসি।

খুব অবাক হয়ে ব্রজগোপালবাবুর দিকে শিবাজী তাকিয়েছিল। কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছিল সমস্ত চেতনা। ব্রজগোপালবাবু চলে যাচ্ছেন দেখে মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেয়ে শিবাজী ভয়ার্ত গলায় বলেছিল, দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

—না, না-না। আপনি বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি। আমার মেয়ে বুলিকে একটু বলে আসি। সে-ই এ বাড়ির গার্জেন। আমি তো আবার বিপত্নীক। মেয়েটাকেই সব দেখাশোনা করতে হয়। বুঝলেন না!

হয়তো ব্রজগোপালবাবু পাঁচ মিনিটের জন্যে নীচে গিয়েছিলেন। কিন্তু শিবাজীর মনে

হচ্ছিল অনন্ত যুগ। ঘরের চারদিকটায় এক ঝলক তাকিয়ে ও দেখেছিল, ঘরটায় ঝুলকালির শ্রীহীন রাজত্ব। দেওয়ালে দু'বছর আগের বিবর্ণ ক্যালেন্ডার। সিপিয়া কালারের কোনও এক পারিবারিক মহিলার যৌবনের ছবি ট্যারাবাঁকা হয়ে ঝুলছে। আঠা দিয়ে লাগানো রঙিন কাগজের ছেঁড়া শিকলের স্মৃতিচিহ্ন বাঁ-পাশের দেওয়ালে, জানলায়। ঘরে একটা সিঙ্গল খাট। দুটো কাঠের চেয়ার। একটা পড়ার টেবিল। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত বই। পুরনো খবরের কাগজ। একগোছা অকেজো ডটপেন। দু'তিনটে রাবারের গ্লাস-ম্যাট। আর একটা কেমন যেন সোঁদা সোঁদা গন্ধ। রোদহীন বর্ষাকালে যেমন গন্ধ শিবাজী ওদের বাথরুমে পায়। কুকুরগুলোর অবিরাম চিৎকারে চোখের দৃষ্টিও বারংবার কেঁপে গেছে। শিবাজী ভাবছিল, হিতুদা না-এসে ভালই হয়েছে। উনি হয়তো এই সব অ্যাবনরমাল ব্যাপার দেখে ব্রজগোপালবাবুর মুখের ওপর দুটো কথা বলে দিতেন।

নীচ থেকে ফিরে এসে ব্রজগোপালবাবু প্রথমেই বলেছেন, পাত্রী আপনার কে হয়? বোন নিশ্চয়ই। মেয়ের ছবি এনেছেন?

একটু ইতস্তত করে বুক পকেটে হাত রেখে ঢোক গিলে শিবাজী বলেছে, হ্যাঁ, এনেছি।

—ওয়েল। কই দেখান দেখি! ব্রজগোপালবাবু হাত বাড়িয়েছেন। ওঁর মুখে কোনও ভাবান্তর দেখেনি শিবাজী। অলির ছবিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলেছেন, বাঃ বেশ লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। তবে আমার পছন্দ তো শেষ কথা নয়। আমার ছেলে বিলু যা বলবে সেটাই হবে। বুঝলেন না, বিয়ে তো আমি করব না। হাঃ হাঃ। দাঁড়ান, বুলিকে ডাকি। ওকে ছবিটা দেখাই। বুলি, বুলি...। ব্রজগোপালবাবু প্যাসেজের ওপাশটায় গিয়ে মেয়েকে ডেকেছেন।

শিবাজী আবিষ্কার করেছিল, ভদ্রলোকের ছেলে ও মেয়ের ডাকনাম বিলু ও বুলি। ভাল নামগুলো কী? জানতে ইচ্ছে করছিল। যদিও ছাদে ছেড়ে রাখা সেই মূর্তিমান শয়তানগুলোর উপস্থিতি ওকে একদমই স্বস্তি দিচ্ছিল না।

কয়েক মিনিট পরেই বুলি এসেছে। কানের দু'পাশে স্কুলের মেয়েদের মতো বেণী দোলানো। বাবার মতো লম্বাটে চেহারা। দেখতে মন্দ নয়। রঙটা একটু চাপা হলেও চোখ-নাক তীক্ষ্ণ। ক্ষণিক মুগ্ধতা আদায় করে নিতে পারে। মুখে সকৌতুক অভিব্যক্তি। বুলির ডান হাতে বিস্কুট সহ চায়ের কাপ-প্লেট।

—এই নিন। বুলি চাপা হেসে বলেছে।

হাত বাড়িয়ে কাপ প্লেটটা নিয়ে শিবাজী টেবিলে নামিয়ে রেখেছিল। ব্রজগোপালবাবু ছবিটা আলতো করে মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে জানতে চেয়েছেন, তোর দাদা এসেছে?

—রামু ডাকতে গেছে বাবা। এক্ষুনি এসে পড়বে। বুলি ছবিটার দিকে তাকিয়ে যন্ত্রের মতো বলেছে।

—ওঃ, ক্লাব ক্লাব করেই ছেলেটা পাগল হয়ে গেল। উনি তো আবার কলকাতায় ফিরবেন, না কি! ব্রজগোপালবাবু নাকের পাটা ফুলিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

বেণী দুলিয়ে দৌড়নোর ভঙ্গিতে বুলি ছবিটা নিয়ে কয়েক মিনিট আগে নীচে চলে গেছে। শিবাজী এখনও চায়ে চুমুক দিতে পারেনি। তির্যক চোখে ওকে একবার দেখে ব্রজগোপাল আবার বললেন, আপনি জল খাবেন কি? চা-টা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কাপ-প্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে শিবাজী সামান্য রুক্ষ গলায় বলল, আপনারা এখানে বহু বছর আছেন, তাই না?

—তো আর বলতে! এ বাড়ি আমার ঠাকুরদার হাতে করা। স্বর্গীয় নন্দগোপাল ঘোষ। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁর আমলে দোতলা পর্যন্ত ছিল। আমার বাবা ঈশ্বর ননীগোপাল ঘোষ রেলে চাকরি করতেন। তিনি এই তেতলা ওঠান। এসব কি আজকের কথা!

—আমার বোনের সম্পর্কে আর কিছু জানতে চান! কিংবা আমাদের ফ্যামিলি...।

—আরে না, না। আপনি তো সবই প্রায় বললেন। কথা পাকাপাকির পর্যায়ে গেলে, আর কিছু যদি জানার থাকে জেনে নেব।

—ছাদের এই দুটো ঘরে আপনি থাকেন? শিবাজী স্থির চোখে জিজ্ঞেস করল।

—আপাতত আমিই থাকি। পাশের ঘরটা মোর-অর-লেস খালি পড়ে আছে। বর্ষাকালে কুকুরগুলোকে ওই ঘরটায় ঢুকিয়ে দিই। তবে বিলুর বিয়ের ঠিক হলে এই ঘর দুটো ওকেই ছেড়ে দেব। বউ নিয়ে এখানে নিরিবিলিতে থাকতে পারবে। আমি আর বুলি তখন পুরো দোতলাটায় চরে বেড়াব।

চমকে উঠল শিবাজী। তিনতলার এই ঘর দুটো মানেই ওই একপাল কুকুরের সঙ্গে নিয়ত বসবাস। যাদের একটা কামড়েই জলাতঙ্কের বীজ অলির শরীরে ঢুকে যাবে। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হলেই মৃত্যু অবধারিত। পাগল ও হৃদয়হীন ছাড়া আর কেউ এ বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দেবে না। শিবাজী নিশ্চিত। সামান্য অবাক হয়ে ও জানতে চাইল, আপনাদের এক তলাটা?

ব্রজগোপালবাবু চোখ বড় বড় করে দাঁতে দাঁত ঘষে একটু নীচু স্বরে বললেন, ওটা বেদখল হয়ে গেছে। একটা বজ্জাত, হারামি ভাড়াটে একুশ বছর ধরে একতলাটা ভোগ করছে। বিনা ভাড়ায়। আমিও মামলা ঠুকে দিয়েছি। দেখি, ব্যাটারা কদ্দিন অত্যাচার করতে পারে। ভাড়াটেটার লক্ষ ছিল কী জানেন, এই তেতলার ছাদটাও অকুপাই করবে। যেদিন আমি টের পেলাম ভাই, সেদিন থেকেই একটা দুটো করে রাস্তার কুকুর আনতে শুরু করলাম। এবার আয় শালারা, দেখি এটার দখল নে! হুঁহুঁ, আর সাহস নেই। ন্যাজ গুটিয়ে প্যালিয়েছে। শুধু ওরা কেন, পাড়ার মস্তানেরাও এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসে না।

মুহূর্তে শিবাজীর মনে পড়ল, ব্রজগোপালবাবু একটু আগে বলেছিলেন, আমার চতুর্দিকে যা শত্রু! মুখ নীচু করে শিবাজী বসে রইল। ওর আর ভাল লাগছে না। ভাড়াটেদের টাইট দেওয়ার জন্য কেউ একগাদা রাস্তার কুকুর পুষতে পারে—এমন অভিজ্ঞতা একেবারে অবিশ্বাস্য। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অপ্রকৃতিস্থ। কিন্তু ওঁর ছেলে মেয়েরা এমন হাস্যকর অথচ মৃত্যুর সামিল একটা ব্যবস্থাকে কেন মেনে নিয়েছে? যেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, সেখানে সুস্থতার হাওয়া বইছে, একথা একটা বাচ্চা ছেলেও বিশ্বাস করবে না। এঁরা যদি অলিকে পছন্দও

করেন, শিবাজী এ বিয়েতে রাজি হবে না। সব জেনেশুনে পারবে না অলিকে মৃত্যুর মুখে সঁপে দিতে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর ব্রজগোপালবাবু বললেন, বুঝলেন, যে আমার ছেলের বউ হয়ে আসবে, তার কাছে আমার একটাই প্রত্যাশা। এই সংসারটাকে একটু গুছিয়ে সুন্দর করে তুলবে। আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। বুলির একার পক্ষে সব করা হয়ে ওঠে না। তার ওপর মেয়েটা একটু আদুরে টাইপের। বউমাকেই আবার সব গড়ে নিতে হবে। আর একটা জিনিস চাইব। বুঝলেন, আমার ওই কুকুরগুলোকে সে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেবে। একটু ভাল-টালো বাসবে। এই আর কী! আর কিছু নয়!

সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তীব্র আতঙ্কে। ও যেন চোখের সামনে দেখতে পেল, নবপরিণীতা অলি একটা সান্‌কিতে কিছুটা ভাত নিয়ে ওই শ্বাপদগুলোর জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। বোনটির কপালে লাল রঙের বড় টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে শাঁখা-লোহা আর চুড়ির রিন-রিন শব্দ। পায়ে অলক্তকের কারুকার্য। কুকুরগুলোর কাছে অলি আগন্তুক। এমন দেহপ্রতিমার সঙ্গে ওদের কোনও পরিচয়ই নেই। ওরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অলির ওপর। ভাতের বদলে অলিই এখন ওদের খাদ্য। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা বোনটিকে নিঃশেষ করে দিল। কয়েকটা হাড়গোড় বাদে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কেবল অলির শাড়ির একটা টুকরো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নিরুদ্দেশের পথে চলে গেল। আচমকা শিবাজী তীব্র বেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখন আসি। দয়া করে আমার বোনের ছবিটা যদি ফেরত দেন...।

---সে কী। আর একটু বসুন ভাই। বিলুই তো এখনও এল...।

ভদ্রলোক কথা শেষ করার আগেই বিলু ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে। শিবাজীর হঠাৎ মনে হল, বিলু হয়তো ওই প্যাসেজটায় দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। ওদের কথা শুনছিল নিজের অস্তিত্বকে লুকিয়ে রেখে।

বিলুকে দেখে সামান্য চমকে উঠে ব্রজগোপালবাবু বললেন, এই যে এসে গেছে। নিন, আপনি কথা বলুন।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ব্রজগোপালবাবু তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল শিবাজীর কাছে। ওর সঙ্গে ছেলের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভদ্রতাটুকুও ব্রজগোপালবাবু করলেন না। শিবাজী দেখল বিলুর চোখে-মুখে বিরক্তি। ভুরু কুঁচকে আছে। অস্বস্তি কাটাতে বিলু দাঁত দিয়ে নখ কাটছে। বাবা, এমন কী বোনের তুলনায় বিলুর হাইট বেশ শর্ট। দেখতেও অন্যরকম। হয়তো বিলু ওর মায়ের বংশগতি বহন করছে। বেঁটে-খাটো হলেও মধ্যবিত্ত স্মার্টনেসের অভাব নেই। শিবাজী ঠিক করতে পারল না, পুনরায় বসবে কি বসবে না।

নিস্তব্ধতা ভেঙে বিলুই প্রথমে বলল, আপনি কি এখনই উঠতে চাইছেন?

—হ্যাঁ, না মানে...। শিবাজী ম্লান হেসে বলল।

—না, না ঠিক আছে। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। বরং বাইরে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালই হবে। চলুন, আমি আপনাকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে

আসি। চলুন।

শিবাজী একটু বিমূঢ় হয়ে গেল। ক্ষীণ বাধা দিতে গিয়েও পারল না। বিলু থমথমে গলায় বলল, আপনার বোনের ছবি আমি দেখেছি। পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা ভীষণ রিলেটিভ। ও বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে, আপনার সঙ্গে আমার কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে। চলুন, বলব।...

পথে চেনাশোনা কয়েকজনের সঙ্গে বিলুর দেখা হল, টুকরো-টাক্‌রা কথাও হল। বিলুকে পাড়ার অনেকেই চেনে। ওর সঙ্গে অনেকেরই আলাপ আছে—শিবাজী দেখল পরিচিতদের মধ্যে একজন ওকে রাজা বলে ডাকলেন। তা হলে বিলুর ভাল নাম কি রাজা। রাজাগোপাল! নন্দগোপাল, ননীগোপাল, ব্রজগোপালের সঙ্গে মিলিয়ে! শিবাজী নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে ভাবল। বিলু খুব মন্থর পায়ে হাঁটছে। দুটো পুকুর ও সুউচ্চ ওয়াটার রিজারভারটা ডানদিকে রেখে একটা বিরাট খেলার মাঠের পাশে এসে বিলু বলল, আপনি আসার সময় এদিক দিয়ে এসেছেন?

একটু চিন্তা করে, চারদিকে তাকিয়ে শিবাজী বলল, ন্-না। রিকশাটা এপথে আসেনি। এই খেলার মাঠটা তো কই...

—সরি, সরি। আপনি তো রিকশায় এসেছেন। হ্যাঁ, রিকশা তো এদিকে আসবে না। বড় রাস্তা দিয়ে আপনাকে নিয়ে এসেছে। বিলু একটু লজ্জা পেয়ে বলল।

—লোকালিটির মধ্যে এত বড় মাঠ খুব একটা দেখা যায় না কিন্তু। শিবাজী মাঠটার দিকে আঙুল তুলে বলল।

—ঠিকই বলেছেন। সারা চন্দননগরে এমন প্লে-গ্রাউন্ড ক'টা আছে হাতে গুনে বলা যাবে। বিলু মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল।

ওরা নীরবে মাঠের ধার দিয়ে হেঁটে এল। আবার রাস্তার দু'পাশে বাড়ি। জমাট লোকালয়। ওই মাঠে যারা বসে আছে, গল্প করছে, যেসব বাচ্চারা ঝপ্ করে সন্ধ্যা নামার আগে শেষবারের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে তারা এবার এই বাড়িগুলোতে ফিরে আসবে। কোনও একটা আবাস থেকে শাঁখ বাজার শব্দ ভেসে এল।

—আপনি এখন রিলাক্সড্ ফিল করছেন তো? বিলু সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করল।

ঠিক বুঝতে না-পেরে শিবাজী অবাক-চোখে বিলুর দিকে তাকাল।

—আমাদের ওই চিড়িয়াখানা-বাড়িতে বসে থাকতে আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল, আমি জানি। আপনার জায়গায় আমি হলে, আমারও হতো।

ভদ্রতার খাতিরে শিবাজী একটু জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করল, না না, অসুবিধে হবে কেন! আপনার বাবা, বোন—এঁরা যথেষ্ট আপ্যায়ন করেছেন।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলু বলল, কিন্তু ওই নেড়ি কুকুরগুলোর রিসেপশন নিশ্চয়ই আপনি জীবনে ভুলতে পারবেন না।

নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল শিবাজী। পারল না। সত্যিই ওই কুকুরগুলো ওকে সহজভাবে এক মুহূর্ত বসতে দেয়নি। একটা অদৃশ্য আতঙ্কে সর্বক্ষণ ভুগিয়ে ছেড়েছে। কষ্ট করে হেসে শিবাজী বলল, ওগুলোকে দেখে আমি বেশ আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। এখনও কেমন যেন লাগছে।

—আপনি তো তাও ঘণ্টাখানেক বসেছেন। কয়েক দিন আগের দুটো পার্টির একজন তো তেতলায় উঠেই ভয়ে পালিয়ে গেলেন। আর অন্যজন তো বাবাকে স্পষ্ট বলে ফেললেন, এটা কী ধরনের ইয়ার্কি মশায়, ছেলের বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়ে বাড়িতে ডেকে এনে কুকুরের ভয় দেখাচ্ছেন! তাও আবার রাস্তার ঘিয়েভাজা নেড়িকুকুর! যত্তো সব!...জানেন, এইসব দেখলে হাসিও পায়, আবার বুকটা ব্যথায় ভরে ওঠে।

—কিছু মনে করবেন না, আপনার বাবা কিন্তু একটা বাজে ধারণার বশবর্তী হয়ে আছেন। আপনি তো ওগুলোকে তাড়িয়ে দিলে পারেন!

—অনেকবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, আমার বিয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়াই ঠিক হয়নি।

—তা কেন! প্রবলেম সব পরিবারেই থাকে, আছে। সেগুলোকে আমরা সবাই ওভারকাম করতে চেষ্টা করি। তাই না!

—হয়তো বিলু হতাশ গলায় বলল, জানেন, আমার মায়ের মৃত্যুর কারণ ওই কুকুরগুলো।

—তার মানে! শিবাজী আঁতকে উঠল, কামড়ে দিয়েছিল বুঝি!

—না। কামড়ায়নি। তার চেয়েও মারাত্মক। একবার মায়ের হাতের চেটোর ওপরে গরম জল পড়ে পুড়ে যায়। পোড়া জায়গাটায় প্রথমে ফোস্কা হল। তারপর ফোস্কাটা ফেটে গিয়ে হল দগদগে ঘা। হাতে ব্যান্ডেজ না-বেঁধে ওই অবস্থায় মা কুকুরগুলোকে খেতে দিত। একদিন একটা কুকুর ওই ঘা-টা হঠাৎ চেটে দিল। মা কাউকে কিছু বলেনি। এরপর কী হল জানেন? বিলুর গলার স্বরে ক্রোধ আর অশ্রু যেন মিশে আছে।

—কী! শিবাজী দম বন্ধ করে কোনওরকমে বলল।

—ঘায়ের জায়গাটা সেপটিক হয়ে গেল। মায়ের ফরসা হাতটার রঙ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছিল একটু একটু করে। প্রথমে বেগুনি, তারপর কালচে লাল, এরপর হলদেটে। আরও কী হতো জানি না। তার আগেই মা তিনদিন হাই ফিভারে ভুগে মারা গেল। একেবারে আমাদের চোখের সামনে। কুকুরে চেটে দেওয়ার ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুকে মা যখন বলেছিল, তখন সব কিছু হাতের বাইরে চলে গেছে।

শিবাজী স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিলুর মুখের দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। এত বড় দুর্ঘটনার পরও কুকুরগুলো শুদেব বাড়িতে আছে কী করে! আশ্চর্য! ব্রজগোপালবাবু কি বদ্ধপাগল হয়ে গেছেন! বিলুরা এমন অভাবনীয় শোক সহ্য করতে পারল কীভাবে! শিবাজী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, তবু, ওই কুকুরগুলো...।

—হ্যাঁ, তবু ওই কুকুরগুলো আমাদের বাড়িতে বহাল তবিয়তে আছে। সংখ্যায় বাড়ছে। দখল করে নিয়েছে প্রায় পুরো ছাদটা। ভাবতে পারেন!

—এবার আপনার একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

—না দাদা, আমি আর এইসব ইক্সেনট্রিক ব্যাপারের মধ্যে নেই। বাড়িতে থাকতে হয় আছি। মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি তো বাবার সঙ্গে কথাও বলি না। বিয়ে করেই বউ নিয়ে আলাদা হয়ে যাব। বোনটার জন্যে একটু মন খারাপ হবে। কিন্তু

কিছু করার নেই। সুস্থ মানুষ ওখানে থাকতে পারবে না। বিয়ের পর আমাকে আলাদা সংসার পাততেই হবে।

শিবাজীর বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। বিলু অন্যভাবে নিজের ভবিষ্যৎটাকে ভেবে রেখেছে। অথচ অন্যদিকে ব্রজগোপালবাবুর মাত্র একটি প্রত্যাশা আর একটি চাওয়া। বিলু যা করতে চাইছে, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার শুকসনাতনতলার ওই বাড়িটা একটু একটু করে শ্মশান হয়ে যাবে, এটাও কাম্য নয়। এই তীব্র সংকটের মূলে যেগুলো, সেগুলোকে বাড়ি থেকে মেরে কেন তাড়িয়ে দিচ্ছে না বিলু, তাও শিবাজীর কাছে স্পষ্ট নয়। অসুবিধেটা কোথায়? ব্রজগোপালবাবু তো সেই অর্থে ডগ লাভারও নন! বিলুও কি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে, ওই পাতি নেড়িকুকুরগুলোর ভয়ে ওদের ভাড়াটেটি কাবু হয়ে আছেন! নাকি বিলু সমস্ত ব্যাপারে নিস্পৃহ হয়ে গেছে! নাকি ও চাইছে শেষ দেখতে! মায়ের মতনই বাবার করুণতর পরিণতি।

—আপনি কিছু বলছেন না যে! বিলু সামান্য গম্ভীর গলায় বলল।

—কী বলব বলুন তো! এ আপনাদের সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপার!

—আচ্ছা, বাবা তো আপনার সঙ্গে খুব কথা বলছিল, তার মধ্যে একবারও কি মায়ের কথা বলেছে।...এই যেমন মা কীভাবে মারা গেল, মা কেমন ছিল...

—না সেভাবে কিছু বলেননি। তবে আপনার মায়ের প্রসঙ্গ দু'-তিনবার উঠেছে। শিবাজী আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল।

—আমি জানতাম বাবা এসব বলবে না। অপরাধী যে! জানেন, পাড়াতে অনেকে আমাকে ভালবাসে। এখানকার ইয়ংস্টার স্পোর্টিং ক্লাবের আমি কালচারাল সেক্রেটারি। ফলে নানা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে পাড়ার লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে। আমাকে সামনে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু আড়ালে ওইসব কুকুর-ফুকুর নিয়ে হাসাহাসি করে।

—তা অবশ্য করতেই পারে। শিবাজী বলল, ব্যাপারটা তো খুব আনইউজুয়াল! অবিশ্বাস্য। না-দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না!

—তা হলে বুঝুন আমাকে কেমন মেন্টাল ডিস্টারবেন্সের মধ্যে থাকতে হয়। মানুষের জীবনে বিয়েটা কত সুখ-আনন্দ, আমোদ-আহ্লাদের অবলম্বন হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে দেখুন—ওটা একটা মুক্তির উপায়। আলাদা হয়ে যাওয়ার একটা ছাড়পত্র। তাই না, বলুন!

বিষাদগ্রস্ত মানুষের মতো ক্ষীণকণ্ঠে শিবাজী শুধু বলল, হ্যাঁ।

এখানে রাস্তাঘাটে কলকাতার মতো পর্যাপ্ত আলো নেই। একটা পাটকেল রঙের বাড়ির সামনে এসে শিবাজীর মনে হল, আসার সময় চলন্ত রিকশা থেকে বাড়িটাকে দেখেছিল। হয়তো কোনও ফ্ল্যাট বাড়ি। বেশ উঁচু। ছ'-সাততলা হবে। আলো-আঁধারিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। এই সব মফস্বল শহরের মানুষের জীবনযাত্রা মেট্রোপলিটন সিটির মতো হয়ে যাচ্ছে। চন্দননগর বনেদি জায়গা। এখানকার একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। ঐতিহ্য আছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হচ্ছে না। ছোট্ট পরিবারগুলোও অদ্ভুত সব সংকটে ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। আবার এরই মধ্যে পুরনো দিনের

মানুষেরা কামনা করছেন, স্বপ্ন দেখছেন লক্ষ্মীশ্রীর স্পর্শে ভেঙে-যাওয়া ঘর গড়ে তুলবে কোনও এক নারী। নতুন প্রজন্ম এখন প্রচণ্ড সেলফ সেন্টার্ড। তাদেরও অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। পরিস্থিতিই মানুষকে চালাচ্ছে। মানুষ পরিস্থিতিকে নয়। শিবাজী হঠাৎ মনে মনে হেসে ফেলল। ওবই বয়সী একটি যুবকের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ও বুড়োদের মতো চিন্তা করছে কেন? ওর নিজের জীবনেই তো কত সমস্যা। অন্তত এই বিয়ে-থার ব্যাপারে। বোনের বিয়ে-হওয়া, না-হওয়ার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছে শিবাজীর বিবাহিত জীবন। ও মনেপ্রাণে চায় অলির বিয়েটা আগে হোক। তারপর নিজের কথা ভাববে। এটা ঠিক, মানুষকে যে বিয়ে করতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। বিয়েটা জীবনযাপনের কোনও শর্তও নয়। তবু এই একটি কৃত্যাকে বরণ করে নিতেই হয় প্রাণের প্রবাহটিকে অব্যাহত রাখার জন্য। পৃথিবীর জীবনের স্পন্দন এখনও ধ্বনিত হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরের ভেতর দিয়ে।

বাড়িতে গিয়ে শিবাজী যখন শুকসনাতনতলার ইতিবৃত্ত বলবে তখন কেউই বিশ্বাস করবে না। অলি হেসে কুটিপাটি হয়ে যাবে। মা বলবে, ওরে বাবা, ওসব পাগল-ছাগলদের বাড়ি আর যাসনি। কুকুরের প্রসঙ্গটাকে বাবা তেমন পাত্তা দেবে না। বরং বিয়ের পর, বিলুর ওই আলাদা হয়ে যাওয়ার মানসিকতাটাকে বাবা কিছুতেই সমর্থন করবে না। উপরন্তু ব্রজগোপালবাবুর স্বপ্নের দাম দেবে।

একটা সুদৃশ্য দোতলা বাড়ির সামনে এসে বিলু বলল, এটা আমার কাকার বাড়ি। উনি পোর্ট ট্রাস্টে চাকরি করেন।

—আপনি যেন কোথায় আছেন? শিবাজী আলতো করে জিজ্ঞেস করল।

—রাইটার্সে। হোম পার্সোনেল অ্যান্ড এ. আর. ডিপার্টমেন্টে। প্রয়োজন মনে করলে অফিসে গিয়েও আমার খোঁজ-খবর করতে পারেন।

একটু অবাক হয়ে গেল শিবাজী। এখনও কোনও কথাই ম্যাচিওর করল না, অথচ বিলু ওর সম্পর্কে গোপন তদন্তের কথা বলছে। পাত্র হিসেবে বিলু কি খুব সিধেসাদা, চাঁছাছোলা টাইপের! কোনও রহস্য, অতিভাষণ, গোপনীয়তা কি পছন্দ করে না! নাকি বিলু ধরেই নিচ্ছে, অলিকেই ও বিয়ে করতে চলেছে! শিবাজী একটু বোঝার চেষ্টা করল। কিছু না-ভেবেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনার বোনের বিয়ের ব্যাপারে কিছু চিন্তা করছেন না!

—ওই এক জায়গায়, আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। দেখেছেন তো, বুলিকে দেখতে খারাপ নয়। একসময় ভাবতাম, ও প্রেম-ট্রেম করে। এখন দেখছি, তাও নয়। জানেন, বাবা যেমন অখাদ্য কুকুরগুলো পুষেছে, তেমনি বুলি একগাদা বিড়াল পুষেছে। দোতলায় গেলে দেখতে পেতেন। নেড়িগুলোর দাপটে বিড়ালের পাল কোথাও নড়ে না। দোতলাতেই থাকে। বুলিটারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, অফিসে একজন বলেছিল, যেসব মেয়েরা গাদাখানেক বিড়াল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তাদের নাকি কোনও অরগানিক সেক্স নেই! সত্যি!

শরীরটা সামান্য সিরসির করে উঠল। শিবাজ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। এমন উদ্ভট তত্ত্বের কথা ও আগে কখনও শোনেনি। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য শিবাজী বলল, কিছু মনে করবেন না, ধরুন যে আপনার স্ত্রী হয়ে আসবে, সে যদি কুকুরগুলো সরিয়ে

দিতে পারে, তা হলে তো নিজের বাড়িতেই থাকবেন! না কি এরপরও আলাদা হয়ে যাবেন?

ভুরু কুঁচকে বিলু তাকাল। থমথমে মুখে বলল, আমার আলাদা হয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে আপনি সাপোর্ট করতে পারছেন না, তাই না!

—ঠিক তা নয়। আসলে ওই সামান্য রাস্তার কুকুরগুলোর জন্যে একটা সংসার ভেঙে যাবে...। আমি কিন্তু অন্য কিছু মিন...। শিবাজী থেমে গেল। ওর মনে হল, বিলুর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করার, কৌতূহল দেখানোর অধিকার ওর নেই। আর অলির তো এখানে বিয়ে হচ্ছে না! অতএব এসব বলার দরকারই বা কি! ভারী হাওয়াটাকে কাটানোর জন্যে শিবাজী হেসে বলল, আমাদের ভাই-বোনের ডাকনামের সঙ্গে আপনাদের ডাকনামের বেশ মিল আছে। বিলু-বাবলু। বুলি-অলি।

বিলু এবার হেসে ফেলল। বলল, তাই নাকি! বাঃ।

অদূরে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। রাস্তাব ধারের একটা শিরিষ গাছের নীচে এসে বিলু দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত ভেবে শিবাজীকে বলল, যদি মনে করেন, তা হলে আপনার বোনকে গিয়ে একদিন দেখে আসব। আমি আবারও বলছি, রূপ-টুপ আমার কাছে কোনও ক্রাইটেরিয়া নয়। একটি ভাল, সিমপ্যাথিটিক মেয়ে হলেই যথেষ্ট।

শিবাজী কোনও উত্তর দিল না। কীই বা বলার আছে! বিলু কি বিয়ে করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে! শিবাজী রাস্তায় দু'বার চটি ঘষল।

—বল এখন আপনার কোর্টে। বিলু একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

এবারও নিরুত্তর থাকা ছাড়া শিবাজীর আর কিছু করার নেই। ও কেবল মৃদু হাসল। এক-পা দু-পা করে ওরা স্টেশন এলাকার মধ্যে ঢুকে এল। সামান্য শীতের আমেজ। রিকশা স্ট্যান্ডের পিছনে বড় বড় দুটো গাছে ঘরে-ফেরা পাখিরা কলতান জুড়ে দিয়েছে। শিবাজী হাওড়া থেকে রিটার্ন টিকিট কেটেই এসেছে। এখন শুধু একটা ডাউন ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করা। অস্বস্তি কাটাতে শিবাজী অন্যদিকে মুখ ঘোরাল।

—একটা কথা বলব! আচমকা নীরবতা ভেঙে হাসতে হাসতে বিলু বলল, আপনি নিশ্চয়ই বিয়ে করেননি। তা হলে একটা কাজ করলে হয় না, সেই যে পাল্টিঘর যাকে বলে! আপনি বুলিকে বিয়ে করলেন, আমি আপনার বোনকে! হাঃ হা! বিলু শব্দ করে হাসল।

রাগ করার বদলে শিবাজীও জোরে হেসে উঠল; কিন্তু ওর স্পষ্ট মনে হল, ওদের দু'জনের হাসির শব্দ চাপা হাহাকারের মতো অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সাঁঝভিক্ষা

দশাশ্বমেধ লজের ভগীরথ এখনও বেঁচে আছে। কুড়ি বছর আগের এক করুণ সন্ধেবেলায় ওকে দেখে রাধারানী চমকে উঠেছিল। লজের সদরে বসে খুব কাশছিল ভগীরথ। মনে হচ্ছিল, কাশতে কাশতে বুঝিবা ওর প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে। রোগা ডিংডিঙে চেহারা, সেই সঙ্গে হাঁপানি। বেঁচে থাকার কষ্টের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ভগীরথ কুড়িটা বছর পার করে দিল। হয়তো আরও কুড়ি বছর...। রাধারানী অবাক হয়ে ভাবে।

বাবা বিশ্বনাথের গলিতে কিংবা ঘাটের কাছে দেখা হলে ভগীরথ আজও বলে, কী ঠাক্‌মা, কেমন আছ? সারা কাশীতে ওই একটি মানুষই রাধারানীকে চেনে। হয়তো এখনও মনে রেখেছে রাধারানীর অতীত পরিচয়। এই কাশীতে, বাবা বিশ্বনাথের বারাণসীতে ওর আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই। কয়েকশো ভিখারিনী বিধবার মধ্যে রাধারানী একজন। ধর্মশালার বারান্দায় অথবা দেউড়িতে কিংবা কোনও ভগ্ন-ভুতুড়ে বাড়িতে যারা রাত্রে ঘুমোয়, নগরপালিকার নোংরা কলঘরে প্রাতঃকৃত্যাদি সারে, পুণ্যতোয়া গঙ্গায় স্নান করে, তারপর সারাদিন ঘাটের সোপানে, রাস্তার ধারে কিংবা কোনও মন্দিরের দোরগোড়ায় এনামেলের কানা-উঁচু থালা নিয়ে, ছেঁড়া থান পরে যারা বসে থাকে পেটের জ্বালায়, বেঁচে থাকার দুঃসহ অঙ্গীকারে।

রাধারানীর জীবন থেকে কুড়ি কুড়িটা বছর ঝরে গেল এই পরিচয়ে। নিজেকে আজ আর অন্য কোনও পরিচয়ে ভাবতেও পারে না। ভগীরথ ওই যে বলে ঠাক্‌মা, ওটা তো কথার কথা। যে কোনও বাঙালি বুড়ির জন্যে খুব চেনা সম্বোধন। রাধারানীর জীবনে ঠাক্‌মা শব্দটার আলাদা কোনও মানে নেই, দ্যোতনা নেই। সে কার ঠাকুমা, তার নাতি-নাতনিই বা কারা! কোথায় থাকে সেই আত্মার আত্মীয়রা?

ভগীরথ ওকে অলীক পরিচয়ে ডাকে। ত্রিভুবনে রাধারানীর কেউ নেই। থেকেও নেই। আর নেই বলেই আজ কাশীর পথে পথে তাকে ভিক্ষে করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। রাধারানী কতদিন ভেবেছে, ভগীরথকে বলবে, আমাকে কেন ঠাক্‌মা বলে ডাক গো! শুধু বুড়ি বলবে। বুড়ি, বুড়ি...। বাঁশের দোলায় চড়ে যেদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়ে পৌঁছব, যখন চিতায় উঠব, তখনও আমাকে সবাই ওই বুড়ি বলেই ডাকবে। রাধারানী নামেও কেউ ডাকবে না।

এগুলো অভিমানের কথা নয়, পদে পদে হাড়ে হাড়ে সত্যি। দুঃখ আর যন্ত্রণা বুকের ভেতর জমে জমে পাহাড় হয়ে গেছে। সেই নিরেট পাথুরে পাহাড়ের চুড়ো রাধারানীকে নীচে ফেলে রেখে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তাই আজকাল আর

আলাদা করে কোনও কিছুতে অভিমান হয় না, কষ্ট নয়। কেননা জীবন বলতে তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন শুধু দু'মুঠো খেয়ে দিনাতিপাত। কেউ দেখার নেই, শোনার নেই, সাথী হওয়ার নেই।

অথচ কুড়ি বছর আগেও রাধারানীর একটা পরিচয় ছিল, আশ্রয় ছিল, সামান্য হলেও স্বাদ-আহ্লাদ ছিল, দিন-রাত্রি-শীত-বর্ষা-গ্রীষ্ম ছিল। রাধারানীর আশপাশে কিছু মানুষও ছিল। বোনপো গোপাল, ওর স্ত্রী ইলা, ওদের দু'বছরের ছেলে নিতাই, মুনিষ ক্ষ্যাপা দাসু, দাসুর মেয়ে সুধা। আরও কেউ কেউ। তাদের মুখ মনে আছে, নাম স্পষ্ট স্মরণে নেই। তবে বীরভূম জেলার উত্তরবাদানপুর গ্রামের সজল-সবুজ বিরাট ছবিটা রাধারানী আজীবন বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াবে। দক্ষিণবাদানপুরের শ্বশুরবাড়ি থেকে বিধবা হয়ে একমাত্র সন্তান তপুকে অপঘাতে হারিয়ে উত্তরবাদানপুরে দিদির কাছে চলে এসেছিল রাধারানী। দিদির অবস্থা তখন ভাল। জামাইবাবু কোনও আপত্তি করেনি। গোপালের তখনও বিয়ে হয়নি, পঁচিশ বছরের তরতাজা যুবক।

প্রথম প্রথম খুব মরমে মরেছিল রাধারানী। যতই দিদি হোক, বলতে গেলে পরের আশ্রয়ে। দক্ষিণবাদানপুরের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওকে চলে যেতে বলেনি। কিন্তু ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছিল এমন অপয়া বউ, স্বামীখাকী, ছেলেখাকী মেয়েছেলেকে তারা রাখতে নারাজ। তপুর বাবা মারা গেছিল দু'দিনের ভুতুড়ে জ্বরে। রামপুরহাটের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত পায়নি রাধারানীর আত্মীয়রা। তপুর মৃত্যু অপঘাতে। আষাঢ়ে এক প্রলয়ঙ্করী বৃষ্টির বিকেলে ছেলেটা মুকুন্দরাম হাইস্কুলের মাঠে ফুটবল খেলছিল। অতগুলো ছেলে, কারও কিছু হল না। আকাশ থেকে বাজ পড়ল একমাত্র তপুরই মাথায়। একেবারে বেঘোরে প্রাণ গেল ছেলেটার। তখন ওর বয়স ঠিক কুড়ি। কার অভিশাপে, কোন্ পাপে রাধারানীর জীবনজুড়ে নেমে এসেছিল এই অন্ধকার তা আজ আরও গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

এই অপূরণীয় ক্ষতি, এই নিদারুণ আঘাতের জন্যে রাধারানীর মনের মধ্যে কোথাও কোনও প্রস্তুতি ছিল না। ফলে শোকের আঘাত ওকে পাথর করে দিয়েছিল। শরীর, মন, প্রাণ সব যেন তখন জড়বৎ। কোনও সাড় নেই। কোনও বোধ নেই। তপুর কাকা-কাকিরা. এক বালবিধবা খুঁড়ি ননদ মৃদুলা, অন্য সকলে প্রথম প্রথম খুব মুখ চুক-চুক করেছে। আহা রে, বাপুর আমাদের কী কষ্ট! কী নিয়ে বাঁচবে, কী নিয়েই থাকবে!

অথচ এসব যে কথার কথা তা বুঝতে রাধারানীর বেশি সময় লাগেনি। মাস ছয়েকের পর থেকেই সমগ্র দক্ষিণবাদানপুর যেন রাধারানীকে বড় অদ্ভুত চোখে দেখতে শুরু করেছিল। যেন দু'দুটো মৃত্যুর জন্যে রাধারানীই দায়ী। শ্বশুরবাড়ির মানুষগুলো বদলে গেল রাতারাতি। রাধারানী তখন যেন ওদের কাছে একটা দায়, আঁস্তাকুড়ের নোংরা। সকলের ব্যবহারই বলে দিল, ওকে ওরা আর চায় না।

এক কাকভোরে উত্তরবাদানপুরের দিদির আশ্রয়ে চলে না-এলে শ্বশুরবাড়ির লোকগুলো নিশ্চিত তাড়িয়েই দিত। দিদি-জামাইবাবু হয়তো সবই জানত। তাই রাধারানীর সেই সহসা আগমনে ওরা আশ্চর্য হয়নি। যেন এটা ঘটবে, ওরা বুঝতে

পেরেছিল। জামাইবাবু ওকে সাদরে, অন্তরের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিল, তা নয়। সেই মানুষটা দয়া আর অনুকম্পা দেখিয়েছে। এটুকুও রাধারানীর প্রাপ্য ছিল, তাও অবশ্য নয়। তবু দিদির দাক্ষিণ্য আর জামাইবাবুর কৃপায় উত্তরবাদানপুরে নীরবে নিশ্চুপে প্রায় সাড়ে সাত বছর কাটিয়ে দিয়েছিল রাধারানী। দিদির সংসারে কাজের মেয়েদের মতো মিশেছিল। কখনও মাথা তোলেনি, ও যে আছে, সেই কথাটা কাউকে জানতেই দেয়নি। মনের মধ্যে একটা গোপন জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল রাধারানী। সেই ভুবনে সামান্য একটু আনন্দ, আর সুখ। বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু দরকার।

এরই মধ্যে মাঝেমাঝে রাধারানীর মনে হত, দিই জীবনটাকে শেষ করে। কী হবে এইভাবে পরভাতা হয়ে বেঁচে থেকে? নিজের বলে যার কিছুই নেই, তার মৃত্যু ছাড়া আর কী-ই বা চাওযার থাকতে পারে! এসব ভাবতে ভাবতে এক একদিন রাত্রে রাধারানীর ভেতরটা অবশ হয়ে যেত। কিন্তু মৃত্যুকামনা এক জিনিস আর মৃত্যুকে বরণ করা এক জিনিস। রাধারানী পারেনি। বেঁচে থাকার লোভ ওকে কাবু করে ফেলেছিল বলে নয়, জীবনটা যে একেবারে অর্থহীন—এটাও ওর কাছে তখন কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

হয়তো কোথাও একটা অদৃশ্য বন্ধন ছিল। যার গিঁট কিছুতেই খুলতে পারেনি রাধারানী। তবে সাদা চোখে দেখা যায় এমন দু'-তিনটি বাঁধন ওর আসঙ্গলিপ্সাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল সেইসময়। তার একটা গোপালের বউ ইলা। আর অন্যটা ওদের ছেলে নিতাই। আহা, ইলার মতো মেয়ে হয় না। পরজীবিনী, পরাশ্রিতা রাধারানীকে যেন অন্ধকার গহ্বর থেকে আলোয় বের করে আনতে চেয়েছিল মেয়েটা। মাসি বলে গোপালের চেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছে। রাধারানীর চোখে কোনও কারণে জল দেখলে নিজেও কেঁদেছে। রাধারানীর জীবনে তখন ইলা শুধু বন্ধন নয় একটা সাহসী অবলম্বন যেন। আর ইলার ছেলেটা বলতে গেলে তো ওরই কাছে বড় হচ্ছিল। স্নেহের গোপন উৎস আবার খুলে গেছিল, মায়ার ঝরনাধারা কোনও বাধা মানেনি।

উত্তরবাদানপুরের সেই দিনগুলোয় যখন একটু একটু করে স্বপ্নের রঙ লাগছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একদিন দিদি বলল, রাধু, ভাবছি গুরুপূর্ণিমার সময়ে একবারটি কাশী যাব। সাত-দশদিন থেকে আসব। তোকেও নিয়ে যেতে চাই রে। শোক-দুঃখ পাওয়ার পর থেকে এখানেই তো পড়ে আছিস। চল্, একটু বেড়িয়ে আসবি, চল্। দেখবি, ভাল লাগবে। বাবা বিশ্বনাথের দর্শনে সব শোকতাপ কেটে যাবে।

পরান্ন খেয়ে যে বেঁচে থাকে, তার আলাদা কোনও মতামত থাকা উচিত নয়। তবু ওদের খরচের কথা ভেবে রাধারানী প্রথমে রাজি হয়নি। আবার ওইসব তীর্থ-ফীর্থ কেন? গয়া-কাশী-বৃন্দাবন থেকে নতুন করে আর কি পাবে রাধারানী? দিদি বলেছিল, আর কিছু না হোক, শান্তি তো পাবি। দেবতার চরণে আশ্রয় নিলে তিনি কখনও ফিরিয়ে দেন না।

রাধারানীর কাছে এসব স্তোকবাক্যের আলাদা কোনও তাৎপর্য ছিল না। ঈশ্বর বলে সত্যিই কেউ আদৌ আছেন কিনা, সে বিষয়ে একটা সন্দেহের গাছ ওর মনের মধ্যে

ডালপালা মেলে ক্রমশ বড় হচ্ছিল। আর শান্তি কাকে বলে সেটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল রাধারানীর চোখের সামনে। তবু, শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হতে হল ইলা আর গোপালের উৎসাহে। ইলা তো প্রায় অভিমানের সুরেই বলেছিল, মাসি, তুমি না গেলে আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করব। যাবে না কেন? আমরা থাকতে তোমার কিসের দুঃখ শুনি?

অতলান্ত দুঃখের সমুদ্র আর তার নিয়ত কল্লোল উপেক্ষা করে রাধারানী কাশীতে এসেছিল দিদি আর জামাইবাবুর সঙ্গে এক সুন্দর সকালে। টাঙ্গায় করে ওই দশাশ্বমেধ লজে। মোটেই খারাপ লাগেনি। জীবনে সেই প্রথম বাইরে আসা। বীরভূমের বাইরে, উত্তর এবং দক্ষিণবাদানপুরের বাইরে। একটু একটু ভাল লাগছিল এই জায়গাটাকে। কতদিন পরে চোখের কোলে মায়াঞ্জনের মতো মুগ্ধতা এসে জমা হচ্ছিল। বহু মানুষের মেলা, তার মধ্যে যেন ওদের মতো বাঙালিই বেশি। আলাদা করে কাউকেই চোখে পড়েনি, মানুষের ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচ, কালো-ফরসা কিছুই নয়। একটা সমগ্র সৌন্দর্য, পুণ্যতোয়া গঙ্গা, বিভিন্ন ঘাট, ঐতিহাসিক সৌধ আবার ঘিঞ্জি-নোংরা গরু মোষে ভর্তি গলি, গঙ্গার পাড়ে বড় বড় ছাতার তলায় কাশীর ব্রাহ্মণপাণ্ডা, ধর্মশালা—সব মিলিয়ে এক চলমান জীবন।

কাশীবাসের ষষ্ঠ দিনে রাধারানী দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিল একা একা। ভোরবেলায় ভাল-লাগার সঙ্গে একটু আবেগ, একটু সাহসও যেন জন্মেছিল তখন। লজে ফিরে এসে রাধারানী অবাক। দিদি-জামাইবাবু উধাও। সেই সঙ্গে ওদের দু'জনের জিনিসপত্র। ফাঁকা ঘরে কেবল রাধারানীর টিনের তোরঙ্গটা পড়েছিল খঞ্জ অন্ধ বালকের মতো। এমন প্রচণ্ড বিস্ময়ের মুখোমুখি স্বামী কিংবা সন্তানের মৃত্যুর মুহূর্তেও রাধারানী হয়নি। শূন্যঘরের মাঝখানে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছুটে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করার মতো সামান্য শক্তিও ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে লজের দোতলা থেকে নীচে নেমে এসে রাধারানী দেখেছিল বাঙালি ম্যানেজার অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। ওকে দেখেও যেন দেখতে পেল না। ভগীরথ নিপাত্তা। একে তাকে জিজ্ঞেস করে স্টেশনে চলে গেছিল রাধারানী। যদি দিদি-জামাইবাবু ওখানে থাকে! ওরা বলেছিল দশদিন কাশীতে থাকবে। কিন্তু ছ'দিনের দিন ওদের স্টেশনে কেন পাওয়া যাবে—এটা রাধারানীর সামান্য বুদ্ধিতেই আসেনি।

দিনান্তে, অবসন্ন দেহে, খিদে তেষ্টায় কাতর হয়ে রাধারানী যখন লজের পথে পা রেখেছিল, সেই মুহূর্তে একটা ভয়, নিরাশ্রয় হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। কেন জানি না মনে হয়েছিল, ওর আর কোনও অবলম্বন রইল না। কেউ বলে দেয়নি তবু বুকের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছিল এই যাতনা—দিদি-জামাইবাবু ওকে ইচ্ছে করে, আগে থেকে যুক্তি করে এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু কেন? কী ওর অপরাধ? রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাধারানী নীরবে কেঁদেছে। কাউকে বলতে পারেনি এই দুর্দশার কথা, স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যে সেই পরিস্থিতির কথা।

লজে ফিরে রাধারানী দেখেছিল, দোতলার বারান্দায় ওর টিনের তোরঙ্গটা পড়ে

আছে। আর যে ঘরটায় ওরা ছিল, তার দরজায় তালা। এই চরম অপমান ও দুর্দৈবের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা রাধারানীর ছিল না। দিনের আলোর মতো সেদিন পরিষ্কার হয়ে গেছিল তার জীবনে এক লহমায় কী ঘটে গেছে!

টলতে টলতে নীচে এসে রাধারানী দেখেছিল লজের ম্যানেজার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কোথায় যেন বিশ্রী হাসির আভাস। আর চোখে নোংরা ইঙ্গিত। রাধারানী কিছু বলার আগেই ম্যানেজার বলেছে, এখানে কিন্তু আর আসবে না বাপু। তোমার আত্মীয়রা ভাড়া মিটিয়ে চলে গেছে। এখন বাবা বিশ্বনাথের রাজত্বে খুঁটে খাও গে। বেধবা মানুষ তুমি, লোকের কাছে হাত পাতলেই কিছু-না-কিছু পাবে।

পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছিল রাধারানীর। বুকের গহন থেকে চল্‌কে-ওঠা কান্নাকে অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখে ও জানতে চেয়েছিল, আমার কী হবে বাবা।

—ওই তো বললাম। খুঁটে খাবে। কাশীতে কেউ মরে না। ভিক্ষে করার ছলাকলাগুলো শিখে নিলেই হবে। ম্যানেজার কথা বলতে বলতে ওর শরীরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল। রাধারানী সভয়ে পিছিয়ে গেছে। লোকটা ওর একটা হাত খপ্ করে ধরে বলেছিল, আরে, ভয়ের কী আছে! আমরা তো আছি! তেমন বুঝলে তোমাকে এই লজের ঝি করে রেখে দেব। ভিখিরি হওয়ার চেয়ে সেবাদাসী হওয়া অনেক ভাল।

হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে রাধারানী জোর করেনি। ওরা দু'চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছিল অনির্বার অশ্রু। তারই মধ্যে ও জিজ্ঞেস করেছে, আমার দিদি-জামাইবাবু কোথায় আছে বলতে পারেন?

ম্যানেজার কুৎসিত হেসে বলেছিল, পাখি উড়ে গেছে গো মেয়ে! তাদের আর ধরতে পারবে না।

সহসা হাত ছেড়ে দিয়েছিল লোকটা। রাধারানী চোখ তুলে দেখেছিল, ভগীরথ। ম্যানেজার ওকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, ওরে, একে তুই সাবিত্রীবালার কাছে দিয়ে আয়। রাত্রে রাস্তায় পড়ে থাকলে হাবিলদারেরা টানাটানি করবে।

কে সাবিত্রীবালা, কোথায় থাকে সে? ওকে কেনই বা থাকতে দেবে? কিছুই স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না রাধারানী। ম্যানেজার চলে যেতেই ভগীরথ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল, সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু আছে!

কপর্দকহীন রাধারানী নীরবে না বলেছিল। যাদের সঙ্গে এসেছিল, তাদের কাছেই ছিল টাকা-পয়সা। রাধারানী ওসব নিয়ে একদম চিন্তাও করেনি। আর নিজস্ব সঞ্চয় তো তার তেমন কিছুই নেই। হয়তো শ'দেড়েক টাকা। তাও রাখা আছে উত্তরবাদানপুরে, ওর ঘরের ছোট্ট কুলুঙ্গিতে। বেড়াতে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসতে সংকোচ হয়েছিল। যদি দিদি-জামাইবাবু কিছু মনে করে। তার মতো পরজীবিনীর পক্ষে তো পয়সার দাপট দেখানো ঠিক নয়।

ভগীরথ আকাশ থেকে পড়েছিল, তাহলে আজকের রেতের বেলায় খাবে কী! হরি মটর না মটর হরি! কিছু টাকা থাকলে তো তোমাকে কলকেতায় যাওয়ার টিকিটও

কেটে দিতে পারতাম।

মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল রাধারানী। নিজের নির্বুদ্ধিতার এই চরম প্রকাশে নিজেকেই ক্ষমা করতে পারছিল না। আবারও দু'চোখ ছাপিয়ে জল নেমেছে।

কর্কশ স্বরে ভগীরথ বলেছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে আর কী হবে শুনি! চল, তোমাকে সাবিত্রীর ঠাঁইয়ে দিয়ে আসি। ওঃ, সাবিত্রী দিদিমার ভাগ্যটা বেশ ভাল গো! একমাসের মধ্যে তিন তিনটে বেধবা পেল। একটা বেধবা মানেই মাসে দশ টাকা আয়।

কিছু বুঝতে পারছিল না রাধারানী। মনে হচ্ছিল, মৃত্যুর রহস্যও এর তুলনায় অনেক সোজা সাপটা। পাথর পাতা, প্রায়ান্ধকার একটা সরু গলির ভেতরে ওকে নিয়ে গেছিল ভগীরথ। গোবর আর নোংরায় পা ডুবে গেছে। ভগীরথ খুব কাশছিল। প্রায় নির্জন গলির দু'পাশের পুরনো বাড়িগুলোর ততোধিক পুরনো দেওয়ালে ওর কাশির শব্দ প্রতিহত হয়ে তৈরি করছিল এক গা-ছমছম পরিবেশ।

রাধারানী অন্ধের মতো ভগীরথকে অনুসরণ করেছে। বেশ কয়েকটা বাঁকের পর একটা নীচু টালির বাড়ির সামনে থেমেছে ভগীরথ। নীচু গলায় বলেছে, এসে গেছি। দাঁড়াও, সাবিত্রী দিদিমাকে ডাকি।

অন্ধকারের মাঝখানে একটা ভগ্নস্তূপের মতো দাঁড়িয়েছিল বাড়িটা। কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল, কালো কুচকুচে গায়ের রঙের এক বেঁটে মোটা বুড়ি। হাতে লণ্ঠন। রাধারানীকে বাঁকা চোখে দেখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভগীরথকে বলেছিল, আ মলো যা। তোদের কি আর আসবার সময় হয় না! এই সবে টাকা-পয়সা ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে বসেছি। ভুল হয়ে গেলে তুই কি দিবি র‍্যা!

ভগীরথ হাসছিল। হাসতে হাসতে ভয়ংকর কেশেছে। তারপর বলেছিল, ও তোমাদের হিসেবের কড়ি, বাঘে খাবে। তা, শোন গো দিদিমা, এই মেয়েনোকটা তোমার ঠাঁইয়ে থাকতে এয়েছে। জায়গা আছে? রাখতে পারবে কি?

আপাদমস্তক রাধারানীকে পর্যবেক্ষণ করে সাবিত্রীবালা বলেছিল, তুমি কি বালবেধবা, নাকি ভাতার সদ্য সদ্য মরেচে?

রাধারানী কোনও উত্তর দিতে পারেনি। অসহায় চোখে তাকিয়েছিল মহিলার দিকে। —তা বাপু, এসে যখন পড়েছ, তখন আজকের রাতটা থাক। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব। সাবিত্রীবালার গলায় কোনও করুণা ঝরে পড়েনি।

মাথা চুলকে ওদের দু'জনকেই ভগীবথ বলেছে, আমি তাহলে আসি গো! ও নতুন ঠাক্‌মা, তুমি নিশ্চিন্তে ওর বাড়িতে সেঁধিয়ে যাও। কোনও ভয় নেই। যাই হোক আর তাই হোক, তোমাকে বাঁচতে তো হবে।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে ভগীরথ ফিরে সাবিত্রীবালাকে বলেছিল, ও হো বলতে ভুলেছি। এই ঠাক্‌মা কিন্তু রেতের বেলাটা তোমাদের সঙ্গেই খাবে। এনার হাতে আবার কড়ি-পাত্তি কিচ্ছুটি নেই।

সাবিত্রীবালা মোটেই খুশি হয়নি। বিকৃত গলায় বলেছে, খাবে বললেই কি ভাত-রুটি পাওয়া যায়! তার ওপর পয়সা নেই। আমাকে কি ধর্মশালার মালিক পেইচিস।

যা ভাগ্, ওসব খাবার-টাবার হবে না। জল খেয়ে পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকবে এখন।

ভগীরথ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাধারানীর মনে হয়েছিল, এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে ওর একমাত্র চেনা মানুষটিও হারিয়ে গেল চিরতরে। সেদিন রাত্রে জল ছাড়া সত্যিই আর কোনও খাবার জোটেনি। বাড়ির ভেতরে ঢুকে রাধারানী দেখেছে প্রায় বিশ-পঁচিশজন নানা বয়সী বিধবা গাদাগাদি করে দুটো ছোটঘরে আলুথালু কাপড়ে বসে আছে, শুয়ে আছে অথবা আধশোয়া। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ওকে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়ে আবার যে যার নিজের মতো হয়ে গেছে।

বাড়ির ভেতরে দাওয়া আর উঠোন। সাবিত্রীবালার আলাদা ঘর।

ওকে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে মেয়েলোকটা তার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। আলো-আঁধারিতে ভূতের মতো বসে থাকতে থাকতে তন্দ্রায় ঢলে পড়েছিল রাধারানী। কতক্ষণ পরে কে জানে খরখরে গলার আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে বসেছে।

—তা, ও মেয়ে তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়?

মৃদু স্বরে উত্তর দিয়েছে রাধারানী।

সাবিত্রীবালা বাঁকা হেসে বলেছিল, রাধারানী! আবে ও নাম তো বাবুদের দেওয়া নাম। আসল নামটা বল দেকিনি। বঙ্কিমবাবুর নবেল থেকে ওই নামটা কাশী-বেন্দাবনে বেশ চালু হয়ে আছে।

রাধারানী আর উত্তর দিতে পারেনি। তাব বদলে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। সাবিত্রীবালা রেগে গিয়ে চোখ বড় বড় করে বলেছিল, ওমা, এতে আবার কান্নার কী হল! বেধবার আবার সতীপনা! ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর ন্যাকামি করো না বাপু। এখেনে আপাতত থাক। কাল সকালে তোমার ব্যবস্থা করে দেব।

ওর মুখের ওপর আবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সাবিত্রীবালা। জাঁদরেল সেই বিধবার কথার নড়চড় হয়নি। অভুক্ত রাধারানী সেদিন বিনিদ্র রাত কাটিয়েছিল দাওয়ায় বসে। ওর চোখের সামনে অন্য বিধবারা রুটি-তরকারি আর ভেলি-গুড়ের টুকরো খেয়েছে কী ভয়ংকর নিস্পৃহতায়! কেউ ওকে একটা রুটি খেতে দেয়নি।

সাবিত্রীবালার আশ্রয় থেকে ভোরবেলাতেই রাধারানীর পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোথায় যাবে? কোন্ চুলোয়? রক্তের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে সেই আত্মীয়রা যখন ওকে বোঝার মতো মাথা থেকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে গেল তখন রাস্তা ছাড়া আর যাওয়ার জায়গা কোথায়? রাধারানী আর সেই টালির ছোট্ট বাড়িটা থেকে, সরু নোংরা পাথরপাতা গলিটা থেকে বেরোতে পারেনি। একজন পরিত্যক্ত বিধবার জীবনবৃক্ষ কাশীর মাটিতে যেভাবে রুগ্‌ণ ডালপালা মেলে, বিবর্ণ পাতা ঝাঁপিয়ে বেঁচে থাকে, রাধারানীর ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যত্যয় হয়নি। দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিকর্ণিকা, ইস্টিশন, গোয়ালির মোড়, বড়লোকদের হাভেলি, লাক্সা রোড, বিশ্বনাথের সহস্র গলি, বাজার চক—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল রাধারানীর ভিখারিনী সত্তা।

ভিক্ষান্নজীবিনী আর পাঁচজন বিধবার জীবনযাপনের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছিল রাধারানীর সমস্ত পরিচয়।

এখন এই কাশী রাধারানীর কাছে আর তীর্থ নয়। বেঁচে থাকার ধাত্রীভূমি। এখানকার দেবতা চিরকালের উদাসীন। তিনি এখনও পর্যন্ত ওর মুক্তির কোনও পথ করে দেননি। এই কুড়ি বছর কোনও পূর্বপরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়নি রাধারানীর। বীরভূমের কোনও লোক, কোনও মুখচেনা রমণী অথবা পুরুষ। আগে আগে ইলা আর নিতাইয়ের কথা মনে পড়ত যখন-তখন। এখন আর স্বপ্নেও ওরা আসে না। ওরাও তো একবার ওকে দেখতে আসতে পারত। রাধারানীর জীবনের ছোট ব্যাপ্তিটা আরও ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। একবার ভেবেছিল, দিদিকে চিঠি দেবে। কাউকে দিয়ে লেখাবে সেই চিঠি। শুধু জানতে চাইবে, ওর সঙ্গে এই প্রতারণার কি খুব দরকার ছিল! সাবিত্রীদিকে চিঠির কথা বলতেই খিঁচিয়ে উঠেছিল, ওলো, তোর তো দেখছি যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ। কাকে চিঠি দিবি শুনি? যারা কুকুর-বেড়ালের মতো রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে! ওরে, আমাদের কেউ আপনজন নেই।

সে চিঠি আর দেওয়া হয়নি। এই না-দেওয়া, না-পাওয়া, না-চাওয়া আজ রাধারানীর জীবনের শেষ কথা। উনচল্লিশ বছরে যে রাধারানী এখানে এসেছিল, আজ তার বয়স উনষাট। মাথার কাঁচাপাকা কদম ছাঁট চুল দেখে আজ রাধারানী নিজেও কল্পনা করতে পারে না কুড়ি বছর আগে সেই চূর্ণকুন্তলা এক নারীকে!

বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি শেষ হল। একটু পরে ধনী ব্যবসায়ী এবং তাঁদের গিন্নিরা দানধ্যানের পুণ্য অর্জন করতে করতে ঘরে ফিরবে। সরু রাস্তার দু'ধারে বসে থাকা খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, বিধবা, কুঠে, সাধুর ভেকধারী, গরিব দোহারকি, অধম পাপী—আরও কত ধরনের ভিখিরিকে তারা পয়সা দেবে, মুঠো ভরে ডাল-চাল দেবে। বসে অথবা দাঁড়িয়ে শুধু থালা বাড়িয়ে দিলেই হল। অনেকে শেঠেদের পিছনে পিছনে দৌড়তে থাকে। তাদের গায়ে জোর বেশি। ভিক্ষে করে খায়, তবু গতর দেখলে মনে হয় রাজভোগ খাচ্ছে।

রাধারানী ঘাটের কিনারা থেকে উঠে পড়ল। থালা আর ঝোলা-ব্যাগটা সামলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল একটু দ্রুত পায়ে। জায়গা করে বসে পড়তে হবে। তা না হলে কিছুই পাবে না।

এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে দশাশ্বমেধ লজের দিকে আনমনে চোখ চলে যায়। অনেকটা অভ্যেসের মতো; হয়তো ওখানেই ওর বলিদানের কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল বলে।

সেই ম্যানেজার লোকটা মারা গেছে। আগে আগে পথে-ঘাটে লোকটা কয়েকবার বিরক্ত করার চেষ্টা করেছিল। তবে সম্ভবত, সাবিত্রীর ভয়ে খুব বেশি এগোয়নি। পাঁচ বছর আগে সাবিত্রীদিও মারা গেছে। মহিলা দারুণ ভাল মানুষ ছিল তা নয়, কিন্তু কখনও রাধারানীকে ভিক্ষে ছাড়া আর কোনও খারাপ কাজে নামায়নি।

পরাশরের রাবড়ির দোকান, লক্ষ্মীবাবুর সরবৎকুঞ্জ আর আগরওয়ালাদের জর্দার দোকান পেরিয়ে গলির মুখটায় আসতেই ভগীরথের সঙ্গে রাধারানীর

দেখা হয়ে গেল।

—আরে ঠাক্‌মা যে! কোথায় চললে!-ভগীরথ হাসতে হাসতে বলল।

বিষণ্ণ হেসে রাধারানী বলল, তুমি তো জানো বাবা, কোথায়। আমাকে আর জিজ্ঞেস করে লজ্জা দাও কেন? কবে যে এই যন্ত্রণা শেষ হবে!

ভগীরথ যেন লাফিয়ে উঠল, এই রে, তুমি ভাল কথা মনে করিয়ে দিলে গো! গেল হপ্তায় শুনলাম, কলকাতা থেকে যে বাংলা খবর কাগজ আসে তাতে নাকি লিখেছে বেন্দাবনের বেধবাদের কষ্ট ঘোচানোর জন্যে গরমেন্ট ব্যবস্থা নেবে। মাসোহারা দেবো। ওখানকার বেধবাগুলোর অবস্থা নাকি খুব খারাপ। খেতে পায় না, মরতে মরতে বেঁচে আছে।

হাঁ করে রাধারানী শুনছে ওর কথা। একটা কাশির দমক আসছিল, সেটাকে অদ্ভুত কায়দায় গিলে ফেলে ভগীরথ চোখ নাচাল, আসল খবরটা কি জান, বেন্দাবনের বিধবাদের জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করেই গরমেন্ট কাশীর বেধবাদের ভালমন্দ দেখার কাজে হাত দেবে। এবার তোমাদের দুঃখের দিন, কষ্টের দিন ফুরলো গো! তুমি এবার বেঁচে যাবে।

রাধারানী হতবাক্। বিধবাদের কষ্ট মোছাতে গরমেন্ট কেন এগিয়ে আসবে? কী দায় পড়েছে গরমেন্টের। যাদের চোখের জল শুকিয়ে গেছে, আধপেটা খেয়ে খেয়ে শরীর অর্ধেক, যাদেব মনের তন্ত্রীতে আর কোনও সুর বাজে না, তাদের নিয়ে সরকারের এত মাথাব্যথা কেন? ওবা তো কেউ আর দুঃখের দিনগুলোকে গোনে না। যারা মরেই আছে তারা আবার নতুন করে কীভাবে বেঁচে উঠবে?

কৌতূহলগুলো ঠেলাঠেলি করে সব পেরিয়ে আসতে চাইছে, তবু খুব কড়া হাতে তাদের দমিয়ে রেখে খুব নিরাসক্ত ভঙ্গিতে রাধারানী বলল, এসব জেনে আমার কী হবে ভগীরথ!

—সে কী গো ঠাক্‌মা! ভগীরথ অবাক, এবার যে কষ্ট ঘুচবে গো!

ফিকে হেসে রাধারানী বলল, আর কিছু বলবে?

ভগীরথ থতমত খেয়ে মাথা নাড়ল। না, বলবে না।

রাধারানী এবার হাসি মুছে ভারী গলায় বলল, তাহলে আমি এবার যাই! দেরি হয়ে গেলে আর সাঁঝের ভিক্ষে পাব না।

হিমকন্থা

ঘাটের এই কোনাটা গঙ্গা একটু একটু করে খেয়ে ফেলেছে। কোম্পানির আমলের সরু সরু ইঁট দিয়ে বানানো সোপানগুলো ঝুলে আছে ভারি বিপজ্জনকভাবে। যে কোনও সময় হুড়মুড় করে সলিলসমাধিতে নেমে যাবে। মানিকচাঁদের ঘাট বলতে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

এখানটায় কেউ ঘাট-সরতে আসে না। সকলেরই প্রাণের ভয় আছে। একমাত্র মহেশী ভোরবেলা থেকে এই ভাঙা জায়গাটার দখল নেয়। ওর কোনও ভয়-ডর নেই। মহেশীর যত রাজ্যের কাজ ওখানেই সমাধা হয়। নিজের ঝুপড়ির ফোকর থেকে সাধু বামনানন্দ প্রতিদিন দেখে। মহেশী এঁটো বাসনকোসন নিয়ে এলো, মেজে-ঘষে কোমর দুলিয়ে চলে গেল। হয়তো এর কিছুক্ষণ পরেই কাদের সব রঙ-বেরঙের জামাকাপড় ঘাটে এনে ফেলে। ধপাধাপ আছাড়ি-পাছাড়ি মেরে ধোয়াধুয়ি সারে। তারপর চলে যায়। সারাদিন ওখানটায় মহেশী কিছু-না-কিছু করেই। ওর কাজের কোনও বিরাম নেই।

প্রদোষকালে সাধু বামনানন্দের ধ্যানের সময়। গুরুর নির্দেশ। দিনে অন্তত একবার আসনে বসতে হবে। তা সেটা প্রত্যুষে হলেই ভাল হয়। তখন মন বড় পবিত্র থাকে। সূর্যের আলো তখনও গায়ে লাগে না বলে যত সব কামাদি কুসুম পাপড়ি বুজিয়ে রাখে। বামনানন্দ গুরুবাক্য স্মরণ করে, জপাৎ সিদ্ধি বলে বসে পড়ে। ঝুপড়ির অন্ধকারে ভোরের গঙ্গার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভেসে আসে। কোনও কোনওদিন শ্মশানযাত্রীদের স্নানের উল্লাস। রাতভর মড়া পুড়িয়ে দামাল ছোকরাগুলো গঙ্গার বুকে দাপাতে নামে। ওঃ সে কী স্নান! ধ্যানাসনে বসে বামনানন্দের খর্বুটে বেঁটে দেহটা পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে ওঠে। এদিকে জপ-ধ্যানে কোনওদিনই তেমন মন বসে না। বসে থাকাই সার হয়। মনের গতি বড়ই বিচিত্র। ইষ্টনাম জপতে বসলেই যতসব আগড়ম-বাগড়ম চিন্তা মন জুটিয়ে নিয়ে আসে। বামনানন্দের ভারি আশ্চর্য লাগে! তার ওপর আছে মহেশী। ভোরের আলো ফুটবলেই ধ্যানীর চোখের পাতা আপনি খুলে যায়। ঝুপড়ির ফোকর দিয়ে চোখ চলে আসে ভাঙা ঘাটের দিকে। মহেশী আর চোখ বন্ধ করতে দেয় না। কতক্ষণ এভাবে ঠায় বসে থাকে বামনানন্দ বলতে পারবে না। তারপর একসময় নিম্নচাপের ধাক্কায় বামনানন্দ উঠে পড়ে। দিনের পর দিন এইভাবে কেটে যাচ্ছে। এ জন্মে তার আর সাধু হওয়া হল না।

আজ সকালে বামনানন্দ একেবারেই আসনে বসতে পারেনি। কাল রাতে মহেশী আটখানা রাধাবল্লভী, একবাটি ছোলার ডাল, একগাদা ঘণ্টপাকানো তরকারি আর

বোঁদে-রসগোল্লা, ভাঙাচোরা সন্দেশ মিলিয়ে এই এতগুলো ওর ঘরে দিয়ে গেছিল। আশপাশের কোনও শ্রাদ্ধবাড়ির উচ্ছিষ্ট। এসব দেবভোগ্য খাবার-দাবার ন'মাসে-ছ'মাসে একবার-আধবার জোটে। বামনানন্দ চেটেপুটে খেয়েছে। ছোলার ডাল দিয়ে রাধাবল্লভীর স্বাদই আলাদা। তখনই মহেশীকে দীর্ঘজীবনের বর দিয়েছে বামনানন্দ। এই শ্মশানতল্লাটে ওই মেয়েছেলেটাই ওকে একটু গন্যিমান্যি করে। সাধু বলে মানে। সুযোগ পেলেই সাধুসেবা করে। দু'গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে বামনানন্দ শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুশকিল বাধল ভোর রাত থেকে। পেটটা দু'বার মোচড় দিয়ে উঠল। বাপের নাম-ভোলানো মোচড়। আর শুয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। ঘাটের দু'পাশে লোহার জাল আর বড় বড় পাথর ফেলে তৈরি বোল্ডারের ফাঁকে বসে তিন-তিনবার পেট খালি করে যেতে হয়েছে। ভয়ংকর দাস্ত। এবার নিয়ে চতুর্থবার। শরীর কাঁপিয়ে শ্রাদ্ধবাড়ির পাপ হড়হড় করে নেমে আসছে। প্রতিবারই মনে হচ্ছে, শাস্ত্রে একেই বলেছে ভগবৎদর্শন। উবু হয়ে বসে থাকতে কী ভাল লাগছে! এক অনির্বচনীয় আনন্দ।

এবার অবশ্য বামনানন্দের ভয় ধরে গেল। এমন জলের মতো পায়খানা হওয়া ঠিক নয়। গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রাণবাবাজি ল্যাটা মাছের মতো সড়াৎ করে বেরিয়ে যেতে পারে। বোল্ডারের ওপর বসে থাকতে থাকতে মৃত্যুভয় বামনানন্দকে বেশ কাবু করে দিল। এখান থেকে ঘাটের ভাঙা দিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আজ মহেশী এখনও আসেনি। কুখাদ্যগুলো খেয়ে ও মাগীও হয়তো ঘটি ছুঁয়ে বসে আছে। আর নড়তে চড়তে পারছে না।

লোভ বড় বিষম বস্তু। বামনানন্দ ওর বিচিত্রজীবনে অনেকবার দেখেছে লোভের ফাঁদ বড় সাংঘাতিক। একবার তার মধ্যে পড়লে আর রক্ষে নেই। কাল রাতে অতগুলো না-খেলেই হত। মহেশীর আক্কেলই বা কেমন! একেবারে ঢেলে দিয়ে গেল। আর কিছু না হোক, মিষ্টিগুলো অন্তত দু'তিনদিন কৌটোয় রেখে রয়ে-সয়ে খাওয়া যেত। এখন কী যে হবে, গুরুই জানেন। এটা কদিনের ধাক্কা—বামনানন্দ ঠাহর করতে পারল না। লোকের চোখ এড়িয়ে আরও কতবার আসতে হবে কে জানে। ডোমেদের ছোঁড়াগুলো আবার মহাপাজি। বারবার এইভাবে বসতে দেখলে ঢিল ছুঁড়বে। কিংবা গালাগালি দিয়ে অণ্ডকোষ লক্ষ করে আধলাও মারতে পারে। কিছুই বলা যায় না। ওঃ একেই বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

বসিরহাট লাইনের শিহড়ে গুরুর ডেরায় যখন বামনানন্দ ছিল, সে সময় যেসব যোগশাস্ত্র শিখেছে, সেগুলো এখন কোনও কাজেই আসে না। অর্ধেক ভুলে গেছে, মরচে পড়ে গেছে অর্ধেকের গায়ে। এ তল্লাটের লোকজন ওকে সাধু বলে মানলই না। ওর মতো বেঁটে মর্কুটের যেন সাধু হতে নেই। বামনানন্দের জীবনে দুঃখ অনেক। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দুঃখ ওর এই তিন ফুট সাত ইঞ্চি মাপের শরীরটা। আগে তো বটেই, এই সন্ন্যাসীবেশ নেওয়ার পরও দেহটা জাতে উঠল না। এখনও লোকে হাসে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। পেন্নাম করা তো দূরে থাক, সাধু বলে মানতেই চায় না। গঙ্গা আর শ্মশান ঘিরে পড়ে থাকা আর পাঁচটা ভিকিরি-নিকিরির যে-দশা, বামনানন্দের অবস্থা

তার চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নয়। অথচ সাধু দক্ষানন্দ মহারাজের কাছে সাধুগিরির দীক্ষা নেওয়ার সময় বামনানন্দ ভেবেছিল, এবার কপাল ফিরবে। কতো ভেকধারী সন্নেসী শিষ্য-সাবুদ জুটিয়ে করে খাচ্ছে। ওর পূর্বাশ্রমের নাম ধরে ডেকে গুরুদেব একদিন বলেছিলেন, বাবা রাখালদাস, এই বামনাকৃতি দেহই তোমার মহা সহায় হবে। তুমি দেখে নিও, ভক্তবৃন্দ তোমাকে ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ বামনাবতার রূপে পূজা করবে। এমন দেহ ধারণ করাও পূর্বজন্মের সুকৃতি। মা শুচ—শোক কোরো না। আমার আশীর্বাদে তোমার কোনও কিছুরই অভাব হবে না। রাজদ্বারে এবং শ্মশানে তুমি একই রকম আপ্যায়ন লাভ করবে। আজ থেকে তোমার নাম হল সাধু বামনানন্দ।

আরও খানিকটা জল শরীর থেকে পিচকিরির মতো বেরিয়ে এলো। বোল্ডারের ফাঁকফোকর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ওই জল মা গঙ্গার গায়ে গিয়ে পড়বে। বামনানন্দের মনে হল, দাঁড়িয়ে ওঠার শক্তিটুকুও আর নেই। যে-হারে জল বেরিয়ে যাচ্ছে তাতে শরীর আর কত টানতে পারে! শালার গুরুদেবও এক ঢ্যামনা। ওর আশীর্বাদ একটুও ফলেনি। রাজদ্বার তো দূরের কথা, এই শ্মশানে প্রায় প্রতিদিন তাকে যে-হেনস্থা সহ্য করতে হয়, তা দেখলে মড়া মানুষের চোখেও জল আসবে। এখন এক একসময় মনে হয়, আগের জীবনই ভাল ছিল। রাখালদাস মান্নার জীবন। তখন প্রফেসর খাটুয়ার দি গ্র্যান্ড ভিলেজ সার্কাসে জোকারের খেলা দেখাত রাখালদাস। গ্রামের লোকেরাই ওকে পরামর্শ দিয়েছিল, সার্কাসের দলে নাম লেখা। জোকারগিরি ছাড়া তোর দ্বারা আর কিছু হবে না। তোকে খেয়েপরে বেঁচে থাকতে হবে তো! অনেক ভেবেচিন্তে রাখালদাস প্রফেসর খাটুয়ার দলে ভিড়ে গিয়েছিল। মা-বাবা, দাদারা—কেউ আপত্তি করেননি। ওর একটা হিল্লে হতে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। অথচ শরীরের এই বেইমানির পেছনে রাখালদাসের কোনও হাত নেই। একদিন ও নিজেই আবিষ্কার করেছিল, বয়স বাড়ছে, কিন্তু শরীর বাড়ছে না। তিন ফুট সাত ইঞ্চিতে থুপ মেরে বসে আছে। ডাক্তার-বদ্যি-ওঝা—কেউ কিছুই করতে পারেনি। দিন দিন বয়স বেড়ে গেছে। কেবল ওর বাড়-বাড়ন্ত হওয়ার ইতিহাস থমকে গেছে আচমকা।

প্রফেসর খাটুয়া ওকে মান্নাবাবু বলে ডাকতেন। লোকটা এমনিতে খুব গুণী, কিন্তু ভারি কৃপণ। দলের লোকেদের যা পরিশ্রম করাত, তার তুলনায় খাওয়া-পরা-মাইনের পরিমাণ ছিল নগণ্য। প্রায়ই দলের ছেলে-মেয়েরা কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনও সার্কাস পার্টিতে নাম লেখাত। রাখালদাস দল ছেড়ে দিয়েছিল ঘেন্নায়। দর্শকদের সামনে প্রতিদিন একই ধরনের বদ রসিকতা করতে করতে মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। তার ওপর সার্কাসের তাঁবুর জীবন রাখালদাসকে শান্তি দেয়নি। প্রায় ওর চোখের সামনে অন্য খেলোয়াড়রা আশনাই করত। গভীর রাতে মদ খেয়ে প্রফেসর খাটুয়া বেহুঁশ হয়ে গেলে যে যার মনের মানুষকে নিয়ে শুয়ে পড়ত তাঁবুর পর্দা ফেলে দিয়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ওর আর সুবলের তাঁবুটা। দুই জোকারের এই তাঁবুতে মেয়েগুলো ভুলেও আসত না। এক-একদিন সুবল কামের আগুনে জ্বলে-পুড়ে উঠে

রাখালদাসকেই টানাটানি করত।

এসব কতকাল আগের কথা। বামনানন্দ হয়ে যাওয়ার পরও রাখালদাস সেসব ভুলতে পারে না। এখানকার কাউকে সেই সব ফেলে আসা জীবনের কাহিনী ও এখনও পর্যন্ত বলেনি। হয়তো কখনও মহেশীকে বলবে। মেয়েলোকটার শ্রদ্ধাভক্তি আছে। একদিন সময় করে ওকে সব বলবে। বলে একটু হালকা হবে। মহেশী নাকি বালবিধবা। তবে বিধবার মতো থানটান কখনও পরে না। গঙ্গার পাড়ে যেদিকটায় সার সার খড়ের গাদা রাখা আছে, সেখানকার একটা ঝুপড়িতে মা'কে নিয়ে থাকে। লোকে বলে মহেশী গতর খাটিয়ে ইনকাম করে। কথাটার অনেক মানে। মেয়েদের গতর খাটানোর অনেক পথ। বামনানন্দ অবশ্য খারাপ কিছু ভাবে না। মেয়েলোকটার বড্ড দয়ার শরীর। তবে ভীষণ মুখরা। কাউকে রেয়াৎ করে না। কেউ কিছু বললে বাপ-বাপান্ত করে মুখ খারাপ করে। শ্মশানের রেজিস্টরবাবু দু'-একদিন ওকে ধমকধামক দিয়ে বলেওছেন এমন অশ্রাব্য গালিগালাজ করলে এ অঞ্চল থেকে বের করে দেবো। ভদ্রভাবে থাকবে বলে দিচ্ছি।

মহেশী এসব বকাঝকা কান করে শোনে বলে মনে হয় না। ওরও দোষ আছে। গঙ্গায় নেমে প্রায় উদোম হয়ে চান করবে। মহেশীর বয়স কত কে জানে। বালবিধবার বয়স বোঝা ভার। ওকে ওই অবস্থায় দেখে চ্যাংড়া ছোঁড়ারা পেছনে লাগতে ছাড়ে না। আর তখনই যত বিপত্তি। বামনানন্দ ভেবে রেখেছে, একদিন ওকে সন্ধেবেলার নিভৃতে ডেকে নিয়ে এসে বলবে, দ্যাখ মহেশী, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—অর্থাৎ গঙ্গায় নাইতে নেমে যে-নারী দেহ প্রদর্শন করে, আমি তাহার উপর রুষ্ট হই। তাহার সাধুসেবা ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব তুই এমনটা আর করিসনি। অবশ্য মহেশী যদি একটু ধৈর্য ধরে শোনে। বামনানন্দ সব সময় ওর ভাল চায়। মহেশী হয়তো ওরই মতো দুঃখী।

কোনও রকমে ঢাল বেয়ে জলের ধারে গিয়ে বামনানন্দ শৌচক্রিয়াদি সারল। পারাপারের প্রথম খেয়ার মাঝিরা সবে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত-পা ধুচ্ছে। মাথায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে, পুবের আকাশে তাকিয়ে সূর্যপ্রণাম সেরে মুখ ফেরাতেই বামনানন্দ দেখল, একেবারে ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মহেশী হাসছে। কোমরে গামছা জড়ানো। হাতে দাঁতন কাঠি।

বামনানন্দ রাগ করে চোখ নামাল। মহেশী বলল, কি গো সাধুঠাকুর, আজ যে একেবারে ভোরবেলায় জল সরতে এয়েছো! জপ-ধেয়ান করলে না! এ কী গা, তোমার চোখমুখ এমন শুকনো লাগছে কেন? অসুখ করল নাকি!

পেটের কাছটায় খামচে ধরে বামনানন্দ বিকৃত গলায় বলল, কাল রাত্রে ওসব বিষ কেন দিয়ে গেলি? ভোর রাত থেকে পেট ছেড়ে দিয়েছে। এই নিয়ে চার বার হল।

—ওমা, তাই নাকি! আহা রে! তা আমি নয় দিয়েছি, কিন্তু তুমি কোন্ আক্কেলে অতগুলো রাক্ষসের মতো গিল্লে। ওইটুকু পেট। খাবার দেখলে আর নোলা ঠিক রাখতে পারে না—মরণ আর কি!...তা যা হয়েছে, বেশ হয়েছে, মাঝে মধ্যে দাস্ত

হওয়া ভাল। জমানো মল বেরিয়ে যায়। মহেশী হেসে বলল।

—রাস্তা ছাড় দেখি, আমাকে উঠে যেতে দে। গুড়গুড়ে দেহটা এপাশ-ওপাশ দুলিয়ে বামনানন্দ বলল।

—যাও না, এই তো এতটা জায়গা রয়েছে। আমি কি তোমাকে জড়িয়ে ধরে আছি! মহেশী খরখর করে উঠল। তবে যাওয়ার রাস্তাটা কিন্তু ছাড়ল না। ভেতরের দাঁত দিয়ে নিমডালটাকে ভাল করে পিষে নিয়ে বলল, শুনেছ গরমেন্ট নাকি এক নতুন নিয়ম করেছে। আমি কালই কুঠিঘাটায় শুনেছিলুম। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।

—কী? বামনানন্দের পেটের দপদপানি মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। গরমেন্টের নিয়ম মানেই তার মতো গরিব-গুরবোদর ওপর খাঁড়ার ঘা।

কলকাতায় নাকি নিয়ম হয়ে গেছে, এবার থেকে মড়ার খাট-বিছানা সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে। লেপ-তোশক-বালিশ কিচ্ছু বাইরে বের করতে দেবে না। এবার এখানকার শ্মশানেও এই নিয়ম চালু হবে। মহেশী চোখ বড় বড় করে বলল।

—তাতে তোর কি? দিক না সব পুড়িয়ে!

—বা রে, তুমি তো বেশ কথা বললে। গঙ্গার পাড়ের এই ঝুপড়িগুলোয় কি মকমলের বিছানা পাতা আছে? সব তো এই শ্মশান থেকে চেয়েচিন্তে, কিংবা দু'পাঁচ টাকায় কেনা। এবার কী হবে বলো তো! আমাদের সুখের শয্যা গরমেন্ট কেড়ে নিচ্ছে গা! তোমাকে এই শীতে একটা লেপ পাইয়ে দেবো ভেবেছিলাম। আগডোম বুদ্ধিনাথকে আমি বলেও রেখেছি। তোমার কম্বলটার যা দশা। মাগো! একেবারে শতচ্ছিন্ন!

আগডোম মানে অগ্রডোম। মানে ডোমেদের সর্দার। বামনানন্দই মহেশীকে কথাটা শিখিয়েছিল। শিহড়ের আশ্রমে থাকতে দক্ষানন্দ একটু-আধটু সংস্কৃতচর্চা করিয়েছিলেন। শ্লোকফ্লোক যা মুখস্থ আছে, তার জোরে এখনও বামনানন্দ মহেশীর ভক্তি আদায় করতে পারছে। খবরটা খুবই দুঃখের! গরমেন্টের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। এবার মড়ার পেছনে কাঠি করতে লেগেছে। বামনানন্দ শুনেছে, দেশের বহু বড়লোক মানুষ নাকি মরার আগে ডাক্তারি-বিদ্যার পড়ুয়াদের জন্যে দেহ দান করে যান, অন্ধদের জন্য চোখ লিখে দেন। তখন সেই বড় মানুষকে আর পোড়ানো হয় না। আচ্ছা, এখন যদি কেউ তাঁর বিছানাপত্তর গরিবদের জন্যে দলিল করে যান, তখন কী হবে? গরমেন্ট আর পোড়াতে পারবে! বামনানন্দ ধন্দে পড়ে গেল। কয়েক ধাপ উঠে এসে মহেশীকে জিজ্ঞেস করল, কেন পুড়িয়ে দেবে?

—সে এক মজার যুক্তি গো সাধুঠাকুর। ওই সব খাট-বিছানা নাকি রোগভোগ ছড়ায়! শোনো কথা! মড়ার আবার রোগ! কেউ মরে যাওয়া মানেই তো রোগ-রুগী দুই শেষ। তাই না! গরমেন্টের মাথায় গরুর নাদা পোরা আছে। ব্যাটাচ্ছেলে গরমেন্টের সঙ্গে একবারটি দেখা হলে, আমি এসব শুধোতাম।

—অগ্রডোম খবরটা জানে?

—জানে না আবার! ওরা তো খুব গজগজ করছিল। ওদের যে দু'পয়সা কামানোর

পথ বন্ধ হয়ে গেল গো!

—বুঝলি মহেশী, মা যা করেন, তা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যে। তবে ধৈর্য ধরে থাক, দেখবি একদিন এসব নিয়মকানুন লাটে উঠে গেছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মা দুর্গা নিজের মুখেই বলে গেছেন : খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্বতী ব্যচরৎ...ব্যচরৎ তদা। মানে বুঝলি?

সাধুঠাকুরের মুখে সংস্কৃত আর শুদ্ধভাষা শুনলে মহেশী ভারি খুশি হয়। গদগদ ভক্তিতে ওর মাথা নুয়ে আসে। লোকটাকে তখন আর বেঁটেবামন বলে বোধ হয় না। জ্ঞানীগুণী যথার্থ সাধু বলে মনে হয়। ওকে যারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাদের ধরে ধরে তখন চড় মারতে ইচ্ছে করে মহেশীর। এই পোড়া জায়গাটায় আছে কি! যতসব ধান্দাবাজ, কামুক, ছ্যাঁচোড়ের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে এই মানুষটাই একমাত্র সাধুপুরুষ। কারোর সাতে-পাঁচে নেই। সারা দিন পুরনো অশ্বত্থ গাছটার তলায় পুজো-পাঠ নিয়ে পড়ে আছে। একমাত্র এই মানুষটার চোখে কোনও কু-ইঙ্গিত ঝিলিক মারে না। বাদবাকি সবাই খাইখাই করে ঘুরছে। ছেলে-মেয়ে হল না বলেই হোক কিংবা রোগজ্বালা নেই বলেই হোক, দু'কুড়ি বয়স হয়ে যাওয়ার পরেও মহেশীর শরীরের বাঁধনগুলো এখনও তেমন আল্গা হয়নি। চান করার সময় বুড়োহদ্দগুলো যেভাবে তাকিয়ে থাকে, তাতেই মহেশী টের পায়। দেহটা নিয়ে বাজারে নামলে বেশ কিছুদিন করে খেতে পারত। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে মহেশী বলল, এই শোলোকের মানেটা কী ঠাকুর?

আকাশের দিকে হাত তুলে লুঙ্গির মতো করে পরা গেরুয়া কাপড় সামলে একটু যাত্রার ঢঙে বামনানন্দ বলল, মা দুর্গা স্বয়ং বলে গিয়েছেন, খট্বাঙ্গ, মানে শ্মশানের খাট-বিছানা যারা গরিবদের বঞ্চিত করে পুড়িয়ে দেয়, তাদের আমি অচিরেই বধ করব—কুর্বতী ব্যচরৎ তদা। তদা অর্থাৎ কিনা তাদের—দুষ্ট লোকদের।

—যাক বাবা, তাহলে তো মিটেই গেল। মা যখন বলেছেন! কথা বলতে বলতে সাধুঠাকুরের পাশ দিয়ে ঘাটের ভাঙা অংশটার দিকে নেমে গেল মহেশী। ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, আজ সারাদিন কিছু খেয়ো না গো। রাতে সাবুর খিচুড়ি করে নিয়ে আসব।

বামনানন্দ চোখ সরু করে দেখল, কাপড় তুলে পায়ের গোছ বের করে মহেশী জলের মুখোমুখি বসছে।

বিহারের রাজমহল থেকে প্রতিবছর ওই ঢাউস নৌকোটা মানিকচাঁদের ঘাটে এসে ভেড়ে। প্রায় মাসখানেক থাকে। বর্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার মুখটায় ওটা আসে। এই সময় মা-গঙ্গা জলে টইটুম্বুর। জলের তলায় থাকতে থাকতে ঘাটের সিঁড়িগুলোয় শ্যাওলা পড়ে যায়। রাজমহল থেকে নৌকোটা বস্তা বস্তা সুপুরি নিয়ে আসে। ফড়েরা ক'দিন ধরেই ঘুর ঘুর করে। পাটাতন সরিয়ে দেহাতি মাল্লারা যখন বস্তাগুলো বের করতে থাকে, তখন সে এক দেখবার জিনিস। ছোট ছোট চটের বস্তা। নৌকোর পেট থেকে বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। যেন শেষ হতে চায় না। ওপাশের গলুইয়ের ওপরে

বসে একজন পাঁড়ে, সফেদ ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, নিলামদারের মতো দর হাঁকে। লাল খেরোর খাতায় দাম টুকে রাখে। একসময় মাল সব খালাস হয়ে যায়। ক'দিন ঝিম মেরে শূন্য, হালকা নৌকোটা জলের ওপরে ভাসে, হাওয়ায় দোলে। তারপর ফেরার সময় জল-কাদা খাওয়ানো সবুজ-হলুদ পোক্ত বাঁশ, খড় আর নারকোল-ছোবড়ার কাতা নৌকোর গায়ে-পিঠে-পেটে বোঝাই করে মাঝি-মাল্লারা রাজমহলের দিকে ভেসে যায়।

অশ্বত্থ গাছটার তলায় বসে বামনানন্দ সারাদিন বড় নৌকোটার কাণ্ডকারখানা দেখে। কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়। ক্ষুদ্র, ভগ্ন, উপেক্ষিত মানিকচাঁদের ঘাটে নৌকোটাকে মোটেই মানায় না। আশপাশের খেয়া নৌকোগুলোকে ওটার পাশে ভিখিরির মতো লাগে। রাজনৌকোটা অন্য কোনও ঘাটে গিয়ে নোঙর ফেলে না কেন? বামনানন্দ প্রতিবারই ভাবে পাঁড়েজিকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু একথা-সেকথায় ভুলে যায়। বড় নৌকোর মাল্লারা জাতে মুসলমান। সকাল-বিকাল পাটাতনের ওপর সার দিয়ে বসে আজান দেয়। ওরা নৌকো থেকে বড় একটা নামে না। আর নামলেও বামনানন্দের সঙ্গে কথা বলতে ওদের বয়ে গেছে। ওর সঙ্গে এখানকার চেনা লোকজনই যেখানে ভাল করে বাক্যালাপ করে না, সেখানে দূরদেশের মাঝি-মাল্লারা তো অনেক পর, অচেনা মানুষ।

বামনানন্দ ক'দিন ধরি লক্ষ করে দেখছে, এবারের যাত্রায় সেই সৌম্যকান্তি, কপালে হরিদ্রা আর চন্দনের তিলককাটা, পানখেকো পাঁড়েজি আসেনি। লোকটা মরে গেল নাকি! দিনকাল যা পড়েছে, তাতে আর আশ্চর্য কি! শ্মশানের বিছানার দিকে যেখানে গরমেন্টের নজর গেছে, সেখানে ভালমানুষের মরতে কতক্ষণ! ঘোর কলিকালের আর কিছু বাকি থাকল না। বামনানন্দ কার কাছে যেন শুনেছিল, পাঁড়েজি রোজ সন্ধেবেলায় তালপুকুরের দিকে ফূর্তি লুটতে যেত। তা যাক। জলে জলে যাদের মাসের পর মাস থাকতে হয়, তাদের ওসব একটু-আধটু না করলে চলে না। ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার, জীবনের এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে জলবারিধি আগুন নেভাতে পারে না, বরং উস্‌কে দেয়। গুরুদেব বলতেন, বাবা রাখাল, কামাগ্নি বড় ভয়ানক জিনিস। বড় রহস্যময়। ওই আগুন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়ায় সারাজীবন জ্বলে। নিভতে চায় না। বড্ড বেয়াড়া। তা, পাঁড়েজি বেয়াড়াপনা করুক আর যাই করুক, দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল। প্রতিদিন গঙ্গার জলে চান করত। ধূপ আর নকুলদানা চড়িয়ে অশ্বত্থতলার দেবস্থানে পূজা দিয়ে যেত। যেদিন মন-মেজাজ খুব ভাল থাকত, সেদিন বামনানন্দের এনামেলের থালাটায় ঠকাস্ করে ফেলে দিয়ে যেত একটা কাঁচা টাকা। রাজনৌকো মাসখানেক থাকলে পাঁড়েজির কাছ থেকে সব মিলিয়ে পনেরো-ষোলটা টাকা সে পেতই। এবারে সব ভোঁ ভোঁ। নৌকো এসেছে, সুপুরিও এসেছে, কেবল পাঁড়েজি বাদ। কী দুর্দৈব! পাঁড়েজির বদলে এবারে একজন উড়ুম্বর গোছের মাঝবয়েসী লোক এসেছে। বেশ লম্বা-চওড়া। মাথার চুলে অল্পস্বল্প পাক ধরেছে, কিন্তু ঠোঁটের ওপর মিশমিশে কালো গোঁফ। গালের দু'পাশে গোঁফজোড়া ছড়িয়ে আছে। লোকটা এখানে নোঙর করার পর ক'দিন ঘাটের আশপাশে একা একা ঘোরাঘুরি করল। শ্মশানের

দিকটায় গিয়ে দু'দিন মড়াপোড়ানো দেখল ঠায় দাঁড়িয়ে। একদিন গলুইয়ের কিনারে পা-ঝুলিয়ে বসে অপলকে তাকিয়ে ছিল মহেশীর দিকে। মহেশী তখন সেই কাপড়-চোপড় আলগা করে চান করছিল। গত পরশু বামনানন্দ অশ্বত্থতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল পেটভর্তি ছাতু আর গুড় খেয়ে। তিন-চার ফোঁটা বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেছিল বামনানন্দের। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখেছিল, দেবস্থানের চাতালে বসে রাজমহলের লোকটা আপনমনে সিগ্রেট ফুঁকছে। বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

এবারে নৌকোটা কবে এসে মানিকচাঁদের ঘাটে কাছি বাঁধল? বামনানন্দ দিনক্ষণ মনে করতে পারল না। খুব সম্ভবত যেদিন ওর পেট ছেড়ে দিয়েছিল, সেই দিন। কেন না, রাতের দিকে সাবুর খিঁচুড়ি দিতে এসে মহেশী বলেছিল, সাধুঠাকুর, আসার পথে দেখলুম মাঝগঙ্গায় লাল আলোর হেরিকেন জ্বলছে। অন্ধকারে বুঝলুম না, মনে হচ্ছে সেই গহনাটা এয়েছে।

রাজমহলের বড় নৌকোটাকে মহেশী বলে গহনা। বামনানন্দ কোথায় যেন শুনছিল, পারাপারের অতিকায় তরণীগুলোকে বলা হয় গহনার নৌকো। মহেশী এ ভাষা কোত্থেকে জানল কে জানে! আজ সকাল থেকে তিরতিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শীত পড়তে এখনও মাসখানেক দেরি। ঘণ্টাখানেক আগে রাধামাধবের দোকানে গরম চা খেতে গেছিল বামনানন্দ। আদার গন্ধ মাখানো ছোট্ট একভাঁড় চা খেয়ে তৃষ্ণা তো মেটেইনি বরং শীত-শীত ভাবটা গায়ে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে লাগছে। আর একবার চা খেতে পেলে ভাল হত। রাধামাধব লোকটা বিনে পয়সায় একদম কিচ্ছু দিতে চায় না। সাধুসন্তকে এক ভাঁড় চা খাওয়াবে, কতই বা এর দাম, তবু লোকটার স্বভাব—ফেল কড়ি মাখ তেল। কোনও মানে হয়! লোকের দেওয়া ভিক্ষের পয়সা বামনানন্দে হাত থেকে তুলে নিতে রাধামাধবের লজ্জাও করে না। অবশ্য শুধু ওকেই বা দোষ দিয়ে কী হবে! বিনে পয়সায় আজকাল কেউ কিছু দিতে চায় না। সে তুমি সাধুই হও, আর অসাধু! গেরুয়া ধারণ করে একদমই সুবিধে হল না। ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে বামনানন্দ দেখল, একটা সিকি পড়ে আছে। অথচ প্রতি ভাঁড় চায়ের দাম চল্লিশ পয়সা। রাধামাধব দেবে কি? দেখাই যাক্। বাকিতেই খাবে। ও তো আর এ-তল্লাটে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না। বামনানন্দ ওঁ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ বলতে বলতে উঠে পড়ল। খড়গাদাগুলো ছাড়িয়ে একটু বাঁদিকে গেলেই চায়ের দোকান।

অগ্রডোম বুদ্ধিনাথ যেন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল—এমনভাবে চা-দোকানের বাখারির বেঞ্চি থেকে উঠে এসে বলল, এসো গো সাঁধুবাবা, এসো। গরম গরম চায়ে পিয়ে যাও। হোই রাধামোধো, সাঁধুকে বঢ়িয়া চায়ে দেও।

বামনানন্দ দেখল, বেঞ্চিতে সেই রাজমহলের লোকটা বসে আছে। এতক্ষণ হয়তো বুদ্ধিনাথের সঙ্গে কথা বলছিল। ছোট ছোট পা ফেলে কাছে এসে বামনানন্দ একটু অবাক হয়ে বলল, কে খাওয়াবে? তুমি! আমার কিন্তু পয়সা নেই!

—আরে বাবা পয়সার কী দরকার আছে? লাখনবাবু তোমাকে সেবা দেবে। আরে এখানে বোসো। হাঁ, হাঁ লাখনবাবুর পাশে।

লোকটা যে দিকে মুখ করে বসে আছে, একটু ঘাবড়ে গিয়ে বামনানন্দ তার উল্টো দিকে গিয়ে বসল। বেঞ্চটা এত নীচু তবু ওর পা দুটো শূন্যে ঝুলছে। বুদ্ধিনাথ হঠাৎ হেঁ হেঁ করে হেসে ওকে বাচ্চা ছেলের মতো দু'হাতে তুলে এপাশটায় ঘুরিয়ে দিল। ডানার কাছটায় হ্যাঁচকা টানে লেগেছে খুব জোর। ওকে নিয়ে সবাই যেন মজা পেয়েছে! টনটনে ব্যথায় রেগে গিয়ে বামনানন্দ মুখ খিস্তি করে বলল, শালা মড়াখেকোর বাচ্চা, শালা ইতর, বাঞ্চোৎ।

অন্য সময় হলে বুদ্ধিনাথ নির্ঘাৎ ওর জটাজুট ধরে টেনে হিঁচড়ে দু'-ঘা বসিয়ে দিত। আশ্চর্য, আজ ব্যাটা কিছুই বলল না। হেসে একেবারে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। বামনানন্দ রহস্যটা ধরতে পারল না। এই লোকটার পাল্লায় পড়ে অগ্রডোম কি দিনের বেলাতেই নেশাভাং করেছে! চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে বামনানন্দ দেখল, রাজমহলের উডুম্বরটাও হ্যা হ্যা করে হাসছে। লোকটার সুরমাটানা চোখ দুটো একেবারে লম্পটের মতো। ও তাকাতেই লোকটা বলল, আইব্বাস, সাধুবাবা গালি দিচ্ছে!

—এই নাও, চা হয়ে গেছে। রাধামাধব চায়ের গেলাসগুলো একটা চটাওঠা কলাই-করা থালায় সাজিয়ে এগিয়ে দিল।

বুদ্ধিনাথ ওদের দু'জনের হাতে গেলাস ধরিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, সাঁধুঠাকুর তুমার সঙ্গে কুছু গোপন বাত্ আছে। মন দিয়ে শুনে লাও।

লাখনবাবু বুদ্ধিনাথের কথায় সায় দিয়ে চোখ নাচাল। মনে হয়, আগে থেকেই এরা ঠিক করে রেখেছিল, তাই বুদ্ধিনাথ কথা শুরু করতেই রাধামাধব দোকান ছেড়ে, একটা টিনের বালতি হাতে দুলিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেল জল আনতে। রাধামাধবের খড়মের খট্‌খট্ শব্দ মিলিয়ে যেতেই বুদ্ধিনাথ বামনানন্দের পায়ের কাছে মাটিতে উবু হয়ে বসে বলল, এই লাখনবাবুর মহেশীকে চাই। তুমি বেওস্থা করে দাও। বাবু তুমাকে 'শ রুপিয়া দেবে।

যে কোনও প্রসঙ্গের একটা শুরু থাকে, কখনও কখনও শুরুরও শুরু থাকে, কিন্তু বুদ্ধিনাথ যেন কথা আরম্ভ করল একেবারে মাঝখান থেকে। বামনানন্দ আন্দাজে কিছুটা বুঝেও গোবেচারার মতো বলল, মহেশীকে চাই মানে!

—চাই মানে চাই! ওহো, এটা তুমি সমঝাতে পারছ না! বুদ্ধিনাথ চুকচুক শব্দ করে বলল। মাটিতে বেমক্কা রাখতে গিয়ে চায়ের গেলাসটা উল্টে গেল।

—সাধুমহাত্মা কী করে বুঝবে! ওরা কি এসব কাম কখনও করল। লাখনবাবু বিজ্ঞের মতো বলল। যেন বুদ্ধিনাথের ভুল শুধরে দিচ্ছে।

—সেটা সাচ্ বাত। বুদ্ধিনাথ জিভ কেটে কথাটা স্বীকার করে নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বলল, সাঁধু, তুমাকে মহেশী মানে। আমরা জানি। তুমি মহেশীকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে লাখনবাবুর হাতে তুলে দাও। বাবু যে ক'দিন এখেনে আছে, সে ক'দিন ওর ঝোপড়িতে বাবুকে মহেশী ঢুকতে দিক। বিলকুল রাতে।...তেমন মনে ধরলে ওকে লাখনবাবু সাদিও করে লিতে পারে। তুমাকে এটা করে দিতেই হোবে।

বুকের ভেতর হাড়গোড় কাঁপার শব্দ পেল বামনানন্দ। এরা বেশ ভেবেচিন্তে আটঘাট বেঁধে নেমেছে। মহেশী নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনল। তুই দেখছিস,

মানিকচাঁদের ঘাটে একটা লম্পট ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা সত্ত্বেও বুক দেখিয়ে নাওয়া-খোওয়া করার স্বভাবটা তুই বদলালি না! এখন মর! বুদ্ধিনাথ জেনেশুনেই বামনানন্দকে পাকড়াও করেছে। কী ভয়ংকর প্রস্তাব! বামনানন্দ দু'চোখে অন্ধকার দেখল। একমাত্র যে-মেয়েলোকটা ওকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, কারণে-অকারণে খেতে-পরতে দেয়, আজ তাকেই কিনা লাখনবাবুর ভোগের আগুনে আহুতি দেওয়ার জন্য বিধিব্যবস্থা করে দিতে হবে! চায়ের গেলাসটা আর মুখে তুলতে পারল না বামনানন্দ। ওর খর্বাকৃতি দেহটা যেন আরও ছোট হয়ে এক আঙুল পরিমাণে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। শিহড়ের গুরু যদি কিছু হঠযোগ শিখিয়ে দিতেন তাহলে ভেলকি দেখিয়ে এক্ষুনি এদের কাবু করে ফেলা যেত। এমন উদ্ভট পরিস্থিতিতে ছাই ইষ্টনাম পর্যন্ত মনে পড়ে না। তবু এধার-ওধার থেকে সাহস জুটিয়ে এনে চিনচিনে গলায় বামনানন্দ বলল, তা কী করে সম্ভব! মহেশী বড় ভাল মেয়েলোক। বড় ভক্তিমতী। তোমরা এসব কুচিন্তা ত্যাগ করো। ছিঃ ছিঃ!

—হামি কি মহেশীকে খারাপ বলেছি? এতে ছিয়ে বাতের কি হলো সাঁধুবাবা! বুদ্ধিনাথ কড়া গলায় বলল, মহেশীকে লাখনবাবুর চাই-ই চাই। তুমি পারবে কিনা বলো?

চুল্লুখোর অগ্রডোমের চোখ দুটো কুঁচভাটার মতো ঘুরছে। বামনানন্দ দেখল, সামনে সমূহ বিপদ। বুদ্ধিনাথকে ধর্মের কথা বলে লাভ নেই। ব্যাটা বুঝবে না। বামনানন্দ এক্ষুনি একটা জুতসই শ্লোক ঝেড়ে দিতে পারে। কিন্তু ডোমের পো কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে। রাজমহলের এই শয়তান লোকটা হয়তো ওর কথা একটু মান্য করতে পারে। লাখন মানে নিশ্চয়ই লক্ষ্মণ। বামনানন্দ শুদ্ধ উচ্চরণে বলল, দেখুন লক্ষ্মমনবাবু, মহেশীনাম্নী ওই নারী সাক্ষাৎ অগ্নি। উহার দাহিকাশক্তি অসীম। আপনি অন্যত্র ভোগ্যবস্তুর সন্ধান করুন। অন্যথায় আপনি মরিবেন। আমি সাধু। আমাদ্বারা এ কাজ কদাপি হইবে না।

—কেয়া? লাখনবাবু বাঁশের বেঞ্চিতে ঘুসি মেরে গর্জে উঠল। বামনানন্দ বুঝতে পারল, এরা সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। এখন একটাই পথ খোলা আছে, এদের মুখের ওপর 'না' বলে দেওয়া। মরে গেলেও বামনানন্দ মহেশীকে বলতে পারবে না, মহেশী, তুই লাখনবাবুর সঙ্গে শো। এ অসম্ভব। আর কেনই বা বলবে? এ তো নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারার সামিল। এমন তো হতেই পারে—লাখনের সেবাদাসী হওয়ার পর ওর দিকে মহেশী আর ফিরেই তাকাল না। তখন শালা না খেয়ে মরো! কিংবা দিনান্তে ভিক্ষান্ন সম্বল। ওরে বাবা, সে আরও ভয়ের। নিজের হাতে সাধুগিরির কাঁথায় আগুন দেওয়া বোকামি। বামনানন্দ লাখনবাবুর গর্জনে চমকে উঠেছিল। এবার একটু ধাতস্থ হয়ে সোজাসুজি বলল, মহেশী তো রাঁড় নয়, বেবুশ্যে নয়, বাজারিও নয়। সে আপনার সঙ্গে শুতে যাবে কেন বলুন! বুদ্ধিনাথ আপনাকে নাচিয়েছে...। আপনি বিদেশি...।

দাঁত কিড়মিড় করে লাখনবাবু বলল, কেঁউ হামাকে লাচায়নি। হামি তুমাকে দো'শো রুপিয়া দেবে। সাধুবাবা, লেকিন ওহি জেনানা চাহিয়ে...।

—আমি পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও। এ মহাপাপ। বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে নেমে বামনানন্দ কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল।

বুদ্ধিনাথ ওকে খামচে ধরতে যাচ্ছিল। বামনানন্দ বিপদ বুঝে হড়কে সরে যেতেই অগ্রডোম চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়া হারামি তোকে দেখাচ্ছি। তুই কী করে এই ঘাটে থাকিস হামিও দেখে লেবে। শালা বাঁটকুল, তোর সাঁধুগিরি ছোটাচ্ছি। বেটা, মহেশী কা নাঙ্‌!...চলিয়ে লাখনসাব, দিওয়ানাকে লিয়ে দুসরা রাস্তা মিল জাতা হ্যায়।

খড়ের গাদার আড়ালে, প্রায় সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে বামনানন্দ দেখল রাজমহলের অতিথিবাবুটিকে নিয়ে ডোমের পো মহেশীর ঝোপড়ির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। ও নিশ্চিত, পরদেশী লাখনকে ওই বুদ্ধিনাথই নাচিয়েছে। মহেশীর ওপর এখানকার প্রতিটা পুরুষের চাপা রাগ আর লালসা। মহেশী কারুর ধার ধারে না। কাউকে পাত্তা দেয় না। আবার ওর কাছে গিয়ে সুপ্রস্তাব বা কুপ্রস্তাব দেবে তেমন সাহসও কারোর নেই। বুদ্ধিনাথ এবার একটা মওকা পেয়েছে। আর ছাড়বে না। মহেশীকে নষ্ট করে দিয়ে কাম-ক্রোধের শোধ তুলবে।

সারা দিন ভেবে ভেবে বামনানন্দ কোনও কূল-কিনারা পেল না। প্রতিদিনের মতো অশ্বত্থতলায় গেল, নুড়ি-পাথরের দেবদেবীর পুজো করল ফুল-বেলপাতা দিয়ে, দুপুরে রামঅবতারের দোকান থেকে গরম গরম চারটে ঠেকুয়া আর চাটনি কিনে এনে খেলো ঝাল কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, স্নানার্থীদের দেওয়া পেলার পয়সা গুনে তুলে রাখল—সব করল। কিন্তু মন পড়ে রইল মহেশীর ঝুপড়িতে। বিপদ তো শুধু মহেশীর একার নয়, বামনানন্দের নিজেরও। বুদ্ধিনাথ শাসিয়ে রেখেছে। কী করবে বলা মুশকিল। আজ বিকেল থেকেই হয়তো ওর পিছনে লাগতে শুরু করবে। মহেশীকে জড়িয়ে-মড়িয়ে ওর নামে রটিয়ে দেবে নোংরা কুৎসা। আবার যে কোনও ছল-ছুতোয় ধরে ঠ্যাঙাতেও পারে। ঘাট-শ্মশানে ওদেরই তো রাজত্ব। বামনানন্দের মনে হল, গরমেন্ট ঠিক করেছে। মরা মানুষের লেপ-তোশক বেচে ওই ব্যাটারা সারা বছর ধরে কম কামায়! শুধু তুলোই বেচে পাঁচশো-ছ'শো টাকার। এ সব অবশ্য বামনানন্দের অনুমান। তবে বুদ্ধিনাথের ছেলেরা যে রকম কাপ্তেনি করে ঘুরে বেড়ায়, তাতে যে কেউ বলবে, ওদের হাতে অনেক কাঁচা পয়সা। ওরা যদি সত্যিই এখানে থাকতে না দেয়, তাহলে এখানকার পাঠ উঠিয়ে বামনানন্দ আবার শিহড়ের দিকে গুরুর আশ্রমে চলে যাবে। অবশ্য সে আশ্রম যদি এখনও থাকে। গুরু দক্ষানন্দ এতদিনে নিশ্চিত দেহ রেখেছেন। বামনানন্দ যখন শিষ্যত্ব নিয়েছিল, তখনই তাঁর অনেক বয়স। শিহড়ে যদি স্থান না হয়, কুছ পরোয়া নেই। এধার-ওধার ভেসে বেড়াবে। তখন ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। সাধু-সন্ন্যাসীর যা রীতি।

মহেশীকে সকালের দিকে প্রতিদিন যেমন দেখে তেমনই দেখেছিল বামনানন্দ। ওই ভাঙা জায়গাটায়। কিন্তু তখনও এইসব দৈবী দুর্বিপাক ঘটেনি। আবার আজ সারাদিনে একবারও মেয়েলোকটা ঘাট সারতে এলো না। কোথায় গেছে কে জানে। ঠিকে ঝিয়ের কাজ করতে গিয়ে হয়তো দূরে কোথাও চলে গেছে। মহেশীকে সতর্ক করে

দিতে পারলে খুব ভাল হতো। আজ রাত্রেই কিছু একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। একটু পরেই সব আলো মুছে যাবে। বামনানন্দের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এখন ভগবানই ভরসা।

সন্ধের মুখে হঠাৎ এক পশলা ভারী বৃষ্টি হয়ে গেল। সকালের দিকে যেটাকে শীতের আমেজ বলে মনে হচ্ছিল, বৃষ্টির পরে তাকেই মনে হচ্ছে মাঘের শীত। সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। মানুষ আর প্রকৃতি—দুজনে মিলেই আজ উল্টোপাল্টা কাজ-কারবার আরম্ভ করেছে। ঝুপড়ির ভেতর ছেঁড়া কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েও বামনানন্দ কেঁপে উঠল।

বামনানন্দের নীচু, ছোট্ট ঝুপড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে মহেশী ভয়ার্ত গলায় ডাকল, ও সাধুঠাকুর, সাধুঠাকুর!

—কে, কে? বামনানন্দ ধড়ফড় করে উঠে বসল।

—আমি, মহেশী গো। আজকের রাতটা তোমার এখানেই থাকতে হবে। একটু লম্পোটা জ্বালাও দিকিনি।

ওষুধের ছিপি ফুটো করে বানানো কেরোসিন-কুপিটা জ্বালিয়ে বামনানন্দ দেখল মহেশীর চোখ-মুখে ভয়ের চিহ্ন। কিছু বুঝতে না পেরে ও জিজ্ঞেস করল, এত রাতে কোত্থেকে এলি? নিজের ঘরে না গিয়ে...।

—আর বোলো না গো ঠাকুর, ব্যান্ডেলে নাইট শোতে সিনেমা দেখতে গেছিলুম। চপলারা বললে খুব ভাল বই—বেদের মেয়ে জোছনা। তা ভালোই লাগল। কিন্তু এদিকে ফিরে আসার আর ট্রেন পাই না। লাইনে গণ্ডগোল। শেষকালে গুঁতোগুঁতি করে লাস্ট ট্রেনে এলুম গো।...একটু জল খাবো সাধুঠাকুর। দেবে?

মহেশী জল খেলো। জলের ছিটে দিল চোখে-মুখে। তারপর একটু দম টেনে আরও নীচু স্বরে বলল, রাস্তায় আসতে আসতে দূর থেকে দেখি আমাদের ঝোপড়ির কাছে দুটো লোক দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছে। অন্ধকারে বুঝতে পারলুম না। এগিয়ে আসতে শুনলুম একটা লোক বলছে, শালা রেণ্ডি মহেশী বিলকুল হাপিস হো গিয়া। লোকটা হিন্দুস্তানি। গলার স্বরটা চেনা-চেনা লাগল।

—চিনতে পেরিছিস! দম বন্ধ করে বামনানন্দ জানতে চাইল।

—না গো! তবে চেনার অত দরকার কি? বেশ বুঝতে পেরেছি, ওদের বদ মতলব আছে। থাক্ বেটারা দাঁড়িয়ে, আমি ঘুর পথে তোমার কাছে চলে এলাম। এই রাতটুকু থাকতে দাও গো। রাতের অন্ধকারে কে ওদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে। তবে একবারটি ভোর হতে দাও, আমি তারপর দেখছি লোকগুলো কত বড় বাপের বেটা। ধরতে পারলে ওদের হাগিয়ে-মুতিয়ে খাওয়াবো...।

কথা থামিয়ে মহেশী লম্বা হাই তুলল। মুখের কাছে তুড়ি মেরে বলল, নাও ঠাকুর, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো। আজ আবার অকাল শীতে কাঁপাচ্ছে।

মহেশী দেহ পেতে দেওয়ার পর আর কয়েক বিঘৎ জায়গা অবশিষ্ট আছে। তার মতো মানুষেরও শোওয়া অসম্ভব। বামনানন্দ হঠাৎ খুক খুক করে হেসে বলল, মায়ের কি অদ্ভুত ইচ্ছে! মাগো, ইচ্ছাময়ী তারা—কারে দাও মা ব্রহ্মাপদ,

কারে করো অধোগামী।

তারপর ছেঁড়া কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বামনানন্দ মহেশীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, আমার আর হিমকন্থার প্রয়োজন নাই।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মহেশী জিজ্ঞেস করল, হিমকন্থা কি গো।

—ওরে, আমরা যাকে লেপ বলি, দেবভাষায় তাকে বলে হিমকন্থা। মহেশী, তোর মাথার দিব্যি, অগ্রডোমের কাছ থেকে তুই কখনও লেপ চাইবি না। আমরা জিয়ন্ত মানুষ, মড়ার লেপ কেন গায়ে দেবো? বল্!

বুকের কবোষ্ণতায় বামনানন্দকে দু'হাতে ঠেসে ধরে মহেশী বলল, ঠিক বলেছ। আমাদের ওসব লেপের দরকার নেই।

বামনানন্দ দেখল, কুপির আলোটা দপ্‌দপ করছে। যে কোনও সময় নিভে যাবে।